রংমহল

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-
রচিত

সবার সেরা
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
KOLAY
QUALITY SWEETS
KOLAY TOFFEE
Glucose

৫৭-তম ব
প্রথম খণ্ড
প্রথম সংখ্যা

—উপহার দিবার উপযোগী ভাল ভাল বই—

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

মেঘদূত

নিখিল বিরহী-জন-হিয়ার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁর অনুপম কাব্য "মেঘদূত"-এর শ্লোকে শ্লোকে—বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি ক'রে গেছেন—ইহা সেই অক্ষয় "মেঘদূত" কাব্যের সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ। নয়নমুগ্ধকর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত। দাম—সাত টাকা

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির তিন শতাধিক রোবাই বহু যত্নে তাহাদের মূলগত তত্ত্বানুসারে এবং ভাবানুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাট কলেবরে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত। বহু ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে অনবদ্য।

দাম—সাত টাকা

॥ উৎকৃষ্ট মুদ্রণ—চিত্রের [illegible] প্রত্যেক বইখানির বৈশিষ্ট্য ॥

উপহার দিয়া অথবা উপহার পাইয়া

আপনাকে খুশি হইতেই হইবে

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-সম্পাদিত

কুমার-সম্ভব

হাজার হাজার বছর পরেও যে মহাকাব্যখানি রসলিপ্সু প্রেমিকগণের নিকট অসীম আনন্দের উৎস-স্বরূপ হইয়া আছে—ইহা তাহারই বাংলা কাব্যানুবাদ।

বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত। দাম—পাঁচ টাকা

ক্ষীরোদনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

ঋতু-সংহার

পৃথিবীর নিত্য-নূতন রূপ-পরিবর্তনের মাঝে আবেগপ্রবণ প্রেমিকচিত্ত যাহা অন্বেষণ করিয়া ফিরে—এই মহাকাব্যে আছে তাহারই অপূর্ব আস্বাদ। দাম—পাঁচ টাকা

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২৲

অনুপম কাব্যগ্রন্থ।

সুরেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী

বালিকাগণ কিরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজগুণে সকলকে সুখী করিতে পারিবে—তাহাই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝান হইয়াছে। দাম—দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশ-কোমল হবে আর চুলের কোমলতা ও মসৃণতা অক্ষুণ্ণ থাকবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

প্রবাসী

ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

পড়েছেন কি ?

বাংলার চিন্তাশীল জনপ্রিয় একশত বাছাই জন লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা
আজ পর্য্যন্ত কোনও ভারতীয় সাহিত্যে এধরণের প্রচেষ্টা হয় নি। লেখনীর প্রসাদ-গুণে ও মাধুর্য্যে
প্রত্যেকটি গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ

বাঁধানির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট শত
ডবল ক্রাউন

আর্ট পেপারে ছাপা, ছবি ও
বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য মাত্র
বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

এতে পাবেন

প্রবাসী প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র,
প্রবাস, রাষ্ট্র প্রসঙ্গ, অর্থনীতি,
দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ
সঙ্গীত, ভাস্কার্য, চিত্রকলা, ইতিহাস
গল্প, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা
ভাষা ও সাহিত্য, মহিলা-বিভাগ, বিবিধ।

আমরা নিঃসন্দেহ যে, সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাই এই গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ পাবেন

প্রকাশক—প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৭৭-১-১ বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ (ফোন নং—১৯-৫৪১০)

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭ হাওড়া।

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

অব্যর্থ প্রস্রাবসিক্ত ও শয্যৌক্সিক্ত

বন্ধ পীড়ার সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজ্য মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ

অমিত্র ব্রেলু

মূল্য দুই সপ্তাহের জন্য ২৲ টাকা ষ্ট্যাম্পের পত্রে অগ্রিম দিতে হইবে। মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

এখানে সর্ব্বাধিক জ্যোতিষের আশ্চর্য্য ও দুরূহ মহাশক্তিপূর্ণ অলৌকিক ও দুরারোগ্য ব্যাধির ধারণীয় ও সেবনীয় ঔষধ সমূহের সেবন ও পরীক্ষা প্রশংসনীয়।

শ্রীপুলিনপ্রসূন ভট্টোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিদ্যায় ওয়াচার্য্য—মহাশক্তি কার্য্যালয়

রাধাবাজার, মনোহর পো: (মজিলা)

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

উপন্যাস : আগুন আলো ঘটে ৫৲, অভাবনীয় ১০৲, অঘটনের ঘটা ৯৲, অঘটনের পোড়াবাড়া ও অঘটনের সুরোহা ১০৲, অঘটনের পূর্বরাগ ৯৲, ছায়ার আলো ৭৲, খেলা ৮৲, ঘোটালা ৬৲, বিচারিণী ৪৸৹,

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী ৫৲

নাটক : তিথারিণী রাজকন্যা ২৸৹, শ্রীচৈতন্য ৬৲, মীরা বৃন্দাবনে ৪৲।

ভ্রমণ : বেপে মেপে চলি উড়ে ৬৸৹, রাধাযাদব ৭৸৹।

কবিতা : অনামী ৩৸৹, (হাফ সং ১০৲) কৃষ্ণ-কথাকারিনী ৯৲।

স্বরলিপি : সুরবিহার (১ম খণ্ড) ৪৲, ঐ (২য় খণ্ড) ৪৲, বিচেত্রগীতি ৮৲, হাসির গান-এর স্বরলিপি ৩৲

অনুবাদ

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কবিতা গান ও নানা অনুবাদ। শেষে ইন্দিরা দেবীর ভাষান্তরিত। অনুবাদ। শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলি সহ ও শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ভূমিকাসহ। মূল্য ১০৲

মহিলা মন্দির, পৃষ্ঠা-১০ ও কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

—প্রকাশিত হইল—

শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের

ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও চাঞ্চল্যকর অপহরণের তদন্ত-বিবরণী

মেছুয়া হত্যার মামলা

১৮৮০ সনের ১লা জুন। মেছুয়া থানার এক সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড ও রহস্যময় অপহরণের সংবাদ পৌঁছাল। ভদ্রলোকের শয়নকক্ষ থেকে এক ধনী বৃদ্ধাস্বামী উধাও আর সেই কক্ষেরই সামনে পড়ে আছে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃতদেহ। এর পর থেকে শুরু হ'লো পুলিশ অফিসারের তদন্ত। সেই মূল তদন্তের রিপোর্টই আপনাদের সামনে তুলে ধরা হ'য়েছে। প্রতিদিনের রিপোর্ট পড়ে পুলিশ-সুপার যে মন্তব্য করেছেন বা তদন্তের ধারা সম্বন্ধে যে গোপন নির্দেশ দিয়েছেন, তাও আপনি দেখতে পাবেন। শুধুতাই নয়, তদন্তের সময় যে রক্ত লাগা শাড়ী, মেয়েদের মাথার চুল, নানা রকমের দেশলাই-কাঠি ইত্যাদি পাওয়া যায়—তাও আপনি এক্সিবিট হিসাবে সবই দেখতে পাবেন। কিন্তু সকলের অনুরোধ, হত্যা ও অপহরণ-রহস্যের কিনারা ক'রে পুলিশ-সুপারের যে শেষ মেমোটি তাঁদের শেষে সিল করা অবস্থায় দেওয়া আছে, সিল খুলে তা দেখার আগে নিজেরাই এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন কিনা তা যেন আপনারা একটু ভেবে দেখেন।

বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন টেকনিকের বই।

দাম—ছয় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

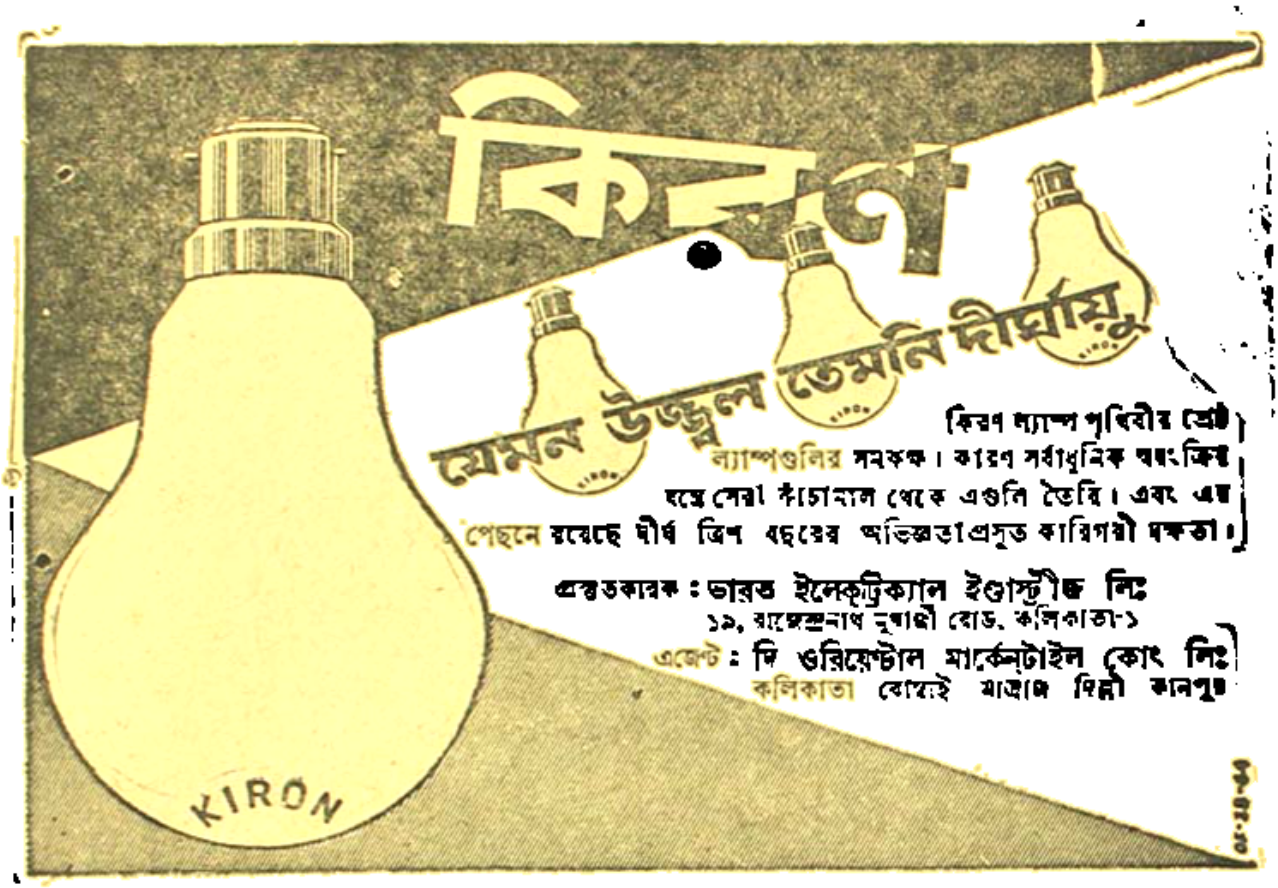

কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ। কারণ সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কারিগরী দক্ষতা।

প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১
এজেন্ট : দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,
কর্তৃক সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা ৩,

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪৲ জনা ৪৲

দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ সাজাহান ৪৲

মেবার-পতন ৪৲

সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

সরোবর

সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল।

অভাবগ্রস্ত একটি ছোট্ট সংসার—তার তরুণ কর্ণধারের জীবনে পড়েছে বৈরাগ্যের ছায়া। দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ তাদের দুটি মনের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া ক'রেছে—তাদের পারস্পরিক আকৃতিকে যেন নকল হ'তে দিচ্ছে না। জীবনের মূল্যায়নে তাহ'লে কি ঐশ্বর্যের স্থানই সব চেয়ে বড়? 'সরোবরে'-এ পাওয়া যাবে তারই উত্তর।

দাম—২·০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৭৬

লেখ-সূচী

১। ধর্ম ও বিজ্ঞানে মহামিলনের পথে (প্রবন্ধ)
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১
২। মেঘদূত কথা (কবিতা)
শ্রীরবীন গুপ্ত ৭
৩। পতিতা ও পতিতপাবন (রম্যরচনা)
শ্রীবিনীতকুমার রায় ৮
৪। কাঠোপনিষদের সাধন পথ (প্রবন্ধ)
শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১
৫। স্বপ্ন (কবিতা)—অরবিন্দ ভট্টাচার্য ১২
৬। পাবক (গল্প)
জ্যোৎস্না গুহ ... ১৩
৭। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যানুবাদ
পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী
৮। বিচিত্র বিশ্ব
শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য
৯। অসংসারী (উপন্যাস)
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। সংকলন
১১। বন্ধিনী তুমি হেসো না (কবিতা)
রহস্য উচিল ৪২
১২। বসন্তের বন্ধন
অরুণকুমার দত্ত ... ৪৬

লেখ-সূচী

১৩। বিশ্বরেখা (ভ্রমণকাহিনী)
সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ... ৫৩
১৪। "সন্ধ্যা হিল" এ একদিন (ভ্রমণকাহিনী)
রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫৮
১৫। মেয়েদের কথা—
(ক) রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী
লীলা রায়চৌধুরী ৬২
(খ) যোগাযোগের গল্পে নারী
শ্রীরেবতী মুখোপাধ্যায় ৬৪
১৬। সঙ্গীত
কথা শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
সুর—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক
স্বরলিপি—শ্রীযুক্তা অরুণলেখা মল্লিক
১৭। খাটি বা মেল
অর্চনা মিত্র
১৮। গ্রহজগৎ
হাতের কথা—সুরাচার্য্য
১৯। হাসিখুশী (কবিতা)
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

লেখ-সূচী

২০। বিশ্বের জগৎ—
(ক) ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল—শ্রীজ্ঞান ৮২
(খ) ছুটির ঘণ্টা
চিত্রগুপ্ত ৮৪
(গ) ঘাঁটী ও হেঁয়ালী
মনোহর মৈত্র ৮৫
২১। পট ও পীঠ—শ্রীশ' ৮৬
২২। ছবি ছবি ঝাঁকি—শ্রীপথিক ৯২
২৩। সাময়িকী ৯৩

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-সোপান

শরীরং ব্যাধিমন্দিরং—অর্থাৎ আমাদের শরীর বিবিধ ব্যাধির আলয় স্বরূপ। রোগের সাধারণ ঔষধিগুলির দ্বারা যথা সময়ে ক্ষীণ ও অল্প পরিমাণের রোগকেও চিকিৎসা হওয়া চাই। তাহাতে তার বিশ্লেষিত বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সকলেরই কিছু-না-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন।

এদেশের জল-হাওয়া মানুষ ও অন্য জীবজন্তুর জন্য এই দেশের ঋষিগণ যুগ-যুগান্তর যে ঔষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতি ব্যবস্থা করে গেছেন, আমাদের পক্ষে তাহা যে সর্ব্বোত্তম বিধান, এতে আর সন্দেহ কি? গ্রন্থকারের রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের যাবতীয় ও সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন।

প্রতি পুস্তকেই মূল্য ডাকের উপযোগী অগ্রিম প্রেরিতব্য।

মূল্য—মাত্র টাকা পঞ্চাশ আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল?
এগুলোর কোনটাতেই আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক

আপনার শুভেচ্ছাই
আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আমাদের
সবচেয়ে বড় পুরস্কার আপনার
সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:
৪, চার্চ্চিল ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা
যেখানে সাহায্য
দিই
আরও কিছু

তা ল তা ম উ প ন্যা স ও গ ল্প-গ্র ন্থ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০

তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুবীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০

নীলকণ্ঠী ৫৲

সবে মিলে ২·৭৫

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নমঞ্জরী

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২·৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪·৫০ বিবর্তন ৪৲

রামগড় ৪·৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲

পোষ্যপুত্র ৪·৫০ পথের সাথী ৩৲

হারানো খাতা ৩৲

পুষ্পলতা দেবী

বীসিমার অঞ্চল ৩·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

বাসাংসি জীর্ণানি ১০৲

জীবন-কাহিনী ৪·৫০

কুমারী মন ৩·৫০

গৌড়জনবধূ ৫·৫০

অগ্নিবেগম ৬·২৫

কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

তারা

কল্প অন্ধ শিশু ২·৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পতাকার ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর প্রাণ ২·৫০

মনীষাধব চৌধুরী

দেবতাত্মা ৫৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲

নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲

সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩·৭৫

বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পরাণব ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲

একটি নির্মম হত্যা ২·৫০

অধরস্তন পৃথিবী ৫৲

একটি আত্মী-হত্যা ৩৲

অন্ধকারের দেশে ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২·৫০

মুক্তির আসাম ২·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মীয়স্বজনের আদর ৪৲

সহজপাঠ (১ম পর্ব) ২৲

বনফুল

অগ্নি (নির্বাচিত) ৩৲

অগ্নীশ্বর ৩৲

জঙ্গম ৩৲

তৃণখণ্ড ৩৲

বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুং-সিন্ধা ৩৲

ফুলের মাশুল ১·৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৫·৫০

কার্‌টুন ২·৫০

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

পত্রস্থ ১ম—২·৫০, ২য়—২·৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তুলের কমল ২৲

খেয়ালের খেসারৎ ২৲

বংশধর ২৲

তোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২·৫

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲

কলিঙ্গপের বিলে ২য় ৪৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরাজ-বৌ ২·৫০ রামের সুমতি ১·২৫ বিন্দুর ছেলে ১·২৫

পথনির্দেশ ১·২৫

সমরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭·৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২·৭৫

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান স্পো ৪·৭৫

রাধাপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২·৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪·৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২·৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩·৫০ পঞ্চভূত ২·৫০ দ্বিপের বন্দী ৫৲ ধাত্রী পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲

চুয়াচন্দন ৩·২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২·৫০ কলরব ২৲

প্রিয়বান্ধবী ৪৲

কয়েকটি আউন্স মাত্র ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চরাজ ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

অবলা শাঙ্খারী ২৲

বনফুল

শিক্ষানবিস ৬৲

অগ্নি ও শরৎ পুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩·

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

CALCU
CENTR
IBRAR
NIVER

প্রথম খণ্ড

প্রথম সংখ্যা,

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ

ধর্ম ও বিজ্ঞান মহামিলনের পথে

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'ধর্ম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—'যাহা ধারণ করে।' সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, বিভিন্নস্থানের মানবগণ—ঝড়, জল, বজ্রপাত, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে, এবং রোগ, শোক ও মৃত্যু হইতে—নিজেদের রক্ষা পাইবার জন্য, এক একটি অজানা শক্তির সন্ধান করিতে থাকেন। সেই শক্তি তাঁহাদিগকে ঐ সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহারা সেই শক্তির উপাসনা করিতে থাকেন। ইহাই ধর্মের উৎপত্তির কারণ। এইভাবে, গাছ, পাথর প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির, এবং পরে মৃত পূর্বপুরুষের উপাসনা আরম্ভ হয়। তবে, প্রথমের দিকে এক ঈশ্বরের ধারণা বা উপাসনা ছিল না, এবং সেই সকল আদিম ধর্মের ভিতর বিশেষ নৈতিক ভিত্তি ছিল না।

এইভাবে পৃথিবীর নানাস্থানে বহু ধর্ম স্থাপিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে, নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এক-ঈশ্বর-বাদযুক্ত, অনেক নূতন ধর্ম আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান সময়ে

ভারতবর্ষ

পৃথিবীতে সাধারণতঃ প্রধানতঃ এগারটি ধর্মকে প্রধানধর্ম বলিয়া বিবেচনা করা হয়। সেইসকল ধর্ম ও তাহাদের উৎপত্তি-স্থান এইরূপ—

১। বর্তমান আকারের হিন্দুধর্ম, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্ম—দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারতে। (মন্তব্য—আদি হিন্দুধর্ম উত্তর বা মধ্য এশিয়ায় উদ্ভূত হয়। পরে উহা উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগমন করে, এবং তাহার পর বর্তমান হিন্দুধর্মের রূপ ধারণ করে।)

২। ইহুদি, পার্সী, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম—পশ্চিম এশিয়ায়, যথাক্রমে, প্যালেস্টাইনে, পারস্য বা ইরান দেশে, প্যালেস্টাইনে ও আরবে।

৩। তাও এবং কনফিউসিয় ধর্ম—মধ্য এশিয়ায়, চীনদেশে।

৪। সিন্টোধর্ম—পূর্ব এশিয়ায়, জাপানে। (মন্তব্য ইহাদের মধ্যে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্ন অন্য নয়টি ধর্মের উপাস্য শক্তি হইতেছেন—এক ঈশ্বর।

'হিন্দুত্ব' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—"বিশেষ জ্ঞান"। ইহা দুই প্রকার—

১। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে ঈশ্বরকে সঠিক ভাবে বুঝিতে পারা যায়, এবং

(২) পার্থিব বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে পার্থিব জগতে নানা প্রকার সুবিধা ও উন্নতি লাভ করা যায়। সাধারণতঃ বিজ্ঞান বলিতে পার্থিব জড় বিজ্ঞান বুঝায়। আমরা এই আলোচনায় বিজ্ঞান বলিতে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের কথাই বলিতেছি। এই পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া, নানা দেশের মানবগণের পার্থিব জীবনে নানা প্রকার সুবিধা ও উন্নতি প্রদান করিয়া আসিতেছে।

ধর্ম ও বিজ্ঞান অনুশীলন সত্ত্বেও দুরবস্থা।

আমরা বহু শত বা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া উপরোক্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম অনুশীলন করিয়া আসিতেছি। তথাপি, ইহা অতি দুঃখের কথা যে, আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষের অধীন হইয়া থাকায়, আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি আজও ঐ সকল দোষে হিংস্র বন্য পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।

আমরা আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া জড় বিজ্ঞান চর্চা করিয়া মানবের পার্থিব জীবনে নানা প্রকার সুবিধা ও উন্নতি সাধন করিয়াছি ইহা সত্য। তথাপি, ইহা অতি দুঃখের কথা যে, এই পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি আজিও, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত অভাব ও দুঃখের মধ্যে জীবন কাটাইতেছেন। তদুপরি বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণ করায়, সারা পৃথিবীর সকল ব্যক্তি একটি ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে জীবন কাটাইতেছেন। যে কোন মুহূর্তে আণবিক যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে, এবং তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ জীবন হারাইবেন।

ধর্ম ও বিজ্ঞান অনুশীলন সত্ত্বেও এই দুরবস্থার কারণ।

এই দুরবস্থার জন্য ধর্মানুশীলনকারীগণ এবং বৈজ্ঞানিকগণ উভয়পক্ষই দায়ী, তবে বেশী দোষ ধর্মানুশীলনকারীগণেরই।

ধর্মানুশীলনকারীগণের ত্রুটী।

প্রত্যেক ধর্মের অনুশীলনে কিছু না কিছু ত্রুটী আছে। কিন্তু অন্যের মনে আঘাত করা অনুচিত জানিয়া, অথচ ধর্মানুশীলনের ত্রুটী সংশোধন করার জন্য এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলনের উদ্দেশ্যে, আমি কেবল মাত্র আমার নিজ হিন্দুধর্মের ত্রুটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। প্রকৃত অবস্থা এই—

১। আমরা ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিনা, অথবা তাহা জানিয়াও সেই প্রকৃতপথে ধর্মানুশীলন করি না। উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মের মূল ভিত্তি হইতেছে নৈতিক জীবন যাপন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি নৈতিক পথে চলা, ধর্মানুশীলনে উন্নতির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। ঈশ্বর সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা স্বরূপ। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে আমাদের কর্তব্য (১) চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সত্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে, (২) প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি (এমন কি, পরম শত্রুর প্রতিও), তাঁহাকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া, ভালবাসা প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং প্রকৃত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে, এবং (৩) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, মনে ও কার্যে, সচ্চরিত্রতা রক্ষা করিয়া ও দুর্নীতিমূলক কার্য পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।

এইপ্রকার সত্য-প্রেম-পবিত্রতার নৈতিক ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা না করিয়া, আমরা যত পরিশ্রম করিয়াই উপবাস, ব্রত, পূজা করি না কেন, যত অধিক দান করি

না কেন, যত অধিক সাধুসঙ্গ বা তীর্থ ভ্রমণ করি না কেন, (তাহাতে আমাদের কিছু উপকার হইলেও) আমরা ধর্মপথে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিব না, এবং ধর্মের চরম লক্ষ্যে (ঈশ্বর লাভে ও মানসিক শান্তি লাভে) পৌঁছাইতে পারিব না। আমরা প্রায় সকলেই এই সত্য জানি। কিন্তু আমরা মূর্খের ন্যায়, সকল নৈতিক উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া কঠিন পরিশ্রম পূর্বক উপবাস, ব্রত পূজাদি করি ও তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, এবং মনে মনে ভাবি যে, আমরা ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে ভুলাইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। আমরা এই আত্ম-প্রবঞ্চনা যতশীঘ্র ত্যাগ করিতে পারিব, তত শীঘ্রই ধর্মানুশীলনের পথে প্রকৃতভাবে অগ্রসর হইতে পারিব।

২। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ধর্মের সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা বেশ কঠিন।

(১) হিন্দু ধর্মে কোন একখানি নির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ নাই। ইহাতে অসংখ্য গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং অনেকগুলির অনেক অংশ দুর্বোধ্য। তদুপরি প্রায় প্রতি হিন্দুধর্মগ্রন্থের ভিতর বহু উপাখ্যান, অতিরঞ্জন প্রভৃতি, মহৎ উদ্দেশ্যে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিলেও, আমাদিগকে সাহসের সহিত সেগুলি বাদ দিয়া সেই অমূল্য গ্রন্থগুলির সারতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের ধর্মানুশীলন সফল হইবে না। বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ধর্মগ্রন্থগুলির কেবলমাত্র সারতত্ত্ব লইলেই ধর্মানুশীলন সফল হইবে, এবং আমাদের সকল শাস্ত্রের সকল অংশ জানিবার, বুঝিবার বা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করার আবশ্যকতা নাই। নিম্নে ঐ প্রকার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইল—

(ক) অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
যল্পশ্চ কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্।

অর্থাৎ, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ অনন্ত, তন্মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বহু, কিন্তু আমাদের সময় কম এবং শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন আছে। সুতরাং, হাঁস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পাইলে, ঐ জল বাদ দিয়া কেবল দুগ্ধটুকু পান করে, সেইরূপ ধর্মানুশীলনকারীগণ কেবলমাত্র ধর্মের সারতত্ত্বগুলি অনুশীলন করিবেন।

(খ) শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অর্থাৎ, শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, কোটী শাস্ত্রগ্রন্থ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা তিনি অর্ধেক শ্লোকে বলিবেন। তাঁহার বক্তব্য সেই সারতত্ত্বটি এই—এই বিশ্বে একমাত্র সত্যবস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম অন্য কোন বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই সমস্ত জীবই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত।

(গ) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
গীতা

অর্থাৎ, সকল ধর্মের সারতত্ত্ব একটি—ঈশ্বরে শরণাগতি। এই শরণাগতি জানিতে পারিলে, কোন ধর্ম শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক নাই।

(২) শাস্ত্রের সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া, শাস্ত্রীয় উপাখ্যানগুলির মর্ম গ্রহণ করিয়া উহাদের আক্ষরিক সত্যতা উপেক্ষা করিলে কোন ধর্মহানি হইবে না। হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদ্ ও গীতা হইতে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিতেছি—

(ক) কঠোপনিষদ্—শাস্ত্রকার ঐ গ্রন্থে ব্রহ্ম, আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। উহা আমাদের সকল হিন্দুর গ্রহণীয়। কিন্তু, ঐ তত্ত্ব পাঠকের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে উহাতে নচিকেতার যমালয়ে গমন ও যমরাজের সহিত কথোপকথন রূপ উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, নচিকেতা নিজে স্বশরীরে যমরাজের বাড়ী গেলেন, যমরাজ তখন সেখানে না থাকায়, নচিকেতা তিন দিন সেখানে যমরাজের জন্য অপেক্ষা করিলেন, যমরাজ আসিয়া লজ্জিত বোধ করিয়া তাঁহাকে তিনটি বর দিতে চাহিলেন। নচিকেতা তন্মধ্যে একটি বর হিসাবে তাঁহার নিকট ব্রহ্ম, আত্মা, পরলোক প্রভৃতির তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। যমরাজ উহা দিতে প্রথমে কিছুতেই রাজী হইলেন না, এবং তৎপরিবর্তে দীর্ঘায়ু, সম্পদ প্রভৃতির বহু প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ঐ মহাপ্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তখন যমরাজ তাঁহাকে ঐ গূঢ় বিষয়ের জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে উপযুক্ত পাত্র মনে করিলেন, এবং

অবশেষে তাঁহাকে ব্রহ্ম, আত্মা ও পরলোকের কথা জানাইলেন। এই উপাখ্যান অংশ বাদ দিলেও, কেবলমাত্র ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি বিষয়গুলি জানিবেই, কঠোপনিষদ পাঠ করা সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

(খ) গীতা—ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের অন্যতম। ইহাতে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে। গীতা-গ্রন্থকার ঐ ধর্মতত্ত্বগুলি আমাদিগকে একাধিকভাবে না জানাইয়া, শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে জানাইয়াছেন। বলা হইয়াছে—কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত, কুরুপাণ্ডবগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উভয় দল উভয় দলের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান, কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইয়া অর্জুনকে যুদ্ধার্থে সেখানে লইয়া গিয়াছেন, অর্জুন সেখানে স্বজন-বধের সম্ভাবনা মনে করিয়া মুহ্যমান হইয়াছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ সেই রথে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে [illegible] দেখিয়া বলপূর্বক ধরিয়া, অর্জুনকে [illegible] রথের অশ্বগণের [illegible] ইতেছেন। এই [illegible] অধ্যায় ধর্মতত্ত্ব শুনা- কেবলমাত্র [illegible] কৃষ্ণের উপাখ্যান অংশ বাদ দিয়াও [illegible] ধর্মতত্ত্বের উপদেশগুলি জানিবেই, গীতা পাঠ করা সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

(৩) হিন্দুশাস্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলিতে গ্রন্থকার ঈশ্বরে মন সমাহিত করিয়া অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব জগৎবাসীগণকে জানাইয়াছেন, অন্য কতকগুলিতে গ্রন্থকার নিজের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বগুলি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আমরা, সাধারণ ব্যক্তিগণ, ঐ দুই প্রকার তত্ত্বের পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম না হইয়া প্রত্যেকটি শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত ও আমাদের প্রতি বাধ্যকর বলিয়া মনে করি। সেজন্য আমরা গ্রন্থগুলি পাঠের সময় আমাদের নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করিতে সাহস করি না। ইহার ফলে, আমরা অনেক অনাবশ্যক শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিতে চেষ্টা করি, এবং তজ্জন্য বিভ্রান্ত হই।

৩। ধর্মের সহিত যে বিজ্ঞানের অতি নিকট সম্বন্ধ তাহা আমরা অনেকে জানি না, আমরা সাধারণ ধর্মানুশীলন কারীগণ অনেক অবৈজ্ঞানিকত্ব গ্রহণ এবং অনেক অবৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকি। অথচ, ধর্ম হইতেছে একপ্রকার উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান, এবং উহা অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানের (অর্থাৎ পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য, ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ (যাহা নিজ অনুভূতি সাপেক্ষ) এবং অন্য কোন কোন ধর্মীয়তত্ত্ব বিজ্ঞানের সীমার বহির্ভূত। তথাপি ধর্মের অধিকাংশতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। তন্মধ্যে যাহা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হইবে, তাহা না গ্রহণ করিলে ধর্মানুশীলনে কোন ক্ষতি হইবে না। আমাদের পূর্ব উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক সত্যের প্রতি অহেতুকী বিশ্বাস ও ভক্তি, আমাদের ধর্মে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রধান কারণ।

এই সম্বন্ধে [illegible] ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের [illegible] ও ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণের কয়েকটি উপদেশ মনে রাখিলে উপকার হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

(১) ধর্ম একপ্রকার প্রকৃত বিজ্ঞান। ইহার সহিত জড় বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। জড়বিজ্ঞান হইতেছে জড়পদার্থ সমূহের বিজ্ঞান। ধর্ম হইতেছে অধ্যাত্ম পদার্থ সমূহের বিজ্ঞান।

(২) ধর্ম ও জড়বিজ্ঞান পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে, এবং উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিবে। (স্বামীজীর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে)।

ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন—

পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সহিত ধর্মীয় অনুশীলনকে মিল রাখিয়া চলিতে হইবে। যে ধর্মীয় আচরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকের সহিত মিল রাখিতে পারিবে না, সে আচরণ অনুশীলনীয় নহে। (আমাদিগকে সাহসের সহিত এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে)।

বৈজ্ঞানিকগণের ত্রুটী।

১। অধিকাংশ ধর্মে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ জানিতেন না বলিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন—'ঈশ্বর আছেন কি না জানি না'। কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্থ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন 'ঈশ্বর নাই'। এই ঈশ্বর তত্ত্ব লইয়া ধর্মানুশীলনকারীদের সহিত বৈজ্ঞানিকগণের মত পার্থক্য থাকায়, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর হইতে দূরে থাকিত। তদুপরি,

ধর্মানুষ্ঠানে বহু কুসংস্কার ও বহু ভুল প্রথা প্রচলিত আছে। ইহার ফলে, বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে, ধর্ম একটি অবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। সেজন্য বহুশত বৎসর ধরিয়া ধর্ম ও বিজ্ঞান পৃথক্ পথে চলিয়া আসিতেছিল, এবং তাহাদের মধ্যে কোন মিলন হয় নাই।

২। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকগণ জানেন না, অথবা বুঝিতে চান যে, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া মানুষের কার্যে প্রয়োগই তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য নহে। তাঁহাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাগুলি মানবকল্যাণের জন্য, নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। বিজ্ঞান নীতির পথ হইতে দূরে থাকার ফলে, (১) বহু ব্যক্তি অভাব ও দুঃখের মধ্যে জীবন কাটাইতেছেন। এবং (২) মারাত্মক যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীর মানুষ ধ্বংসের আশঙ্কায় জীবন কাটাইতেছেন। বিজ্ঞানের এই নীতি বর্জিত আবিষ্কারাদির কথা ভাবিয়া, তাহাতে বৈজ্ঞানিকগণের মনে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী আনিবার উদ্দেশ্যে, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

জড়বিজ্ঞানের সফলতা লাভের জন্য, তাহার কর্তব্য হইতেছে ধর্মের নিকট হইতে আশীর্বাদ সংগ্রহ করা অর্থাৎ ধর্মীয় নীতির পথে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারাদি পরিচালিত করা কর্তব্য।

ধর্ম ও বিজ্ঞান মিলনের পথে।

১। সৌভাগ্যক্রমে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। গত ১৯০১৫০ বৎসরে, বৈজ্ঞানিকগণ, আকাশে অনেকপ্রকার নক্ষত্রাদি আবিষ্কার করিয়া ও অন্যান্য জ্ঞান লাভ করিয়া, ধর্ম সম্বন্ধে, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কতক-পরিমাণে পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পূর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেন। ঐ সকল আবিষ্কারের ফলে, কোন কোন বৈজ্ঞানিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও, তাঁহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এডিংটন, জেম্‌স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

২। এই অবস্থায়, এই বর্তমান বিংশ শ্রীষ্টাব্দের মাঝা-মাঝি সময়ে, বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহবিজ্ঞানের (Astronomy-র) সাহায্যে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, (১) এই, বিশ্বের মধ্যে অসংখ্য শক্তিশালী সূর্য-তারকা দেখিতে পাইয়াছেন, (২) তাহাদের ভীষণ গতিতে পূর্বনির্দিষ্টপথে বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন, এবং (৩) এই বিশ্বের কল্পনাতীত অসীমত্ব দেখিতে পাইয়াছেন।

উপরোক্ত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ।

আলোকবর্ষ—উক্ত সূর্য-তারকাগুলির বিরাট গতি ও দূরত্ব বুঝিতে হইলে, সাধারণ মাইলের গতিতে তাহা বুঝান কঠিন। সেই দূরত্ব বুঝাইবার জন্য "আলোক-বর্ষের" অবতারণা করা হইয়াছে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। একবৎসর ক্রমাগত চলিলে, আলোক ৫,৮৭০০০ মিলিয়ন মাইল গমন করিতে পারে। মোটামুটি হিসাবে আলোকের একবৎসরের গতির দূরত্ব ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল, অর্থাৎ ষাটলক্ষ কোটী মাইল। সুতরাং এক আলোকবর্ষ বলিলে, ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মাইলের অথবা ষাটলক্ষ কোটী মাইলের দূরত্ব বুঝায়।

(১) এই বিশ্ব কল্পনাতীত বিরাট। বিজ্ঞান আজিও তাহার প্রকৃত পরিমাণ বা সীমারেখা জানিতে পারে নাই। আকাশের অসংখ্য সূর্য-তারকার দলগুলি, ক্রমাগত একদল অন্যদল হইতে ভীষণ বেগে সরিয়া যাওয়ার ফলে, বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অসীম পরিমাণ কিছু-কিছু দেখিতে পাইতেছেন।

(২) আকাশে রাত্রে যে ছায়াপথ (galaxy) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে আমাদের এই সূর্যমান সূর্য আছে। সেই সঙ্গে, সেই ছায়াপথে, ঐ প্রকার শক্তি ও জ্যোতিঃসম্পন্ন অন্ততঃ দুইশত কোটী সূর্য আছে। তাহারা সকলে ঐ ছায়াপথ-রূপ বিরাট মালার মধ্যে অনবরত ঘুরিতেছে।

(৩) ঐ ছায়াপথের ব্যাসরেখা (diameter) লম্বায় একলক্ষ "আলোকবর্ষ"। পূর্বে বলা হইয়াছে একটি আলোকবর্ষের দূরত্ব ষাটলক্ষ কোটী মাইল।

(৪) আমাদের এই সূর্য অন্যান্য সূর্যের সঙ্গে ঐ

ছায়াপথ বা মালার একবার ঘুরিয়া আসিতে ২৫ কোটী বৎসর সময় লাগে।

(৫) আমাদের এই পৃথিবী প্রায় ৬০০ কোটী বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সে আমাদের সূর্যের সহিত ঐ ছায়াপথে বা মালার এপর্য্যন্ত বোলবার ঘুরিয়া আসিয়াছে। (৬) আমাদের এই বিরাটছায়াপথেরন্যায় অন্তরীক্ষে আরও কোটী কোটী ছায়াপথ আছে। তাহাদের প্রত্যেকটি ঐপ্রকার কোটী কোটী সূর্য সহ মালার ন্যায় ঘুরিতেছে।

(৭) এই প্রকার বহুকোটী ছায়াপথ (galaxy) এক একটি আরও বিরাট ছায়াপথের (metagalaxy-র) ভিতর ও অধীন হইয়া ঘুরিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যন্ত কয়েকশত ঐ মেটাগ্যালাক্সী দেখিতে পাইয়াছেন। আরও কত গ্যালাক্সী বা মেটাগ্যালাক্সী এই বিশ্বের সীমাহীন অনন্ত আকাশে আছে বা ঘুরিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ আজিও জানিতে পারেন নাই।

(৮) সর্বাপেক্ষা দূরের যে বস্তু বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা এই পৃথিবী হইতে প্রায় ৫০০ কোটী "আলোক বৎসর" দূরে অবস্থিত আছে।

(৯) এই সকল ছায়াপথগুলি ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনটিই অন্য কোনটির প্রতি ধাক্কা মারিতেছে না। তন্মধ্যে, এই সকল অনন্ত কোটী সূর্য-তারকাও ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনটি অন্য কোনটির প্রতি ধাক্কা মারিতেছে না।

(১০) এই সকল ছায়াপথগুলি ও সূর্য-তারকাগণ অসীম বেগে চলিতেছে।

(১১) এই সকল ছায়াপথগুলি ও সূর্য-তারকাগণ পূর্বনির্দিষ্ট কক্ষপথে চলিতেছে।

উপরোক্ত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল

বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, (১) এই কল্পনাতীত অসীম বিশ্বে অনন্ত কোটী সূর্য্য তারকাগণ (২) পূর্ব নির্দিষ্ট পথে, (৩) অসীমবেগে চলিতে থাকায়, ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের পশ্চাতে একটি শক্তি আছে, এবং সেই শক্তিই তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ও চালিত করিতেছেন। ইহা হইতে, কয়েকজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ধর্মে উল্লিখিতঈশ্বর নিশ্চয়আছেন। তাঁহারা মনেকরেনযে,(১) এই সকল অসংখ্য সূর্য-তারকা ও ছায়াপথগুলি, (২) পূর্বনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া, এবং (৩) অসীম বেগে ধাবিত হওয়াই—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মানুষের দেহের ভিতর অসংখ্য জীবাণুর বাস ও ক্রিয়া এবং বিবিধ গ্রন্থিগুলির নানাপ্রকার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া চিন্তা করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আসে।

ধর্ম ও বিজ্ঞান মহামিলনের পথে

১। একদিকে বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্তভাবে, ও উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ধর্মের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন এবং ধর্মের চরমতত্ত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অপরদিকে ধর্মানুশীলনকারীগণের মধ্যে অনেকে আর পূর্বের ন্যায় প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রের আক্ষরিক সত্যের উপর বিশ্বাস, এবং শাস্ত্রবাক্য বিষয়ে পূর্বের ন্যায় ভীতি পোষণ করিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করিতেছেন। ইহার ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞান ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে। এখন অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই, এবং বিজ্ঞান হইতেছে ধর্মের একটি বিভিন্ন স্বরূপ। তথাপি এখনও বহু পূর্বদৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ধর্মানুশীলনকারী আছেন, এবং এখনও সকল বৈজ্ঞানিক (১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, এবং (২) হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের যে প্রকৃত স্বরূপ ও ক্রিয়াদি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা উপলব্ধিকরিতে পারেন না বলিয়া ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে পারেন নাই।

২। ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে হইলে ধর্মে ঈশ্বরের স্বরূপ ও সৃষ্টি বর্ণনা জানা আবশ্যক, সেইজন্য এক্ষণে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব ও অনুষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। সেই আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মহামিলনের এখনও কিছুদিন দেরী আছে। তবে, যেভাবে বিজ্ঞান মানুষ ও বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানে অগ্রসর হইতেছে, এবং যেভাবে ধর্মানুশীলনকারীগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, হয় এই বিংশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, অথবা একবিংশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মহামিলন হইবে। তখন ধর্ম বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বীকার করিবে, এবং ধর্ম, নীতি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই জগতের সকল মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। [ক্রমশঃ]

মেঘদূত-কথা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

নব-রত্ন-শ্রেষ্ঠ ছিলে 'বিক্রম'-সভাতে,
যুগ যুগ পূর্বে তুমি কবি কালিদাস ;
শিপ্রা-তটে ঘুরে ঘুরে পরাণ মাতাতে,
দিবা কাব্য-কলরবে আকুলি' আকাশ।
ব্যাকুল বাতাসে, তব কাব্য-মন্ত্র-পাতে,
দুরন্তার যত মোহ করিতে বিনাশ।
তোমারে ভারতী বীণা দিল নিজ হাতে
তাই বুঝি থামিছে না তা'রও কল-ভাষ।
কত যুগে কত কবি রচে বাণীরাজি
তব রেশে তাহাদের বাণী ওঠে বাজি' ;
আজি তাই না থেকেও আছ কায়াহীন,
কাব্য-কবিতার মাঝে হ'য়ে অবলীন।
'রঘুবংশ,' 'শকুন্তলা,' আছে 'মেঘদূত,'
'কুমার-সম্ভব'ও আছে অপূর্ব অদ্ভুত।

(২)

অভিনব 'উজ্জয়িনী'-স্বর্গ আলো ক'রে
স্বর্ণোজ্জ্বল গুপ্ত-যুগে কবি-কুল-পতি
বাণী-পুত্র কালিদাস, ছিলে দেহ ধ'রে ;
বিক্রমাদিত্যের সভা লভিত আরতি।
স্বর্ণ-দীপ্তি সম তব প্রতিভা মহতী—
মুহুর্মুহু ভুবনেরে দিত শুধু ভ'রে ;
প্রকৃতিও লভি' শুদ্ধ সঙ্গীত-সংগতি
ধন্য হোতো ; নর-চিত্ত-ভূমিতে তা' ব'য়ে
মোহিত করিতে সবে আনন্দের ঘোরে।
নর-দেহ ধ্বংস করি' নিষ্ঠুরা নিয়তি
নিলো তোমা সুর-স্বর্গে পৃথ্বী হ'তে হ'রে ;
মানিল না প্রেম-স্নিগ্ধ মর্ত্যেরও মিনতি।
নর দেহাতীত যাহা ক'রে গেলে দান,
বিশ্ব লভে নিত্য তা'রই অমর সন্ধান।

(৩)

বর্ষে বর্ষে আষাঢ়ের ধূম-জ্যোতি মেঘে
যে ছন্দ বাজিয়া ওঠে মৃদঙ্গের মত,
কে জানিত পূর্বে তব, তা'রই ছোঁয়া লেগে
দুটি ভিন্ন সুর শুধু জাগে অবিরত
প্রকৃতির বুকে আর মানব অন্তরে !
যদিবা জানিত কেহ, পারিত বুঝিতে,
'মন্দাক্রান্তা'-তালে তা'রে মল্লার-মন্ত্রে
'মেঘদূত' সম ভাষা কে বা পারে দিতে
তুমি বিনা কালিদাস ? বিশ্ব-দূত তুমি।
যে-মেঘ নিসর্গ মাঝে আনে নিত্য বহি'
অপূর্ব রসের বার্তা, স্পর্শে যা'র ভূমি
ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে, কে জানিত ইহি'
যাবে চিত্ত কণ্ঠাশ্লিষ্ট প্রেমিকেরো তার,
বিরহের কল্প-স্বর্গ জাগিবে ধরায় !

(৪)

হৃদয়ের 'রামগিরি'-সানুদেশে বসি'
অভিশপ্ত যক্ষ মোর তপ্ত আঁখি-জলে
বক্ষ-ফাটা বেদনায় ব্যাকুল বাদলে
বিলাপ করিছে শুধু। অবলুপ্ত-শশী ;
মসীময়ী অন্ধকারে ক্ষণে ক্ষণে খসি'
ওঠে ওই পুরবী বাতাস ; বিরহীরে
বারে বারে ঠেলে আরও ব্যর্থতার ঘিরে।
দূরে-দূরে-বহুদূরে যেথায় রূপসী
মূর্তিমতী ভালোবাসা, মিলন-আকুল
একাকিনী বসি' আছে স্বপনের ফুল,
পাখা যায় ছুটে যাই—উড়ে যাই চ'লে।,
পারি না—পারিনা হায় দেহ আছে ব'লে।
স্থানে-কালে বাঁধা এই দেহে বার বার,
দেহাতীত ক'রে তোলে অতনু আমার।

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পনেরো

"কিন্তু নাটকের অবতারণার আগে বিষ্কম্ভক চাইই চাই, যাকে সাহেব পুরাণে বলেছে 'প্রোলোগ'। অর্থাৎ গুরুদেবের জীবনকাহিনী। সংক্ষেপেই বলতে হবে (হাতঘড়ির দিকে চেয়ে) দ্রুতবুত্তে গানযাত্রা—মাত্র সাড়ে তিনঘণ্টা সময়। তাই খবর্দার—জেরা করিস নি—শুধু শুনে যা মহাপুরুষের 'হৃৎকর্ণরসায়ন' কথা।

"তুই অবিশ্যি করলে কী হবে মহাপুরুষদের জীবনে কৃপার অবতরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটেই ঘটে নানা, অবিশ্বাস্য অঘটন যার ফলে তাঁদের সাধনার প্রগতি হয় দ্রুত—অন্ধকার থেকে আলোকের ঊর্ধ্বলোকে। আমি সেসব আশ্চর্য কাহিনী থেকে বলব না আরো এই জন্যে যে, আমার মুখে শুনলে তোর সংশয় হয়ত আরো বেড়েই যাবে। তাই যদি শুনতেই হয়—তাঁর মুখেই শুনিস। যদি শুনতে চাস অবিশ্যি।

"গুরুদেব বিবাহ করেন মাত্র কুড়িবৎসর বয়সে। বিহারী 'বইস' তো—ওদের বিয়ে কম বয়সেই হয়। গুরুদেব প্রায়ই হেসে বলেন: 'আমাদের পরিবারে শুধু অরক্ষণীয়া নয় অরক্ষণীয়কে নিয়েও সবাই গালে হাত দিয়ে ভেবে আকুল হ'ত—হা হা হা।

"কিন্তু লীলাময়ের লীলা কে বুঝবে বল্। হ'ল কি, ওঁর ষোড়শী স্ত্রী আবাল্য পরমহংসদেবের ধ্যান করতেন—বিবাহ নামী সত্তার কিছুই চাইতেন না। বাপ মা জোর ক'রে বিবাহ দেবার ফল হ'ল অন্তত: একটি মেয়ের জন্মদানের পরে তিনি গুরুদেবকে সাফ ব'লে দিলেন তাঁর সঙ্গে দেহ-সম্বন্ধ রাখবেন না, হবে স্বামীর ধরণী হ'য়ে সেবা করতে রাজী আছেন। গুরুদেব বিষম ঘা খেয়ে অভিমানে স্ত্রীকে ছেড়ে সোজা বৃন্দাবনে গিয়ে এক বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নেন।"

অসিত বলল: "বোসো ভীষ্মদা, তোমার গুরুদেব তাহ'লে বৈষ্ণব?"

"গুরুদেব কোনো বেষেরই তথমা মানেন না। নিষ্ঠা মানেন কিন্তু আচারী নন। গুরু মানেন, কিন্তু গুরুবাদী নন। তিনি উঠতে বসতে আমাদের বলেন: 'প্রতি যুগেরই একটি ধর্ম আছে—যাকে বলে যুগধর্ম—না মেনেই পারে না। এ-যুগের ধর্ম ওরফে মহাবাণী হ'ল পরমহংসদেবের মত পথ তত মত, তাই মতুয়ার বুদ্ধি কোরো না—কি না বোলো না—"আমার মত ছাড়া আর সব মতই ভুল।" তাই তিনি নানা শিষ্যকে নানা মন্ত্র দিতে দ্বিধা করেন না যার ইষ্ট কৃষ্ণ তাকে হরিনাম, যার ইষ্ট শিব তাকে শিবনাম, যার ইষ্ট কালী তাকে মাতৃনাম···পরমহংসদেবের তিনি বিষয় ভক্ত, বলেন—এ-যুগের তিনিই যুগাবতার, যেমন প্রাক-রামকৃষ্ণ যুগের যুগাবতার ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। গুরুদেব পরমহংসদেবকে আরো ভালবেসেছিলেন নিজে রসিক ছিলেন ব'লে। ব্রাহ্মদের 'নিরাকারী' গোঁড়ামি নিয়ে প্রায়ই একগাল হেসে উদ্ধৃত করেন পরমহংসদেবের বিখ্যাত উপমা ব্রাহ্মরা যেন সানাইয়ে নিরাকারের এক পোঁ ধরে আছে, হিন্দুরা বেসরোয়া তুলছে রকমারি 'আকার'-এর বোল পড়ন তাল আলাপ। মর! একঘেয়ে হবে কী দুঃখে? আমি খোলে কালে অম্বলে সবতাতেই আছি।'

"দেবপ্রয়াগে তাঁর আশ্রম গড়ে ওঠার সাত বৎসরের মধ্যেই সাতটি শিষ্য তাঁর কাছে এসে মন্ত্র নেয়। বছর দুই বাদে আমরা এসে জুটি। গুরুদেব মাঝে মাঝে হেসে বলেন 'আগে আমার বাহন ছিল সপ্তঋষী, এখন—নবগ্রহ।'

অদিতি হেসে শুধায় "সপ্তরথীর নাম বলবে না?"

"প্রসাদ, দিবাকর, বিষ্ণুদাস, রণধীর, পিণাকী, রঘুবীর, চন্দন। আমার নাম করণ হ'ল—গুরুদাস, মা-র—কৃষ্ণময়ী। সপ্তরথীর মধ্যেও দুটি দল ছিল: প্রসাদকে নেতা করে দল গড়ল চতুর্থীর—দিবাকর, বিষ্ণুদাস, রণধীর ও পিণাকী—গুরুদেব এদের উপাধি দিয়েছিলেন পঞ্চপ্রবীর—কেন—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। রঘুবীর ও চন্দন রইল একান্ত গুরুদেবের অনুগত। পঞ্চপ্রবীর ওদের ঠেস দিয়ে বলত 'গুরুর ন্যাওটো'। ওরা পিঠ পিঠ জবাব দিত গুরুর প্রসাদের ন্যাওটো হওয়ার চেয়ে খোদ গুরুর ন্যাওটো হওয়া ঢের ভালো। কিন্তু এবার একটু পেছিয়ে যেতে হবে—সাহেব পুরাণে বলে জানিস তো: 'You mustn't go ahead of your story.'

একটু থেমে ভীষ্ম সুরু করে: "তুই জানিস আমি কিরকম উড়নচণ্ডী ছিলাম—টাকা আসতে না আসতে নয় ছয়! তাই তুইই আমাকে বলেছিলি বৌ-এর নামে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকার সাইক ইনশিওরেন্স করে রাখতে। বলতিস প্রায়ই হাসতে হাসতে: লোক-খাইয়ে কতুর আমি হবই হব—তাই বৌ-এর একটা হিল্লে করে রেখে যাওয়াই চাই। আমি সচরাচর তোর কোনো বেল্লিকি ঠাট্টাইই কান দিই না বটে, কিন্তু তোর এ-যোক্ষম তীরন্দাজিটি লক্ষ্যভেদ করেছিল। ফলে আমি ভাগলপুরে বৌ-এর নামে কুড়ি হাজার টাকার বীমা ক'রে অতিকষ্টে কোনমতে মাস মাস দক্ষিণা জোগাতাম—কখনো কখনো এজন্যে ধার করতেও হ'ত। এসবই তুই জানিস। যেটা জানিস না সেটা এই যে, আমি বোকা হ'লেও বুদ্ধি ধরি, যাকে সাহেবেরা বলেন: I may be a fool, but not a dammed fool: তাই কাকাকে ঘুণাক্ষরেও বলিনি এ-বীমার কথা। তাঁর 'পরে আটচালা দুটির ও মেয়েদের ভার চাপিয়ে বিশহাজার টাকা নিয়ে হিমালয়ে পাড়ি দিয়েছিলাম গুরুগৃহে—মাকে নিয়ে। মা-র সত্যিই গুরুভক্তি হয়েছিল। কিন্তু সংসারে কোন কিছুই তো নিখুঁৎ নয়রে ভায়া। তাই গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেবার পর উনি টাকাটা প্রণামী দিতে যেতেই মা বাগড়া দিলেন। বললেন মেফালির বিয়ে এখনো বাকি, তাছাড়া কার যে কখা কী হয় কে বলতে পারে? সাততাড়াতাড়ি এই হাতের পাঁচটা খুইয়ে কাজ নেই।

"আমি রাগ ক'রে বললাম 'মা, আর যে-অপরাধই করো না কেন মা, তাদের ঘরে চুরি কোরো না কোরো না কোরো না। মুখে বলছ—আমাদের যাকিছু আছে সবই গুরুদেবের। কিন্তু এদিকে আখেরের চিন্তা দেখি বেশ টনটনেই রয়েছে। এর নাম আর যাই হোক আত্ম-সমর্পণ নয়।' মা ধমক খেয়ে খুব কাঁদলেন। আমারো মন বিষম খারাপ হ'ল। হঠাৎ রাত্রে শিয়রে স্বয়ং গুরুদেব! ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন যার মন সরল তার কোনো ভয় নেই। কুড়ি হাজার টাকা এখন তোমার কাছেই থাক। আমাদের আশ্রম ছোট, খরচেরও সঙ্কুলান হয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের কৃপায়।' আমি বললাম 'মা নালিশ করেছেন নাকি গুরুদেব।' গুরুদেব বললেন হেসে না: আজ যখন সে এসেছিল প্রণাম করতে তখন তার মাথায় হাত দিতেই টের পেলাম সে কী চায়। তুমি তাকে বোলো মা তৈঃ। সব ঠিক আছে।'

পরদিন সকালে উনিশ হাজার টাকা গুরুদেবের কথা-মত দেবপ্রয়াগের পোষ্ট অফিস ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ঘরে ফিরে ধ্যান করতে বসলাম। কিন্তু ধ্যান করব কী? মন বিষম খারাপ হ'ল। ধর্মের নামে এ কী তঞ্চামি করছি? যোগী যোগ করতে এসেও করবে পরিণাম চিন্তা? গুরুদেব অন্তর্যামী—কাউকে জোর করেন না, তাই না বললেন টাকাটা আমার নিজের নামেই জমা রাখতে! কিন্তু আমার কি উচিত ছিল না তাঁকে বলা যে, যদি জমা রাখতেই হয় রাখব তাঁরই নামে—আমার বা মা-র নামে নয়, যোগপন্থীকে হ'তেই হবে নিঃস্ব···এই ধরণের সে যে কত আত্মধিক্কার! ধ্যান হ'ল না। গেলাম গঙ্গায় স্নান করতে ঘাড়ে দশটায়—বিষণ্ণ মনে।

"স্নান ক'রে নদীর পাড়ে একটি গাছতলায় ব'সে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইলাম ভাগীরথীর দিকে। মনের ভার একটু হাল্কা হ'য়ে এল। কী সুন্দর! মরি, মরি। সেদিন কী একটা পার্বণের শুভ তিথি ছিল মনে নেই। বহু সন্ন্যাসী এসে কয়েকদল গঙ্গাজলে নেমে তর্পণ রত। কয়েকজন ধর্মার্থীকে পাণ্ডারা ফুল হাতে গুঁজে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছে।

ডান দিকে আমার আসন থেকে আটদশ হাত দূরে আমো কয়েকটি পুরুষ দ্রৌব্রীরা তর্পণ করছে ফুল বেলপাতা নিয়ে।

"হঠাৎ এক পাতলা আটাশ বৎসরের শ্রীমতীনীর আবির্ভাব। সঙ্গে এক অনিন্দ্যকান্তি আট নয় বৎসরের শিশু। দুজনে হাঁটুজলে নামতেই ছেলেটি পরমানন্দে গান ধ'রে দিল। মা অঞ্জলিতে গঙ্গাজল নিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে তর্পণ করে, আর ছেলে গান গেয়ে চলে হাততালি দিয়ে। তার সে অপরূপ গান শুনবামাত্র আর সন্দেহ রইল না যে, এইই সেই শান্তনু—রঘুনাথজির মন্দিরে যার গান শুনতে রোজ ভিড় জমে—যার উপাধি রটে গেছে কিশোরকুমার। মা-র মুখে দিনের পর দিন শুনে এসেছি তার রূপ গুণ—বিশেষ ক'রে অপরূপ কণ্ঠের কথা। দুই আর দুয়ে চার—সিদ্ধান্ত : ঐ শ্রীমন্তিনীই তার মা কুন্তী যাকে নিয়ে গোল বেধেছে—এ-নাটকের নায়িকা।

"আমি মুগ্ধ নেত্রে ছেলেটির দিকে চেয়ে শুনি তার অপরূপ কীর্তন। সে হাঁটুজলে যে-ই ডুলে পড়ে—অমনি মা তার হাত চেপে ধরে। তবে নাটকের পাট দিচ্ছি যখন তখন শোন গ'এটি—যেটি আমি পরে তার কাছেই শিখে-ছিলাম।" ব'লেই ভীষ ধ'রে দেয় নীলকণ্ঠের বিখ্যাত কীর্তন :

> সজল জলদাঙ্গ সুস্মিতভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে
> হেরিলে হরে জ্ঞান, মন প্রাণ পড়ে পদতলে।
> নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজবনতলে?
> সাজ হেরি লাজে ধিরয়াজ নভোমণ্ডলে।
> উচ্চ শিখা তুচ্ছ করি' পুচ্ছ শিখা বামে হেলে
> তুচ্ছ করি' জাতি ধর্ম মূর্ছা করি' নারীকুলে!
> ভুবন করি' আলো বনমালা দোলে বেশ গলে।
> বাঁশি ধরি' হাসি' ছবি নাচে মরি, হেলে দুলে।
> (নীল) কণ্ঠ ভণে : 'মনে মনে কে অচেনায় চিনিতে পারে'
> (যে) চিনিতে পারে, জিনিতে পারে, কিনিতে পারে বিনা মূলে।

গাইতে গাইতে কেষ্ট তীষের চোখের জল গাল বেয়ে নামে সক্ষ রেখায়। কোঁচায় মুখ মুছে অর্জিতের দিকে চেয়ে বলে : "কিন্তু এ কিছুই হ'ল না। গানটিকে আমি মার্ডার ক'রে বসলাম, হায় হায়! আহা, শান্তনু যখন হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে এ-কীর্তনটি গাইছিল তখন কেমন যেন আশপাশের হাওয়াই গেল বদ্‌লে। সবাই শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতই। ভুলব কি কোনদিন সে-গান আর তার অপরূপ রেশ? সকাল বেলার সূর্যের সোনায় আলো। সামনে মা গঙ্গা নেচে চলেছেন যেন গানের সঙ্গে তাল দিয়ে, সবার ওপর, গাইছে একটি কোকিলকণ্ঠ বালক, মাঝে মাঝে হাততালি দেয়, আবার চ'লে পড়তেই মা স্নিগ্ধ হেসে তাকে চেপে ধরে—সব জড়িয়ে যেন একটি নিটোল ছবি! এক একটা পরিবেশ যেন এক একটা গানের ফ্রেমমতন হয়ে দাঁড়ায় চক্ষের নিমেষে। সে কি ভুলবার তাই?" একটু থেমে কেষ্ট চোখ মুছে : "আলো এ-গানটির সুর ভাঁজতেই মনে পড়ে গেল সেই অবিস্মরণীয় পরিবেশের কথা। আবার ভাগীরথীতে ডুব দিতে না দিতে মনে প'ড়ে যায় গানটির কথা : যেন এবলে আমায় দেখ, ও বলে আমাকে!

অর্জিত আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে : "কিন্তু মনে রেখো—এখনো পর্যন্ত তুমি কুন্তী বা শান্তনু কারুর কথাই বলোনি।"

ভীষ হেসে বলে : "ওরে বেরিক, জানিস না কি—আর্টের একটি শ্রেষ্ঠ বাহন হ'ল উদ্বেগ—suspense : তোর মন আকুলি বিকুলি করছে কি না বল্—কে এরা জানতে? তৃষ্ণা না জাগলে জল জোগানো বৃথা। তাই এবার বলছি এদের কথা, শোন্। তবে এজন্যে আগে একটু পেছিয়ে যেতে হবে।"

ক্রমশঃ।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম মন্ত্র (১।২।৭)

মন্ত্র— শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা—
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

অর্থ—যিনি অনেকের শ্রবণের জন্যও লভ্য নন, যাঁহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানেন না, ইহার বক্তা আশ্চর্য (দুর্লভ), ইহার লব্ধাও কুশল নিপুণ ব্যক্তি। কুশল আচার্য দ্বারাও উপদিষ্ট জ্ঞাতা ও আশ্চর্য দুর্লভ।

ব্যাখ্যা—দ্রাঘিমারাজের সাহায্যে যেখানে আসিয়াছি, সেখানে ইহলোক পরলোকের সীমানা আর দেখা যায় না; তাহাদের ঊর্ধ্বে যে আত্মার বিস্তৃতি তাহাই গগনপ্রায় নয়নে ভাসিতে থাকে। "ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে লাগিবে মরমে ব্যথা।" সেইজন্য একেবারে নিসাড় হইয়া যাইতে হইবে। প্রেয় এবং শ্রেয়ের বিচারের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি। এখন এদেশের উপযোগী করে কান পেতে রই।

কর্ণ বাহিরের খবর শোনায়। কর্ণ দিয়াই ত ইহলোককে শোনা যায়। সেই কর্ণকে ভিতরের দিকে কার্যকুশল করিতে হইবে। ইহলোক ছিল বহিঃপ্রকরণের ক্ষেত্র, পরলোক হইল অন্তঃকরণের ক্ষেত্র। এখন আর "করণ" পর্যন্ত থাকিবে না, ইহা একেবারে যাত্রার শেষ অংশ, ইহাকে বলা চলে পরাগতির পথে বা সন্ধানে। ইহলোক বিষয়কে লইয়া ব্যস্ত, পরলোক পদার্থ, যাহাতে ভগবানের 'পদ' অর্থ রূপে লাভ হয়। এখন একেবারে পরমার্থের চরমটানে চলিতে হইবে, ভক্ত ও ভগবানের ভেদটুকুও তিরোহিত হইয়া আসিবে, তবে প্রকৃষ্টতম ধামে পৌঁছানো হইবে। সে পথে কর্ণ পূর্ণমাত্রায় হইবে শ্রবণ। শ্রেয়ের পথে চলিবার সঙ্গে আশ্রয় পাওয়া যায় তাহা আমরা দেখিলাম (দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যার শেষ কথা)। সেই আশ্রয়ই গুরু বা জীবন দেবতা রূপে প্রত্যক্ষ হইতে থাকেন। ভিতরের আচার্যের পদধ্বনি শোনা যায়। তিনি জীবনের ধাপে ধাপে আরো কাছে এসে অন্তরতম প্রদেশে তাঁর বাসস্থান স্থিরীকৃত করেন, সদ্‌গুরু রূপে প্রমাণিত হইয়া যা'ন। এখন সেই সদ্‌গুরুর (অব্যক্ত আত্মার) অব্যক্ত বাণী শ্রবণে পশিবার কথা। মন যেদিন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গত রক্ষা করে চলতে শিক্ষা করেছে তখন নির্মল হয়েছে। বুদ্ধি যোগ নিষ্পন্ন হইলে উজ্জ্বল হইয়াছে চিত্তের দুয়ার। এক্ষণে একনিষ্ঠ হইয়া যদি সদ্‌গুরুকে শ্রবণ করিতে পারি তবেই সেই চিরসুন্দরের সঙ্গ লাভ করে আপনহারা হইতে পারিব।

তখন সেখানকার বাতাসের কথা শোনা যাইবে, তারার রাগিণী ধ্বনিত হইবে, অন্তর আকাশের সূর্যচন্দ্র যে বীণা ও বাণী শুনাবে তাহাতে হৃদয় ভরপুর হইবে। সবই যেন অব্যক্তের প্রেরণা, যাহা নিবিড়তর অব্যক্তের দিকে আকর্ষণ করিবে। কয়জন এই আহ্বান পাইবেন? আবার শ্রবণে আসিলেও সেই অব্যক্তের ভাষা ও ভাব কয়জন ধরিতে পারিবেন? ভাষা ত অনেক রকম শোনা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার ভাব গ্রহণ সেই করিতে পারিবে, যাহার হৃদয়ে সেই ভাষা সঞ্চিত হইয়াছে, শুনিয়া শুনিয়া, ধরিয়া ধরিয়া ও বুঝিয়া বুঝিয়া। এতো শেখানো বুলি নয়, শাস্ত্রের কথা দিয়া ইহার ভাব অন্বেষণ করিলে চলিবে না। যে গান রচিত হয় নাই, যে শাস্ত্র আজও মানুষের অন্তরেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, যে বাণীর উৎস নিজের বুকেই ভেসে উঠবে নিজের অশ্রুজলে ও হাসিতে, সে তো

শুনেও ধরা সহজ নয়, যাঁহারা অমৃতের কূলে পারাপার হতে পারবেন, তাঁহারাই চেউএর মুখে সেই উচ্ছ্বাসের ধ্বনি পাইবেন, যাহা অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই তরঙ্গিত হইয়াছে। ইহাই হইবে "বেদ"। যাহাকে কাহারও পক্ষে বাহিরে "বেত্তি" (বা জানি) বলা চলে না। যাহা অন্তর বাহির পার হইয়া কোথায় যে কথা বলে, তার জানায়, তাহার কূল পাই না ; তাহা অন্তর বাহির দ্বারা অপ্রকাশ, সেখানে আত্মার চৌকী পাতা আছে, তোমার আমার সব জগদ্‌বাসীর জন্য, যে কেহ জুড়াইতে চাহিবে।

যে বক্তা সে বেদের বার্ত্তা বহন করে এখানে দিবে, তাহাকে আশায় আশায় বিচরণ করিতে হইবে (তাই তাহাকে আশ্চর্য্য বলা হইয়াছে এই মন্ত্রে), যদি আত্মা নিজেকে কোন শুভ মুহূর্ত্তে প্রকাশ করেন, তাঁর আপন করা ভাষায়, আপন-ভোলা ভাবের মধ্য দিয়া। যে শুনিবে, সেও সুনিপুণ আধ্যাত্মিক জীব হওয়া চাই, কেবলমাত্র ইহলোক বা পরলোকের আনন্দকে আলগোচে পান করিতে চাহিলে হইবে না। এ আনন্দ সাগরে ডুব দিয়া নিজকে ভুলিয়া গিয়া নিজকে অখণ্ডভাবে পাইতে হইবে। জ্ঞান আত্মা (বুদ্ধি যোগের পরিণত অবস্থার নাম) অনুগত হইয়া থাকিবে, অব্যক্ত আত্মা তাহাকে পথের কথা শুনাইবে, তাহাদের উভয়ের মিলিত স্বরূপ "অণু" বা জীবাত্মা প্রতীক্ষায় থাকিবে, কি করিয়া মহৎ আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া (৯।২।২৩ পরে দেখুন) পরমাত্মার "হদু"তে সমর্পিত হইবে (১।৩।১৩ দ্রষ্টব্য)। জীবাত্মার অব্যক্ত ও বাক্যের সহজ মিলনে উপদেষ্টা ও শ্রোতা একত্র হইয়া, আমাদের প্রতি কি করুণা করিবেন ? যমরাজ ও নচিকেতা উভয়ের প্রসাদ কি আমরা লাভ করিতে পারিব ? আচার্য্য দেবতার ন্যায় দরদী হওয়া চাই ; এবং শ্রোতার অন্তরে ইহলোক বা পরলোকের ভাব ও ভাষার গুঞ্জন ধ্বনি পর্য্যন্ত যেন আর না থাকে। এমন নীরবতায় এমন মধুবর্ষণ কোন আকাশে গেলে হৃদয়তায় পাওয়া যায় ?

এই মন্ত্রে আভাস দেওয়া হইল যে অব্যক্ত আত্মাকে সাধক নীয় স্বভাবে শ্রবণ করেন। পরের মন্ত্রে জানিব তিনি সাধকের সত্তায় বহির্ভূত হইয়াও তাঁহার মধ্যে যথাযথ স্পন্দনের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারেন।

ক্রমশঃ]

স্বপ্ন

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কোথায় সুড়ঙ্গপথে এতক্ষণ শান্ত হয়ে ছিল
অসহায় নজরবন্দীরা। অন্ধকার চাপ চাপ রক্তের মতন
এ'খানে ও'খানে, ক্ষীণ প্রাণ-প্রদীপের নীচে কি পঙ্কিল
ইচ্ছার ত্রিশূলে গাঁথে অসমাপ্ত নশ্বর জীবন।
চের-চোল-চালুক্যের সভ্যতার আকণ্ঠ জিজ্ঞাসা,
মোগল-শিখের শৌর্য্য, রবীন্দ্রের প্রেম, ভালবাসা।

মূর্ত্ত হয় অনবদ্য রঙে, যবে উত্তেজনা গাঢ় হয়ে এলে
রক্তের ছোঁয়াচ লাগে কল্পনায়—আকাশের ছায়া পথ

মেঘে।

পাবক

জ্যোৎস্না গুহ

ভারতের বুকে তখন নব ইতিহাসের চেতনা। সে যেমন ব্যথায় রাঙ্গা তেমন আলোয় উজ্জ্বল। স্বার্থান্বেষীর কুটিল চক্রান্তে ভারত দ্বিধা বিভক্ত হলো। মুসলমান রাষ্ট্র যে হিন্দুর দেশ পড়ল তাদের বুকে ত্রাস চোখে ভয় এই নিয়েই তারা ঘর বাড়ী ফেলে ছুটে আসতে লাগল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে। দ্বিখণ্ডিত ভারতের পূর্ব বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিম বঙ্গের আকাশ বাতাস তাদের ক্রন্দনে ভারী হলো। "ওগো দুটি ভাত দেবে, একটু ফ্যান। একটু আশ্রয়, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই।" ক্ষুধা। একটা অরণ্যচর প্রাগৈতিহাসিক দানবের ধারালো দাঁত দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে তাদের। ভাত চাই, খাদ্য চাই। রক্ত মাংস হাড়ের ভিতরে বিষাক্ত যন্ত্রণা। "দাও দাও আমাদের থাকতে দাও, তোমাদের দেশে।" আজ তারা উদ্বাস্তু, এর বেশী পরিচয় আর তাদের নেই।

পশ্চিম বঙ্গের কর্মচঞ্চল সহর কলকাতা। এয়ার-কণ্ডিশণ্ড রুমে, সেক্রেটারিয়েট ভবনে বসে রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার সুজিত চ্যাটার্জি নিজের কাজে ডুবে আছে। খুট্ করে দরজা খোলার শব্দ হলো, সুজিত চোখ তুলে চাইলে। বেয়ারা এগিয়ে এসে এক খানা কার্ড হাতে দিতে, কার্ড-খানা চোখের সামনে ধরে নামটা পড়ল রূপশ্রী ব্যানার্জি। একটু ভাবল না এ নামটি পূর্বে শুনেছি বলে মনে হলো না। কার্ডখানা টেবিলে রেখে, বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল, নিয়ে আসতে। বেয়ারা দরজা খুলে সসম্ভ্রমে এক পাশে সরে দাঁড়াল। রূপশ্রীর দেহলাবণ্যে এবং দামী বিলিতী সেন্টের সৌরভে, ঘরের বাতাসে নববসন্তের আকুল আহ্বান যেন আকুলিত হয়ে উঠল। সুজিত মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল। রূপশ্রী তার দেহরেখায় ছন্দময় হিল্লোল তুলে এগিয়ে এসে চকিত দৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে পদ্মকলির মত দুখানা হাত যুক্ত করে নমস্কার জানাল সুজিতকে। স্মিতহাস্যে সুস্মিত নমস্কার বিনিময়ের পরে, সম্মুখের চেয়ার দেখিয়ে বলল, "বসুন।" রূপশ্রী তার দামী সিল্কের শাড়ির ফস্-ফস্ আওয়াজ তুলে, নেহাৎ আগোছাল ভাবে বসল। কোলের উপর রাখল ভ্যানিটি ব্যাগটি। চঞ্চল দুটি আঁখির তারায় দুষ্টু হাসির খেলা। সুজিত যথাসম্ভব অফিসারি মেজাজ বজায় রেখে বলল, "আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।" লীলায়িত ভঙ্গীতে রূপশ্রী তার সুন্দর দুখানা হাত সম্মুখবর্তী টেবিলে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, বিলোল কটাক্ষে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, সুজিত দা, শিলং-এর রুমকীকে তোমার মনে পড়ে!" সুজিত যেন তার হারানো স্বপ্নকে ফিরে পায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "তুমি, তুমি রুমকী! বাব্বা, কি বদলে গেছ।" "সে প্রশ্ন আমারও। বদলানো বলে বদলানো।" হা-হা করে দরাজ গলায় হেসে সুজিত বলল, "খুব বদলেছি বুঝি।" "তা আবার বলতে।" আবার সুজিত হো-হো করে হাসে। রূপশ্রীর চোখে কৃত্রিম তিরস্কার, "কি হচ্ছে বলতো! লোক জড়ো হয়ে যাবে যে—" "থাক এত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, হলোই বা লোক জড়ো।" "তার পরে তোমাদের খবর কি বলো।" রূপশ্রীর চটুল উজ্জ্বল চোখে নেমে আসে ছায়া। হঠাৎ যেন ওকে অনেক বয়স হয়েছে মনে হয়। স্থিরদৃষ্টিতে সুজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই বলতেই তোমার কাছে আসা।" সুজিত ওর পরিবর্তন লক্ষ্য করে বলল, "কি ব্যাপার বলতো।"

"তোমার বাবা মা রন্টু মন্টু সবভাল আছেন তো?" রূপশ্রী একটু চুপকরে থেকে উদাস কণ্ঠে বলল, "বাবা মারা গেছেন।" "কবে?" "এই কয়েক বছর আগে." "কোথায় আছ তোমরা।" "যাদবপুর—বলতে পার জবর দখল কলোনী." "ওঃ" কথা যেন থেমে যায়। নীরব নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরে। রোদের লুকোচুরী খেলা চলে নিঃশব্দে। সে নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন তুলে সুজিত ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ স্যার, এখুনি পাঠাচ্ছি ফাইলটা। ফোন রেখে সুজিত সহাস্যে বলল "রুমকী, তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, ভারী জরুরী কেস্। দিল্লীর থেকে রি-হ্যাবিলিটেশন মিনিষ্টার জানতে চেয়েছেন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হলো, শীঘ্র জানাও। এবং ওদের অভাব অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ দাও।" হেসে সুজিত বলল, "মানে ডিটেলস্ ওদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ওরা, মানে উদ্বাস্তুরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। যাকগে কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি। তারপরে তোমাদের বিষয় সব শুনবো।"

এই অবসরে রূপশ্রী ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে, প্রসাধন সামগ্রী বের ক'রে, রূপটাকে আরও একটু ঝালিয়ে নেয়। ছোট্ট আয়না মুখের সামনে ধরে, পাউডারের নরম পাফ্‌টি মুখে বুলোয়। আইব্রো পেনসিলটা দিয়ে ভ্রূটা আরও একটু উজ্জ্বল করে। স্বেচ্ছাচারী চুলগুলোকে চিরুনীর সাহায্যে শাসন করল। তারপরে লিপষ্টিক্ বুলিয়ে ঠোঁট দুটিকে সরস করে নেয়। আয়নার বুকে নিজের প্রতিবিম্বকে একটু মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে জিনিষগুলি যথাস্থানে রেখে, অপেক্ষা করে সুজিতের আর্জেন্ট ফাইলটা শেষ হওয়ার। সুজিতের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়। এযেন ক্ষণপূর্বের সে সুজিতনয়। সিরিয়াস্ কাজের সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় মুখপ্রদীপ্ত। মনে হয়না রূপশ্রীর উপস্থিতি ওর মনে আছে। ওর এই রূপ রূপশ্রীকে মুগ্ধ করে। শ্রদ্ধায় অন্তর ভরে যায়। "এই না হলে আর এত সুনাম হয়? উদ্বাস্তুদের বেদনা ও অন্তর দিয়ে অনুভব করে। অথচ ওদের দেশ পশ্চিম বঙ্গে। দেশ ঘর হারানোর ব্যথা ওকে কোন দিন পেতে হয়নি। পেতে হয়নি অভাবের জ্বালা। তবু ও অনুভব করে এর বাস্তব ভয়ঙ্কর রূপ। তাই উদ্বাস্তুদের এত শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। উদ্বাস্তু নামে চিহ্নিত লোকগুলির অধিকার যে, এদেশের উপর পূর্ণ মাত্রায় আছে, সে কথাটাই সুজিতদা সকলকে বোঝাতে চায়। তারা যে আজকাল মানুষ নামের অযোগ্য হয়েছে তার জন্য ভারতবাসীর অনেক খানি দায়-দায়িত্ব আছে। টাকা দিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব আজ আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। শীর্ষ স্থানীয়েরা অবশ্য ভাবেন টাকা দিয়ে সব হয়। কিন্তু সবই পাওয়া যায়কি? নীতিভ্রষ্ট মানুষ আর হালভাঙ্গা নৌকো তলিয়ে যাবেই। তলিয়ে যাওয়ার আলোড়নের আঘাত হানবে সমাজের সকল স্তরে। আজ গোটা কয়েক টাকা ছড়িয়ে দিলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? তা হবে না। তাই এদের ক্ষতিপূরণ কেউ করতে পারবে না। দেশের আত্মা যখন তার অর্দ্ধাংশকে অস্বীকার করল, তখনই উপেক্ষিত অংশের মৃত্যু ঘটেছে। আজ মৃতদেহে জীবন সঞ্চারের বৃথা প্রয়াস।

উদ্বাস্তু বহিরাগত বলে যাদের অবহেলা করেছে, অপমান করেছে, একদিন "অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান···," প্রায় একঘণ্টা, ফাইলটা শেষ করে সুজিত টেবিলের উপর কলিংবেলে চাপ দিতে বেয়ারা ছুটে আসে। ফাইলটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে চাপরাসীকে নির্দেশ দিয়ে সুজিত একটু হেসে রূপশ্রীকে বলল, "এবারে তোমাদের কথা শুনবো।" দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে রূপশ্রী বিষণ্ণ একটু হেসে, যেন বিশেষ একটি ঘটনা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। তারপরে বলতে লাগল—মিলং-এর বাবার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর চাকরীটা একটা মিথ্যা অভিযোগ চলে গেল। দাদার সঙ্গে বাবার "বস্" বিপিন বাবুর ছেলে ভবানী পড়তো। কি নিয়ে ওদের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়। সেই থেকেই একটা অসন্তোষ ধোঁয়াতে থাকে। একদিন দাদাকে ভবানী বিদ্রূপ করে বলল, "একটা কেরাণীর ছেলের আবার এত তেজ!" দাদা বাড়ী এসে বাবাকে সে কথা বলতে, বাবা রেগে আগুন হন—তখুনি চান রেজিগনেশন দিতে। মা

ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ, গম্ভীর ভাবে বললেন, "পাগলামী করোনা। চাকরী ছাড়া মানেই তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে উপোস করে মরা।" কিন্তু তখন ছাড়লেই মানের সঙ্গে আসতে পারতেন। এ ঘটনার প্রায় একমাস পরে কোম্পানীর ম্যানেজার বাবাকে ডেকে পাঠালেন। ম্যানেজার সাহেবের ডাক শুনে বাবার পিলে চমকে উঠল। বাবার মত নীচস্থ লোককে বড় একটা তিনি ডাকেন না। ডাকলেই দুর্গা নাম জপতে হয়। ম্যানেজার সাহেব একটা কাগজ বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এরপরও আপনাকে আর রাখা চলে কি?" কাঁপতে কাঁপতে বাবা, কাগজটা পড়ে দেখলেন; বিপিনবাবুর দীর্ঘ নোট। তাতে শিগ্‌গিরই যে একটা "ফ্রড" হয়ে গেছে সেটার সঙ্গে বাবার নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। বাবা এই সবৈব মিথ্যা অভিযোগে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শুধু বললেন, "স্যার, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" কিন্তু প্রমাণ অভাবে বাবার চাকরীটি গেল। সুজিত, শুষ্ক ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে বলল, "তারপর।" রূপশ্রীর মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি। "তারপরে আমরা শিলং থেকে চলে এলাম আমাদের পূর্ববঙ্গের দেশের বাড়ীতে। বাবা, অনেক ধরাধরি করে একটা প্রাইমারী স্কুলে চাকরী জোগাড় করলেন। কোন প্রকারে পাঁচটি প্রাণীর খাওয়া পরা চলতে লাগল। বাবার কাছে বাড়ীতে আমরা পড়তে লাগলাম। দাদার খুব স্কুলে পড়ার ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া শিখে আরো অনেক বড় হওয়ার। গরীবদের অনেক ইচ্ছাই দীর্ঘশ্বাসের তলায় চাপা পড়ে যায়; দাদারও গেল।" রূপশ্রীর মুখে ম্লান হাসি। সুজিতের তা দেখে মায়া হয়, তাকিয়ে থাকে। রূপশ্রী ফিক্ করে হেসে বলল, "এত কি দেখছ বলতো।" "তোমাকে," "আমাকে! কেন বলতো।" আবার দু-জনের হাসি। সুজিত মনে করিয়ে দেয় "বলো তারপরে।" রূপশ্রীকে হঠাৎ গম্ভীর দেখায়, বলল, "তারপরের ঘটনাও বলতে হবে! হোক তা যতই নিন্দনীয়।" "না না তোমার বলতে সঙ্কোচ হয়, এমন কিছু আমি শুনতে চাই না।" রূপশ্রী সোজা-সুজি সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু, আমার যে বলতেই হবে সুজিতদা। না-না তোমাকে না শুনিয়ে আমার উপায় নেই।" বড় ক্লান্ত দেখায় রূপশ্রীকে। সুজিত বেয়ারাকে ডেকে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দেয়।

চায়ের সঙ্গে চলে গল্প, "প্রাকৃতিক নিয়মেই দিনগুলি চলে যেতে লাগল। আমাদের সংসারও ঠিক চলা নয়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে লাগল। কিন্তু মুস্কিল হলো, যুদ্ধ শেষে দেশ ভাগ হয়ে। আমাদের দেশ পড়ল, পাকিস্থানে। বাবা তাঁর মাইনে কোন দিনই ঠিক মতন পেতেন না। এখন হিন্দুরা দেশ ছেড়ে অনেকেই ভারতে চলে আসতে, স্কুলটি প্রায় উঠে যাওয়ার দাখিল হলো। দাদাকে কিছুদিন আগেই বাবা গ্রামের জমিদার দীনবন্ধু বাবুর হাতে পায়ে ধরে, তাঁর সেরেস্তায় একটি মহুরীর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। দাদা যেদিন প্রথম কাজে গেল সেদিন যত কাঁদলো দাদা, তার চেয়ে বেশী কাঁদলেন মা। বাবা, ওদের কান্না দেখে রেগে গেলেন, বললেন "একি কাঁদবার সময়, কোন রকমে বেঁচে থাকতে হবেতো। যা-দেশের অবস্থা, অনেক কাঁদতে হবে। এই সামান্য কারণে চোখের জলের অপব্যয় করো না। আর কান্নার হয়েছে কি! ছেলের ছোট চাকরী হলো এই তো! আরে সকলেই কি লাটগিরি পায় নাকি। যত সব…," মা, আঁচল দিয়ে দাদার চোখ মুছিয়ে বললেন, "কাঁদিসনে বাবা, সকলেই কি সবকিছু পায়।" বাবা, ক্রুদ্ধদৃষ্টি হেনে বললেন, "দেনায় তলিয়ে গেছি, জিনিষ-পত্র অগ্নিমূল্য, তাও সব কিছু পয়সা দিলেও পাওয়া যাচ্ছে না। আমি দীনবন্ধু বাবুর কত হাতে-পায়ে ধরে, ছোঁড়ার জন্যে কাজটা জোগাড় করলাম, আর কিনা তা নিয়ে মায়ে পোয়ে কান্নাকাটি চলছে।" পরের দিন দীনবন্ধু বাবুর সেরেস্তার কাজে যোগ দিল ছটু, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় নানা বয়সের মহুরীর সঙ্গে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের হিসাব মেলাতে। সুজিত বলল, "আহা, ছটুর কথা শুনে ভারী কষ্ট হলো। ছোট বেলায় ওর পড়াশুনায় বেশ মন দেখেছি।" রূপশ্রী ছোট্ট একটি হাই তার সুন্দর হাতের আড়ালে শেষ করে বলল, "গরীবের আবার লেখাপড়ায় মন।" সুজিত প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এত দিন

পরে আমায় খোঁজ পেলে কি করে?" "সংবাদ পত্রে তোমার নানাবিধ গুণাবলীসহ সংক্ষিপ্ত জীবনীও বেরিয়েছিল যে! ঐ সূত্রধরেই তোমার কাছে এসেছি। কাগজে তোমার বাবার নাম, এবং সিলং কন্‌ট্রোলার অফিসে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তা পর্য্যন্ত লেখা ছিল। তা না হলে তুমি যা বদলেছ, কিছুতেই চিনতে পারতাম না।" সুজিত হেসে বলল,—"সেটা তোমার বা আমার দোষ নয়; দোষ যদি কারুর থাকে তা সময়ের।"—"তা বলতে পার" বলে, রূপশ্রী কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারে না। বলল, "যাই বলো, কলকাতার জল-হাওয়ায় তুমি একটি জীবন্ত বিজ্ঞাপন। সুন্দর পেশল দেহটি বাগিয়েছ বেশ।" সুজিত হেসে বলল, "দিলে তো নজর! যাক ওসব কথা, তুমি পরের ঘটনা বলো।"—"পার্টিশনের পরও আমরা দেশেই থেকে গেলাম। কিন্তু দেশের অনেক হিন্দুই পালাতে লাগল। বাবার স্কুলটিও ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে গেল। দাদার চাকরীটি অবশ্য তারপরেও কিছুদিন ছিল। তাই কোন রকমে আধ পেটা খেয়ে দেশেই পড়ে রইলাম। একদিন শুনছি, বাবাকে মা বলছেন, "বলি, রুমকীর দিকে ইদানীং তাকিয়ে দেখছ? মেয়ের দিকে যে আমি আর তাকাতে পারিনা।" বাবা একটুতেই রেগে যান, বললেন, "থাক, যা বলবে এক কথায় বল, হেয়ালী আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। কি হয়েছে রুমকীর? সে কথা খোলসা করে বল।" মা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "মরণ আর কি! দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলে যে হালকা হবো, তারই কি জো আছে? বলি, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? মেয়ে যে মর্ত্তমান কলার মত বেড়ে উঠেছে। আধপেটা খেয়েই এই, পুরো খেলে কি হতো? ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। এখনও চেষ্টা চরিত্তির করে, এ দেশ থেকে মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাই, চল।" এই দেশ! যে দেশ কিছু দিন আগেও, জননী জন্মভূমি ছিল, সুখে-দুঃখে কত বড় আশ্রয়। আজ তার চোখ বিমাতৃসুলভ নির্দয়তায় ক্রুর কুটিল। তার বিষদৃষ্টি থেকে যতদূর সম্ভব পালিয়ে বাঁচতে হবে। বাবা বললেন "কোথায় যেতে চাও শুনি?" "কেন, কলকাতায়, কোলকাতায় গিয়ে কোথায় মাথা গুঁজবো? না বায়ুভূত হয়ে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াব?"—"তা তুমি যাই বল, এখানে ঐ সোমত্ত মেয়ে নিয়ে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আর আভাগীর রূপ নয় তো আগুন!" আড়াল থেকে মার কথা শুনে, প্রথম সে দিন নিজের দিকে বেশ ভয়ে ভয়ে তাকালাম। লজ্জায় চোখ বুঁজে এলো। না না, আমাদের গরীবের ঘরে এত রূপ কেন! এ আপদ এখন সামলাই কি করে! মার চোখে আতঙ্কের ছাপ, এবার বাবারও দুশ্চিন্তার কারণ হবে, একি করলেন ভগবান! এই রূপের জন্যে সে দিন প্রাণভরে ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম।" সুজিত অভিভূত হয়ে শুনছিল। বলল, "তারপর!" "তারপর দাদার চাকরীটিও গেল কারণ দীনবন্ধুবাবুরা সকলে কলকাতায় যাচ্ছেন, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে, জায়গা-জমি বিক্রি করে। বাবা বললেন মাকে, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। দেশে থাকার আর কোন উপায় রইল না। চল, ছেলে মেয়ের হাত ধরে কলকাতায়, যা হোক একটা হবেই উপায়।" মা, তাঁর গৃহস্থালির হাঁড়ি-কুঁড়ি, ডালা-কুলো, কৌটো-বাটার দিকে তাকিয়ে মমতায় কাঁদছেন, এসব কিছুই নেওয়া যাবে না। এর প্রতিটি জিনিষ তাঁর বাৎসল্য-রসে সিক্ত। এদের ফেলে যাওয়া মানে, নিজের পুত্র-কন্যা ফেলে যাওয়ার দুঃখ। মার অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হলো। তবুও সব কিছু ছেড়ে আসতে হলো।

একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রে আমরা আমাদের বহু পুরাতন ভাঙ্গা ঘরটিতে একটি মরচেপড়া তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে যৎসামান্য গুটিকতক জিনিষ। যাত্রার আগে মা আমাকে মোটা ধূসর রঙের একটা চাদর হাতে দিয়ে বললেন, "মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বেশ ভাল করে জড়িয়ে নাও।" আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন? কি বিশ্রী দেখাবে বলতো? মা চাপাস্বরে বললেন, "ঐ-জন্যেই তো বলছি। আয় তো আমার কাছে" বলে, কি যেন কালো ধুলোর মত খানিকটা আমার মুখে মাখিয়ে দিলেন। আমি রেগে গেলাম, কি মাখালে? মা হাসলেন। মরা মানুষে যদি হাসে ঠিক সেই রকম। বললেন, "দুষ্টু লোকের নজর যাতে না

লাগে, সেইজন্যে ঐ সব করতে হয়।" যাই হোক, আমাদের যাত্রা কালে অন্ধকার ভেদ করে একটু চাঁদের মরা আলো পড়ল আমাদের কুঁড়ে ঘরখানার উপর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরখানা যেন কাঁদছে। ওকে যে আমরা এত ভালবাসতাম, তা বোঝা গেল ছেড়ে আসার সময়। বুকটা মুচড়ে মুচড়ে কান্না আসতে চায়। বেদনার সে এক অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। ঘরখানার ভাঙ্গা চোরা কুশ্রী রূপটা এতদিন আমাদের সকলেরই বিরক্তির কারণ ছিল। কিন্তু আজ সে যে এমন করে কাঁদাবে, তা কেউ কি ভেবেছিলাম। সকলের চোখ ভেজা, ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি। বাবা যেন জীবন যুদ্ধের নির্ভিক সৈনিক। বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে এই একটিই তাঁর সঙ্কল্প। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এগিয়ে চল। পিছন ফিরে তাকানো মানুষের ধর্ম্ম নয়। তাকে এগিয়ে যেতে হবে অগ্রগতিই তার জীবনের লক্ষ্য। প্রতিকূল অবস্থায় হতাশ হলে চলবে না। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করার নামই তো জীবন, মুছে ফেল চোখের জল। বিপদের সঙ্গে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চল।" সেদিন বাবার কথায় আমরা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।" সুজিত বলল, "তোমাদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, কাগজের কল্যাণে আমরাও কিছু কিছু জানতে পেরেছি।'

লাস্যময়ী রূপশ্রী বলল, 'না, কিছুই জানতে পারনি। এ ব্যথা কি কাগজের বুকে প্রকাশ পায়? পায় না। এ ব্যথা সন্তান হারা পিতা মাতার বক্ষের সমতুল্য। দেশ, গৃহ, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য হারানোর যে কি ব্যথা তা কি করে তোমাকে বোঝাব। তোমরা কিছু রিফিউজি ক্যাম্প এবং ডোল দিয়ে এই দায় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাও কিন্তু তা হয় না। রাহুর প্রেমের মতই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করবে ভারতচেতনা। যে দিকে তাকাবে সেইদিকেই ঐ ছিন্নমূল মুখগুলি তাকে পীড়িত করবে।" অপরাধী গলায় সুজিত বলল, "পথে আর কোন অসুবিধা হয়নি তো?" "হয়েছিল বৈ কি। ষ্টেশনে আসার পথে, আমার রূপ যৌবনে প্রলুব্ধ হয়ে দুজন মুসলমান গুণ্ডা আমাদের আক্রমণ করলে। বাবার তখন মনে অপরাজেয় শক্তি। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ভগবান সে দিন আমাদের মান ইজ্জত রক্ষা করলেও বাবার একখানা পা দুর্বৃত্তদের লাঠির আঘাতে হাঁটুর থেকে ভেঙ্গে ঝুলতে লাগল। কিন্তু সেদিকে তাকানোর সময় নেই কারুর। বাবার বেহুঁস দেহটা দাদা কাঁধে নিয়ে ছুটতে লাগল। যাহোক আমরা গাড়ীতে উঠতে পারলাম। বাবার পাখানা দাদা তার ধুতির খানিকটা ছিঁড়ে বেঁধে দিলে। অসহ্য যন্ত্রণায় বাবা অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন। মা মুখে আঁচল পুরে ঘুরে বসে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। সে সময়কার অবস্থা আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না সুজিতদা।

শেয়ালদা এসে পৌঁছোলাম আমরা। আশ্রয় পেলাম আর পাঁচটা রিফিউজির সঙ্গে, ষ্টেশনের একপ্রান্তে। বাবাকে দাদা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলে। যা দুচার টাকা সঙ্গে এনেছিলেন মা, তা চিকিৎসা এবং আমাদের খাওয়ার খরচ চালাতে নিঃশেষ হয়ে গেল। ছ'মাস বাদে বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন খোঁড়া অবস্থায়। হাঁটুর নীচের অংশটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেখে বাবা হাসলেন, কি মর্ম্মান্তিক সে হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন,"সেদিন ব্যাটাদের খুব জব্দ করেছি। যা ঠেঙ্গিয়েছি কিছুদিন ওদের মনে থাকবে, বলে নিজের খোঁড়া পা-খানার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না। এদিকে আমাদের তখন প্রায়ই উপোস যাচ্ছে। ক্ষুধা তার দাবী সরবে ঘোষণা করছে। ইচ্ছা হচ্ছে নিজেদের হাত-পা খানিকটা কামড়ে খাই। বাবার বয়স হয়েছে, তার উপর অসুস্থ। তিনি ক্ষুধার তাড়নায় শয্যা নিলেন। কণ্ঠস্বর হলো ক্ষীণ, চোখে অস্বাভাবিক লোভের প্রকাশ। দোকানে খাদ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো, বাবা লোলুপ দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। ছোট শিশুর মত কোল টানেন জিবে। স্নায়ু নীতি তখন আমাদের পেটের ক্ষুধার আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দাদা ছোড়দা পকেট কাটতে সুরুকরল প্রথম যেদিনছোড়দা পকেট কেটে চার টাকা এনে মার হাতে দিল, মা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছোড়দা কুড়িয়ে আনলো। বাবা শত ছিন্ন ময়লা বিছানাটার উপর

আধ শোয়া অবস্থায় ছিলেন, উত্তেজনায় উঠে বসলেন। আদেশের সুরে বললেন, "যা মন্টু চাল ডাল, সব কিছু কিনে নিয়ে আয়। আঃ অনেক দিন পরে রাইসের সঙ্গে দেখা হবে।" মাকে বিদ্রূপ করে বললেন, "অমন করে হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? উঠো ধর্ম্মপত্নী, উনুনটা জ্বালাও। মন্টুর আর ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে। ততক্ষণে উনুনটা জ্বলে উঠবে।" বাবা খোঁড়া পা-খানা আনন্দে নাচাতে লাগলেন। সেদিন, অনেক দিন পরে আমরা পেট ভরে খেলাম। কিন্তু মা সেই চোরা টাকার অন্ন মুখে তুলতে পারলেন না।" রূপশ্রী একটু দম নিয়ে সুজিতকে বলল, "আচ্ছা সুজিতদা, তুমি তো রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার, কর্ত্তব্যের খাতিরে উদ্বাস্তু নামক জীবগুলিকে দেখতে শেয়ালদা ষ্টেশনে দু-একবার গেছ নিশ্চয়।" "তা যেতে হয়েছে বৈকি।" "আচ্ছা সেখানে ভাঙ্গা তোবড়ানো রংচটা টিনের বাক্সের ওপর কোন যুবতীকে ছিন্নবস্ত্রে নিজের অনাবৃত যৌবনকে ঢাকবার মিথ্যা প্রচেষ্টায় ব্যস্ত দেখে থাকবে। সে যে আমি নয়, হলপ করে বলতে পার!" সুজিত অস্বস্তিতে নড়ে-চড়ে বসে। রূপশ্রীর অধরে তীক্ষ্ণ হাসি। তীব্র জ্বালাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূপশ্রী বলল, "এইখানেই শেষ নয়। বহুসপ্রচার কাগজের রিপোর্টারদের এই-দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করে জনগণকে দেখাবার সেকি উৎসাহ। কেউ বলছেন, আঃ ঢেকো না, যেমন আছে ঠিক তেমনি থাক। খুট করে শব্দ হলো, বুঝলাম রিপোর্টার মহাশয়ের কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে। তার উপর আছে, নির্লজ্জ পথিকের আদিম প্রবৃত্তির কৌতূহল। কোথায় ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছে শরীরের একটু অংশ, তা দৃষ্টি দ্বারা লেহন করছে।" সুজিত উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, "রাসকোল। রুটু সটু ওগুলোকে চাবকাত না কেন?" "কত চাবুক মারবে? এত নিত্যদিনের ব্যাপার। কিছু দিন এরকম চলার পরে, দাদা একটা সুখবর আনলে। তখন রাত প্রায় দশটা। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর উদ্বাস্তুরা সকলে ঘুমোচ্ছে। আমাদের একটু করে মুড়ি আর জল চলছিল ক'দিন থেকেই। বাবার চোখে ঘুম নেই। দাদা কাছে বসে ফিস্-ফিস করে বলল, "যাদবপুরে একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি। অবশ্য লোক বসতির অযোগ্য।" বাবা, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন, ভীত শ্বাপদের মত চারদিক তাকিয়ে অত্যন্ত নিম্ন-স্বরে বললেন, "জায়গাটা কার জানিস কিছু?" "না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটুকড়ো সিমেণ্ট করা জমি পড়ে আছে। হয়তো বহুকাল আগে কিছু কাজের জন্যে তৈরী হয়েছিল। এখন জমিটুকু জঙ্গলে ঢেকে ফেলেছে। সামনে একটা পানাভরা পুকুরও আছে। ধারে কাছে বসতি নেই।" দাদার একথা শুনে বাবা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, "রাত ডিনটের সময় বের হবো। কেউ দেখলে বলবি, আমরা এক আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছি।" মার ঘুম ওদের ফিস্ ফিসানীতে ভেঙ্গে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাবাকে বললেন, "কিগো?" বাবা সব কিছু বললেন। মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এও আমার কপালে ছিল। পরের জমি টের পেলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে।" বাবা বিরক্ত হলেন, মার এই উক্তি শুনে। অধীর আগ্রহে সময়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাত্রি তখন আড়াইটে। নিঃশব্দে বাবা মাকে ঠেলে বললেন "ওদের তোল। এবার রওনা হতে হবে।" আমরা যেন সব বোবার দল। কারুর মুখে শব্দ নেই। দাদা, মাথায় নিল ভাঙ্গা বাক্সটা। ছোড়দা চটজড়ানো বিছানাটা, বাবা জলের কুজো, মা হ্যারিকেন আর পাখা। আমার হাত দুখানা নিযুক্ত রইল, নিজেকে সামলাতে। মা কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "কোন দিকে যদি মেয়ের খেয়াল থাকে, ছেঁড়া জামা দিয়ে যে গা বেরিয়ে রয়েছে!" নিজেই ঢাকবার অযথা চেষ্টা করে, বিরক্ত হয়ে আমার উপর রেগে গেলেন। "এই সেদিনের জামাটা এর মধ্যে এমন করে ছিঁড়েছিস? একটু যত্ন নেই জিনিষের।" অথচ মা নিজেও জানেন, ব্লাউজটার বয়স বোধহয় কম করেও দেড় বছর। একটি ছাড়া দুটি নেই, আর কত দিন চলতে পারে! যাক্, আমরা এসে গেলাম, দাদার নির্দ্দিষ্ট জমিতে। পূবের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। দু-চারটে পাখী কলস্বরে নতুন দিনকে স্বাগত জানিয়ে নীল আকাশে উড়ে গেল। বাবাকে বড় ক্লান্ত দেখাল। খোঁড়া পায়ে এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেছেন। হাতের কুঁজোটা সেই জঙ্গলে ঢাকা সিমেণ্টের

উপর রেখে বসে পড়লেন। দাদা, ছোড়দাও মাথার বোঝা নাবিয়ে, জায়গাটা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। এতক্ষণে যেন মার চোখে একটু খুশী ঝিলিক দিল। খুশী গলায় আমাকে বললেন, "ছাখ কেমন অযত্নেও লাউ-কুমড়োর গাছগুলি বেড়ে উঠেছে। কত রকমের শাক-পাতা। আম গাছটা ঝেঁপে বোল এসেছে। কচি আমের অম্বল খেতে বেশ।" আমার কিন্তু এতসব লোভের বস্তু দেখেও, জায়গাটা পছন্দ হলো না। আমরা যেন কোন্ আদিম যুগে চলে এসেছি। সভ্যতার আলো এসে এখনও পৌঁছায়নি। সকলের এত আনন্দের মাঝে নিজেকে ব্যতিক্রম মনে হলো। চেষ্টা করলাম নিজেকে মানিয়ে নিতে।

বাবা, দাদাদের কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন। আজ যেন তিনি জয়ী। পেয়েছেন বাসস্থান, ভাতের ব্যবস্থাও ক্রমশঃ হবে নিশ্চয়। মা বললেন, "পরিষ্কার তো হলো, কিন্তু মাথার উপর একটু আচ্ছাদন না হলে তো বাস করা যাবে না!"

এ কথাটা যেন এতক্ষণ মনেই ছিল না কারুর। তাই তো! মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের হাতের সোনা বাঁধানো লোহা গাছা, দাদার হাতে দিয়ে বললেন, "যা স্যাকরার দোকানে নিয়ে সোনাটুকু খুলে বিক্রি করে ঘরখানা তৈরীর মত জিনিষ কিনে আন।" এত সহজে সমস্যার সমাধান হতে দেখে সকলেই খুশী। হলো আমাদের একখানা খড়ের ঘর। না, ঘরামীর দরকার হয় নি। দাদারা নিজেরাই তৈরী করল। সে তো আর ঘর নয়—কোন রকমে মাথা গোঁজার আশ্রয়। মার মধ্যের গৃহিণী, গৃহ পেয়ে আবার ঘরকরণায় মেতে উঠলো। পাশেতরা এঁদো পুকুরটাই আমাদের জলের প্রয়োজন মেটাত। বঁড়শী দিয়ে ছোড়দা মাছ ধরতো মাঝেমধ্যে। আর জঙ্গল থেকে শাক পাতা মা তুলে এনে সেদ্ধ করতেন। চলছিল এই প্রকার। কিন্তু এও বেশীদিন নয়। নীরব উপেক্ষায় যে জমি এতদিন পতিত হয়ে ছিল, সেও প্রাণের স্পর্শ পেয়ে মূল্যবান্ হলো। মহৎ ইচ্ছার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় কয়েকদিনের মধ্যেই, উদ্বাস্তু কলোনীতে পরিণত হলো। কি করে টের পেলে জানি না, ব্যাঙের ছাতার মত ছোট ছোট চালাঘরে জায়গাটা ভরে গেল। জঙ্গল সাফ্ হয়ে গেল। আমার ভালই লাগল। প্রতিবেশীদের ভাল-বেসে, হিংসে করে, সময়েতে ঝগড়া-কোঁদল করে, কলোনীর দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। ভগবান্ও বোধহয় আমাদের উপর একটু প্রসন্ন হলেন। এত দিনে দাদা একটা কাপড়ের দোকানে হিসেব লেখার পঁচিশ টাকা মাইনের কাজ পেল। ছোড়দাও বসে নেই। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দুখানা গাড়ী ধুয়ে দশ টাকা পেত। এই পঁয়ত্রিশ টাকায় আমাদের কোন রকমে দিন চলে যাচ্ছিল। বাবার কাছে আমি আবার পড়তে লাগলাম। প্রায় বছর খানেক পরে দাদাকে আমি বললাম, আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চাই। দাদা শুনে খুব খুশী।' নিজের তো কিছু হলো না, যদি বোনের হয় তাতেও অনেকটা আত্মতৃপ্তি। কিন্তু বাবা শুনে হাসলেন। বিদ্রূপ করে বললেন "কুঁজোর চিৎ হয়ে শুতে সাধ হয়।" শেষ পর্যান্ত পরীক্ষা দেওয়া ঠিক হলো। কিন্তু ফিসের টাকার জোগাড় হবে কি করে? হঠাৎ কানে হাত দিয়ে মনে হলো এখনও মাকড়ী দুটো আছে। আশ্চর্য্য লাগল, এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এ দুটো টিকে রইল কি করে। খুলে দাদার হাতে দিয়ে বললাম, এই দুটো বিক্রি করেই আমার ফিসের টাকা হবে নিশ্চয়।

পাশ করলাম থার্ড ডিভিসনে। একটু মুষড়ে পড়লাম।

দাদা হেসে বলল, "পাগল নাকি। পাশ করেছিস এই কত—আবার ডিভিসন! তাছাড়া ডিভিসনের দাম দু-দশদিন তারপরে শুধু পাশ—ব্যস,তা তো হয়েছিস। এবারে টাইপটা শিখে নে।" আমি বললাম "শিখতে টাকা লাগবে না!"—"সে হয়ে যাবে।" পরে জানতে পেরেছিলাম, অবসর সময়ে দাদা বিড়ি বেঁধে আমার পড়ার খরচ চালাত।

কিন্তু ভগবানের প্রসন্নতা আমাদের উপর বেশী দিন রইল না। কিছু দিনের মধ্যেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমাদের জীবন ঢেকে ফেলল। বাবার শরীর কিছু দিন যাবৎই খারাপ যাচ্ছিল। এখন প্রায় শয্যাগত হয়ে পড়লেন,ঘুষঘুষে জ্বর সর্দিকাসী। মা বললেন দাদাকে, "এবার তোর বাবাকে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে চলছে না।" দাদা বলল, সে কথা আমিও ভেবেছি। পরশু নিয়ে যাবো।" দাদার কাঁধে ভর দিয়ে বাবা, অতিকষ্টে হাসপাতালে

গেলেন। ডাক্তার দেখে বললেন, "মশাই, রোগ আপনার সিরিয়াস। সব কিছু এক্জামিন না করে কিছু বলতে পারি না। তাতে সময় এবং অর্থ দুয়েরই প্রয়োজন।" সময় যদি বা আছে—কিন্তু অর্থ কোথায়? দাদাকে একটু আড়ালে ডেকে ডাক্তার বললেন, "আমার মনে হয় টি. বি.। এখানে সে চিকিৎসা সম্ভব নয়।" সে দিন বাবার চোখে নৈরাশ্যের যে ঘনীভূত রূপ দেখেছিলাম, তাতে আমার জীবনের মূল শুদ্ধ নাড়িয়ে দিল। পথের পরিশ্রমে বাবা অস্থির হয়ে পড়লেন। শুধু হাঁপাতে লাগলেন। মা তা দেখে ব্যাকুল হয়ে দাদাকে বললেন, "রমেশবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, হন্টু।" রমেশবাবু আমাদের কলোনীরই একজন। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করেন। একটাকা দক্ষিণা দিলেই তাকে আনা যায়। তাই অসুখ বিসুখে আমরা ওকেই ডাকি। একেবারে যে ভাল হয় না তা নয়। রমেশবাবু বাবাকে পরীক্ষা করে বললেন, "হার্টের অবস্থা খুব দুর্ব্বল"—মোটেই নড়াচড়ার শক্তিও তখন ছিল না বাবার। দাদার চোখে দেখলাম একটা হিংস্র আলো। এই ঘটনার পরের দিন, দাদা রাত্রে আর দোকান থেকে ফিরল না। সারারাত মা ঘরবার করে কাটালেন। সকালবেলায় দাদা এল না, এল পুলিশ। দাদা নাকি সেই কাপড়ের দোকানের মালিককে ছোরা মারার অপরাধে গ্রেফ্তার হয়েছে। মামলা চলল কিন্তু একতরফা। দাদার পুরো পাঁচ বছর জেল হলো। দাদার আয়েই সংসার চলতো, এখন একেবারেই অচল হয়ে পড়ল। ছোড়দার দশ টাকাই একমাত্র ভরসা। আবার ক্ষুধা তার বীভৎস রূপ নিয়ে দেখা দিল। বাবার অবস্থাই হলো শোচনীয়। একে অসুস্থ, তার উপর পথ্য পাচ্ছেন না। কষ্টে তাঁর রুগ্ণ চোখ দিয়ে যখন জল গড়িয়ে পড়ত, যখন তা দেখে, মানুষ হওয়ার অপরাধে নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করেছি। কত জায়গায় চাকরীর জন্যে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব জায়গাতেই শুনেছি, "নো ভেকেন্সি", কোথায়ও স্থান পাইনি। দু একজন দয়াপরবশ হয়ে যদি বা পরীক্ষার সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু স্পীড কম বলে হেসে বলেছেন, "এত কম স্পীডে কাজ দেই কি করে বলুন তো।" এই চলেছে দিনের পর দিন।

একদিন রাত্রি তখন গভীর, নিঃশব্দ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে একটা গোঙানী শোনা গেল। মা আঁৎকে উঠে আমাকে ঠেলে বললেন, "তোর বাবার গলা না?" মার ভীতি ব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম। আমরা ছুটে যখন বাবার শয্যাপার্শ্বে গেলাম তখন বাবার প্রায় শেষ অবস্থা। দৃষ্টি ঘোলাটে, বাক্শক্তি রহিত। কিন্তু সেই ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে বাবা যেন কি খুঁজছেন। মা বুঝতে পেরে, গীতাখানা এনে বাবার কপালে ছোঁয়ালেন। সব খোঁজা, সব চাওয়া-পাওয়া শেষ হয়ে গেল। দুটি চোখ চির-নিদ্রায় নিমীলিত হলো। বাবা সেই পরম জ্যোতির্ময় পুরুষের বাণী "মামেকং শরণং ব্রজ" পাথেয় করে মহত্তর জীবনের পথে যাত্রা করলেন।

আমরা যে বাবা মারা যেতে খুব কেঁদেছিলাম, তা নয়। বরং মনে একটু স্বস্তি পেয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুপথযাত্রীর ক্ষুধার কষ্ট আর সইতে পারছিলাম না। নিজেদের অক্ষমতার গ্লানি বহন করা দুঃসাধ্য হয়েছিল। এমন কি মার চোখেও এতটুকু জল দেখলাম না। তিনিও বোধহয় আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না।

সুজিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কাকাবাবু শেষ পর্য্যন্ত বিনা ওষুধপথ্যেই মারা গেলেন।" রূপশ্রী একটু ভাবল, তারপরে সহজ গলায় বলল, "এ তো কিছুই নতুন নয় সুজিতদা, আমরা, মানে গরীবরা প্রায় সকলেই এভাবেই মরি। মৃত্যুকালে যাকে তোমরা ভগবান বল, তাঁর কাছে শেষ নালিশ জানিয়ে যাই—আমাদের জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলার অপরাধে তোমাকেও অনেকখানি নেবে আসতে হবে। বলির পশু যেমনি করে জানায় ঠিক তেমনি করে।" সুজিত যেন আর শুনতে পারে না এই যন্ত্রণাদায়ক উপাখ্যান। কিন্তু তবুও শুনতে, জানতে ইচ্ছা হয়। রূপশ্রী বলল, সুজিতদা, একটু জল দিতে বল। জল খেয়ে, সিক্ত ঠোঁট সুগন্ধি রুমালে মুছে আবার গল্পের ছিন্নসূত্র হাতে তুলে নেয়। "মা যে শেষ পর্য্যন্ত এই করবেন তা আমার স্বপ্নের অগোচর। কারণ আমরা গরীব হতে পারি, তবু ভদ্রলোক এবং ব্রাহ্মণ। বর্ণের আভিজাত্যটুকু কিছুতেই যেতে চায় না। একদিন শুনি আমাদের কলোনীর ফেলুর মা, মাকে অতি

নিম্নস্বরে বলতে, "দিদি, কাজ চেয়েছিলে তা একটা খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু রান্নার কাজ নয়—বাসন মাজা ঘর মোছার কাজ। তবে জাত ব্রাহ্মণ তোমাদেরই স্বঘর।" মার কণ্ঠ আগ্রহে সতেজ, বললেন, "মাইনে দেবে কত?" "দশ টাকা।" মা মিনতিমিশ্রান সুরে বললেন; "কালই তুমি নিয়ে যেও আমাকে।" আমি যে শুনতে পেয়েছি তা আর মার কাছে প্রকাশ করলাম না। বরং হিংসে হলো, যা হোক মা তো একটা কাজ জোগাড় করে নিলেন। কিন্তু আমি? ইদানীং হোড়দার মেজাজ ভারী খিটখিটে হয়েছে। বোধহয় অভাবে। প্রায়ই আমাকে শোনায়, এতখানি গতর নিয়ে বসে থাকতে লজ্জা হয় না? রাত্রে মা গামছা পরে, কাপড়খানা সোডা দিয়ে কেচে দিলেন। খুব উৎসাহ মনে হলো। আমি নীরব দর্শক। মতামত প্রকাশ করবার জোর কোথায়। মা কাজে যাওয়ার আগে হেসে বললেন," আমাদের আবার মান মর্য্যাদা কি রে? কোন রকমে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখা নিয়ে কথা।" আমি ভাবলাম মা ভদ্রলোকের খোলসটা ঝেড়ে ফেলতে পেরে বেঁচে গেছেন। যে ভূয়া মান আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না তা দিয়ে আমি কি করব? মা এক বড় ডাক্তারের বাড়ী কাজ পেয়েছেন।

প্রথম মাসে মাইনে পেয়ে মা নোট খানা দেখে ভারী খুশী—যেন প্রথম পুত্রমুখ দর্শন করছেন। নোটখানা কপালে ছুঁইয়ে বাক্সে রেখে দিলেন। বললেন, "কাল স-পাঁচ আনার পুজো মার বাড়ী দিয়ে আসব।"

আবার গতানুগতিক দিন চলতে লাগল। মা, ক্ষুধার আগুনে পুড়ে, সব সংস্কারমুক্ত হয়েছেন। এখন সবজী-পাতি গৃহস্থের চোখের আড়ালে নিয়ে আসতে কোন নীতিতেই আর আটকায়না। সত্যিই তো আমাদের বাঁচাতে হবে।

একদিন খেতে বসে মা আমাকে বললেন, "ডাক্তারবাবু মানুষ নয়,দেবতা।"আমি উৎসুকচোখে তাকালাম, মা একটু জল খেয়ে গলার ভাত নাবিয়ে বললেন, "আমার দুঃখের কথা শুনে বললেন, "তোমার মেয়ের একটা কাজ হতে পারে, একটু ইতঃস্তত করে বললেন, "দেখতে কেমন মেয়ে?" আমি বলেছি সে মেয়ে রাজার ঘরে মানায় বাবা। একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার বাবু বললেন, "আমার এক মাড়োয়ারী পেশেন্ট আছে তার পার্ক ষ্ট্রীটে মস্ত বড় হোটেল, একজন মেয়ে টাইপিষ্ট চায়।" কালই ডাক্তারবাবুর চিঠি নিয়ে সন্টুর সঙ্গে তোকে যেতে বললেন। দেরী হলে কাজ নাও হতে পারে।" দেরী হবে কেন, আমাদের যেমন করেই হোক বাঁচতে হবে।

পরের দিন ঘুম তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে গেল। পৃথিবীর সদ্য জাগ্রত চোখের সামনে একি রহস্য। মায়াচ্ছন্ন পৃথিবীর এখনও যেন ধ্যান ভাঙ্গেনি। রাতের পুঞ্জ পুঞ্জ রহস্য যেন এখনও তার চোখে। নীল আকাশের নীচে স্পন্দিত দু চারটে নক্ষত্র যাই যাই করছে। তার নীচে শান্ত পৃথিবী। পূর্ব্বদিগন্তে উষার আগমনে আকাশের বক্ষ লাল হয়ে উঠেছে। গাছে গাছালির চোখে তখনও ঘুমের আবেশ। দু-চারটে পাখী ঘুমভাঙ্গা চোখে ডেকে উঠল। এমন করে পৃথিবীকে কোন দিন দেখেছি বলে মনে হয় না। কারণ দেরীতে ঘুমভাঙ্গার বদনাম আমার চির কালের। একটু কর্সা হতেই মুখধুতে পুকুরে গেলাম। সেখানেও যেন আর এক বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিস্তরঙ্গ জলে আমার পূর্ণদেহের ছায়া পড়ল। হঠাৎ যেন নিজেকে আবিষ্কার করলাম। বিধাতা আমার বেলায় যতই কৃপণ হোন, রূপ দিতে কার্পণ্য করেন নি। দুই হাত ভরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান করেছেন। জলের ছায়ায় নিজের মুখ খানা দেখে—নিজেই প্রেমে পড়লাম। চোখ যেন আর ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। সদ্য জাগ্রত ঈষৎ স্ফীত চোখের পল্লবে এ কোন অজানা রহস্যের ইঙ্গিত। কাকে ভোলাতে চায়? নিজেই ভুলে গেলাম। কতক্ষণ যে বসে ছিলাম জানি না। মা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "ওমা, তুই ঘাটে বসে আছিস? আর আমি এখান সেখান খুঁজে বেড়াচ্ছি। আয়, তাড়াতাড়ি চান করে নে—যেতে হবে সে কথা মনে আছে?" আমার যেন মার কথায় তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। তাই তো। এ-তো ভাব-বিলাসের সময় নয়, বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে। আমি আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নিলাম। একখানা কালোপাড়ের তাঁতের শাড়ি, আর একটি কালো ভয়েলের ব্লাউজ কোন জায়গায় যাওয়া আসার

জন্য বাক্সে তোলাই থাকে। সেগুলি বার করে পরলাম। শুকনো গামছা দিয়ে মুখ খানা ঘষে মুছে ফেলাম। ক্রিম পাউডার আমাদের নেই তা মাখার কথা আমার কল্পনায়ও আসলে না। পায়ে অতি শস্তাদামের এক জোড়া ধুলো মাখা চটি। দুই ভাই বোন বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার সময় মা ডাক্তারবাবুর একখানা পরিচয় পত্র হাতে দিলেন। খামে আঁটা চিঠি। কি লিখেছেন, কিছুই বুঝা গেল না। মা, "দুগ্গা দুগ্গা" করে আমাদের যাত্রার শুভকামনা করলেন।

কল্পাউণ্ডওয়ালা বেশ মস্ত বড় হোটেল। বাড়ীটি ত্রিতল। ম্যানেজার অমর সিং দোতলার পূর্বদিকের মাঝারি সাইজের একখানা ঘরে বসেন। তার কাছেই আমাদের যেতে হবে। ঘরটির যতই নিকট হতে লাগলাম, পা এবং বুক কাঁপতে লাগল। শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিলাম। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। ইতিপূর্ব্বে চাকরীর খোঁজে অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে, তবে এমন চিঠি পত্র আঁট ঘাট বেঁধে আর কোথায়ও যাইনি। যাই হোক ঘরে এসে ঢুকলাম। ককককে মোজাইক করা ঘরটার মাঝখানে কার্পেট বিছানো, তার উপরে দামী কাঠের টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের উপর প্রয়োজনীয় নানা কাগজ পত্র। দরজাটিকে সম্মুখে রেখে চেয়ারে বসে আছেন অমর সিংজী। সব কিছু দেখে মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। ম্যানেজার অমর সিং কেবল যে কদাকার তাই নয়, অদ্ভুত। মানুষের দেহ যে এত বিরাট হয়, ইতিপূর্ব্বে আমার দেখা ছিল না। তবে রং কালো নয় পোড়া তামাটে, লালের কাছ ঘেষে। মাংসের চাপে চোখ দুটো কুঁৎ কুঁৎ করছে। কিন্তু সেই কুঁতকুঁতে চোখে কি ভয়ঙ্কর লালসার দৃষ্টি। দৃষ্টিতে যেন কামনার লালা ঝড়ছে। মনে হলো আমি যেন আফ্রিকার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছি। আর সম্মুখে হিংস্র কোন বিরাটকায় জানোয়ার, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আর তার অতিনিকট সান্নিধ্যে শিকার দাঁড়িয়ে। আমাকে যেন সে পায়লে এখনই গলে গিলে শেষ করে ফেলে। অস্থির হাতের থাবা বারংবার খুলছে আর বন্ধ করছে। অস্থিরতার ব্যঞ্জনায় চেহারটা আরো বিকট দেখাচ্ছে। আমি ভীত হরিণীর মত ছোড়দার সার্টের কুলন্ত কোণটা মুঠো করে ধরলাম। ছোড়দার মুখ দেখে মনে হলো, সে-ও এই পাঞ্জাবী ভদ্র লোকটিকে তেমন সুনজরে দেখছে না। ম্যানেজার হাতের ইঙ্গিতে আমাদের বসতে বললেন। ছোড়দার দেওয়া চিঠিখানা অমর সিং মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। বোধ হয় আমার সম্বন্ধে ডাক্তার-বাবু অতিরঞ্জিত করে কিছু লিখেছিলেন। কারণ দুটো একটা মামুলি জিজ্ঞাসাবাদের পরে বললেন, "কাল থেকেই আপনি কাজে যোগ দিন। "মিস্ পিয়ারসন্ রিসেপশনিষ্টকে বেয়ারাকে ডেকে আনতে বললেন। বেয়ারা সেলাম দিয়ে চলে গেল। মিস্ পিয়ারসন্ আস্তে গম্ভীর গলায় বললেন, "কাল থেকে এই মেয়েটি ললিতা বোসের জায়গায় কাজ করবে। প্রয়োজনীয় সব কিছু আপনি দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।" তারপরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে এখানেই থাকার ঘর দেওয়া হবে, যাতে সব সময়ই আপনাকে পাওয়ার সুবিধা হয়। আপনার কোন অমত নেই তো?" আমি ছোড়দার মুখের দিকে তাকালাম। ছোড়দাই ম্যানেজারকে বলল, "না, অমতের কি আছে!" সেই বিভীষিকাময় পুরুষ তখন বলল, মাইনে পাবেন দেড়শো, ফ্রি বাসস্থান আর খাওয়া তো আমাদের হোটেলেই খাবেন।" কি শুনছি। যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আমার দাম এত। পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্য কত অনুনয় বিনয় করেছি। কিন্তু কোন জায়গার থেকে এতটুকু আশার ইঙ্গিতও পাই নি। এমন কি দু মিনিট দাঁড়িয়ে দু-টো কথা বলার সুযোগ দিতে চায়নি। আর এক কথায় দেড়শো। তার উপর খাওয়া থাকা ফ্রি। সত্যিই ডাক্তারবাবু দেবতা। তা না হলে তার একখানা চিঠিতেই এই পর্বত প্রমাণ মানুষটির হৃদয় হতে এমন করুণার ধারা প্রবাহিত হয়। হোক কুৎসিত,তবু দয়ালু যে, তা নিঃসন্দেহ। লঘুপক্ষ পাখীর মত যেন হাওয়ায় ভেসে চলে গেলাম বাড়ী। সবচেয়ে আনন্দ আমি আর বেকার নই। সামনের মাসেই দেড়শো টাকা মাইনে ঘরে আনবো। একসঙ্গে এতগুলি টাকা জীবনে কখনও চোখে দেখিনি। কেমন না জানি দেখতে। কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেলাম।

কিন্তু, বাবা আর দাদার ম্লান মুখ আমার রঙ্গিন কল্পনার সব রং মুহূর্তে মুছে দিল। দাদা যে অপরাধ করেছে, তা বাবার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হতে যাচ্ছে দেখে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই। চোখে নেমে আসা পাতা দু-টির চাপে চোখের কূলে কূলে ভরা জল গড়িয়ে পড়ল। চকিতে চারি দিকে তাকিয়ে মুছে ফেল্লাম। দু-দিন যেতেই বুঝতে পারলাম, আমার প্রয়োজন হোটেলের চেয়ে, তার ম্যানেজারের বেশী। আর আমার প্রয়োজন বেঁচে থাকা। এই দুই প্রয়োজনের দুর্বারগতিতে ভেসে গেল, যতকিছু যুক্তিতর্ক ন্যায়নীতি খড় কুটোর মত।" স্বচ্ছল জীবন যাদের কাছে স্বপ্ন তাদের কাছে স্বচ্ছল সমৃদ্ধ জীবনের আবেদন যদি অন্যায় নীতি গর্হিত পথ বেয়ে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার প্রলোভন এড়ান বড় সহজ নয়। অভাব যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিক উপায়ে আমাদের জীবন থেকে অপসারিত হলো। অমর সিং-এর দরাজ হাতের দানে, শিগগিরই আমাদের ঘরের চালে টিন উঠল। মাকে বললাম আর কেন, এইবার চাকরী ছেড়ে দাও। আমার একটা প্রেস্‌টিজ্ আছে তো। আবার সুপ্ত ভদ্রলোকী সম্ভ্রম আমার মনে জেগে উঠেছে। অর্থের হাত ধরেই আসে অহঙ্কার। অর্থ যখন এসেছে, তাকে অস্বীকার করবো কি করে। মা কিন্তু রাজী হলেন না চাকরী ছাড়তে। বললেন, "টাকা কি কারুর বেশী হয়। দশ দশটা টাকা কি কম হলো।" বুঝলাম মা স্বাধীন ভাবে খেটে খাওয়ার স্বাদ পেয়েছেন। তবে মার কপাল ভাল বলতে হবে, সম্প্রতি তিনি রাঁধুনীতে প্রমোশন পেয়েছেন। ছোড়দাও অনেক দিনের চেষ্টায় ষ্টেটবাসে কন্‌ডাক্‌টারের কাজ পেয়েছে। এখন ক্ষুধার ভয়ঙ্কর রূপ আমাদের চোখে নিষ্প্রভ। এখন কলোনীর লোকেরা আমাদের হিংসে করে। জান তো, হিংসে করলে কি আনন্দ? সেটুকু আমরা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করি। আমাদের অনুপাতে বেশ প্রাচুর্য্যের মধ্যেই দিনগুলি কাটছিল। কিন্তু সম্প্রতি গোল বাঁধিয়েছে, হোটেলের প্রোপ্রাইটার মহামায়া প্রসাদের ছেলে, সদ্য আমেরিকা ফেরৎ লীলা প্রসাদ। সে আমার রূপের ছটায় আকৃষ্ট হয়ে, বাঘ কামনায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে শোয়াবে নয় সম্পূর্ণ ভাবে চায় আমাকে। ম্যানেজার তাতে যে রাজী নয় বুঝতেই পারছ। কাজেই আমার চাকরী আর আগামী মাস থেকে থাকছে না। বেশীদূর গড়াবার আগেই ম্যানেজার অমরসিং আমাকে সরিয়ে দিতে চান। আর আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সুজিতদা, জীবন নিয়ে এই টাগ-অব-ওয়ার খেলায়। শান্ত সুন্দর একটু জীবন চাই আর চাই একটি চাকরী।" রূপশ্রীর হতাশ ক্লান্ত চোখের দিক তাকিয়ে, সুজিত কি এতক্ষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল? রূপশ্রী আসতে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। অস্পষ্ট গলায় বলল, "চাকরী"! রূপশ্রী ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, "হাঁ। সুজিতদা, যা হোক একটা চাকরী তোমার অফিসে আমাকে জোগাড় করে দাও।" "আচ্ছা, চেষ্টা করবো" বলে, সুজিত বলল, পরশু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু কি কাজ চাও বলতো? টাইপের হাত ঠিক আছে তো? "কোথায় আর ঠিক আছে," বলে রূপশ্রী বিলোল কটাক্ষে তাকাল। সে দৃষ্টির আকস্মিকতায় অনেকগুলি বছর অতিক্রম করে সুজিত এসে দাঁড়াল তার ষোড়শবর্ষের সীমানায় তখন রূপশ্রীর বয়স ছিল বারো। শিংএর একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় আটকে পড়েছিল রূপশ্রী সুজিতদের বাড়ীতে। তাকে পৌঁছে দেবার জন্যে এমনিই কাতর মিনতির মধ্যে বিদ্যুৎ খেলেছিল চোখে রূপশ্রীর। আর সেই বিদ্যুতালোকেই দেখতে পেল সুজিত নিজের রাঙ্গানো মনখানাকে। কেমন একটা মদির ভঙ্গীতে গ্রীবা হেলিয়ে রূপশ্রী বলল, "আচ্ছা চলি সুজিত দা। তোমার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম।" উঠে দাঁড়াল রূপশ্রী নয়নে তার যুথবদ্ধ হরিণীর চঞ্চলতা। সুজিত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসল। সে হাসিতে তার মনের অনেক না-বলা-কথা প্রকাশ পেল। ব্যাগটি বাঁ-হাতে বুকে চেপে আগোছাল শাড়ি একটু ঠিক করে বেরিয়ে গেল রূপশ্রী। ঘর খানা তার প্রাণের স্পর্শে এখনও বিভোর। সুজিত তাকিয়ে থাকল ওর গমন পথের দিকে। তারপর আবেগোদ্বেল হৃদয়ে স্মৃতির ঘন যবনিকা ঠেলে, সুজিতের চোখে আবার যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল, বাল্যের সেই দিনগুলি।

ছোট বেলাটা কেটেছে তার শিলং-এ। বাবা সেখানে চাকরী করতেন। ওদের বাড়ী ছিল। খাবান হরিসভার কাছে। রুমকীদের বাড়ী এদের দু-চার খানা বাড়ীর পরেই। আসা-যাওয়া দু-বাড়ীর লোকের মধ্যে ছিল যথেষ্ট। রুমকী তো বলতে গেলে ওদের বাড়ীতেই থাকতো দিনের অনেকটা সময়। মা, ওকে খুব স্নেহ করতেন। ওরা ছিল পাঁচ ভাই, বোন ছিল না। সকলেই ওকে ভালবাসত। ওর স্বভাবের কৌতুকপ্রিয়তা সকলকে আনন্দ দিত। মার কাছে কাছে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। একদিন 'ও' না এলে ডাকতে পাঠাতেন। আমাদের বাড়ী কিছু ভাল রান্না হলে, রুমকীরও ভাগ থাকতো। মা, কথায় কথায় বলতেন, "মেয়েটা আমাকে জ্বালাবে দেখছি। এর পর ওকে ছেড়ে দেশে গিয়ে থাকবো কি করে।"

একদিন শুনি বাবাকে মা বলছেন, "আমার ইচ্ছে করে বিয়ে—" বাবা শুয়ে বই পড়ছিলেন, বইখানা মুড়ে পাশে রেখে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তোমার আবার বিয়ে করতে ইচ্ছা করে!" মা কোপ কটাক্ষ হেনে, বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "না, তোমার আর এ-দোষ কোন দিন যাবে না—কথাটা পুরো না শুনেই মন্তব্য করার।" বন্ধ বইখানা চোখের সামনে খুলে বাবা বললেন, "ওঃ, পুরো বলা হয়নি বুঝি? যাক্ আমার তো পিলে চমকে গিয়েছিল। তা কি যেন বলছিলে, বল!" মা, মুখখানাকে যথাসম্ভব সরস ক'রে বললেন, "আমার ইচ্ছা করে সুজিতের সঙ্গে রুমকীর বিয়ে দিতে। কেমন মানাবে দুটিতে। আর যাই বল, মেয়েটা বড় হলে ডাকের সুন্দরী হবে। সবে তো বারো বছর বয়স, এখনই যেন রূপের জোয়ার এসেছে অঙ্গে। আর আমার মনে হয় তোমার ছেলেও ওকে ভালবাসে।" মার চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল। তিনি বললেন, "একদিন দেখি রুমকীর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আমাকে আসতে দেখেই মুখ নীচু করল।" বাবা, রুষ্টস্বরে বললেন, "ছেলেটা তো ভারী বাঁদর হয়েছে। আর তুমিও বোধ হয় ঈস্কানী দিচ্ছ।" মা, হাসিতে চোখ নাচিয়ে বললেন, "আমি দেব কেন, যে দেবার সেই দিচ্ছে।" বাবা, ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "কৈ, সে লোকটা শুনি।" মা, হা-হা করে হেসে বললেন, "মরণ আমার, তাও জান না। ওগো, বয়স—বয়সই জানিয়ে দেয় সকলকে। নিজের সে বয়স না হয় হারিয়ে গেছে, কিন্তু একদিন তো ছিল।" বাবা যেন তার হারানো দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার মিথ্যা প্রয়াসে, হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, মাকে বললেন, "ওঃ এই কথা। সে দেখা যাবে যখন বিয়ের বয়স হবে।" মা, চতুর গৃহিণীর মত বললেন, "এখনই পাকা করে রাখা ভাল। আমরা তো তোমার পেন্‌সেন হলেই চলে যাব কলকাতায় আর তার তো বড় একটা দেরীও নেই।"

সুজিতের মনের অবস্থা তখন যুবক মাত্রেই বুঝতে পারবে। কেমন এক অনাস্বাদিত পুলকে দিশেহারা ভাব। কিছুদিন বাদে বাবার পেন্‌সন্ হতে ওরা চলে এল কলকাতায়। সেই থেকেই রুমকীদের সঙ্গে ছাড়া-ছাড়ি। সে এখন থেকে দশ বছর আগের কথা। প্রথম প্রেম শুনেছি, অমর। বোধ হয় সে কথা সত্যি। কারণ, এত-গুলি বছরের নানা ঘটনার তলায় চাপা পড়েও সে মরেনি। সুপ্ত মনের মণিকোঠায় আজও দেখছি তা উজ্জ্বল আছে। বিস্মৃতির ধূলোয় সে মণি আবৃত হলেও অনুকূল হাওয়ায় ধূলো সরে গিয়ে আবার পূর্ব্বমহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তার দ্যুতি তার মনের সবটুকু স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুজিতের মন আর সেদিন কাজে বসল না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়ল। রাত্রে শুয়ে ভাবল "কি করে আবার রুমকীকে তার হৃতসম্মানে ফিরিয়ে আনা যায়। চাকরী? না, চাকরীতে ওর মন ভরবে না। একবার যে অনেক টাকার স্বাদ পেয়েছে, সে আর ফিরে যেতে চাইবে না অভাবের জীবনে। তবে কি উপায়ে ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।" চিন্তার সঙ্গে তালমিলিয়ে রাত্রির প্রহর অতিবাহিত হতে লাগল। মনে পড়ল সুজিতের, মাকে। তিনি জীবিত থাকলে হয়তো এ সমস্যার উদ্ভবই হতো না। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে রুমকীর বিয়ে দেওয়ার। ঘটনা-চক্রে তা আর হয়ে উঠেনি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাকে এখন কি আমি রূপ দিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। আমি রুমকীকে বিয়ে করবো। তাকে ফিরিয়ে আনব সংসারের কল্যাণময় পরিবেশে কল্যাণী-রূপে।

আনন্দে উত্তেজনায় সুজিত বিছানায় উঠে বসে। ঘুমোতে ইচ্ছা হয় না এই মধুর চিন্তা ছেড়ে। পরশু দিনটা বড় বেশী দূর মনে হয়। নিজের খোকামীতে নিজেই বিরক্ত হয়। কাল আসতে বললে দোষ কি ছিল? যাই হোক দূরের পরশু নিকট হলো। আজ সেই পরশু। সুজিতের রোজের চেয়ে অফিস যাওয়ার পোষাক পরিচ্ছদে আজ একটু বিশেষ যত্ন লক্ষিত হলো। গুন্ গুন্ করে কণ্ঠে এল গান। ক্ষিপ্রহস্তে দামী টাইয়ের ফাঁসটা বেঁধে ফেলল। আজ সময় যেন নতুন রূপে, গন্ধে ভরে ওর হাতে ধরা দিয়েছে। সবই মধুময় মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি জুতোর ফিতেটা বেঁধে সুজিত নিজের মনেই বলল, "নাঃ, বড্ড দেরী হয়ে গেল. রুমকী যদি এসে পড়ে? সে দিন কখন এসে ছিল? তা প্রায় বারোটা। আজ হয় তো চাকরীর আশায় একটু তাড়াতাড়িই আসবে।"

অফিসে যখন পৌছল সুজিত, তখন বেলা দশটা। সেইথেকে ঘড়ির দিকে আরদরজার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কোথায় রুমকী? সুজিত অধৈর্য্য হলো। "নাঃ, অনেক বেলা হয়েছে। আজ বোধ হয় আর এলো না।" হতাশ হয়ে নিজেকে কাজের মধ্যে ঠেলে দিতে চেষ্টা করল। ঠিক সেই সময়ই রুমকী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। বেয়ারা সেলাম দিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল—"বাইয়ে মেমসাব।" সুজিত উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। "আরে এত দেরী করলে কেন?" রুপশ্রী ধীরে সুস্থে চেয়ারে বসে, হেসে বলল "কেন, ডেকেন্সি ফিলাপ হয়ে গেছে নাকি?" সুজিত অর্থপূর্ণ একটু হাসি হেসে বলল, "না, এ ডেকেন্সিতে তোমার ছাড়া কারুর অধিকার নেই।" বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুপশ্রী বলল, "ব্যাপার কি বলতো? বেশ একটু গোলমেলে ঠেকছে।" সুজিত চিন্তা করতে লাগল কি ভাবে কথাটা বলা যায়। কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনের মত হচ্ছে না। তারপর মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, "জানি না পোষ্টটা তোমার পছন্দ হবে কি না।" রুপশ্রী আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, "আরে না না আমি যে কোন পোষ্টেই রাজী।" সুজিতের চোখে কৌতুক। বিনা ভূমিকায় বলল, "আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই রুমকী। আমার সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রীর পদই তোমার জন্য নির্ব্বাচন করেছি। আমি তোমার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিলাম—তুমি আমাকে গ্রহণ করে, নিজে সার্থক হয়ে আমাকে সার্থক করো।" রুপশ্রী বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন এমন দুর্বোধ্য কথা এর আগে আর কখনও শোনেনি। তারপরে সুজিতের পায়ের কাছে বসে পড়ে, অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "তুমি আমাকে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বিয়ে করবে!" বিস্ময়ের ঘোর একটু স্তিমিত হলে, রুমকী সুজিতের পায়ের উপর মাথা রাখল। সুজিত বিচলিত হয়ে ডাকল, "রুমকী ছিঃ, উঠো।" রুমকী আবেশ মিশ্রিত আকুল কণ্ঠে বলল, "আর একটু থাকতে দাও—আমার জীবনে এতবড় সৌভাগ্য আরতো আসবে না।" রুপশ্রী যখন উঠে বসল, এ যেন সে রুপশ্রী নয়, আর কেউ। অভূতপূর্ব্ব এক প্রশান্তি তার মুখে, স্বর্গীয় জ্যোতির আভায় মুখ উদ্ভাসিত। দু-চোখে তার জল এল। হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে চাইল। তবু সে বলল, "তুমি যে আমার ধ্যানের দেবতা। তোমাকে এই অপবিত্র দেহ দেব কি করে? তুমি আমার জীবনে মঙ্গলময় শিব—তোমাকে পতিরূপে কামনা করেছি জন্মে জন্মে। তোমাকেই মনের মাধুরী মিশিয়ে কত রূপে গড়েছি। আমার সে স্বপ্নকে তুমি ভেঙ্গে দিও না। তুমি আমার প্রাত্যহিক জীবনের অনেক উর্দ্ধে। আজ তোমাকে উচ্ছিষ্ট দেহ দিয়ে ধূলায় নাবিয়ে আনতে পারবো না; না-না, সে লোকসান আমার সইবে না। আমার সব গেছে, শুধু এই

মহাসম্পদটুকু অবলম্বন ক'রে বেঁচে আছি। "রূপশ্রী দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদে। সুজিত ধর্মকের ভূমিকায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। রূপশ্রীর ক্রন্দনাবেগ একটু প্রশমিত হলে, অশ্রুবর্ষণসিক্ত চোখে তাকিয়ে আত্মগত ভাবে ফিস্-ফিস্ করে বলল, "তোমার প্রেমাগ্নিতে আমার যত কিছু মালিন্য, যত কলুষ, যত অশুচিতা, পুড়ে ছাই হয়ে যাক।" সুজিত রূপশ্রীর কোমল হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নেয়। তাকিয়ে থাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রূপশ্রীর নিবেদনের অপূর্ব্ব শ্রীময়ী ভঙ্গীটির দিকে। ওর শিশিরসিক্ত পূজার পুষ্পের মত মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভাবে, "যে নদীটি দুর্বার প্রাণের গতিতে, পাহাড় পর্বত খানা খন্দ, শুচি-অশুচি স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, সে আজ মহাসমুদ্রে মিশে গেছে। আর কিছুকাল পূর্ব্বের সত্তায় তাকে দেখা যাবে না। উদ্বাস্ত জীবনের ক্ষতির পরিমাপ, আর কিছু দিয়েই করা সম্ভব নয়। এই ভুলের অভিশাপ বুকে নিয়ে শুধু অসবে, আর অসবে তারা।

———

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ২।১।৩০

ঈশ্বর কন পরমেশ্বর সর্ব্ব শক্তি ময়
"আর্দ্রনাৎ" শ্রুতিবাক্যেতে এই কথা জেনো কয়
ছান্দোগ্যেতে এই কথা আছে
সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বকাম আছে
সর্ব্বমিদং অভ্যাত্তঃ অবাকী ও অনাদর
সবের মাঝারে আনন্দময় সত্য সে শঙ্কর।
সকল কর্ম্ম করেন সেজন সকল পূর্ণময়
সকল প্রাপ্তি হয় যৌনতা আগ্রহ নাহি রয়
তিনি যাহা চান সত্য তা হয়
সংকল্পতে সত্যই রয়
তাঁহার শক্তি বিবিধ এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জন
তিনি জ্ঞান তিনি বল তিনি ক্রিয়া তিনিই সকল হন।

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ (২।১।৩১)

যদি কেহ ভাবে ইন্দ্রিয় হীন ঈশ্বর কিবা করে?
এর উত্তর দিয়েছি আগেই সকলি সেজন পারে
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
অনন্ত সেই যে সবার বিধাতা
তাঁহার প্রকৃতি বলেছে শ্রুতিতে শুধুই যে অনুমান
সর্ব্বত্র তার হস্ত দুটি সকল স্থানেতে কান।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (২।১।৩২)

বিপক্ষ কহে জগৎ কর্ত্তা ঈশ্বর নহে কভু
কার্য্য থাকিলে থাকিবে কারণ ঈশ্বর নহে প্রভু
লোকে করে কাজ ফল লাভ তরে
পূর্ণ সেজন কেন কাজ করে
আপ্তকাম সে নিজে ভগবান কামনা যাহার নাই
কেন সাধ করে সৃজে সংসার ভাবেযে সকলে তাই।

"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" ২।১।৩৩

শিশুরা যেমন নিজে খেলা করে বিনা কোন প্রয়োজনে
শিশু ভোলানাথ তেমনি সৃষ্টি করেছেন নিজ মনে—

বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ২।১।৩৪

শ্রুতি বাক্যেতে কহে কর্ম্মের অপেক্ষা আছে বলে
বৈষম্যে নৈর্ঘৃণ্যে ন বৈষম্য নিষ্ঠুরতা নাই বলে
সুখ দুখ দুই জগতেতে আছে
সুখেতে ভুলিয়া হরি ভুলে আছে
অসাধু কর্ম্ম করে যদি কেহ নাহিক পরিত্রাণ
সবদিকে তাঁর সমান দৃষ্টি সেই জন ভগবান্।

ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ ২।১।৩৫

———

[ক্রমশঃ

বিচিত্র বিশ্ব

শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য

আত্মা অক্ষয়

সময়টা গ্রীষ্মকালের শেষ—বসন্তের সুরু। দক্ষিণেশ্বরে তখন একটা ফিল্ম ষ্টুডিও ছিল। প্রায় বছর পনের আগেকার ঘটনা। রাত্রে সুটিং হচ্ছে। একজন খ্যাত-নামা অভিনেত্রীর সময়ের অভাবের জন্য পরিচালক মশাই এই ব্যবস্থা করেছেন। ষ্টুডিওর ভেতরে একটি বিরাট বড় পুকুর। তার চার দিক ঘিরে নানান ফল ও ফুলের বাগান। বিশেষকরে পূর্বদিকটাতে বেশ একটা ঘন জঙ্গলের আবহাওয়া। বড় একটা ওদিকে কেউ যায়না। একমাত্র বিশেষ একটি প্রাকৃতিক নিয়মের তাগিদ ছাড়া, তাও দিনের বেলায়। কিছুক্ষণ দিব্যি সুটিং চললো। গরমটা সেদিন একটু বেশী থাকায় অল্প পরিশ্রমে কষ্ট হচ্ছিল বেশী। রাত যখন প্রায় একটা, চিত্র পরিচালকমশাই তখন সব'ইকে ঘণ্টা খানেকের বিশ্রাম দিলেন। যেন বাজতেই কলাকুশলী ও শিল্পীরা সব বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। বেশ দূর দূরে প্রথম বসন্তের হাওয়া দিয়েছে তখন।

পুকুরঘাটের ঠিক সামনের বড় হলঘরটার বারান্দার বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে গল্প সুরু করলেন। একজন বিখ্যাত অভিনেতা ও সহকারী পরিচালক মশাই দুজনে এসে একেবারে পুকুর ঘাটের দুইপাশের দুই বাঁধান বেঞ্চিটার উপর টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়লেন। সিগারেট খেতে খেতে নানা গল্প চলতে লাগলো দুজনের মধ্যে। শেষে একসময় ষ্টুডিও ফ্লোরে কাজ আরম্ভ হওয়ার বেল বাজলো। সবাই ধীরে ধীরে চলে গেলেন ভেতরে।

শুধু পুকুর ঘাটের বেঞ্চিতে অন্ধকারে শুয়ে রইলেন সেই বিখ্যাত অভিনেতা। সহকারী পরিচালককে বলে দিলেন সময় হলে আমাকে ডেকো। বসন্তের হাওয়ায় একটু ঘুমিয়ে নি।

সবাই চলে যেতে স্থানটি বেশ নির্জন হয়ে গেল।

অভিনেতা ভদ্রলোক কিকিৎ কাৎ হয়ে উঠে বসে সিগারেট ধরিয়ে নানান এলোমেলো কথা চিন্তা করতে লাগলেন। মুখে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের কলি গুনগুনিয়ে গাইছিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অগণিত তারা জ্বল জ্বল করছে। শিল্পী মানুষ, বেশ ভাল লাগছিল। সামনেই একটা বাঁকড়া হাসনুহানার গাছ, বেশ মিষ্টি গন্ধ আসছে।

একসময় গানটা গাওয়া বন্ধ করলেন। ভাবলেন এবার একটু সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। মাথায় হাত রেখে শোওয়ার উদ্যোগ করতেই একটু দূরে হঠাৎ নজরে পড়লো পূব দিকের পুকুর পাড়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভুল দেখছেন কিনা। না, ভুল নয়। নিশ্চয়ই কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলেন কেউ হয়তো প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষে করতে গিয়ে থাকবে।

একটু জোরেই ভদ্রলোক ডাকলেন ওখানে কে রে? উত্তর নেই। ছায়ামূর্তিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার ডাকলেন ভদ্রলোক বলি ওখানে দাঁড়িয়ে কেরে এতরাতে? একটা আলো হাতে করে নিয়ে যেতে পারোনি। এদিকে আয় তোর শ্রীমুখখানা ভাল করে দেখি।

অভিনেতা ভদ্রলোক জীবনে ভাতের বলতে কিছু জানতেন না। বিশ্বাসও করতেন না পৃথিবীতে মৃত্যুর

পর মানুষের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। অতএব ভদ্রলোক পকেটের দেশলাইটা হাতড়ে বার করলেন। দেখা গেল ধীরে ধীরে ছায়ামূর্ত্তিটা এই পাশ বাঁধানো ঘাটের দিকেই আসছে। ভদ্রলোক খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ছায়ামূর্ত্তিটা একেবারে হাসনুহানা গাছটার তলাটায় ঘেঁসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক তখনও ভাল করে বুঝতে পারছেন না লোকটি কে, তবে দেখা গেল গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি, পরণে একটা খাঁকি রংয়ের হ্যাফ্ প্যাণ্ট।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন কেরে জগা? অর্থাৎ জগন্নাথ কিনা। জগন্নাথ আমাদের ট্রুডিওর ইলেক্ট্রিক্ মিস্ত্রী। কেউ উত্তর দিল না। কোন উত্তর এলনা। ছায়ামূর্ত্তিটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েই রইল।

ভদ্রলোক ফস্ করে একটা দেশলাই কাঠি জেলে মুখের দিকে এগিয়ে ধরলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের আলোতে মুখখানা দেখে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ধমকা হাওয়ায় কাঠিটা নিভে গেল। ভদ্রলোক তবু জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুই? ঠিক করে বল।

খুব ধীরে ধীরে জবাব দিল ছায়ামূর্ত্তিটা—বাবু আমি জলধর—এই বাগানের পুরনো মালী। আমাকে চিনতে পারছেন না?

তুইতো মরে গেছিস্ আজ অনেকদিন হল।

হ্যাঁ বাবু। তবু পাবেন না আজ বড় মন কষ্ট পেয়ে আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে এসেছি।

এবার মনে হল অভিনেতা ভদ্রলোক কিছুটা ভয় পেয়েছেন। একটা সিগারেট ধরাবার নিষ্ফল চেষ্টা করছেন বার বার। যদিও তাঁর দৃষ্টি রয়েছে ছায়ামূর্ত্তিটার দিকে অপলক ভাবে।

জলধর বললো ধীরে ধীরে—আজ সন্ধ্যার সময় দেশ থেকে আমার পরিবার জগন্নাথকে চিঠি লিখে কিছু টাকা পাঠাতে বলেছে। জানেনতো ও আমার জাতি ভাই। আমিই এখানে এনে কাজে লাগিয়েছিলাম। আমার বড় খোকার বাড়াবাড়ি অসুখ। টাকার অভাবে ছেলেটার চিকিৎসা হচ্ছেনা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না বাবু—তাই আপনাকে অনুরোধ, কিছু টাকা যদি বাবু আমার পরিবারকে সাহায্য করেন, তাহলে আমার বড় খোকা বেঁচে যাবে। আমি শান্তি পাব। এর আগেও তো বাবু আপনি অনেকবার আমাকে টাকা সাহায্য করেছেন।.....ভদ্রলোক উত্তরে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দূর থেকে ডাক এল—দাদা চলে আসুন—সেট রেডি।

সহকারী পরিচালক মশাই এগিয়ে এলেন ঘাটের দিকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ছায়ামূর্ত্তিটা মিলিয়ে গেল। অভিনেতা ভদ্রলোকটিকে ওরকম ভাবে চুপচাপ করে বসে থাকতে দেখে বললেন কি হল? আপনি ঘুমোন নি? সেই থেকে এই অন্ধকারে জেগে বসে আছেন? চলুন —এবার আপনার ডাক পড়েছে। এক কাপ গরম চা খেয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন। কোন উত্তর বা উৎসাহ না পেয়ে সহকারী পরিচালক মশাই যেন একটু ভড়কে গেলেন।

অভিনেতা ভদ্রলোক সিগারেটা ধরিয়ে একটা টান মেরে বললেন—পরিতোষ, চট্ করে একবার স্টোর থেকে জগন্নাথকে ডেকে নিয়ে আয়তো। বলবি, জরুরী দরকার। .....আর ডিরেক্টর সাহেবকে বলবি আমি মিনিট দশেক পরেই আসছি।

পরিতোষবাবু তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন ডাকতে। একটু পরেই জগন্নাথ এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল কি বলছেন বাবু?

তোর দেশ থেকে কোন চিঠি এসেছে?

হ্যাঁ, বাবু—আজই এসেছে, আমার পকেটেই আছে। জলধরের পরিবার লিখেছে। বড় খোকার খুব অসুখ বোধহয় বাঁচবেনা। অনেক টাকার দরকার, পাঠাতে লিখেছে। তা আমি গরীবলোক, এত টাকা কোথায় পাব। তাছাড়া এ মাসের মাইনে এখনো পাইনি। কি যে করি তাই ভাবছি। তবে চাঁদা করে নিজেরা গোটা ছুড়ি টাকা জোগাড় করেছি তাই কাল পাঠাব ভাবছি। কেন বাবু, কি হয়েছে?

অভিনেতা ভদ্রলোক কেমন একটা অসহায় ভাব বোধ করলেন।

শুধু বললেন কিছু হয়নি, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম, ছুটি শেষ হলে আমার সঙ্গে দেখা করবি। যেন ভুল না হয়।

কথাটা শুনে জগন্নাথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল আর

দাঁড়াল না। কাজ ফেলে এসেছে সেদিকেই ছুটে গেল।

পরিতোষবাবু অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার বলুনতো।

বোসো এখানে।—পরিতোষবাবু পাশে বসলেন। আনুপূর্বিক সব ঘটনাটা খুলে তাকে বললেন অভিনেতা ভদ্রলোক। পরিতোষবাবু সব শুনে উত্তরে বললেন জলধরকে আজও আমরা ভুলতে পারিনি এ কথা হয়তো সত্য কিন্তু ভাবতে বিস্ময় লাগছে যে সে আজও আমাদের ভুলে যায়নি এবং সর্বদাই কাছাকাছি আছে। রহস্যময়ীর ভাণ্ডারে কত না বিস্ময় লুকিয়ে আছে কে জানে? চলুন দাদা, ওপারে যাওয়া যাক।

হ্যাঁ চল।

ভোরবেলা স্যুটিং শেষ হলে কথামত জগন্নাথ এসে সামনে দাঁড়াল—এই যে বাবু চিঠিখানা। আপনিও যদি কিছু সাহায্য করেন।

অভিনেতা ভদ্রলোক কোন উত্তর দিলেন না। শুধু পাঁচখানা একশো টাকার নোট জগন্নাথের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে বললেন—টাকাটা আজই জলধরের পরিবারকে তার করে পাঠিয়ে দিন্। যেন ভুল না হয়। ছেলেটার সুস্থ হওয়ার সংবাদ এসে আমাকে জানান্

জগন্নাথ অবাক হয়ে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এতগুলো টাকা সে সাহায্য পাবে—ভাবতেই পারেনি। অভিনেতা ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে ষ্ট্রার্ট দিলেন। ভোর হয়ে গেছে। রাতটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। পাশে বসে পরিতোষবাবু শুধু —বললেন দাদা, আজকের সব উপার্জনটাই দিয়ে দিলেন, —নিজের জন্যে কিছুই রাখলেন না?

একটি অতৃপ্ত আত্মার শান্তির জন্য যদি জীবনের যাবতীয় সঞ্চিত ধনও বিলিয়ে দিতে হয়—তাও আমরা দিতে পারি—নইলে জাত শিল্পী হওয়া যায় না পরিতোষ।

গাড়ীটা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। জগন্নাথের ডান হাতখানা তখনও তার নিজের কপালে নমস্কারের ভঙ্গীতে ঠেকানো।

প্রেতাত্মার আশীর্বাদ

ঘটনাটা গজেনদার মুখে শোনা। একসঙ্গে দুইবন্ধুতে এক বিখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রায় বছর দশেক চাকরী করেছি। তারপরে ছাড়াছাড়ি। বর্তমানে গজেনদা বোম্বাই আহেরাবাদের কোন এক কাপড়ের কলের প্রধান হিসাবরক্ষক। কিন্তু অল্প বয়সেই বিবাহ করেছিলেন তিনি। তার মানে ধরুন যখন২৩।২৪ বছর তখন বিবাহ হয়েছিল পাড়াগাঁয়ের দিকে, ছোট লাইনের শেষ ষ্টেশন আমতা থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে। মাঝেদয় নদের বাঁধের উপর দিয়ে কাঁচা রাস্তা। গ্রামের নাম বালিচক। গজেনদার শ্বশুর জমিদার-বংশের শেষ কনিষ্ঠা রাজকন্যার তিনি নাকি পাণিগ্রহণ করেছিলেন। যাইহোক সেটা ক'ওন দাম। নব বধূবধূ ফিরাগমনে গিয়েছেন। জমিদার বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে আনন্দস্রোতে তখনও ভেসে ভাঁটা পড়েনি। নতুন জামাই যখন গিয়ে পৌঁচেছেন তখন সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি নেই। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। গজেনদার শ্বশুর জীবিত নেই। বিবাহের আট বছর আগে হঠাৎ কলকাতায় এসে কলেরা হয়ে তিনি মারা যান। তাঁরই ব্যবহৃত সুসজ্জিত কক্ষে মেয়েজামাইকে শুতে দেওয়া হয়েছে।

ঘরে শ্বশুর মশায়ের প্রৌঢ় বয়সের একখানি ফটো বড় করে বাঁধান। একপাশে দামী খাট, পাশে চেয়ার-টেবিল আরামকেদারাটা একটু দূরে। তারি পাশে দেরাজে ধরনের একটি সিন্দুক। রাতে শুতে এসে খাটে বসে গজেনদা নববধূকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা তোমার বাবার ফটো—না? নববধূ মৃদু হেসে জবাব দিলেন-হ্যাঁ।

গজেনদা যেন একটু রসিকতা ভাবেই জবাব দিলেন—তা টাঙ্গাবার আর জায়গা পাও নি। একেবারে জামাইয়ের মুখোমুখি, বালিশটা এপাশে করে নিলুম। নানান গল্পগুজবের মধ্যিখানে সিন্দুকটার দিকে নজর পড়তেই গজেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—বলি এটাতে কিছু ক্যাশ-টাশ আছে—নাকি তুমিই বাপের নাই কাড়িং? সলজ্জ উত্তর এল—বর পণে কিছু কমতি পড়লে বাধ্য হয়েই সিন্দুক খুলতে হত। তবে তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে

বাবা মারা যাবার পর এই আট বছরেও ঐ সিন্দুক একবারও আর খোলা হয়নি। চাবিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাও জানি না কি ক'রলে অন্য কোন উপায়ে এটাকে খুলতে দেননি। দাদা দু'বার চেষ্টা করেছিলেন মা প্রতিবারেই বাধা দিয়েছেন।

গজেনদা উৎসাহ ভরে বললেন—তাহলে ত আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখতে হয়!

নববধূর উত্তর—তাহলে শুয়ে শুয়ে গান চিবিয়ে আর সময় নষ্ট কোর না ঘরের দরজা বন্ধই আছে, সাবা রাত ধরে চেষ্টা কর—কেউ বাধা দেবে না।

গজেনদা—হুঁ:—ও ভাবে ছিনতাই করে নেব কেন? শাশুড়ীকে সন্দেশের ভেতর শেকড় খাইয়ে বশ করে চাবিটা হাতিয়ে নেব। ও-চাবি নিশ্চয়ই শাশুড়ীর কাছে আছে। দুজনেই হেসে ফেললো।

নিচে একতলার কলকোলাহলে মিটে যেতে শাশুড়ী ঠাকুরণ একবার দরজার বাইরে থেকে বলে গেলেন মিনু, জামাইকে বলিস্ বাইরে যাবার দরকার হলে যেন পাশের ঘর থেকে সন্তুকে ডেকে নেয়। পাঁড়াগাঁ, এত অন্ধকারে ওর চলাফেরা করা অভ্যেস নেই। নববধূ দুজনেই মুচকি মেরে পড়ে রইলেন। শাশুড়ী ঠাকুরণও আর উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়ালেন না।

রাত রাত। বক্‌বক্ করতে করতে এবং সময় দুজনেই ক্লান্তিভরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিসের একটা খস্‌খস্ শব্দে গজেনদার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আধবোজা চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। দেয়ালে টাঙান মেজের বাতির কম আলোয় দেখা গেল একটা অস্পষ্ট চেহারার মানুষ ঘরের ভেতর চলে বেড়াচ্ছে। মুখখানা ভাল করে দেখা যাচ্ছেনা। গজেনদা একলাফে বিছানায় উঠে বসে পাশে ঠেলা দিয়ে নববধূকে ডেকে দেখালেন। অস্পষ্ট চেহারার মানুষটি তখন সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছে। গজেনদা নববধূর হাত ধরে বিছানা থেকে নেমে সন্তু সন্তু বলে চেঁচাতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা গেল অস্পষ্ট চেহারার মানুষটি এদিকে মুখ ঘুরিয়ে ইসারা করছে চীৎকার না করতে। নববধূর চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলো —একি—এ যে বাবা? গজেনদা হতবাক্ হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখা গেল সেই অশরীরী মানুষটী হাত তুলে আশীর্বাদ করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ম্লান হাসি।

এদিকে দরজায় সন্তুর ঘন ঘন করাঘাত। গজেনদার চীৎকারে বাড়ীর সবাই উঠে পড়েছে। গজেনদা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিয়ে সন্তুকে ঘরের বাইরে। এমন ভয়াবহ কাণ্ড তার জীবনে আর দ্বিতীয়টী ঘটেনি। খোলা দরজা দিয়ে প্রথম ঢুকলো সন্তু। আচমকা সিন্দুকের কাছে বাবাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্তু একলাফে ঘরের বাইরে। হঠাৎ সন্তুর চীৎকার ও নিচে দৌড়ে পালানোর ফলে হল এই যে বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই সন্তুকে অনুসরণ করে তারাও নিচে নেমে গেলেন ঝড়ের বেগে। দোতলার বারান্দা মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু যিনি পর মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন তিনি এ বাড়ীর গিন্নী, অর্থাৎ গজেনদার শাশুড়ী। ঘরে ঢুকে তিনি স্বামীকে চিনতে পেরে অস্ফুট স্বরে বললেন—তুমি?.....এ ঘটনার প্রায় মিনিট পনেরো পরে উপরে কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে সবাই উঠে এল। প্রথমে ঘরে ঢুকলো গজেনদার বড় শালক সন্তু, পিছনে গজেনদা মালকোঁচা মারা। ঘরের দৃশ্য দেখে সবাই আঁতকে উঠলো। মেঝেয়, উপরে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন গজেনদার শাশুড়ী এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় সিন্দুকটী প্রায় সম্পূর্ণ খোলা। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা মেরে অনেক কষ্টে শাশুড়ীর জ্ঞান ফেরান গেল। গজেনদা ওরি ফাঁকে শ্বশুরমশাইয়ের ছবিটার দিকে আড়-চোখে তাকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কি জানি কেন ভালো করে আর শ্বশুর মশাইয়ের মুখখানা মনে করতে পারলেন না। জ্ঞান ফিরতেই শাশুড়ী অর্থাৎ সারদা দেবী উঠে বসলেন। ভালো করে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। ছেলে মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘটনাটার বিষদ বিবরণ নেবার জন্যে।

দেখা গেল সারদা দেবী যেন অনেক অনেকখানি সামলে উঠেছেন। মেয়েজামাইকে কাছে ডেকে বললেন —বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা বাবা—তোমার শ্বশুর নিজে হাতে সিন্দুক খুলে তোমাদের জন্য গয়না আর টাকা ঐ বিছানার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। তোমরা তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা কর। সিন্দুকের বাকি গয়না সন্তু আর

নম্বর বৌ-এর জন্ম দিয়ে গেছেন।

সারদা দেবীর কথামত সবাই এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। আশ্চর্য্য! পর পর কয়েকখানি দামী গহনা সাতার আর নগদ টাকার বান্ডিলও রয়েছে খানকয়েক।

শরীর একটু সুস্থ হলে, সারদা দেবী ধীরে ধীরে পূর্বের কিছু কিছু সত্য ও অলৌকিক ঘটনার কথা জানালেন।

কলকাতার স্বামী যেদিন মারা যান হঠাৎ, ঠিক সেই-দিনই দুপুরের কিছু পরেই উনি ছাদে উঠেছিলেন শুকনো কাপড়-জামা তুলে আনতে। তখন গ্রীষ্মকাল, বেলা প্রায় তিনটে হবে। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন ঠিক চিলে-কোঠার পাশে যেখানে সূর্য্য পশ্চিমে হেললে বেশ খানিকটা ছায়াপড়ে—ঠিক সেইছায়াচ্ছন্নজায়গায়ানম্রমুখে স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন, এবং যেন কিছু বলতে চাইছেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম সারদা দেবী ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। স্ত্রীকে দেখতে লুকিয়ে বাড়ীতে পালিয়ে আসার বয়স তখন আর নেই। অবাক হয়ে তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্বামী সৌরেন-বাবু অনেক কষ্টে অস্ফুটভাবে বললেন—অমন করে কি দেখছ, আমি আর বেঁচে নেই। কথাটা শেষ হতেই সৌরেনবাবুর প্রেতদেহটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সারদা দেবী ভীষণ একটা চীৎকার করে সেখানেই আছড়ে পড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরেই কলকাতা থেকে লোক এল সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে যে সৌরেনবাবু অকালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন।

এর পর আরও কয়েকবার তিনি স্বামীকে সামনা-সামনি দেখেছেন এবং স্বামীর সঙ্গে তিনি কখন কখন বৈষয়িক আলোচনাও করেছেন। প্রথম প্রথম সৌরেন-বাবু দিনের বেলাতেই দেখা দিতেন যাতে স্ত্রী ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারেন। সিন্দুকের তালা না খোলার নির্দ্দেশটা সৌরেনবাবুই সারদা দেবীকে দিয়েছিলেন, সেই কারণে সারদা দেবীর যতই আর্থিক প্রয়োজন থাকুক, সিন্দুক তিনি খুলতে দেননি। এমনকি সিন্দুকের চাবিটী সৌরেনবাবুর পছন্দমত একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্থানটি একমাত্র সারদা দেবী ছাড়া আর কোন জীবিত লোক জানতেন না। কথাগুলো বলবার সময় অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি। বললেন মেয়ে জামাইকে নিজে হাতে সোনা আর টাকা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন বলে আজ দেখা দিয়েছিলেন।

এই কথা শোনার পর আর কারও পক্ষে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। এমনকি গজেনদার মত লোকও মর্ম্মাহত চিত্তে শুধু বললেন, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও পৃথিবীতে ঘটতে পারে নিজে চোখে না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস করতুম না। মায়ার বাঁধন যে এত শক্ত কে জানতো?…সারদা দেবী শেষে বড় ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন—মন্তু, বাড়ীর কাজকর্ম মিটে গেল আমার বাবা কাশীতে থাকবার বন্দোবস্ত করে দে। শেষ জীবনটা আমি ওখানেই কাটাব। আত্মঘাতী হতে উনি নিষেধ করেছেন, নইলে বড় দীঘির কালো জলে আমি এখুনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতুম।

উনি বলেছেন—কর্ম্ম ক্ষয় না হলে মানুষের মৃত্যু হয়না। আমাকে সেই কর্ম্ম ক্ষয় করতেই কাশীতে যেতে হবে। ওখানে আমি ওঁকে আর আমার শ্রীবিশ্বনাথকে দুজনকেই কাছে পাব। যাও বাবা, তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। যেটুকু রাত আছে, বিশ্রাম করে নাও। আমি আজ এই ঘরেই রাত কাটাব। মিনু আর গজেনকে ওদিকের বড় ঘরটায় শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও শিবুর মা।

গজেনদা এ কথার প্রতিবাদ করে বললো—আমাদের জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। বাকি রাতটা আমি লাইব্রেরী ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারব। বলে বিছানার উপর থেকে একটা বালিশ বগলদাবা করে গজেনদা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই অতবড় বাড়ীটা আবার নিঃঝুম হয়ে গেল। কৃষ্ণ-পক্ষের অন্ধকার যেন বাড়ীটাকে একেবারে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে রইল।

জানিনা সে রাতে কারও ঘুম আর এসেছিল কিনা, তবে গজেনদা যে একবারও চোখের দুটি পাতা এক করতে পারেন নি একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সদাশিবের বাড়ীতে দু'খটা একেবারে চুপচাপ। সন্ধ্যার একটু আগেই সদাশিব নিজের ঘরে গিয়ে দেখে গৌরী তখনও খাটের ওপার শুয়ে আছে। কোনরকম ভণিতা না করেই শিববাবু তাকে বলে, আজ রাত্তিরের মধ্যে তৈরী হয়ে নাও, কাল বিকেলের গাড়ীতে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসবো। যে কাণ্ড আজ হোল এবং যে সব কথা লোকের মুখে শুনলুম, তাতে আর তোমাকে রিস্কীতে রাখতে পারবো না।

গৌরী কোন জবাব দিলে না। সে যেন কিছু শুনতেই পায়নি, এমনই ভাবে পূর্ববৎ শুয়ে রইলো।

কাল যাওয়ার জন্য তৈরী থেকো। অনেকটা আদেশের ভঙ্গীতে কথাগুলো বলে শিববাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গৌরী তাতেও কোন সাড়া দিলে না। একটু পরে সদাশিব পুনরায় ঘরে ঢুকে জামা কাপড় পরে বোধহয় যেন কোথায় বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলে।

গৌরী শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করলে—তাহলে কাল আমায় যেতেই হবে।

হাঁ।

সত্যি মিথ্যে কোন অনুসন্ধানই তুমি করবে না?

অনুসন্ধানের কিছুই নেই। চরিত্রহীন ও ভ্রষ্টাকে আমি স্থান দিতে পারব না।

তোমার বন্ধু সমীরকে?

সমীর ছিল প্রাণের বন্ধু। কিন্তু সেদিন যখন দেখলুম বেণু রয়েছে তার কাছে, তখন তার বাড়ী থেকে জলস্পর্শ না করেই চলে এসেছি।

তাহলে আমাকে বিনা অপরাধেই তাড়িয়ে দেবে?

বিনা অপরাধে নয়, মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে ঘৃণিত যে অপরাধ, সেই অপরাধেই তোমাকে তাড়াব।

সত্যি মিথ্যে খোঁজও করবে না?

কার কাছে খোঁজ করবো, প্রবোধের স্ত্রীর কাছে?

গৌরী একটু বিব্রত বোধ করলে। মুখে বলে, তোমার দয়া।

বেশ, তাই হবে। দৃপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে সদাশিব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গৌরী দ্রুতগতিতে উঠে এঘরে এসে শিববাবুকে কি যেন বলতে যাবে, এমন সময় দেখলে চোরের মত রামরূপ দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব রামরূপকে দেখেই বল্লে, কি মনে করে শংতান। এ বাড়ীতে কের আসতে তোর লজ্জা করে না?

রামরূপ ঘাড়ে হেঁট করে বল্লে, আমার টাকাকড়ি সমস্ত আজ পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিন।

টাকা? একপয়সা দেবনা, নালিশ করে আদায় করগে যা।

এবার রামরূপ মুখ তুলে দেখলে, বল্লে, আমার কি কসুর আছে বলুন।

কসুর? সদাশিব গর্জে উঠলো। ভদ্রলোকের বাড়ীতে —তুই কি ভেবেছিস্ কি?

রামরূপ মরিয়া হয়ে এসেছে। সমশ্রেণীর আরও কয়েকজন চাকরকে ও সঙ্গে করেই এসেছিল, তারা পেছনে বাড়ীর হাতার মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ঘর

থেকে তাদের দেখা যাচ্ছিল না। রামরূপ জানে যে যে-সব ব্যাপার হয়েছে তাতে ওর মাইনে পাওয়ার আশা কম, অথচ প্রায় একমাসেরই মত মাইনে ওর পাওনা হয়েছে। ওর বন্ধুরাই ওকে জোর করে ঠেলে পাঠিয়েছে এবং হয়ত পেছনে এমন কেউও থাকতে পারে যার স্বার্থ হচ্ছে বাঙালী-বাড়ীর কুৎসা প্রচার করা। তাদের বলেই রামরূপ বলীয়ান্, তাই সে মুখ তুলে বল্লে, আমার কি কসুর আছে, মাজিজী আমাকে বল্লে, মেমসাব বলে ডাকবি, তারপর বল্লে আমার গা হাত পা ধলাই-মলাই করে যে, তারপর—

গৌরী পেছন থেকে ভ্রূকুটী করছে। নিজের চুড়ীতে হাত দিয়ে বিছাপদক পরার ধারগায় হাত দিয়ে ইসারা করছে, কিছু বলিস্ নি' চুড়ি ভাঙিয়ে বিছাপদক গড়িয়ে দেব।

সদাশিব বল্লে, তারপর ?

রামরূপ সামলে নিয়ে বল্লে, তারপর আর কিছু নয়। কিন্তু পাশের বাড়ীর দিদিমণিরা এসে তাই দেখেই—

হোল, শুরুলে এখন, গৌরী এগিয়ে এসে বল্লে। একটা বাচ্চা ছেলে, সেদিন ভয়ানক গা হাত পা কস্‌কস্ করছিল, তাই ওকে দিয়ে একটু গা টিপিয়ে ছিলুম, আর অমনি সমস্ত পাড়াশুদ্ধ চি চি পড়ে গেল।

তুই মাজিজীর ঘরে বসে সিগারেট খেয়েছিস্ ?

কই না ত বাবু, কবে ? রামরূপ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

কাল শনিবার, দুপুরে। আমি যখন অফিস থেকে ঘরে ঢুকেছি, তখনও সিগারেটের গন্ধ ছিল ঘরে।

নেহি বাবু, কাল দুপুরে আমি বেলা বারো বাজে চলে গিয়েছি।

কোথায় গিয়েছিলি ?

ঐ ওদিকে, আমার সব বেঙ্গোয়ালী দোস্ত আছে, তাদের কাছে।

গৌরীর দিকে চেয়ে সদাশিব জোরের ওপোরে প্রশ্ন করলে, তাহলে ঐ সিগারেট কে খেয়েছে, সেকথা বল্‌তে হবে তোমাকে।

গৌরী বেশ একটু লঘুভাবে বলে, যা রে সিগারেট কে খেয়েছে তা আমি কি করে বল্‌বো ? কোথায় থেকে হাওয়ায় উড়ে, কিংবা সমীর যখন ছিল, সেই আমলের কোন টুক্‌রো চরত ঘরের কোণে-টোনে কোথাও পড়েছিল।

প্রবোধের স্ত্রীর কাছে আমি খবর নেব সে কি দেখেছে। জোর করে শিববাবু কথাগুলো উচ্চারণ করে বাইরে যাওয়ার জন্ত পা বাড়ালে।

রামরূপ বল্লে, আমাকে কি আর রাখবেন ? না-রাখবেন ত মাইনে চুকিয়ে দিন।

তোমাকে আমি রাখবো না।

তাহলে টাকা চুকিয়ে দিন।

গৌরী খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সদাশিবকে আড়ালে ডাকলে।

সদাশিব বিরক্ত হয়ে বল্লে, কি বলবে বলনা, আবার আড়ালে কেন ?

দরকার আছে, শোনোই না, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে গৌরী সদাশিবকে ভেতরের বারান্দাকে নিয়ে গেল। বল্লে, রামরূপকে এখুনি ছাড়ালে লোকেও সন্দেহ করবে, আর ওরও রাগ হলে ও নতুন নতুন ঘা-তা বানিয়ে বানিয়ে বল্‌তে থাকবে। তার চেয়ে কিছুদিন রেখে—আর বাস্তবিক আমি কিছু ভেবে ওকে দিয়ে পা টেপাই নি।

আচ্ছা, সদাশিব নিতান্ত বিরক্ত ভাবে কথাটা উচ্চারণ করে এঘরে আসতে আসতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে, মাজিজীর বদলে মেমসাব বলতে ওকে শিখিয়েছিলে কেন, তার কৈফিয়ৎ দিতে পার ?

গৌরী একটু ঘাবড়ে গিয়ে বল্লে, সে ত ওই শিখিয়েছে। বল্লে, এখনকার দিনে আর কেউ মাজিজী বলেনা, সব মেমসাব বলে। তাই আমিও বলেছিলুম, বেশ তোর যা ইচ্ছে হয় তাই বলিস্।

রামরূপের দিকে চেয়ে সদাশিব বল্লে, কি রে, মেমসাব বলতিস কেন ? তোর মনে নিশ্চয়ই কু এসেছিল।

নেই সাব। আমি—

আবার সাব, সদাশিব ধমকে উঠলো।

রামরূপ সপ্রতিভের মত উত্তর দিলে যে ছেলেবেলা থেকেই সে বাবুদের বাড়ী কাজ করছে, এবং সাব, মেমসাব বলতেই সে অভ্যস্ত, অতএব এখানেও সে মেমসাব বলেছে।

প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে সরল করার উদ্দেশ্যে গৌরী বলে, যাক রামরূপ, এখন আর রাজে কথায় দরকার নেই। তুই চট করে স্টোভটা ধরিয়ে বাবুকে চা তৈরী করে দে। ওঃ, আজ সারাদিন ধরে কি কষ্টই পোয়াতে হোল। সদাশিবকে বলে বিচার-টিচার পরে কোরো, এখন একটু বোসো, চা-টা খেয়ে তবে বেরিও।

সদাশিব বলে, আর চা খেতে হবে না, আমি এখুনি বেরুবো, বলে বাইরের দিকে পা বাড়াতেই গৌরী খপ করে সদাশিবের হাতটা ধরে বলে, আমার মাথা খাও, এখন বেরিও না গো; আর আজকেই ত শেষ দিন, কালই ত চলে যাচ্ছি, তোমার কষ্ট যে আর দেখতে পারি না!

হুঁ, সদাশিব অসহায়ভাবে ডেক চেয়ারে বসে পড়লো। রামরূপকে তাড়া দিয়ে গৌরী বলে, নে, নে, চট্‌পট্ চা-টা তৈরী করে দে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

রামরূপ চট করে একবার বাইরের দিকে বেরিয়ে তার বোস্তদের ইসারা করে চলে যেতে বলেই আবার ঘরে ঢুকলো এবং বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ষ্টোভ ধরাতে বসে গেল।

গৌরী হতাশভাবে বেতগুয়ারের খাটখানার ওপোর বসে বল্লে উঃ, মানুষের গ্রহ যে কখন কোথা দিয়ে কি সর্ব্বনাশ করে—

প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে সদাশিব বল্লে, হাঁ গো, একটা সত্যি কথা বলবে?

বল। আমি কি কখনও তোমার কাছে মিথ্যে কিছু বলেছি। খুব মিষ্টি করে গৌরী উত্তর দিলে।

সত্যি, সত্যি করে বলত, এ সব ব্যাপার কি? তুমি কি সত্যিই আমাকে পছন্দ কর না! আজ সকাল থেকে যা শুনছি, সেগুলো কি?

ওপোর দিকে চেয়ে গৌরী বলে ভগবান সাক্ষী, এর বেশী নিজের মুখে নিজে আর কি বলবো? তার চেয়ে এক কাজ কর, চাকরী ত অনেকদিন হোল, এবার দিন-কতক ছুটী নিয়ে চল একটু তীর্থ করে আসি।

ভগবান বিসের সাক্ষী সে প্রশ্ন না করে শুধু মাত্র ভগবানের নাম শুনেই সদাশিবের বুকের গুরুভার যেন অনেকটা লাঘব হয়ে গেল। বল্লে, তীর্থ কি আর আমাদের বরাতে হবে, তীর্থের খরচ কত? তারপর তোমার শরীরে এত ঝাঁকানি সহ্য হবে কি?

তোমার সঙ্গে তীর্থে যাব তাতে আবার কষ্ট কি, তুমি সঙ্গে থাকলে কষ্টকে আর কষ্ট বলে মনে হয় কি? গৌরী যেন কথাগুলো অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে উচ্চারণ করলে।

একটা থালার ওপোর দুবাটী চা নিয়ে রামরূপ ঘরে এসে ঢুকলো। দুজনের কাছে দুবাটী চা দিয়ে রামরূপ ঘরের আলোটা জেলে দিলে, তারপর সোজা ওঘরে গিয়ে সেখান থেকে মশলার কৌটোটা এনে সদাশিবের ডেক-চেয়ারের হাতলে রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে সদাশিব বল্লে, যাই বল, রামরূপ কিন্তু বেশ কাজের লোক। দেখ, মশলার কৌটোটা কেমন হিসেব করে নিয়ে এসেছে।

ছেলেটা ভালো, তবে বড় বোকা গোছের, আহা, ছেলেমানুষ ত! আরও দু'এক চুমুক খেয়ে গৌরী বল্লে, এই চা খাওয়াটা আবার ছেড়ে দেব। এ তোমার ঐ অনামুখো বন্ধু নরীরই আমাকে নতুন করে ধরিয়েছিল। চা খেতে বসলেই ঐ হতভাগার কথা মনে পড়ে বলেই এবার থেকে চা খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওঃ, কি কাল-সাপই যে বন্ধু সেজে এসেছিল!

একথায় সদাশিব আর কোন মন্তব্য করলে না। গৌরী চা-পান শেষ করে মেঝের ওপোর বাটীটা নামিয়ে রেখে বল্লে, তুমি কি নীরোদবাবুদের বাড়ীতে যাবে নাকি?

না, কেন? সদাশিব যেন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

প্রবোধের বউয়ের কাছে ভদ্রতাভদ্রি করতে।

না, এ নিয়ে আর লোক হাসিয়ে কি লাভ? তুমি যখন ভগবান সাক্ষী করে আমার কাছে বলেছ তখন কি আর ভগবানের ওপোর কোন মানুষের সাক্ষী দাঁড়ায়?

তাহলে কালকে আমায় দেখে নিয়ে যাবে ত?

ও রাগের মাথায় কি একটা বলেছি, তাই বুঝি মজা পেয়ে গেছ? মিটি মিটি হেসে সদাশিব কথাগুলো বল্লে।

না না, তা নয়, অনেকদিন যেতে যাইনি, তাই বলছি। চলনা, যদি আবার একটা রান্নার লোক পাই।

সে জন্যে যেতে হবে কেন, চিঠি লেখ না, সদাশিব সরলভাবে উত্তর দিলে।

তাও হয়; তবে তাই লিখি, যদি কোন লোক-টোক মেলে, গৌরী চিন্তিতভাবে উত্তর দিলে। বল্লে, বেশুর

মত একটা মেয়ে যদি থাকে, তাহলে সারাদিন বাড়ীতেই রইলো, গাহাত পা টেপা থেকে সমস্ত কাজই করবে, অথচ পাড়ার লোক কেউ একটা কথাও বলতে পারবেনা।

হ্যাঁ। সদাশিব ধীরে ধীরে জামার বোতামগুলো খুলতে লাগলো।

কি, আজ আর বেরুবেনা, গৌরী প্রশ্ন করলে।

না, কোথায় আর যাবো? বিশেষ করে যে সব ব্যাপার হয়েছে আজ, তাতে করে আর বেরুতে ইচ্ছে হচ্ছে না। লোকেরা যে কি বলবে তার ঠিক নেই।

হুঁ, সবই গ্রহের ফের আর ত কিছু নয়। তবে নাও, সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে নাও। বলে গৌরী বিছানা থেকে উঠে বা বড় একটা করে না, তাই করলে, অর্থাৎ সদাশিবের জামাটা হাতে করে নিয়ে যেন ওঘরে যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখার জন্ত চলে গেল। সদাশিব তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে পুজোআহ্নিক সারবার জন্তে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

গৌরী রান্নাঘরে ঢুকতেই রামরূপ হাসি হাসি মুখে নিজের ডানহাতের কনুইয়ের ওপোর হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বিছানাপত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই গৌরী পেছন ফিরে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঘাড় নেড়ে দায় দিলে, অর্থাৎ হবে, সব হবে, ব্যস্ত হোয়োনা। তারপর রান্নাঘরে একটু এদিক ওদিক করে নিজের শয়নকক্ষে চলে গেল।

বিছানায় বসে বসে গৌরীর চোখ ফেটে জল এসে গেল। হায়রে, এই তার স্বামী! মানুষ বলেও হয়, পুতুল বলেও হয়। পাল পাল ছাগলকে হাঁটিয়ে কসাইরা সহরের শেষ সীমায় অবস্থিত গোখানায় নিয়ে যায় কাটার জন্তে, ছাগলগুলো কতখানি সরল বিশ্বাসে কসাইদের নির্দেশ অনুসারে পায়ে হেঁটে যেন যেন আনন্দ করতে করতে যায়, মনে করে বুঝি কোন ভালো জায়গায় চরতে যাচ্ছে, ঠিক যেন বরযাত্রী। কিন্তু মানুষ যদি এই রকম ছাগলের মত সরল বিশ্বাসী হয়, তাহলে সেই শিশু-মানুষের জন্ত অনুকম্পা জাগে, তাকে দয়া করা চলতে পারে, কিন্তু সেই লোককে স্বামী বলে মেনে নিয়ে তার নির্দেশ অনুসারে সংসার করা,—ওঃ,এ, যেন জীবন্ত সমাধি! খবরের কাগজে পড়তুম, সরোজিনী নাইডুর কথা, এখন পড়ি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কথা, নেতাজীর সঙ্গে ছিল লক্ষ্মী স্বামীনাথন্। আর বাঙ্গালীদের মধ্যে, সরোজিনী নাইডু বাঙ্গলী, সুচেতা কৃপালনী বাঙ্গলী, অরুণা আসফ-আলি বাঙ্গালী, বীণা দাস বাঙ্গালী, সখীদের কাছে শুনেছি চট্টগ্রামের বাঙ্গালীমেয়ে প্রীতি ওয়াদ্দেদারের কথা, প্রতিভা সেনগুপ্তের কথা। আমি তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই, কিন্তু এমনই ঘরে জন্মেছি, আর এমনই লোকের হাতে পড়েছি, যে খালি উদয়াস্ত কড়াক্রান্তির হিসেব কষে টেনে-টুনে সংসার চালিয়েই যাচ্ছে, অথচ কার জন্তে এত সব সঞ্চয়! মাঝে মাঝে মাতৃত্বের জন্ত গৌরীর মনটা হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। বয়স হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ শূন্য, মহাশূন্য। অন্তান্ত সংসারে যখন আসবে জামাই এবং পুত্রবধূ তখন আমার সংসারে সেই পুরাতন বুড়োবুড়ি এবং তারপর একজনের মৃত্যু। যদি বিধবা হই বৃদ্ধ বয়সে কেউ নেই, নিজেও কিছু জানি না, টাকা পয়সা থাকলেও পরের হাতে সর্বস্ব, এবং তারপর একদিন মৃত্যু। আশাহীন, উৎসাহহীন, জরাগ্রস্ত, অবসন্ন জীবন! 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন, তরল তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন',—ওঃ, ঐ সখীর! জীবনের কি উত্থান-পতনটাই না ওর ওপোর দিয়ে গেছে। আর এখনও দেখ, বেণুকে ও ভালবাসে, কি রকম জোরের ওপোর বেণুকে নিয়ে ও সরকারী বাংলোয় একা বাস করে। কি তীক্ষ্ণ ওর বুদ্ধি। রামরূপ যেমনই গেছে গোয়েন্দাগিরি করতে, অমনি এক নিমেষে ওর ঘাড় ধরে টানতে টানতে এনে হাজির করেছে। বেণুর কথা জোর করে সকলের সামনে বলতেও কিছুমাত্র দ্বিধাই করলে না, বল্লে, ও আমার বোন। আর সদাশিব? সদাশিব তো সদাশিব। কে একটু অপবাদ দিলে, অমনি যাও চলে দেশে, কি না পালিয়ে বাঁচবে। বউকে তাড়িয়ে দিয়ে সকলকে দেখাবে, দেখ আমি কত ভালো। আবার একটা ধাপ্পা দিতেই অমনি জল। উঃ, এত বোকাও পুরুষমানুষ হয়! রামরূপ যে রামরূপ,সেও ওর চেয়ে চালাক আছে। গৌরীর চোখ ফেটে জল এল। হা ভগবান, তুমি যদি এইভাবেই নীরবে রোগে ভুগিয়ে ঘরের ভিতর ভিলে ভিলে নিঃশেষ করার জন্তই আমাকে তৈরী করেছিলে, তাহলে কেন আমার মধ্যে এই কর্মের ক্ষুধা

দিলে, নিজের ওপোর এতখানি আত্মবিশ্বাস কেন দিলে, এবং সর্বোপরি কেন আমার সন্ধান না দিয়ে সংসারে রেখেও সংসারী করলে না। ভগবান সাক্ষী, আমি সত্যি বলছি ভগবান সাক্ষী, আমার অন্তরের আকুলতার একমাত্র সাক্ষী ঐ ভগবানই—

কি, শুয়ে আছ বুঝি, সদাশিব পূজো-আহ্নিক সেরে ঘরে এসে ঢুকে এই মামুলী প্রশ্ন করলে।

গৌরী বল্লে, দেখ একদিন আমি তালের সঙ্গে ভাত মেখে খাবা খাবা করে খাচ্ছিলুম এমন সময় আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাত খাওয়া হচ্ছে বুঝি, তখন আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলুম, কেন সন্দেহ আছে, তা তোমাকেও, আজ আমার সেইরকম পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সদাশিব অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না, তাই জিজ্ঞেস করছি যে, আবার শরীর-টরীর খারাপ হোল না কি?

কই, তা ত জিজ্ঞাসা কর নি, গৌরী সহাস্যমুখে উত্তর দিলে।

না না, ঐ হোল আর কি? একটু খেমে সদাশিব বললে, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া যায় না, সব তাতেই হেঁয়ালি।

ঐ ত যোগ, ঐখানেই ত গোলমাল। যে বামুন ঠিকুজি মিলিয়ে বলেছিল, রাজযোটক মিল, তার সঙ্গে এক-একবার ঝোকাপড়া করতে ইচ্ছে হয়, রাজযোটক মানে কি?

সদাশিব সরল ভাবেই বল্লে, রাজযোটক মানে সব-দিক দিয়েই মিল।

গৌরী সহাস্যমুখে বললে, বোধ হয় তা নয়। রাজ-যোটক মানে রাজায় রাজায় যেভাবে মিল হয়, অর্থাৎ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। আচ্ছা বলতে পার, কোন সময় কোন রাজার সঙ্গে কোন রাজার কি মনের মিল হয়েছে? কখনও না। হয় কোনো একজন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দুই রাজায় মিতালী করেছে, না হয়ত একজনের কাছে লড়াই করে হেরে গিয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে। রাজাদের বিয়ে পর্যন্ত দেখ; তারা যুদ্ধ করে অপর রাজাকে বধ করে তার রাজ্যশুদ্ধ উৎখাত করে তার মেয়েকে জোর করে বিয়ে করে নিজের অন্তঃপুরে এনে তোলে। তাই শ্বশুরকে বধ করে তবে তার মেয়েকে বিয়ে করে রাজারা। কাজেই রাজযোটক মিল কথাটা বড় সাংঘাতিক কথা।

যাক্ গে, ওসব বড় কথায় আমার দরকার নেই, তার চেয়ে আমার অফিসের অনেক কাজ আছে; বিকেলে করব বলে মনে করেছিলুম, কিছুই করা হয় নি, এখন ও ঘরে গিয়ে সেগুলো সারা যাক্, বলতে বলতে দোয়াত কলম হাতে নিয়ে অফিসের ফাইলগুলো বগলদাবা করে কোমরের কাপড়টা আঁটতে আঁটতে সদাশিব ও ঘরে চলে গেল। গৌরী চীৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে সরকারী বাংলোর চালাই করা সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলো।

খাওয়াদাওয়ার পর সারারাত কেটে গেল। পরের দিন সকালটাও যথারীতি শেষ হোল। অফিসের ফাইল এবং খাবারের কৌটো নিয়ে সোমবারের ধোপদোরস্ত কাপড় ও গলাবন্ধ কোট পরে সদাশিব অফিসে চলে গেল। গৌরী রান্নাঘরে গিয়ে রামরূপকে বললে, দেখ রামরূপ, তুমি চট্‌পট্ খেয়ে নিয়ে আগে যেমন বাইরে যেতে, এখন দিনকতক তেমনিভাবে বাইরে যাবে, কারণ মনে রেখ, অনেকেই এ বাড়ীর দিকে এখন থেকে নজর রাখবে, বুঝলে।

রামরূপ মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে বললে, জী মেমসাব। তারপর ইতস্ততঃ করে বললে, আমার সে কথাটা মনে আছে?

আছে বে, বাপু আছে। কিন্তু তুমি বড় শয়তান আছ। কালকে কি বলে তুমি সব বলে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলে?

কী করবো মেমসাব? বাবু যে—

ওরে বোকা, সব কথা বলে দিলে যে মার খেয়ে তোর গতর চূর্ণ হোত।

ইস্। আমি কি এত্তা ছিলুম না কি? আমার কতগুলো সাথী বাইরে ছিল তা জানেন? সদর্পে রাম-রূপ উত্তর দিলে।

তাই নাকি? জোর করে হেসে উঠলো গৌরী। একটু খেমে বললে, বন্ধু নিয়ে গুণ্ডামি করতে আর হবে

না। কিছুদিন অপেক্ষা কর, তোমাকে যা দেব বলেছি, তাই দেব।

উৎসুক হয়ে রামরূপ বললে, বেশভাব, পা-হাতপা ধলাইধলাই করতে হবে না।

মুখ টিপে গৌরী বললে, এখন না, দিনকতক পরে।

বিরসবদনে রামরূপ বললে, আচ্ছা।

বেলা বারোটা নাগাদ রামরূপ চলে গেল। দরজা বন্ধ করে সমস্ত জানালাগুলো খুলে গৌরী আজ কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। সমীরকে চিঠি না লিখলে সে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছে না। বেশুর দিদিমার কথাগুলো তার আর একবার মনে পড়লো, ডুবেছি না ডুবতে আছি দেখি পাতাল কতদূর।

কাল সারাটি রাত এবং আজ সমস্ত সকাল ধরে গৌরী ভেবেছে সমীরকে চিঠি লেখা উচিত কি না এবং সেই সঙ্গে আরও ভেবেছে, কি লিখবে, কেমন করে লিখবে, কি ভাবে আরম্ভ করবে, কি ভাবে শেষ করবে। মনে মনে তার অন্ততঃ দশবার লেখা হয়ে গেছে সেই চিঠি।

বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়ে গেল। কে একজন লোক হয়ত বা পরিহাসচ্ছলেই বলেছিল যে, হিন্দু বিবাহ মানে জেলখানা, বিনাঅপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড। সত্যি কথা,—জানি না, চিনি না, ভালো কি মন্দ বুঝি না, এমন একজন অচেনা লোকের সঙ্গে জীবন ভোরের চুক্তি। আরে বাপু, একটা লেদাইয়ের কল, কি একটা রেডিও কিনতে হলে তার জন্য পাঁচটা দোকান ঘুরে, দশটা মেশিন এনে বাড়ীতে দুমাস ধরে ট্রায়াল দেওয়া হয়, আর সে মেশিনগুলো কি রকম,—না ইচ্ছে হলে বদলে ফেলা যায়, দান করা যায়, ফেলে দেওয়া যায়, ব্যবহার না করে চাপা দিয়ে ফেলে রাখা যায়। কিন্তু এখন যে বিয়ে, তার কোন ট্রায়াল নেই, বদল নেই, একটা বর একবার পাওয়া হয়ে গেলে আর কোন নতুন বর পাওয়া যাবে না। জেলখানার কয়েদীর যেমন নিজের ইচ্ছা বলে কিছুই নেই। পরের ইচ্ছায় সাথর ভাঙো, ঘানি ঘোরাও। হিন্দু মেয়েদের বিয়ের পর দিন থেকেই ঠিক সেইরকম স্বামীর হুকুম মতই সবকিছু করতে হবে। গৌরীর স্কুলের এক সহপাঠীর কথা মনে পড়ে গেল। সে ছিল এক রেল অফিসারের মেয়ে। বিয়ের অনেকদিন পরে একবার তার সঙ্গে গৌরীর দেখা হয়েছিল। গৌরী তাকে বলেছিল, বিয়ে, তুই রেল অফিসারের মেয়ে, রেল অফিসারের বউ, রেলের পাশ নিয়ে খুব ও ঘুরেবেড়াস। সে দুঃখ করে বলেছিল, রেল চড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। গৌরী জিজ্ঞাসা করেছিল কেন? রেল গাড়ীর অপরাধ? সে বলেছিল, বাবার সঙ্গে বরাবর ফার্স্টক্লাসে চড়েছি, এখন স্বামী মহাশয় থার্ড-ক্লাসের বেশী পাশ পান না, কাজেই বিরক্ত হয়ে রেলচড়া বন্ধ দিয়েছি। জন্মে অবধি ফার্স্টক্লাসে চড়ে আর থার্ড-ক্লাসে চড়া যায় না। সত্যি, দেশের এমনই নিয়ম, বরই বড়লোক হও, বিয়ের পরেই স্বামী গরিব হলে তার সঙ্গে সুরভাত খাও, আর তার মন রেখে চলো, তা তার মন রাখতে চাচ্ছে হোক, আর নাই হোক। সন্ধ্যাসির প্রথম প্রথম গৌরীকে বলতো, দেখ, আমাদের দেশে চিরদিনই লোক প্রার্থনা করে, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃত্তানুসারিণীং, অর্থাৎ সুন্দরী বা শিক্ষিতা বা ধনী কন্যা চাইনা, চাই মনোরমা, অর্থাৎ যে স্বামীর মন জুগিয়ে চলতে পারবে এবং যে স্বামীর চিত্তবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলতে পারবে। গৌরী একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিল, এ সমস্ত শাস্ত্রকার পুরুষ মানুষ, তা না হয়ে তারা মেয়েমানুষ হইলে, এই শ্লোকটাই হোত এইরকম যে, স্বামীং মনোরমং দেহি এবং এমন স্বামী যে স্ত্রীর চিত্তবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলতে পারবে। এই কথা বলার পর আর একদিনও সন্ধ্যাসির ঐ স্বার্থবাদী শ্লোকটাকে উচ্চারণ করেনি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে গৌরী মনেমনে বলে,এবারআমি এই অত্যাচারের শেষ করে দেব, আমার জীবন রূপ কারবারের অংশীদার বদলাব। বদলাব যখন হয়েইছে এবং সংসারে ছেলেমেয়ে বলে কোন পিছটান যখন কিছুই নেই, তখন এই হতভাগা দাসত্ব জীবন শেষ করে এই হিন্দু ব্রাহ্মণদের সনাতন প্রথাকে দুপায়ে মাড়িয়ে ডিঙিয়ে আমি আমার মনোমত সঙ্গীকে জোর করে জুটিয়ে নেব, সুখী হব। বদলাব মানে এই ত? লোকে আর কি করবে আমার? ঐ ত বেণু! ঐ কালী, নিরক্ষর, হত-কুৎসিত মেয়েটা, ওরও যদি সমাজে স্থান থাকে, তাহলে আমিও আমার স্থান করে নেব। বড় বড় নায়িকা

মেয়েদের ত কত রাশি রাশি বদনাম শুনতে পাই, কিন্তু তাতে ত তারা কেউ মরে যায়নি। এবার দেখবো নিজের জোরে, নিজের চেষ্টায়, নিজের ইচ্ছা অনুসারে চলে, দেখবো, বাঁচি কি মরি।

ঠিক সেই সময়েই বেণু সমীরকে ভাত দিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলছে দাদা, আপনি আমায় অন্যকোন হুকুম আর করবেন না। আমি হিন্দু বিধবা আমাকে আপনি স্নেহ করেন বটে, কিন্তু সেজন্য আমি আপনাকে লোক-সমাজে শেলো করতে পারবো না। একঘরে যে লোকের বাড়ী ঝি-বাঁদুনীর কাজ করেছে, তাকে বিয়ে করে আপনাকে নীচে নামতে আমি দেব না। আইন যাই-থাক্, আমার বাবা লোকের গুরু ছিলেন, পুরোহিত ছিলেন, তাঁর মেয়ে হয়ে আমি কখনো এরকম শাস্ত্রছাড়া কাজ করতে পারবো না। তার চেয়ে আপনি বিয়ে করুন, আপনার সংসারে আমি ঝি-বাঁদুনী হয়েই থাকবো, তাহলে আর আপনার কোনো বদনামও হবে না, আর আমিও আপনার সুখে সত্যি সুখী হতে পারবো।

সমীর কাল রাত থেকেই নতুন করে জেদ ধরেছে বেণুকে বিধবা বিয়ে করার জন্য। সে বলছে, তোকে বিয়ে করে যদি আমি নেমন্তন্ন করে পাড়ার লোকগুলোকে খাইয়ে দিতে পারি, তাহলে আর কোন শা—কিছু বলতে পারবে না, কারণ স্পষ্ট দেখলি ত, মানুষ, মানুষ! তারা তোর দেবত্বের কোন মূল্যই দেবে না। আর মানুষের মধ্যেই যখন বাস করতে হবে, তখন মানুষের হিসাবমতই বাস করা ভালো, দেবতা হয়ে অথবা নিজে কুড়িয়ে কোন লাভ নেই।

কাল রাত থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত বেণু সমীরের এই জেদটাকে ঠেকিয়ে আসছে। সমীর বলছে, বিয়ে করলে সেই নতুন বউ এসে তোকে সন্দেহ করে অশান্তি করবে, হয়ত শেষ পর্যন্ত তোকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বে। তখন?

তখন চলে যাবো। বুঝবো যে দাদাকে সংসারী করে এলুম, হাসিমুখে বেণু উত্তর দিলে।

আর নিজে, সমীর প্রশ্ন করলে।

গম্ভীরমুখে বেণু বলে, আপনি কি ভুলে গেছেন দাদা বৃন্দাবনে কত বৈষ্ণবী দুবেলা পেটভরে খেয়ে বেঁচে আছে। যদি কোথাও জায়গা না হয়, তাহলে সে জায়গা ত কেউ কেড়ে নেবেনা। একটু থেমে বলে, দাদা, ধর্মের জয় সর্ব্বত্র। যদি সৎপথে চলি, তাহলে স্বয়ং ভগবানও আমাকে দুঃখ দিতে পারবেন না।

খেয়ে উঠে জলের ঘটি নিয়ে আঁচাতে গিয়ে সমীর বলে, যা খুসি তোমার।

উৎফুল্ল হয়ে বেণু বলে, তাহলে বিয়ে করবেন ত দাদা? জলের ঘটিটা রাখতে রাখতে সমীর রহস্য করে বলে, এ জীবনে প্রজাপতি আর প্রজাপতি হওয়ার ফুরসৎ পাবে না, তাকে শুঁয়োপোকা হয়েই থাকতে হবে।

কিরকম? কে আবার কি কথা, বেণু সপ্রশ্ন নেত্রে চেয়ে রইলো।

সমীর বলে, ও, তুই বুঝি জানিস্ না যে, ডিমথেকে যে জিনিষটা শুঁয়োপোকা হয়ে জন্মায়, বড় হয়ে তারই কাঁচা ঘরে নিয়ে তানা বেরোয় এবং তারপর প্রজাপতি আকারে সে উড়তে থাকে।

যান, তা বুঝি আবার হয়? অবিশ্বাসের সুরে বেণু উত্তর দিলে।

হ্যাঁরে বোকা, তাই হয়, বলতে বলতে সমীর নিজের ঘরে গিয়ে পান খেয়ে সিগারেট মুখে দিয়ে খাটের ওপোর আড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে সুরু করলে।

আহারাদি সেরে রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে বেণু এসে এ ঘরে ঢুকে দেখলে সমীর তখনও জেগে আছে। দেখেই প্রশ্ন করলে, দাদা এখনও ঘুমোন নি।

না, কাগজ পড়ছি।

বেণু বলে, দাদা, পিসিমাকে টাকা পাঠাবার কি করলেন।

সমীর বলে, পাঠাই নি, ভাবছি দুদিনের ছুটি নিয়ে একবার কাশীতে যাব, গিয়ে সব দেখে শুনে যা হয় একটা ব্যবস্থা করবো।

আনন্দে বেণু বলে, তাই করুন দাদা, তাই করুন। আহা বুড়ো মানুষ, মনে বড় ব্যথা পেয়ে গেছেন। যিনি আপনাকে মায়ের মত মানুষ করেছেন, তিনি যদি একটা অন্যায়ই করেন, আর অন্যায়ই বা এমন কি, আমি যদি আপনার পিসিমা হতুম, তাহলে ঐরকম চিঠিপত্র

পেয়ে আমিও ঠিক ঐরকমই করতুম। তিনি ত আর বুঝতে পারেন নি যে আপনি কত মহৎ, কত উদার।

আমি মহৎ, আমি উদার? ওরে রেণু, এটা মনে রাখিস, আমি মহৎও নই, উদারও নই, শুধু তোর পায়ায় পড়ে, তোর ছোঁয়াচ লেগে আমাকে বাধ্য হয়ে মহৎ হতে হয়েছে।

সলজ্জকণ্ঠে রেণু প্রতিবাদের সুরে বলে, কি যে বলেন দাদা, আপনি যদি মহৎ না হতেন তাহলে কি আর আমি থাকতে পারতুম। কোথায় ধুলোর মধ্যে মিশিয়ে যেত আমার ধর্ম কর্ম। আমি বলি দাদা, আপনি একবার সময় করে কাশীতে যান, সেখান থেকে পিসিমাকে এখানে নিয়ে আসুন, বিয়ে-থাওয়া করুন, সংসার করুন। আমার জন্য আপনি একটুও ভাববেন না, যা করলে আপনার সংসারে সুখ শান্তি হবে, আমি হাসিমুখে আমার দাদা-বৌদির জন্য তাই করবো।

সাধু বৎসে, সাধু, সমীর হাসিমুখে উত্তর দিয়ে খবরের কাগজটা পাশে সরিয়ে রেখে সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। বল্লে, কটা বাজলো রেখ ত রে?

রেণু টেবিলের টানা থেকে তার হাতঘড়িটা বার করে দেখে বল্লে, ছুটো বাজতে দশ মিনিট।

সমীর বল্লে, ঠিক আড়াইটার সময় আমাকে ডেকে দিবি, তিনটের সময় অফিস পৌঁছুতে হবে।

রেণু বলে, আচ্ছা তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

সন্ধ্যের পর সমীর বাসায় ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই রেণু একটা বেগুনি রঙের মোড়া খাম এনে সমীরের হাতে দিয়ে বল্লে, দাদা, বিকেল ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময় দেখি, এখানা জানালার ধারে পড়েছিল। বোধ হয় আপনাকেই কেউ দিয়ে গেছে, তাই মনে করে তুলে রেখেছিলুম।

সমীর সাইকেলটা ঠিকভাবে ষ্ট্যাণ্ডে রেখে জামা প্যাণ্ট না খুলেই খামটা হাতে করে নিয়ে দেখলো তার উপরে পরিষ্কার গোটা গোটা লেখা আছে শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কোন ঠিকানা নেই। স্পষ্ট বুঝলে, চিঠিটা কেউ হাতে করে দিয়ে গেছে, ডাকঘরের কোন ছাপ নেই। ডাকটিকিটও নেই।

মনে মনে একটু কৌতূহলী হয়ে কোনরকম দেরী না করেই সে খামটা ছিঁড়ে পড়তে বসলো, দীর্ঘ এক চারপৃষ্ঠাব্যাপী পত্র। শেষের দিকে দেখলো নাম লিখেছে তোমারই প্রতীক্ষারত গৌরী।

এক মুখ বিরক্তি নিয়ে সমীর চিঠিটা আদ্যোপান্ত পাঠ করলে। রেণু একটু অপেক্ষা করে বললে, কার চিঠি দাদা, পিসিমার না কি?

না, সংক্ষেপে উত্তর দিলে সমীর।

তবে?

এ অন্য ব্যাপার, বাড়ীর কিছু নয়।

রেণু নিজের কাজে মন দিতে অন্যত্র চলে গেল।

সমীর চিঠিখানা আর একবার সমস্তটা পড়লো। তার চোখ মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলো। এ চিঠির মানে কি? গৌরী কি এত নীচ, এত ছোট, এতই সুধার্ত সে? মনে মনে রেণুর সঙ্গে তুলনা করে গৌরীকে সমীরের মানুষ বলে মনে করতেও আর ইচ্ছা হোল না। কিন্তু এর উত্তরে সে কি বলবে? ভাবতে ভাবতে সে তার আধা প্যাণ্ট খুলে লুঙ্গি পরলে, কাঁধের ওপোর তোয়ালে ফেলে এবার কলঘরে চলে গেল। হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সমীর বল্লে, চিঠিটা কখন পেলিরে?

রেণু বলে, বলছি ত, বিকালে ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময় দেখি, জানালার তলায় পড়ে আছে একটু থেমে বল্লে, কেন দাদা, কি আছে ওতে, কে লিখেছে?

সমীর একবার ভাবলে, সবটা খুলে সে বলে, কিন্তু পরক্ষণেই মনের ভাব চেপে রেখে গম্ভীরভাবে বলে, ও আমার অফিসের ব্যাপার। সমীর চাইছিল, প্রসঙ্গটাকে একেবারে চাপা দিতে!

আহারাদি শেষ করে রাত্রি প্রায় ১টার সময় সে আর একবার বসলো চিঠিখানা নিয়ে। আর একবার কে সবটাকে পড়লে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি যুক্তি। কেবলই মনে হতে লাগলো, রেণু এক হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, গৌরীও আর এক হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে। রেণু নিরক্ষর। বর্তমান জগৎ, বর্তমান সাহিত্য, বর্তমান সংবাদ পত্রের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, সে আছে অন্ধকারে। আর গৌরী সমস্ত লাইব্রেরী

যে দু'তিনবার করে পড়ে শেষ করে ফেলেছে, সে শিক্ষিতা! একটা ভারসা পড়তে গিয়ে সমীরের ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। গৌরী কি মনে করে সমীর চরিত্রহীন, অতএব সমীরের পক্ষে বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা শক্ত নয়। ইঃ, এতবড় শয়তানী! শেষকালে সে বলছে কি না যে, বেণু কাছে থাকলেও গৌরী আপত্তি করবে না, শুধু সদাশিবের কাছ থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। সে বাঁচতে চায়, সে মানুষ হতে চায়, মনের মানুষকে সে জোর করে দখল করতে চায়। কি স্পর্দ্ধা এই স্ত্রীলোকের! ভাবতে ভাবতে সমীরের মনে হোল, এ স্ত্রীলোকটি শুধু চরিত্রহীনই নয়, এ খুন করতেও পারে!

কিন্তু এর প্রতিকার কি? ঘড়িতে দেখলে, রাত্রি তখন সাড়ে ন'টা। ভাবলে, এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। সদাকে ডেকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে এনে চুপিসাড়ে চিঠিটা পড়িয়ে বলে দেবে সাবধান হতে, এবং তারপর চিঠিখানা পুড়িয়ে শেষ করে ফেলবে। না কি, আর কি করা যেতে পারে। এর চেয়ে যদি গৌরীকেই আলাদা ডেকে সাবধান করে দেয়! মুহূর্ত্তেই কপালের শিরাগুলো ওর ফুলে উঠলো। কক্ষনো নয়, শয়তানীকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য নিরালায় ওর সঙ্গে দেখা করলে ঐ গৌরীই যে কোনো রকম অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। এর উপযুক্ত ওষুধ হচ্ছে সদাশিব।

বেণুর ঘরের কাজ তখনও শেষ হয় নি। সমীর বেণুকে ডেকে বললে, দরজাটা বন্ধ করে দে, আমি এখুনি আসছি বলেই চিঠিখানা খামে ভরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

সদাশিবের বাড়ীতে সমস্ত অন্ধকার, তারা বোধহয় সমস্ত কাজ কর্ম চুকিয়ে শুয়েছে। দাওয়ায় একটুখানি ইতস্তত করে সমীর আবার ফিরে এলো। দরজায় ঘা দিতে বেণু দরজা খুলে দিয়ে বললে, কোথায় গেছিলেন দাদা?

এমনি একটু—সমীর উত্তর দিলে।

বেণু আর কোন বাক্যব্যয় না করে ভেতরে চলেগেল কিন্তু তার মনে কেমন একটা খটকা লেগে গেল। দাদা যেন তাকে এড়িয়ে কি একটা জিনিষ গোপন করে চলেছে। যাক্, আপন দাদা ত নয়, পাতানো দাদা, অমনিতেই বেণুর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো।

রাত্রি বোধ হয় দুটো কি আড়াইটে, সমীরের দরজায় টুক্ টুক্ করে শব্দ হোল। সমীরের খুব যে খুব সজাগ সেটা সবাই জানে, বোধহয় বিপ্লবী দলের লোকদের সকলকেই ঘুমের মধ্যেও সজাগ থাকার অভ্যাসটা করতে হয়। ঘুম ভেঙে সমীর কান খাড়া করে রইলো। বাইরের দরজায় আবার শব্দ, টুক্ টুক্ টুক্।

তড়াক করে বিছানা থেকে উঠেই সমীর সুইচ্ টেনে আলো জ্বাললে। অল্প খোলা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সাদা কাপড় মোড়া কে একজন তার বোনাকে তারই দরজার হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সমীর জানালা দিয়ে প্রশ্ন করলে কে? সে যেন অনেকটা আন্দাজ করে নিয়েছে।

চাপা কণ্ঠে বাইরে থেকে উত্তর এলো, দরজাটা খোল।

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন একটা বরফের টুক্‌রো চলে যাচ্ছে সমীরের এমনই মনে হোল। কেন? সমীর প্রশ্ন করলে।

চাপা কণ্ঠে পুনরায় অনুরোধ এল, আগে দরজাটা খোলত।

যন্ত্রচালিতের মত সমীর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে সরে দাঁড়ালো। একটা মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় গৌরী ভেতরে ঢুকে এসে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিলে। প্রথম প্রশ্ন হোল, বেণু কোথায়?

অস্ফুট কণ্ঠে সমীর উত্তর দিলে, ও ঘরে।

মাঝের দরজার দিকে দৃষ্টি দিয়ে গৌরী বললে, দরজা কি বন্ধ?

হাঁ।

তবে কি ও দরজা বন্ধই থাকে?

হাঁ, নিয়মিত ভাবে। ও যে আমার বোন, সত্যিই বোন।

বেশ ভালো। তাহলে বোসো, অনেক কথা আছে। বলেই গৌরী সামনের চেয়ারে বসে পড়লো, বললো, আলো নিভাও, দরজার ছিটকিনী দাও।

সমীর দাঁড়িয়েই রইলো। স্পষ্টস্বরে বললে, না আলো থাক, দরজাও খোলা থাক্।

তুমিও এরকম কাপুরুষ ছিলে না। গৌরী ওর মুখের দিকে মধুরকণ্ঠে দৃষ্টিপাত করে কথা গুলো উচ্চারণ করলে।

উত্তরে সমীর বললে, না, আমি কাপুরুষ নই, আমি পুরুষ এবং তুমি পরস্ত্রী, তাই আলো জ্বলবে এবং ঘরেও খোলা থাকবে।

ও, তাই নাকি? আচ্ছা বেশ আমার চিঠিটা পড়েছ ত?

পড়েছি।

তার উত্তরটা নিতে এসুম।

যথাসময়ে জানিয়ে দিতুম।

আমি জানি যে, তুমি এর কোন উত্তরই সোজাসুজি হয়ত দেবে না, সেই জন্যই—

বাধা দিয়ে সমীর বললে, তাই যদি জানতে তাহলে এরকম চিঠি না লিখলেও পারতে।

কিন্তু না লিখে আমার উপায় ছিলনা। আমি ত বলেই দিয়েছি, আমি জীবনে পরিবর্ত্তন চাই।

কিন্তু আমি যে এরকম পরিবর্ত্তন চাইনা।

চাওনা?

না।

রোষকষায়িত লোচনে গৌরী বললে, তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে নষ্ট করতে এসেছিলে কেন? কাঙ্গালকে ধনাগার দেখিয়ে—রাগে ফুলতে ফুলতে গৌরী তার বাক্য আর শেষ করতে পারলে না।

ধনাগার দেখানোর কাঙ্গালেরও হাত ছিল অনেকখানি, বই বেহুকে ত এপথে আনতে পারিনি?

ওর কাছে হেরে গেছ? তাহলে তুমিও হারো?

হারিনি, শ্রদ্ধায় বশ্যতা স্বীকার করেছি।

ও, ওহুঁ? তা বেশ। তাহলে আমার চিঠির জবাব দিতে তোমার কোন সমস্যাতেই পড়তে হবেনা। তাহলে সেই জবাবই দাও।

জবাব এই যে তুমি পরস্ত্রী, বন্ধুপত্নী। নিজের ঘরে ফিরে যাও, আমি তোমার কোন অনিষ্টই করবো না। কেউ জানবেনা তোমার এই অন্যায় অভিসার। মন থেকে সমস্ত গ্লানি দূরিয়ে ফেলে সুখী হও।

একরাশ কলঙ্ক নিয়ে স্বামীর কাছে সন্দেহভাজন হয়ে তারই সংসার করতে হবে?

ও সন্দেহ আস্তে আস্তে কেটে যাবে।

জানি, 'আগিকার দুঃখসুখকে স'হবে কাল, শতবর্ষ পরে' কিন্তু সমস্যাটা আমার আজকের, শতবর্ষ পরের নয়।

তা আমি কি করতে পারি?

আমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারো।

অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো নয়, বেশী করে অপমৃত্যু ঘটানো। সেটা আমি চাইনা।

গৌরীর দুটো চোখে জল টল টল করছে। বললে, তোমার কি দয়ামায়া বলে কিছু নেই?

আছে এবং আছে বলেই তোমাকে শেষ করতে চাই না, পারবো না।

আমি শেষ হব, শেষ হতেই চলেছি, পারো যদি, বন্ধু যদি হও, তাহলে আমাকে রক্ষা কর।

চল, তোমাকে সমার কাছে নিয়ে যাই।

সে ঘুমুচ্ছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

এ্যাঁ, সমীর চমকে উঠলো, তার মানে—তবে কি—

মধুর হাসি হেসে গৌরী বললে, ভয় নেই, পতিঘাতী নই। তাকে সে বললে, সমীরটা আবার লাগছে, সেই অজুহাতে আমার ঘুমের ওষুধ থেকে দু'তোজ ব্রোমাইড মিক্শ্চার তাকে একসঙ্গে খাইয়ে দিয়েছি।

মেঝের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সমীর বললে, কিন্তু বেহুঁস ব্রোমাইড খায়নি—

ও মড়ার মত ঘুমোয় আমি জানি, আর যদিই এখন তোমার কাছে এসে ওর ঘুম পাংলা হয়ে থাকে, তাহলেও ও ত বোন, ওর চটবার কি আছে?

অন্যায় সহ্য করতে ও পারেনা, হয়ত চেঁচিয়ে উঠবে।

ভালই হবে, লোকে জানবে, আমি তোমার ঘরে নিয়মিত ভাবে আসি, স্বামী আমায় তাড়িয়ে দেবে, তখন কি তুমি আমায় ফেলতে পারবে?

তবে স্বামীকে ব্রোমাইড খাইয়েছ কেন?

ভুল হয়েছে। কিন্তু ভুলই বা কেন, ঘেগে থাকলে কি এতদূর এসে পৌঁছাতে পারতুম?

না পারলেই ছিল ভালো।

তাত বলবেই। ডেনীতে ন্যাটা মাছ গাঁথতে বড় সুখ হয়, কিন্তু তোমার ছিপে চোপ খেয়েছে হাঙ্গরে। হয় তুমি ওকে বধ কর, নইলে সে তোমায় বধ করবে।

ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চাও ?

মোটেই নয়। ভয় বলে কোনো বস্তু যে ভগবান তোমায় দেননি তা আমি জানি এবং জানি বলেই ত মরেছি। এখন বল তোমার বক্তব্য।

বহু পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি, তুমি পংগ্রী, বহুপত্নী।

সেই বহু যদি পত্নীকে ভাড়িয়ে দেয়, তাহলে কি পথে পড়ে-থাকা বেওয়ারিশ মাল তুমি কুড়িয়ে নিতে রাজী আছ ?

পথে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ মাল রাজার প্রাপ্য। কুড়ানো মাল নিয়ে সমীর তার বাহু ভর্ত্তি করেনা।

সৌরীর চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে এল। কিন্তু তাহার আগুনের কণাটুকুও প্রকাশ পেলে না। মুখে বললে, বাক্সোয় না রাখলেও পাশের ঘরে পায়ের তলায় ফেলে রাখবে কি ?

না, স্পষ্টভাবে সমীর উত্তর দিলে।

এতদূর ? আচ্ছা। সৌরী উঠে দাঁড়ালো। দরজাটা খুলে চৌকাঠের বাইরে একটা পা দিয়ে আর একবার এদিকে ফিরে বললে, এত স্পর্দ্ধা থাকবে না। একদিন এই আমার কাছেই তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, কারণ আমি যে তোমায় ভালোবাসি।

সমীরের মুখের ভগায় অনেক রকম উত্তরই এলো। একবার মনে হোল বলে, এখনই ক্ষমা চাইছি, আবার মনে হোল, বলে, যখন চাইবার হবে তখনই চাইবো, কিন্তু কোন কিছু বলবার পূর্ব্বেই ঐ উন্মাদ অভিসারিকা নিস্তব্ধ রাজপথ অতিক্রম করে নিজের বাসার দিকে দ্রুতপদে চলে গেল। এর সাক্ষী আর কেউই রইল না, মাত্র একটা পেঁচা তার কর্কশকণ্ঠে আকাশটাকে ফেরফার চিরে দিয়ে সদাশিবের বাড়ীর ওপোর দিয়ে উড়ে এধারে সমীরের বাড়ীর ওপোর দিয়ে চলে গেল। সমীরের সমস্ত শরীর ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে যেন বিছানার মধ্যে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

বাকী রাতটুকু সমীর আর চোখ বুঁজতে পারলেনা। অদ্ভুতরকম এলোমেলো চিন্তা, কি যেন একটা অব্যক্ত আতঙ্ক, ভবিষ্যতের অজস্রকম ভয়াবহ কল্পনা, সমস্ত মনটা একেবারে এলোমেলো হয়ে গেল। সূর্য্যের আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমীরের মনে হোল যেন সে সারারাত ধরে একটা ভীষণ দুঃস্বপ্নে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথাটা টলে গেল। একবার জেলখানার মধ্যে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে তাকে বন্দুক বেত মারিয়েছিল। বেত খাওয়ার পরই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই নিদ্রাভঙ্গের পরেও এই-ভাবে তার মাথা টলছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে নিদারুণ ব্যথা সে অনুভব করেছিল। আজ এতকাল পরে এই সকালে সমীর পুনরায় সেই অনুভূতিই ভোগ করলে, গৌরী যেন তার সর্ব্বাঙ্গে বেত্রাঘাত করে গেছে।

ঘরের দরজা না খুলেই সমীর তার বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বার করলে, এবং দেশলাইটা জেলে সেই আগুনে চিঠিখানার একটা কোণ লাগিয়ে দিতে গিয়ে আবার যেন কি ভেবে জলন্ত কাঠিটা ফেলে দিলে। একমিনিট পরেই আবার দেশলাই জ্বাললে, কিন্তু সেটাও পূর্ব্বের মত নিবিয়ে দিয়ে চিঠিখানা হাতে নিয়ে উঠে নিজের বড় সুটকেশটা খুলে তার সব তলায় যেখানে সে টাকার থাম রাখে সেইখানে চিঠিখানা গুঁজে রেখে বাক্সটা বন্ধ করে উঠে পড়লো। তারপর ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নিজের ঘরে ঢুকে সে আবার সন্তর্পণে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে চিঠিখানা বার করে আর একটা দেশলাই জ্বালছে এমন সময় বেণু এসে দরজার ঘা দিয়ে বললে, দাদা, চা এনেছি। এখন দরজা বন্ধ করলেন কেন ?

যাচ্ছি, যেতে দেরী হবে। ভেতর থেকে কথাগুলো বলেই খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটাতে সমীর অগ্নিসংযোগ করলে। তার রাত্রের জলখাওয়ার গেলাসে খানিকটা জল ছিল। সেই গেলাসের ওপোর সে সেই জলন্ত চিঠিটাকে ধরলে। চিঠিটা নিঃশেষে পুড়ে তার ছাই-গুলো সমস্তই ঐ জলের গেলাসের ভেতর পড়লো। কুঁজো থেকে আরও একটু জল ঢেলে গেলাসের সমস্ত জলটা ভালোকরে গুলিয়ে নিয়ে সে বাইরের দরজা খুলে ঐ ছাই-গোলা জলটা বাইরের মাঠে ফেলে দিয়ে ঘরে এসে আরও একটু জল নিয়ে গেলাসটা ধুয়ে আর একবার বাইরে গিয়ে জল ফেলে ঘরে ভেতরে এসে বাড়ীর দিকের দরজা খুললে। যেন কিছুই হয় নি, এমন ধারা একটা

শান্তভাবে মুখে এনে সমীর ডাক দিলে, কই রে বেণু, চা নিয়ে আয়।

বেণু চা ও খাবার এনে টেবিলের ওপোর রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সমীর খাবার খেতে খেতে বল্লে, কি রে অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে, কিছু বল্‌বি না কি?

মাথা হেঁট করে বেণু বললে, না। একটু থেমে বললে, যদি আপনার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে ক্ষমা করবেন দাদা।

কেন, একথা কেন? হঠাৎ আজ সকালে এ কথা বল্‌ছিস্ কেন রে?

এম্‌নি বল্লুম। ছোট মুখে বড় কথা অনেক ত বলি, তা সে সবগুলো ছোট বোন বলে নিজগুণে মার্জ্জনা করে নিতে পারবেন না?

কেকটা গলাধঃকরণ করে চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সমীর বললে, ব্যাপার কি বল্‌ত? আমি ত তোকে কিছু এমন বলি নি যে এ কথা উঠ্‌তে পারে!

বেণু ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ঘরে এসে দেখে সমীরের প্রাতঃরাশ শেষ হয়ে গেছে, সে বেরোবার উদ্যোগ করছে। উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো তুল্‌তে তুল্‌তে বেণু বললে, আপনার কি হয়েছে বাদা? কাল রাত্রে খাওয়ার পর বেরিয়ে গেলেন, আজ সকালে মুখ ধোবার পর হরদা বহু করলেন, আপনার চোখ দুটো অমন লাল হয়ে রয়েছে, অপনার কি কোন—

কিছু হয় নি রে, কিছু হয় নি, একটু ব্যস্ত আছি। বলে বিনা ভনিতায় বেণুর পিঠে একটা ফুলো চড় মেরে সমীর বললে, ও সব নিয়ে তুই মাথা ঘামাস্ নি, তুই আমার যে-বোন সেই-বোনই আছিস্, তোর কোন ভয় নেই।

বেণুর মন থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল।

[ক্রমশঃ

———

সংকলন

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা সম্বন্ধে ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ।

ঁ মার্তাঁ লিখেছেন—সুবৃহৎ বাঙলা অঞ্চলে এমন উৎকৃষ্ট পণ্য আছে যা ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অংশে রপ্তানী হয়। এখানে জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য আছে এবং তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যঞ্জনা ওঠে। তা সত্ত্বেও লোকেরা এখানে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। মুদ্রার বিরলতা চোখে পড়ার মত। এই দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হিসাবে বলা হয় যে মোগলদরবারের বহু প্রধান অভিজাত তাঁদের রাজস্বের অল্প অংশে সৈন্য মজুত রাখবার জন্য ঐখানকার রাজস্বের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে বাধ্য হন।

একথা বর্তমান কালে ও কতখানি অপরিচর্বিত রয়েছে, তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। অনিরুদ্ধ রায়

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ সালে আন্দাজ চালের দর কত ছিল?

ত্রৈমাসিক পত্রিকা স্বাউগাকের (মাঘ চৈত্র ১৩৭১) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দত্তের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে উপরোক্ত বিষয়ে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতিসার প্রভৃতি আলোচনার দ্বারা লেখক প্রমাণ করেছেন যে টাকায় তখন ২৬মণ চাল পাওয়া যেত।

অর্থাৎ তখনকার একটাকার মালিক এখনকার দু হাজার আশী টাকার মালিকের সমান।

একে কালানুপাত বললে বোধ হয় ভুল হবে না। মিতালি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা—৬

ভারতের জাতীয় পতাকা ও ম্যাডাম ভিকাজী কামা

এনাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় আছে বৌমী রস নামে এক মহিলা আমেরিকার জাতীয় পতাকার প্রাথমিক রূপটি দেন। ভারতের জাতীয় পতাকারও প্রাথমিক রূপ দেন এক মহিলা দেশপ্রাণী ম্যাডাম ভিকাজী কামা। ১৮৬১ সালে ম্যাডেম কামার জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ঁ সোরাবজী ফ্রামজী প্যাটেল। তিনি ১৯০১ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লণ্ডন যান। কয়মাস পরে সেখান থেকে তিনি প্যারিসে যান। প্যারিসে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন ও বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি বীর সাভারকর, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, মুকুন্দ সেনাই, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশত্যাগী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

১৯০৭ সালে জার্মানিতে যে সোসিয়েলিষ্ট কংগ্রেস হয় তাতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করেন।

নিশ্চয়ই ইহা ভারতের এক মহীয়সী নারীর সুমহান গৌরবময় কৃতিত্ব।

অমিত ঘোষ, কলিকাতা—২৬

গল্প সাহিত্যে ভারত

সম্প্রতি আমেরিকার কোনিয়ন রিভিও পত্রিকায় নানা দেশের গল্প সাহিত্য সম্পর্কে তদ্দেশের গল্প লেখকগণ আলোচনা করেছেন।

ভারতের গল্প সাহিত্য সম্বন্ধেও শ্রীগণকা সেন রচিত একটি সুন্দর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনেক অজানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এ নিবন্ধে। বিশেষ করে ভারতের লেখকেরা যে চিরকাল দারিদ্র্য পীড়নের নিষ্পীড়িত এ সত্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু বাঙলা দেশের গল্প সাহিত্য সমগ্র ভারতের মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার উল্লেখ তিনি করেন নি। বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' যে এককালে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে প্রবুদ্ধ করেছিল একথাটা তিনি বেমালুম বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

বিদেশের সাহিত্য আলোচনার আসরে, দেশের মহান্ সাহিত্যের প্রতি এমন অবহেলা সত্য সত্যই মর্মান্তিক ব্যাপার।

ত্র্যম্বক সেন, বীরভূম

যক্ষিণী তুমি হেসো না

মঞ্জরী উকিল

যক্ষিণী, তুমি ঐ হাসি আর হেসোনা
আজকে ছড়ানো ঘাসের আস্তরণে—
কাগজের ঠোঙা, চিনা বাদামের খোসা—

চারিদিক ঘুরে গর্দিল কালো পথ
অজগরমুখী গাড়িরা ক্রুদ্ধ ছুটছে
ছিটকে ফেলেছ কাল-চক্রের বৃত্তে
চাকরী হলনা, পত্র নাকও পকেটে কয়েক পয়সা
নীল তারাময় মৃদু রহস্যে কাছে ঘুরে তুমি হাসছ।

সামনে বিশাল পাছশালার দ্বারদেশে আছে চৈত্য
অন্তরে নেই নির্বাণ, আছে বাসনার দাহ দীপ্তি

সম্মুখ ভাবে বিশাল-ফাঁকায় নেই কোনও অঙ্গনা
বিস্তৃত শুধু সাদা দেওয়ালে অঙ্কিত বিজ্ঞাপন!

যুব-যৌবনে কোন ইতিহাসে সেই হাসি তুমি হাসলে
পাগল করলে, মাতাল করলে, ধরায় রইলে অধরা
কখন চাঁপার আঙুলি-ফাঁদে পদ্মকলিকে বাঁধলে
কখনও হাটলে বসনা দুলিয়ে জল-পদ্ম মাড়িয়ে
অশোক-কাননে মোহন করলে, বকুলে ছিটোলে
মদিরা

কোমল-কমলী উরুতে তোমার চীন-অংশুক দুলল,
হরষ ঘোষাল স্বর্ণ-কেয়ূর দুই দক্ষিণ ভুজা
হরন-বণিক পলেস্তারে পুঁছে রোমক আদর পিয়াল।

স্বপ্ন দেখেছি ঘোর অরণ্যে সার্থ-বাহী যে যাত্রী
গভীর রাত্রি পার করে তারা তোমার পূজাই করল,
অনাবৃষ্টির দুর্বৎসরে সেই সব কৃষকেরা
ফলল পাবার আশায় তোমাকে বৃষকা-রূপে স্মরে

পুণ্য স্থানের প্রহরী-রূপিণী বন্দিতা দেবী তুমি
সযতনে আঁকা অঙ্গদেশে বয়, অতি আতঙ্ক ভরে
দেখনা তোমার নিশিষ্ট হয় পুষ্পিত-যৌবনে
পত্র পুষ্প ফল ও কোরকে সাজানো বল্লতরু

ও দেহ তোমার মৃত্তিকা ভেদি' উঠেছে স্বর্গ পানে
পাতালে গোপন বল সঞ্চয় শিরে তারকার মালা
শেষ-অগ্নির নীল শিখা তুমি নীল বারবীর জ্বালা।

আমার জীবনে জাগিয়ে তুললে এ কী দাহ আর
দীপ্তে
হেসোনা, হেসোনা বলে যাও আজ কবে হবে
তব তৃপ্তি?

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চার

সেদিন বারবিকিউয়ে সভা জাঁকিয়ে বসেছিলেন চক্কোত্তি মশায়। কোণের গোটা টেবিলটাই তাঁর দলের লোকেরা দখল করেছিল। জন পাঁচ ছয়ত হবেই।

শঙ্কর কাজ শেষ করে লাঞ্চ খেতে আসতেই চক্কোত্তি মশাই গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—আমাদের দলে আর একজন বাড়ল। তারপর শঙ্করের সঙ্গে অন্যসকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বুঝলেন মিত্তির, আমি হলাম, এডিনবরার পুরোনো ঘুঘু। এখানে অনেক বছর ধরে আছি। খুব হুঁশিয়ার হয়ে এদেশে থাকবেন। একমনে পড়াশুনো করে পাশটি করেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। চারদিকে চাকা ঘুরছে। ভুলে একবার পা দিয়েছ কি মরেছ। পা আটকে গেলেই গেল। আর দেশে ফিরতে পারবে না। বনবন করে চক্রের ফেরে ঘুরতে হবে। গোরখপুরের এক শান্ত ছেলে উপাধ্যায় মাইনিং পড়তে এডিনবরায় এসেছিল। কম্বা চেহারা, রংটা ফরসার দিকে। সে মজলিসের এককোণে বসেছিল। মাস ছয়েক হলো এসেছে। কিন্তু এখনও এদেশে মন বসাতে পারেনি।

প্লেট ভরে সকলকে 'ভিল' দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। চক্কোত্তি মশায়ের ফরমাস মত।

উপাধ্যায় চমকে উঠে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল—ইয়ে ক্যা বীফ্ স্থায়ে চক্করবর্তি জি।

—আরে বাবা খেয়ে নাও। বিদেশে কোন নিয়ম নেই। কালুবাবুরা যখন এদেশে প্রথম আসে, তখন এটা খাবনা, এটা করবনা ওসব অনেক কিছু বলে থাকে। যখন ফিরে যায় তখন আর তাদের চেনা যায়না।

শঙ্কর এডিনবরায় এসে এতদিনে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিল এখানকার ভারতীয় ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ডাক্তার। আর অজান্তে তাদের মধ্যে একটা গ্রুপিং হয়ে গেছে।

অচিকিৎসক ছাত্রদের মনে একটা ধারণা বলবৎ হয়েছে যে ডাক্তাররা নিজেদের খুব বড় মনে করে। চক্কোত্তি মশায়ের আড্ডায় তাদের দুজনকে ছেড়ে দিলে আর কোন ডাক্তার ছিলনা।

এই রকম আবহাওয়া শঙ্করের খুব খারাপ লাগছিল।

কিছুক্ষণ পরে বারবিকিউয়ে শরৎ চৌধুরীর সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। শঙ্করের সঙ্গে পরে সে ভদ্রলোকের একদিন আলাপ হয়েছিল। তার নাম প্রেমমঙ্গল সিং। রাজস্থানে আদিনিবাস। পরে বিহারে সেটল করে। এফ, আর, সি, এস পড়তে এসেছেন।

তারা কিন্তু চক্কোত্তি মশায়ের দঙ্গলকে উপেক্ষা করে অন্যদিকে চলে গিয়ে ক'ফ খেতে বসল।

ঢাকার নজরুল ইসলাম কেমিক্যাল ইনজিনীয়ারিং পড়তে এসেছিল। বাংলাভাষী এডিনবরায় কেউ ছিলনা তাই সেও চক্কোত্তি মশায়ের আড্ডায় ভীড়ে গিয়েছিল।

সে এতক্ষণে মুখ তুলে বলল, দাদা আসছে শনিবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের হলে একটা ককটেল পার্টি আছে এডিনবরায় নতুন বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে। আপনাদের সকলেরই আসা চাই।

লাঞ্চের পরে শঙ্কর গিয়ে ঢুকল বারবিকিউয়ের পাশের এক মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে। নাম 'ডোলাল ফেরিডাস লাইব্রেরী'।

এখানে বসে বিনাপয়সায় ডাক্তারি বই ও জার-

নাল পড়া যায়। মাটির নীচে বেসমেন্টে রিডিং-রুম। ম্যাকিনটশটা খুলে সেখানে বসল।

সামনে আরও দু চারজন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বসেছিল। উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলোয় চারদিক আলোকিত।

শঙ্করের লাইনের একেবারে শেষপ্রান্তে একজন বসেছিল। চেনা চেনা লাগল। তার মনে হল এ যেন তাদের মেডিক্যাল কলেজেই পড়ত। কয়েক বছরের সিনিয়ার ডাঃ হেমেন বড়ুয়া।

সাহস করে কাছে গিয়ে ডাকল। ঠিক তাই। হেমেন বড়ুয়ার বাড়ী গৌহাটি। সে অসমীয়া হলেও তরতর করে বাংলা বলতে পারে। বই বন্ধ করে সে বলল—বাইরে চলুন কথা হবে।

তার সঙ্গে শানাই পোদ্দার বলে একজন কলকাতার ছেলে বসেছিল। সেও ডাঃ বড়ুয়ার সঙ্গে উঠে এল।

তারা উঠে ফের বারবিকিউয়ে এল। তিনকাপ কফির অর্ডার দিল শঙ্কর।

—দাদা কি করতে এসেছেন? শানাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

এম, আর, সি, পি,। শঙ্কর চোক গিলে জবাব দিল।

আরে পালিয়ে যান। পালিয়ে যান। আমি আজ দুবছর ধরে এডিনবরায় বসে বসে পড়ছি। বার তিনেক এম, আর, সি, পি পরীক্ষা দিলাম। কোন লাভ নেই। এত পরিশ্রম, এত অধ্যবসায় সবই বিফলে গেল।

জাহাজ ভরে ভরে এত ডাক্তার আসছে দেশ থেকে। কি করবে এরা? আরে পরেশদাকে জানি কলকাতা থেকে এম, এস পাশ করে এলেন। ফাইনাল এফ, আর, সি, এস, করতে না পেরে হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে দেশে ফিরে গেলেন। আর কি অন্ধকার জায়গাটা। বছরের দশমাসত ঠাণ্ডা। ফগ আর স্নো। শীতকালে যখন সূর্য্য উঠবে, তখন মনে হবে আমাদের দেশের পূর্ণিমার চাঁদ, এর চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। দু'পা বাইরে বেরোন দেখবেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আর খাওয়ার মধ্যে খালি ফিস এণ্ড চীপস। যত সব অখাদ্য, সস্তার খাওয়া ল্যাণ্ডলেডিরা দেবে; এদেশে মানুষে থাকে।

শঙ্কর রীতিমত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল এইভাবে এক পরিবেশে থেকে তাকে পড়াশুনা করতে হবে বলে।

সে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য ধরা গলায় বলল—আপনারা আছেন কোথায়?

—মিসেস ফক্সের গেস্টে। যত সব চোখা জায়গা—শানাই বাবু বললেন।

—সে আবার কি?

আরে এই সামনেই লরিস্টোন পার্কে মিসেস ফক্সের বাড়ী। সব ইন ডায়ান, পাকিস্তানী টেনান্টসে ভর্ত্তি। ওসব ল্যাণ্ডলেডের বড়ি ধরে খাওয়া আমাদের আর পোষাচ্ছেনা। সেকেণ্ড খালি ঘরের ভাড়া হপ্তায় দু'পাউণ্ড দই। নিজেরাই রান্নাকরে খাবি। প্লেট ধুয়ে রাখি। যখন খুসি খাই। একদিন রাঁধলে এই ঠাণ্ডার দেশে তিনদিন চলে যায়। এতক্ষণে হেমেন বড়ুয়া কথা বললেন।

কি রান্না করেন?

কেন? এই ভাত আর টিনড্ ফুড থেকে, ভেজিটেবল কারি বা মিটকারি গরম করে নিই। এক ঘন্টার মধ্যেই সব হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে ব্রেডও দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসি। ডিম আর দুধ ত বাড়ীতেই দিয়ে যায়। ডাঃ বড়ুয়াই বলতে থাকেন।

শঙ্কর মনে মনে ভাবে তাহলে এত সস্তাতেও বিলেতে থাকা যায়। তার মনে পড়ল তার এক দূর সম্পর্কীয় কাকা গ্লাসগো থেকে ইনজিনীয়ারিং পাশ করে এসে বলেছিলেন—আমাদের দেশে যেসব দেশী সাহেবদের বড় বড় পোষ্ট অধিকার করে, ত্যাগ করে ইংরাজীতে কথা বলতে দেখ, তারাও বিলেতে থাকবার সময় ওইভাবে নিজেদের হাতে রান্না করতেন, প্লেট ধুতেন। বিলেতে পয়সা ফেলেও লোক পাওয়া যাবেনা। নিজের গাড়ী নিজেকেই ড্রাইভার করতে হয় সকলকে। সোফেয়ার পাওয়া যাবেনা বিলেতে।

রাতে বাড়ী ফিরে শঙ্কর আর ঘুমাতে পারল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে ছটফট করতে লাগল।

ডাঃ গ্রেভাল চলে গেছে। ঘরে সে একা। তার বড় নিঃসঙ্গ, অসহায় মন হতে লাগল। বাইরে আকাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কার্টেন

ছিলের চিরসঙ্গী পাইন, পপলার আর সিলভার-বার্চ গাছগুলো থেকে সরসর করে হাওয়ার শব্দ ভেসে আসছে। তার মনে হল রাত্রি যেন ডাকছে, তার নিজস্ব ভাষায়, বোবা-কান্নায়। চারিদিকে 'নক্তংসংহের বাণী শুনে শুনে, আর চারপাশের ছেলেদের চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি দেখে শঙ্করও কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

যে আশা উৎসাহ নিয়ে সে এডিনবরায় ছুটে এসেছিল সেটায় যেন কেমন ভাটা পড়ে গেছে। হাতের ভায়োলিন সঙ্গে তার অন্তরের যন্ত্রসঙ্গীত যেন এক হয়ে মিশে গেছে। শঙ্কর ভাবল বাড়ী ফিরে যাবে। বাড়ীর জন্য বড় মন কেমন করতে লাগল।

হুগলীজেলার ইটাচুনা গ্রাম পুকুরের পাশে একসার তালগাছ। বাঁশের ঝাড়। নারকোল গাছ হেলে পড়েছে। পুকুরের জল তার ছায়াটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। চরা পাখনার ওঁয়া ওঁয়া চীৎকার এক প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে। নতুন বলেজ বিল্ডিংটার মাথা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। কালো কালো একসার মুখ। ক্ষীণ তাদের স্বাস্থ্য। কিন্তু সেখানে কত সুখী ছিল শঙ্কর। তার গাল-ভরা হাসি ছিল। পায়ে পায়ে ম্যানার্স আর কালচারের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ঠোকর খেতে হতনা।

এমন সময় উপ্‌স ডেপ মি···বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে শঙ্কর চমকে উঠল। তার স্বপ্নের তাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মনে হল দরজার বাইরের করিডোরে যেন কেউ সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে করিডোরের আলোটা জ্বালে। ফিউজড্ বাল্‌ব জ্বলে না। আলো-আধারির অস্পষ্টতার মধ্যে সে দেখে কে একজন মেয়েছেলে সিঁড়ির মুখে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে শার্লি ম্যাকডোনাল্ড।

কি হল। কি ব্যাপার?

—পা পিছলে পড়ে গেছি সিঁড়ি থেকে। উঠতে পাচ্ছি না।

শঙ্কর তাকে তুলে ধরে কিন্তু শার্লি নেতিয়ে শঙ্করের কোলে পড়ে যায়। শঙ্করের সারা দেহে যেন হাজার ভোল্টের ইলেক্‌ট্রিকের শিহরণ বয়ে যায়।

···ইটাচুনা গ্রামের স্কুলের হেডপণ্ডিতের ছেলে শঙ্কর। সাত ভাইবোনের মধ্যে সংযম আর সামাজিক অনুশাসনের বাগ দেওয়া লাইনেরেতের দিয়ে চলতে হয়েছে। ভোরে উঠে সূর্য্য দেখে 'প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্' শ্লোক আওড়াতে হত। তারপর ভাই-বোন মিলে পড়তে বসা। দুপুরে স্কুল। সেখান থেকে ফিরে খেলার মাঠ। তারপর সন্ধিবরে বাড়ী ফিরে বই খুলে বসা, ঘরে সন্ধ্যার শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া কো-এডুকেসনের কোন সুযোগই হয়নি। সে সুযোগেরও কোন সুবিধে ছিলনা।

—আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে চল। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা মুচকে গেছে।

একমুহূর্ত্তে শঙ্কর পুরুষ হয়ে যায়। তার ডাক্তারি সত্ত্ব ফিরে আসে। সে শার্লিকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

পা-টা পরীক্ষা করে শঙ্কর বুঝতে পারে আঘাত মোটেই গুরুতর নয়। অ্যাঙ্কার ত হয়ইনি একটু মুচকে গেছে বড়জোর।

হঠাৎ শঙ্কর লক্ষ্য করে শার্লি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

শঙ্কর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতেই মুচকি হেসে শার্লি বলে ডাঃ মিট্রা তুমি বড় নাইভ (naive)। যাকে বলে স্কোয়ার। এজ এ ডকটর না হলেও এজ এ ম্যান।

তার মানে?

কাল সন্ধ্যে পাঁচটার সময় নর্থ ব্রিটিশ হোটেলের নীচে অপেক্ষা ক'র। আমি বুঝিয়ে দেব। বলেই তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে গুড নাইট বলে সে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই টক্‌টক্ শব্দ হতেই শঙ্কর দরজা খুলে দেয়।

হাসিমুখে হেম দত্ত ঘরে ঢোকে। সে শঙ্করের রুমের বিপরীত দিকে থাকে। তার বাড়ী হাক-লংয়ে। স্কোসাল সায়েন্স এম. এ পড়তে এসেছে।

কি ব্যাপার মিত্র। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় সে বলল। সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্ক ওয়াটার। যাকে ইংরাজীতে বলে ডার্ক হর্স। বলেই ধপ করে শঙ্করের খাটে বসে পড়ে।

কেন। কি হল?

কি আবার হবে? এতক্ষণ ধরে তোমার ঘরে মেমসাহেবের কণ্ঠস্বর শুনছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তাও দেখলাম।

শঙ্কর তখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে সব ঘটনাটা খুলে বলল।

সব শুনে হেম দত্ত বলে—মিত্র, তুমি এমন একটা সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে। আরে আমি এতদিন ধরে ওয়েট করছি কিন্তু এপর্য্যন্ত একটাও চান্স পেলাম না।

কেন, চান্স নেওয়ার কি আছে এতে?

তখন গম্ভীর হয়ে যায় হেম।

মিত্র, তুমি কিছুই বুঝলেনা। শালি যে পড়ে-গিয়েছিল সেটা একটা ছুতো। আসলে তোমাকে ওর ভাল লেগেছে। তোমাকে কাল যে নর্থ-ব্রিটিশ হোটেলের নীচে ওয়েট করতে বলেছে, তাকে বলে ডেটিং। এভাবে এদেশের মেয়েরা স্বামী পাকড়াও করে।

শঙ্কর, তুমি খুব ভালমানুষ, সেজন্যই বোধহয় শালির তোমাকে ভাল লেগেছে। আমি দেখেছি ও একটু আলাদা ধরনের মেয়ে। সকলের সঙ্গে যেচে আলাপ করে না।

শঙ্কর ভয় পেয়ে গিয়ে বলে, না না আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমাকে মা গীতা ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছেন পাশ করে সোজা দেশে ফিরে যাব। ডাইনে, বাঁয়ে আর কিছু দেখব না। মদ খাবনা। বীফ স্পর্শ করবনা।

তা হয়না শঙ্কর। এদেশে মেয়েরা কখনও যেচে নিজে থেকে ডেট্ করেনা। শালি এতদূর যখন করেছে তখন তোমাকে যেতেই হবে। তারপর যা হবে আমি আছি। আর গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে ঘুরলেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই।

সে রাত্তিরে আর শঙ্করের সাপার খাওয়া হলনা।　　[ক্রমশঃ

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের বিমান বন্দরে পঞ্জার সাহেব কোম্পানীর গাড়ীতে ক'রে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়ে গেল। সঙ্গে ছিল ইরানি ভুঁইয়া। তারপর বিমান বন্দরে এসে যোগ দিল শ্রীমান আগরওয়ালা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি যখন বিমানে উঠতে যাব গভীর করমর্দন করল পঞ্জার সাহেব। আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানালো শ্রীমান আগরওয়ালা ও ভুঁইয়া। তাদের আমি স্নেহ-নিধন দিলাম। অপেক্ষমাণ বিমান যাত্রীরা অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল, এরা করে কি? কোথাকারই বা লোক এরা?

ফিং ফিং ক'রে বাঁশী পড়ছে—ইলেকট্রিসিটির এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। হেঁটে গিয়ে পোর্টকোলিও ব্যাগটী হাতে নিয়ে চড়লাম National Air Line-এর বিমানে। সেদিন বিমানটী নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে ছেড়েছিল। ফলে কোনোটী বিমান বন্দরে পৌঁছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ বিমান বন্দরে অবতরণ করতে দিল না। তাই বিমানটীকে বৃহত্তর নিউইয়র্ক মহানগরীর উপর কয়েকবার পাক খাওয়াতে লাগলো যতক্ষণ না নামার নির্দেশ আসে। লাভ হ'ল এই যে বৃহত্তর মহানগরীর শোভা ও বিস্তার চোখ দুটি দিয়ে দেখার সুবর্ণ সুযোগ মিলে গেল। বিমানে আসার সময় আমার পাশ-আসীনা যে মেয়েটীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সে হ'ল 'সুষ্টী'। সে তার বাপ-মাকে ছেড়ে চলেছে ওয়াশিংটনে কাজ করতে। ভারতবর্ষ থেকে ওর কলম-বন্ধু তাকে চিঠি দিয়েছে।

আমার ভারতীয় জেনে চিঠিখানা খুলে পড়াতে লাগলো। তার চিঠির প্রতি নিবিকার অনীহা তার কাছে প্রকাশ করলাম না, নীরবে প'ড়ে গেলাম। পাঠ শেষে প্রশ্ন করলাম 'কবে যাচ্ছ আমাদের দেশে?' সে বলে 'যাবার তো ইচ্ছে খুব। তবে রোজগার ক'রে কিছু টাকা জমিয়ে একদিন নিশ্চয়ই যাব।'

আমি তাকে আমার ছাপানো ভিজিটিং কার্ড একটী দিলাম। আর বললাম 'এই সব পত্রালাপ আন্তর্জাতিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে প্রচুর সাহায্য করে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বাড়িয়ে তোলে। 'আমি তোমার আমাদের মধ্যে কোনদিন পেলে অত্যন্ত খুশী হব।'

নিউইয়র্কের মাটী স্পর্শ করার পর আমরা যে যার মালপত্র নিয়ে বিমান থেকে বেরিয়ে বিমান বন্দরে এলাম। পঞ্জার টেলিফোনে ব'লে দিয়েছিল 'মেটকাফ এণ্ড এডীর' প্রতিনিধি রস্ হোল্ট (Ross Holt) এসে আমার সঙ্গে বিমান বন্দরে দেখা করবেন। হোল্ট সাহেব গাড়ী নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মালের কাউন্টার থেকে ভারী ব্যাগটা নিতে বেজায় দেরী হ'য়ে গেল। যাই হ'ক হোল্ট বড় ব্যাগটী ও আমি ছোটটী নিয়ে গাড়ীতে চড়লাম। প্রথম বললাম—

—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে আপনাকে!

—কী করবেন আপনি, বিমান যদি আসতে দেরী করে।

—থাকার কিছু বন্দোবস্ত হয়েছে? আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?

—আমাদের গুজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য টিউডর (TUDOR) হোটেলে একখানা পাকাপাকি ঘর ভাড়া করা আছে। তারা শুক্রবার বৈকালে যে যার বাড়ী চলে যায় আর আসে সোমবার সকালে। ওরা শুক্রবার

কাজের পর যে যার বাড়ী চলে গেছে। শুক্রবার রাত থেকে ঐ ঘরটা খালি থাকবে শনি ও রবিবার। আপনি তো রবিবার সকালে চলে যাচ্ছেন। আমাদের ঘর এখন ফাঁকা যাচ্ছে। আপনার যদি পছন্দ হয় তো শুক্রবার থেকেই সেখানে থাকতে পারেন। তবে এটি সহরের কেন্দ্রে। অতএব যাতায়াতের বহু সুবিধে রয়েছে।

আমার থাকা তো মাত্র রাতের বেলায়। তখন এত বাছাবাছিতে লাভ কি? অন্যরা যখন থাকতে পারে তখন আমিইবা কেন পারবো না। সেইখানেই যাওয়া যাক। না দেখেই আমার পছন্দ বলে দিলাম।

তবে মনে মনে যে একটা হিসেব করিনি এ কথা ঠিক নয়। ভেবে দেখলাম অযথা কেন ঘরভাড়া দিয়ে অর্থব্যয় করা? ওদের তো এ ঘরভাড়া দিতেই হচ্ছে। আমি গ্রহণ করে এদের লাভ করছি ও লাভ হচ্ছিও। ওদেরও খরচ নেই আমারও খরচ নেই। শুধু একটু বন্দোবস্ত করা মাত্র।

এই রকম কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গাড়ী করে আমরা সহরের দিকে এগিয়ে চলেছি তো চলেছি। সহরতলী ছাড়িয়ে এবভারদায় দেখলাম এক বিরাট সাইনবোর্ড

If You Have Not Visited Macey
You Have Not Visited New York।

এখানে দেখলাম পথে, বিশেষ করে ভিড় যেখানে, সেখানে মেয়ে পুরুষ বেশ মার্জিত রুচিতে সুসজ্জিত। কথায় কথায় হোস্ট বললেন এখানের অনেক রেস্তোঁরায় শুধু সার্ট পরলে বা গলায় টাই না লাগানো ভদ্রলোকদের পরিবেশন করেনা। তাদ্ব মার্কিনী কায়দায় সজ্জিত হতে হবে। তবে একথা বলা যেতে পারে যে দিনের নিউ-ইয়র্ক বেশভূষা সম্বন্ধে সুসচেতন কিন্তু রাতের বেলা এত নিয়মতান্ত্রিকতার বালাই নেই। খুশী মত জামাজুতো পরতে পারো ও চলে যেতে পার রাতের অভিসারে।

—জানলাম তোমার কাছ থেকে এ সহরের আচার ব্যবহার। অতএব আমি সবসময়েই আমার সার্ট, টাই ও কোটে সুসজ্জিত হয়ে থাকবো। অতএব কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু আমার বিভিও তো কলকাতার। কলকাতার Bengal Clubএর হোটেলেরও ঐ একই নিয়ম। ডাইনিং হলে কোট পরে যেতে হবে। ক্লেজার স্বাস্থ্য দপ্তর রাজগোপালন সাহেব এসেছেন কলকাতায়। ডিনলেজ সাহেব তাকে 'বেঙ্গল ক্লাবে' নিমন্ত্রণ করেছেন দুপুরের লাঞ্চে। তিনি তো এসেছেন বুশসার্ট পরে দিল্লী-থেকে। কী করা যায়! ঐ বুশসার্টের ওপর ডিনলেজ সাহেবের জোব্বাকোটা কোট চড়িয়ে এলেন রাজাগোপালন খাবার হল ঘরে। আমার মনে পড়ে গেল বিংশশতকের প্রথমে এক মহা উপন্যাসের (শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী) উপনায়ক শেষাদ্রিআয়ার চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল।

এই রকম কথার মাঝে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থানে,—460 West 42nd Street অর্থাৎ Tudor Hotel-এ। দুজনেই আমরা গেলাম আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। তিনি সব আমায় দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতর বড় বেজায় গরম। ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটী চালিয়ে দিলাম ঘরটী কিছিৎ শীতল করার জন্য। জানালা খোলার যো নেই। সবের বাহুল্যের কলের জলও কমানো।

'বস্' বিদায় নিয়ে গেলেন। তবে কথা রইল যে শনিবার অর্থাৎ কাল সকাল ৯টায় আসবেন ও আমায় একটা Sewage Treatment Plant দেখাতে নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ সকাল ন'টা থেকে দশটা লাগবে যেতে, Sewage Treatment Plantএ ১ ঘণ্টা ও ফিরতেও ১ ঘণ্টা যার অর্থ হচ্ছে তিন ঘণ্টা সময়। সরকারী কাজে বেলা বারোটা পর্যন্ত, তারপর কেনাকাটির ব্যাপারে এক ঘণ্টা বা হতে অধিক।

রাতের বেলা ঘরে বসে টেলিফোন করলাম বাগচী সাহেবকে। শ্রীমতী কবি দেবী ধরেছিলেন টেলিফোন। টেলিফোন কর্তাকে দিতে উনি গলার স্বরে চিনে ফেললেন ও তাঁকে বললাম সময় আমার আগামীকাল মাত্র একদিন। রবিবার সকালে ৮।০টায় বিমান বন্দরে যেতে হবে। অতএব সময় অল্প। তার মানে আমরা শনিবার সকাল ৯টার সময় বেরুচ্ছি ও তারপর দুরে 'ছেটকাক এণ্ড এভী'র পরিকল্পনার মহান পরিশোধনাগার দেখে আমরা কিছু কেনাকাটা করব। আপনি আসুন কাল সকাল ৯টার সময় Tudor Hotelএ। আমরা সকলে বেরুবো। সারা শনিবার ব্যস্ত থাকতে হবে।

বাগচী সাহেব রাজী হয়ে গেলেন ও কাল সকাল ৯টায়

আসবেন, বললেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিখিলানন্দকে টেলিফোন করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যা শুনলাম উনি একটু বেশী ব্যস্ত হয়েছেন তাই আর সংযোগের চেষ্টা করলাম না। প্রায় বিশবছর আগে যখন নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম তখন তাঁর 'The Gospel of Ramkrishna' বইটী বেরিয়েছিল। সানফ্রান্সিসকোতে যে লোক অসুস্থ থাকায় তাঁর জন্য দেখা করতে পারেন না তিনিই কিনা তার পরদিন সকালে দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারেন! অতএব ওঁদের বহু স্বামীজির সঙ্গে অন্তরের প্রীতি থাকলেও প্রীতি ভিক্ষে করে হলনা। দু'তরফে মিলিয়েই তা সম্ভব হবে। আমি গিয়েছিলাম যেন স্বামী লুইসের সঙ্গে দেখা করব বলে সানফ্রান্সিসকোতে ওঁদের প্রার্থনা সভায়।

রাত্রে এত গরম যে ঘরের Air cooler চালিয়েও বিশেষ ঠাণ্ডা হ'ল না ঘর। কি আর করি। সামান্যমাত্র পরিচ্ছদে নিজেকে আবৃত করে শুয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা জলে একবার স্নান করে নিলাম।

সকাল হ'ল। তৈরী হয়ে নিয়েই কাছে এক অটোম্যাটে আসকে পিটে (প্যান কেক) ও মেপেল রস ও অন্যান্য খাবার কিছু খেয়ে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। মায়া সভ্যতার উপর লেখাটাও কিছু এগিয়ে নিলাম। বাগচী সাহেব ৯টার কয়েক মিনিট আগে এসে হাজির। আমি Rossকে বলে দিয়েছিলাম আসবে যখন তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবে। শনিবার, আজতো সবাইকে ছুটী আমরা ঘুরে আসব সবাই। ৯টা যখন বেজেছে টেলিফোন এল সে নীচে এসে গেছে। আমরাও নীচে গেলাম। আজ আর কোট নিলাম না, বেজায় গরম।

বাগচী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। Ross তার দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছে। মেয়ে দুটীকে নিয়ে আসেনি। আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। Mamaroneck Sewage Treatment Plant নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে 'ওয়েষ্ট চেষ্টার কাউন্টি'তে (West Chester County)। এখানে পূর্ণ পরিশোধন করা হয়না। Sludge দূরে অন্য একটি মহলাবলে নিয়ে গিয়ে পরিশোধন করে। এটী একটী Parkএর খুব কাছে; অধিবাসীদের বেজায় আপত্তি প্রথমে ছিল, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখিও বেখেছে এই মহলা কলটী। এখানে Exhaust বেরুবার সময় তাতে Ozone দেওয়া হয় দুর্গন্ধ নাশ করার জন্য। বিশেষ কোন গন্ধ ভেতরেও নেই বাইরের তো কথাই নেই।

সেখান থেকে ফিরে শহরের এক হোটেলে উঠে সবাই মিলে Ice Cream ও Pie খেলাম। তারপর Macyতে কিছু জিনিষ কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হলনা। মাত্র কয়েকটা টাই কিনেছিলাম। আর চারটে চকলেটের বাক্স Ross-এর ছেলেমেয়েদের জন্য কিনলাম। ছেলে দুটীর হাতে দিয়ে দিলাম তাদের বোনেদের দেবার জন্য। সেখান থেকে আমরা ঠিক করলাম Empire State Buildingএ ওঠা যাক্। ২৫ সেণ্ট করে ভাড়া দিয়ে লিফ্টে করে উঠতে হয়।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং

যে যেখান থেকে যে যানবাহনে আসুন না কেন সিকিমাইলের বেশী উঁচু এই পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকার চৌম্বক আকর্ষণ যে আছে এ কথা অনস্বীকার্য। এটীর আঙ্গিক ও পরিকল্পনায় একটি রুচির ও সৌন্দর্যের পরিচয় আছে। ইণ্ডিয়ানার শ্বেত মর্মরের বহিরাবরণ ষ্টেনলেশ্ ইস্পাত ও কাঁচের সমন্বয়ে এক অপরূপ আকৃতি ধারণ করেছে। ১৪৭২ ফুট উঁচু এই বিরাট হর্ম্য। এখানের লবীতে মারবেলের আবরণ ইতালী, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স থেকে আমদানী করা হয়েছিল।

বাগচী সাহেব আমাদের সবাইএর মাথাপিছু ২৫সেণ্ট দিয়ে টিকিট করেছিলেন। আমরা আধ মিনিটে ৮৬তলায় উঠে গেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ১০৫০ফুট উঁচুতে পর্যবেক্ষণ চাতালে এলাম। চারিদিকের দিগন্ত রেখায় ৪০।৫০ মাইল দূরের দৃশ্য, নির্মল ও উজ্জ্বল দিনে ৮০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। রাত্রে উজ্জ্বল আলোয় এর রূপ আরও মোহনীয় হয়ে ওঠে যেন এক স্বপ্নপুরীর মত প্রতীয়মান হয়। কাঁচ দিয়ে ঘেরা পর্যবেক্ষণ চাতাল থেকে নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া, কানেটিকাট ও ম্যাসাচুসেট রাষ্ট্রের ভূমি দেখা যায়। দর্শকরা যদি আরও উঁচুতে উঠতে চান তাঁরা ৮৬ তলা থেকে ১২০ তলা পর্যন্ত লাইন দিয়ে লিফ্ট করে উঠে যান। তখন আপনি ১২৫০ ফুট উঁচুতে পৃথিবীর মানুষের গড়া উচ্চতম

স্থানে আরোহণ করেছেন। এটী ভিতর থেকে আলোকিত করা হয় সাড়ে ১২কোটী প্রদীপের সমষ্টীর সিখায়। আলোর প্রাবল্য আনতে ১০০০ ওয়াটের আয়োডিন কোয়ার্টজ বাতি ব্যবহার করা হয়। এই সর্ব্বোচ্চ চাতালেই শেষ নয়। এর উপরও ২২২ ফুট উঁচু ৬০টন ভারী টেলিভিশনের সম্প্রচারক যন্ত্র উদ্যত আছে ৮০লক্ষ দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে টেলিভিশনের তরঙ্গ ছড়াতে। Engineering News Record এ পাঁচ বিশ বছর আগে যখন এই টেলিভিশন স্তম্ভ তোলা হয় তখন কর্মীদের অভিজ্ঞতার কাহিনীতে লেখা আছে যে ভীষণ জোরে বাতাস বয় ও চিল পর্য্যন্ত অতি বেগে উড়ে যায়। প্রায় তিন কোটী লোক দেখতে এসেছেন এখানে। সেই সঙ্গে এসেছিলেন ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ II ও তাঁর স্বামী ফিলিপস, থাইল্যাণ্ডের রাজরাণী, গ্রীসের রাণী Frederika, সুইডেনের রাজকুমারী, পণ্ডিত নেহেরু ও আপনাদের বহু জন ও বিনীত আমি। এটী বর্ত্তমান পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। বিশলক্ষ বর্গফুট ভাড়া দেওয়ার স্থান এখানে; তিনকোটী সত্তর লক্ষ ঘনফুট আয়তনে। নির্ম্মাণে ষাটহাজার টন ইস্পাত, ৬০ মাইল জলের পাইপ, ৩৫০০ মাইল টেলিফোনের তার, ৭ মাইল লিফটের চোঙ্গা (Shaft), ৬৫০০টী জানালা। এই বিরাট হর্ম্ম্যটীর মোট ওজন হ'ল ৩,৬৫,০০০ টন যার নির্ম্মাণে লেগেছিল ১৬,০০০ লোক। সিঁড়ি দিয়ে ১০২ তলা উঠতে ১৮৬০টী ধাপ আছে। মাসে এ বাড়ীতে ২০ লক্ষ Kilowalt বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়। ২০০ মেথ ও নিগ্রো দাসী এটীকে পরিষ্কার রাখতে রাখা হয়েছে। দিনে গড়ে ৩৫,০০০ লোক দর্শনার্থী হয়ে আসে এই ধর্ম্মাতলে।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং থেকে Panam-এর বাড়ীর ছাদে আরশোলার মত ধীরে ধীরে এক Air Taxi নামতে দেখলাম অর্থাৎ একটা Helicopterকে। লোক নেমে গেল ছাদে! কিছুক্ষণ বাদে আবার উড়ে গেল হেলি-কপটার বাজী নিয়ে।

বেলা প্রায় আড়াইটে (২॥) বাজলো যখন Rossকে বললাম 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি বাড়ী যাও। বাগচী সাহেব ও আমি একটু দেখে ওঁদের বাড়ী যাব। কেমন?'

এখন আমি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বাগচী সাহেবের উপর। তিনি আমায় নিয়ে চললেন। Paul Guggenheim সংগ্রহশালায়। এই বাড়ীর পরিকল্পনা Frank hloyd Wright-এর এর। নবীনত্ব কিছু নেই। সিঁড়ির বদলে Roup দিয়ে উঠতে ওপরে। রোমের Vatican Cityতে আমি দেখেছি এমন Ramp যে একটা দিয়ে উঠেছে আর একটী দিয়ে নামছে। এখান থেকে নিউইয়র্কের Metropoliotan Museum of Art দেখতে গেলাম। একতলা দেখতেই পাঁচটা বেজে গেল। বেরিয়ে আসতে হ'ল অপূর্ণ বাসনা নিয়ে। এখন কি করা যায়? আবার একটা দোকানে যাওয়া হ'ল, একটা সার্টও কেনা হ'ল। তারপর ঠিক হ'ল যাওয়া যাক Southern Feryর দিকে। এবার Undelground ট্রেনে চললাম Southern Ferryতে: সেখান থেকে জাহাজে ক'রে Statue of Liberty দেখে যাওয়া আমার ইচ্ছে। Statue of Libertyতে যাবার বেলা ৬টায় বন্ধ হ'য়ে গেছে। দূর থেকেই দেখা গেল। এখানে Soconyর এক বিরাট বাড়ী।

তখন সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে ৬টা। Southern Ferry থেকে ফিরতি ট্রেনে চড়ে টাইমস্ স্কোয়ারে (Times Square) এলাম। এখানে বিভিন্ন স্তরে স্তরে সুড়ঙ্গ ট্রেন চলে। টাইমস্ স্কোয়ারে বদল ক'রে আর একটী ট্রেন ধ'রে চললাম Flushing এর দিকে। এখানে এক সময় বেজায় ভিড় থাকতো যখন Newyork এ world fair হ'য়েছিল। এবার হবে Montreal এ।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং থেকে যে সব বহুতল বাড়ী দেখা যায় তাদের মধ্যে প্রধানগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল।

নিউইয়র্কের বহুতল বাড়ীর তালিকা

সংখ্যা	উচ্চতম বাড়ীর নাম	ঠিকানা	উচ্চতা (ফুট)	কততলা
১।	এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং	পঞ্চম এভিনিউ ও ৩৪ নং ষ্ট্রীট,	১২৪০	১০২
২।	ক্রাইসলার	লেক্সিংটন্ এভিনিউ ও ৪২নং ষ্ট্রীট	১০৪৬	৭৭
৩।	বাট .হওয়াল টাওয়ার	৭০ নং পাইন ষ্ট্রীট	৯৬৫	৬৭
৪।	৪০ ওয়াল ষ্ট্রীট	৪০ নং ওয়াল্ ষ্ট্রীট	৯২৭	৭১
৫।	আর, সি, এ	৩০নং রকফেলার প্লেস্	৮ ০	৭০
৬।	চেস, ম্যানহাটান	১নং চেস ম্যান্হাটন্ প্লেস্,	৮১৩	৬০
৭।	প্যান এমেরিকান	২০০নং পার্ক এভিনিউ	৮০৮	৬০
৮।	উলওয়ার্থ	২৩৩ বে	৭৯২	৬০
৯।	সিটি ব্যাঙ্ক ফার্মার ট্রাষ্ট	২০নং এক্সচেঞ্জ প্লেস	৭৪১	৫৭
১০।	ইউনিয়ন কারবাইড	২৭০ নং পার্ক এভিনিউ	৭০৭	৫২
১১।	মেট্রোপলিটন লাইফ	১নং ম্যাডিসন্ এভিনিউ	৭০০	৫০
১২।	৪০০ ফিফথ এভিন্যু	পঞ্চম এভিনিউ ও ৪২নং ষ্ট্রীট	৭০০	৬০
১৩।	চেজ ব্যাঙ্ক Ny ট্রাষ্ট	২০৭নং পার্ক এভিনিউ	৬৮৫	৫০
১৪।	চেনিল	১২২নং ই ৪২ ষ্ট্রীট	৬৮০	৫৬
১৫।	লিংকন	৬০নং ই ৪২ ষ্ট্রীট	৬৭০	৫৩
১৬।	আরভিং ট্রাষ্ট	১নং ওয়াল ষ্ট্রীট	৬৫০	৫০
১৭।	জেনারেল ইলেকট্রিক	৫৭০নং লেকসিংটন এভিনিউ	৬৪১	৫০
১৮।	ওয়ালডর্ফ-এষ্টোরিয়া	পার্ক এভিনিউ ও ৫০তম ষ্ট্রীট	৬২৫	৪৭
১৯।	১০ই ৪০তম ষ্ট্রীট	১০ই ৪০তম ষ্ট্রীট	৬২০	৪৮
২০।	নিউইয়র্ক লাইফ	৪১ ম্যাডিসন্ এভিনিউ	৬১৫	৪০
২১।	সিগ্রাম	১৪৯ বে	৬১২	৪৭
২২।	১৩০১ এভিন্যু অব আমেরিকা	১৩০১ এভিন্যু অব আমেরিকা	৬০৯	৪৫
২৩।	নেলসন টাওয়ার	৪৫০নং সপ্তম এভিনিউ	৬০০	৪৭

স্থপতির ধারণা :

বিমান থেকে নামবার সময় ওপর থেকে বহুতল অট্টালিকা সমন্বিত নিউইয়র্ক দেখলে মনে হয় যেন কাঠের বাক্সে নানা রকমের সিগি বোতল ঠাসা একটী অকল। যদিও দুই বাড়ীর মধ্যে বেশ চওড়া চওড়া রাস্তা আছে কিন্তু দীর্ঘাঙ্গী বাড়ীর তুলনায় এরা প্রায় নগণ্য। এখানে রাস্তা চলে গেছে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে। উত্তর দক্ষিণের রাস্তাগুলো হ'ল avenue এবং পূর্ব পশ্চিমের রাস্তা হ'ল ষ্ট্রীট। যেমন হাওড়াতে রোড আছে, লেন আছে বাইলেন আছে কিন্তু 'ষ্ট্রীট' নেই। উত্তর দক্ষিণে লম্বা Fifth avenue-এর পূর্বদিকের রাস্তার উপর বাড়ীর ঠিকানা অমুক ষ্ট্রীট ইষ্ট ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত হ'লে অমুক ষ্ট্রীট ওয়েষ্ট আখ্যা দেওয়া হয়।

ম্যানহাটান দ্বীপে এর বিরাট পার্কটী অত ঘন বসতির মধ্যে একটু দম নেওয়ার জায়গা। তবে সাধারণ নিউইয়র্কবাসীরা এটীকে গতির, ভিড়ের, ব্যবসা-বাণিজ্যের ও অপঘাত মৃত্যুর সহর ব'লে মেনে নিয়েছে। এই ঘন-বসতিপূর্ণ ইট কাঠ, কাচ ও কংক্রীটের জংগলে মানুষ জন্ম নেয়, বেঁচে থেকে, কাজ করে, ঘুমোয়, খায়, খেলে ও চিরবিদায় নেয়।

ইতিহাস :

তিনশতকে এই নগণ্য সমুদ্রকূলবর্তী গ্রাম আজ এক বৃহত্তম সহরে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে তিন-মাত্রায় এর ধারণাতীত প্রবৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ করে সূচিত হয়। তাই এক অর্থে নিউইয়র্ক হল আমেরিকার বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতিমূর্ত্তি। নিউইয়র্ক রাষ্ট্রকে বলা হয় Empire State ডাচেদের নিউ আমস্টারডাম্ (New Amsterdam) চল্লিশ বছর বাদে হল ইংরেজের নিউ ইয়র্ক। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের 'ফার'(Fir)বিক্রীর কেন্দ্র স্থাপনকরেএইম্যানহাটান দ্বীপে। ডাচ সরকার এই কোম্পানীকে দেদারদার ও হাডসন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল উন্নয়নের ক্ষমতা দেন। এই অঞ্চলকে নিউ নেদারল্যাণ্ড বলা হয়। ম্যানহাটান দ্বীপের ডগায় দুর্গ গড়ে উঠল। বসলো ডাচেদের বৈশিষ্ট্য উইণ্ডমিল। গৃহ নির্মিত হ'ল এবং প্রায় দুশো লোক এখানে বাস করতে লাগলো। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে পীটার মিনুইট (Peter Minuit) স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে কথাবার্তা ক'য়ে ষাট গ্রীল্ডারে (অর্থাৎ ২৪ ডলারে) 'মানহাত্তা'স্ দ্বীপ ক্রয় করলেন। খুব তাড়াতাড়ি গড়ে উঠল এক গির্জা, ৩০০ বাড়ী ও বিরাট এক সরাই-খানা। শেষটী নাকি উত্তরকালে নিউ আমস্টারডাম্ পৌরসভার অফিসে রূপান্তরিত হয়।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ পাঠালো চারটি যুদ্ধ জাহাজ ও ডাচেদের আত্মসমর্পণ করতে বললো, কেননা এই দ্বীপ নাকি ইংরেজ আগেই আবিষ্কার করেছিল। প্রায় সপ্তাহ খানেক প্রতিরক্ষা চালিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে আত্মসমর্পণ করেন ডাচেরা। রাজা চার্লসের ভাই জেমসের সম্মানার্থে ডিউক অব ইয়র্কের নামানুসারে ম্যান-হাটান দ্বীপের ডগায় আমস্টারডাম দুর্গের নাম বদল হল জেমস্ দুর্গে। পরের ১৬ মাসের জন্য এর নাম হল (১৬৭০-১৬৭৪) উইলেম্ হেণ্ড্রিক দুর্গ। তখন নিউইয়র্কের নাম বদলে হয় 'নিউ অরেঞ্জ' পরে সন্ধির সর্ত অনুসারে এই স্থানটী ইংরেজকে ফেরৎ দেওয়া হয় তখন এই স্থানের নাম হল 'নিউইয়র্ক'। যদিও ডাচ্ শাসন চলেগেল তবু ও ডাচ প্রভাব দূর হল না। আজও তার কিছুটা বর্তমান। আজও 'ফাদার নিকার বোকার'—বলতে নিউইয়র্কেই বোঝায়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ২৩,০০০ লোক বসবাস করতো। এটী সাত বছর যুদ্ধ হতে আমেরিকান বিদ্রোহের সময় বৃটিশের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৭৮৩ থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত এটী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী রূপে ১৭৮৯ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। এইখানেই জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৮৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন। তিনি এখানে ১৭৯০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ছিলেন যখন আবার রাজধানী ফিলাডেলফিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং অবশেষে ওয়াশিংটনে চলে আসে তার কাহিনী আগেই ওয়াশিংটন-পর্বে বলা হয়েছে।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের সমসময়কালে নিউইয়র্কের অসাধারণ উন্নয়ন পর্বের সূত্রপাত হয়। ১৮৫০ সালে নগর অঞ্চল 42nd ষ্ট্রীট পর্যন্ত এগিয়ে যায় ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃহত্তর নিউইয়র্ক স্থাপনের পর ব্রুকলীন, কুইনস্ ও স্টাটেন দ্বীপ

(বর্তমানে রিচমণ্ড), ম্যানহাটান ও ব্রাংকেসর সঙ্গে যুক্ত হয় ও জনসংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষে দাঁড়ায়। নিউইয়র্কের উন্নয়নের মূল কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাটা 'ইরি খাল' ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহানগরীর বিস্তৃতি বৃদ্ধি। নিউইয়র্কের অধিকাংশ লোক ভাড়া বাড়ীতে থাকে ও ইচ্ছামত এখান থেকে সেখানে উঠে যায়। এই মহানগরী বিভিন্ন জাতির সমাবেশে গড়ে উঠেছে।

বিস্তৃতি :

নিউইয়র্ক মহানগরী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল নগরী। গত একশো বছর ধরে এটী আর্থিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এটী যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য বন্দর ও সবচেয়ে ব্যস্ত বিমান বন্দরের অধিকারী। এখানে যেমন উত্তুঙ্গ প্রাসাদ শ্রেণী ধনিক ও কৃতিমানদের উদ্ধত কর্মকুশলতার বিকাশ স্থল তেমনি এখানের বস্তি অঞ্চলের দারিদ্র্য-দুঃখও এখানে বিশেষ সইতে হয়। পৃথিবীর উচ্চতম প্রাসাদ আরও উচ্চতর হয়েছে কিন্তু দারিদ্রের মান কি সে পরিমাণে উন্নত হয়েছে? দ্বীপকেন্দ্রিক মহানগরীর বিস্তৃতি ৩১২৮ বর্গ মাইল সর্বাধিক দৈর্ঘ্যে ৩৬ মাইল ও প্রস্থে ১৬½ মাইল। মহানগরী পাঁচটী বরোতে (Burrough) বিভক্ত যেমন ব্রংক্স, ব্রুকলীন্, ম্যানহাটান, কুইনস্ ও রিচমণ্ড।

	বিস্তৃতি (বর্গমাইল)	দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্থ (মাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৬০)
The Bronx	৪৩'১	৮'৩	৮	১৪,২৯,৮১৫
Brooklyna	৭৮'৫	১১'৬	১০'২	২৬,২১,৩৯৯
Manhatton	২৫'৬	১৩'৪	২'৩	১৬,৯৮,২৮১
Queens	১১৪'৭	১৬'৮	১৩'৪	১৮,০৯,৫৭৮
Richmond	৫০'৯	১৩'৯	৭'৩	২২১,৯১১

মেট্রোপলিটান নিউইয়র্কের বিস্তৃতি ১৯২১'৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটী। মূল নিউইয়র্ক মহানগরী ছাড়াও পরিকল্পিত অঞ্চল এর মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

ম্যানহাটানের অনেক জায়গা ভরাট করে তোলা হয়েছে—কোথাও বা ময়লার গাদ দিয়ে কোথাও বা লণ্ডনের বোমাবিধ্বস্ত বাড়ীর রাবিশ দিয়ে। যুদ্ধের সময় সমরোপকরণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গেছে কিন্তু ফেরার সময় জাহাজে কিছু ভার দিতে পণ্যের বদলে বাড়ীভাঙ্গা রাবিশ নিয়ে এসে নিউইয়র্কের ম্যানহাটান দ্বীপের ভরাট করে দিয়েছে।

লোকসংখ্যা :

মহানগরী যখন বৃহৎ আকার ধারণ করে তখন তার লোক সংখ্যা সমানানুপাতিক ভাবে বাড়ে না। বৃহত্তের বৃদ্ধির নানা অসুবিধে ঘটায়। ফলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় অতি মন্থর গতিতে অথবা অবক্ষয়ে। নিউইয়র্কের দশাও আজ তাই নীচের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই ক্রমশঃ হার নেমে গেছে।

খ্রীষ্টাব্দ—	লোকসংখ্যা	পূর্বের বছরের উপর বৃদ্ধির হার
১৯০০	৩,৪৩৭,২০২	
১৯১০	৪,৭৬৬,৮৮৩	৩৮'৭%
১৯২০	৫,৬২০,০৪৮	১৭'৯ „
১৯৩০	৬,৯৩০,৪৪৬	২৩'৩ „
১৯৪০	৭,৪৫৪,৯৯৫	৭ '৬ „
১৯৫০	৭,৮৯১,৯৫৭	৫ '৯ „
১৯৬০	৭,৭৮১,৯৮৪	—১'৪ „

এখানে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার চাপ পড়ে ২৪,৩৩৬ জন ও ম্যানহাটান অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫,০৭২ জন। এখানে নানা ইউরোপীয় দেশ থেকে লোক এসেছে, তারা মোট লোকসংখ্যার পাঁচ (৫) ভাগের এক ভাগ। এখানের নিগ্রোদের সংখ্যা ১,০৮৭,৯৩১ যারা গত দশ বছরে শতকরা ৪৬ ভাগ বেড়েছে।

পৌরশাসন :

এখানে পৌরশাসন 'মেয়র-কাউন্সিল' পদ্ধতিতে চলে। মেয়র হলেন মহানগরীর Chief executive officer। তিনিই পৌরবিভাগের প্রধানদের নিয়োগ করেন, নিয়োগ করেন বিভিন্ন কমিশন; ফৌজদারী আদালতের ও পরিবার আদালতের (Family court) জজেদের। মেয়রের City Conneil থেকে পাশ করা আইনে ভেটো দিয়ে দিতে পারেন। কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর আয়ু চার বছর। বিভাগীয় প্রধানরা মাইনে পান বছরে ৪০,০০০ ডলার।

মেয়র মাইনে পান বছরে ৫০,০০০ ডলার। বরোর সভাপতিরা পান বছরে ৩৫,০০০ ডলার।

এখানের ১৯৬২-৬৩ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে ব্যয় ধরা হয়েছিল ২,৭৮৪,৭৩১,২২২

ডলার অর্থাৎ ছ হাজার কোটী টাকারও বেশী। তার মধ্যে শতকরা একুশ ভাগ (২১%) শিক্ষা ও গ্রন্থাগারে, দেনা শোধে সাতেরো (শতকরা ১৭) ভাগ, সামাজিক সেবা-ক্রমে পনেরো (শতকরা ১৫) ভাগ, জনগণের নিরাপত্তার বারো (শতকরা ১২) ভাগ, পেন্‌সন্ ইত্যাদিতে দশ শতকরা ১০) ভাগ ; হাসপাতালের জন্য ছয় (শতকরা ৬) ভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্য ছয় (শতকরা ছয়) ভাগ, পরিচালনা খাতে চার (শতকরা ৪) ভাগ, ও বিবিধখাতে নয় (শতকরা ৯) ভাগ।

এর মুখ্য আয় হ'ল নাগরিক সম্পত্তির উপর কর যাতে শতকরা ৪১ ভাগ ওঠে, প্রাদেশিক সরকারী সাহায্যে শতকরা ১৮ ওঠে, বিক্রয়কর শতকরা ১২, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য শতকরা ৯ ও অন্যান্য বিশেষ সৌরকরে শতকরা ১৩।

নিউইয়র্কের পরিবহন ব্যবস্থা :

এটী সমুদ্রের ধারে ব'লে নৌবন্দর তো বটেই তবে Newyork State Barge Canal System দিয়ে St Lawrence 'সী-ওয়ের'সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে ৯টী রেলওয়ে, ১৭০টী নৌ কোম্পানী, ৪১টী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানী ও ৫০০টী লরী মালবহন কোম্পানী আছে। এরা কত যাত্রী ও মালবহন করে তার পরি-সংখ্যান থেকে বোঝা যাবে কত বিরাট এর পরিবহন পরিচালনা পর্ব। ১৯৬০ সালে ১৭ কোটী যাত্রী, ৬৮'৪৭ লক্ষ টন মালবহন, ৯'২৪ লক্ষ নৌযাত্রী, ২৬,৩৩২টী জাহাজ চলাচল। ৮লক্ষ বিমানের ওঠানোনাতে ১কোটী ৬৩লক্ষ যাত্রী ও ৫০কোটী ৫৯লক্ষ পাউণ্ড বিমানবাহী মাল চলাচল করেছে।

এখানে রয়েছে সর্ববৃহৎ বাসের টার্মিনাল। এখানে রয়েছে ৬০টী সেতু ও ৪টী সুড়ঙ্গ পথ। Newyork Port Authority ৪টী সেতু ও ৬টী সুড়ঙ্গ, Triborough Bridges and Tunnel Authorityর ৬টী সেতু ও ২টী সুড়ঙ্গ ও City Department of Public Works ৫০টী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ করেন ও কিছু শুল্কও আদায় হয়। এখানে ২৪টী পারাপারের ফেরী আছে। পৌরসংস্থা নগরের ২৩৮'৭ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথে (Subway) ও যান চলাচলের ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এখানে সাতটী Television প্রচার কেন্দ্র আছে। [ক্রমশঃ

"নন্দী হিল"-এ একদিন

(ভ্রমণ)

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এ ছেন বেঙ্গালোর যখন থেকে অনেক দূরে, এখানে রোগ নেই, শোক নেই, শুধু হাসি শুধু গান, শুধু খেলা আর প্রাণ। উপরের নীলাকাশের তলে আমরা ক'জন, আর রবি-কিরণ-রঞ্জীন বা হীরক-মুখরীবাবু ও বৌদি নই কটি নাম, আজ একটি নামে, ক'টি পরিবারের বিচ্ছিন্ন ক'জন মানুষ আজ একটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। নানা-দিকে প্রবাহিত শাখানদী, উপনদী আজ একটি বড় নদীতে মিলে একটি নদীতে পরিণত হয়েছে। নন্দী হিলস্-এর সবুজ ঘাসে ঢাকা আস্তরণের উপর বসে আজ আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি। নন্দী হিল। পৃথিবীর অন্তে স্বর্গ কোথায় তা জানিনা, আজ মনে হচ্ছে, কোথা নয় কোথা নয় শুধু এইখানে, নন্দী হিলস্-এ।

দুপাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছ, লাল মাটি, কোথাও বা টিলা, বাস ছুটে চলেছে। আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখে-ছিলাম। সকাল ৯টায় বাঙ্গালোরে বাসটাণ্ড থেকে অনেকগুলি মানুষকে নিয়ে বাসটি যাত্রা করেছিল। মাঝে উঠেছে আরো অনেক লোক। কখনো উঁচু, কখনো নীচু, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে বাস চলেছে ছুটে। শহর থেকে এসেছে গ্রামের পথে। দুপাশে খোলা মাঠ, কোথাও বা গাছের সার, উঁচু পাহাড়। H, A, C-র চত্বর পার হয়ে চলে গেলাম। দুপাশে গভীর খাউবন, সবুজে ছাওয়া। বাস থামতেই দুটি ছোট ছেলে ছুটে এল,আলুসিদ্ধ আম্রা—ছাড়ানো কাঠালের কোয়া, কেউ কেউ কিনল বটে। বাস আবার ছুটে চলল পাহাড়-কাটা পথ দিয়ে।

বাসের যাত্রীদের দিকে চোখ পড়ল। তরুণ মন কিন্তু আগে দেখল নারী যাত্রীদের। রঙীন আমার দিকে ফিরে মিটি মিটি হাসছে। মেয়েগুলির অঙ্গশ্রী বড় ভালো লাগলো। সাধারণতঃ এরা মন কালো। তামলাও আছে। কালো মুখে ঘন কালোর উপর টানা চোখে কাজল আঁকা। মাথায় ফুল। মুখে হাসি। আবার সুঠাম গৌরাঙ্গী তন্বীও আছে। সরু টানা ভুরু, পায়ে অলক্তার, আঙুলে আংটি।

তারাও দেখছে—চারিদিকে মাঠ, কখনো পাহাড়, মাঝে পাহাড়-কাটা রাস্তা। দূরে এক উপত্যকা। গাড়ী উঠছে উঠতে, একটু একটু করে শীত কমে আসছে, পাশে গভীর খাদ, ইউকালিপটাস গাছ। গাড়ী চলেছে এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে। উপরে উঠছি, কত কত উপরে! ১০০০, ২০০০, আরও আরও। গাড়ী থেমে নিল, ৩৮০০ ফিট উপরে, সরু পিচঢালা রাস্তা, সাদা রঙ দিয়ে পথনির্দেশ আঁকা, লেখা আছে—Sound, Horn, over Taking Poihi-bited, নীচে, কত নীচে পৃথিবী, ৪০০০ ফিট নীচে। যে রাস্তা দিয়ে বাসটা এসেছে মনে হচ্ছে সেটা ঘুরে পড়ে আছে ঘুমন্ত মৃত এক অজগরের মত। পায়ে পায়ে গাড়ী উঠছে, পাশে লেখা, Safety save, ৪৮৫০ ফিট নীচে ফেলে এসেছি হারানো পৃথিবী। বড় পাথরের একটি গেটের ভেতর দিয়ে গাড়ী ঢুকল, দুপাশে পাথরের দেওয়াল। তার মাঝ দিয়ে পথ। চৌকো চৌকো পাথরের গড়া দেওয়াল। ঠিক যেন দুর্গ, ভেতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বাস গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আছে আরও কতকগুলি বাস। সামনেই টিকিট ঘর, লম্বা লাইন।

সুন্দর বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছাদিত পথ, এগিয়ে চললাম।

বাঙ্গালোর থেকে ৩৭ মাইল বাসে বা রেলে, "নন্দী-হিল'স" একটি ছোট, পরিচিত গ্রীষ্মাবাস। সমুদ্র থেকে ৪৮৫০ ফিট উপরে। সুন্দর সাজানো, ঝকঝকে। মহী-শূরের রাজধানী ঐতিহাসিক বাঙ্গালোর থেকে দূরে।

পাথরের গড়া জলাধার অমৃত সরোবর পার হয়ে

এগিয়ে চললাম। চার পাশে নানা জাতের গাছ। খাঁজ কেটে কেটে পাথরের ধাপ নীচে নেমে গেছে। অনেক নীচে জল। ফসল কিছু নেই। শুনলাম এটি চোল-রাজাদের তৈরী। হবেও বা। পার হয়েই এলাম টিপুর গ্রীষ্মাবাসের সামনে। আবাসটি একটু নীচে। সিঁড়ি-দিয়ে নামতে হল।

ক্যামেরা নিয়ে এদিকে ওদিকে রথীন, বিনয়, নন্থ এগিয়ে গেল। টিকু তখন ব্যস্ত তার চেয়েও ছোট একটি বানর নিয়ে। প্রিয়বাবু (চক্রবর্তী) দেখছেন বাহুকের কাঁধে টিফিন কেরিয়ারটা ঠিক আছে কিনা। আমি দেখছি ইতিহাসের পুরানো পাতা। হায়দার, টিপু স্বাধীনতা, সংগ্রাম।

পাশেই কতগুলি ধাপ (২১৬০টি) নীচে নেমে গেছে। টিপুর গ্রীষ্মাবাস এটি। ছোট্ট বাড়ী। খোতলা, নীচের ঘরটি যেন স্বাভাবিক তাপনিয়ন্ত্রিত। ছোট্ট বানরটি তখন টিকুকে ছেড়ে পাশের গাছটিতে উঠেছে। গাছ, গাছ, আর গাছ। নানা রকমের নানা জাতের গাছ এনে এখানে সকল করা হয়েছে, বেশ পরিকল্পিত ভাবেই সাজানো।

যাবার পথেই পড়ল অতল গঙ্গা। উপরে উঁচু পাথর, তলায় কিছুটা জল। ছোট্ট তিনটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। দুপাশে গাছ, মাঝে সরু পথ। পথ শেষ হয়েই পড়ল প্রাঙ্গণ। 'উঃ, আগো' বলে বৌদি বসে পড়লেন। লাফাতে লাফাতে টিকু এগিয়ে চলেছে। সমস্ত দলটা পিছনে চলেছে। হঠাৎ পেছনে আস্তে একটি হাতের ছোঁয়ায় থমকে দাঁড়ালাম। দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে, দক্ষিণী নয়, বাঙ্গালীও নয়, ইংরাজীতেই বলল—আপনারা কোন্ ভাষায় কথা বলছেন? বলল সামনের ফরসা ছেলেটি। মুখ ফিরিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, বললাম —বাংলা। ছেলেটির মুখে মৃদু হাসি জাগল।—" ওঃ! তাই এত সুন্দর!" নিজের ভাষায় মেয়েটিকে কি যেন বলল। পরস্পর পরস্পরকে হাত জোড় করে দাঁড়ালাম, আরও একটি পাখোনদী এসে মিলে গেল। ছেলেটিকে বললাম —বাংলা তোমার ভাল লাগে?—খু-উব। কলকাতায় জ্যোতিষ ঘোষ আছেন, তার সঙ্গে আমার পত্রালাপও হয়েছে।

জ্যোতিষ ঘোষ! বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কি? দূর থেকে তাঁকে প্রণাম জানালাম। খাতাটা এগিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বললাম তোমার নাম ঠিকানাটা দাও। সে লিখেদিল—Dinesh D Dedhia, বোম্বের লোক, ব্যবসা সূত্রে বাস মাদ্রাজে।

হনুমান মন্দিরের সামনে একটি গ্রুপ ছবি তুলে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলাম। উঁচু টিলার উপর মন্দির। পাথরের গড়া দেওয়াল, পাথরের দরজা। ভেতরে পাথরে গড়া ঠাণ্ডা ঘাস। পাথরের মেঝে। অনেকগুলি মন্দিরের সমন্বয় এটি। প্রথমেই পড়ল যোগেশ্বর মন্দির, শিব ও পার্ব্বতী। অন্ধকার, উঃ, কী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! সেই অন্ধকারে দেবীর অঙ্গে জ্বলছে একখণ্ড হীরা। জ্বল জ্বল করছে। দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বৌদি এগিয়ে এলেন, পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়ালেন মুখার্জীবাবু (দাদা), সকলের পিছনে দাঁড়াল দীনেশ ওর বন্ধু ও মেয়ে দুটি। সমস্ত স্থানটি জুড়ে কেমন যেন একটা অপার্থিব ভাব বিরাজ করছিল। ছোট্ট দরজা, মাথায় ঠেকে যায়। হাত বাড়ালেই হাতে লাগে ঠাণ্ডা দেওয়াল, ভেতরে জ্বলছে একটি ছোট্ট প্রদীপ আর দেবীর গায়ের হীরা। মন্দিরের পাশেই একটি কুণ্ড। পাশেই হনুমানজীর মন্দির। মন্দিরটি কত পুরানো তা ঠিক করতে পারলাম না, তবে অনেক পুরানো।

মন্দিরের বাইরে টিলার উপর থেকে দেখা যাচ্ছে দূরে শহর। ঠিক যেন একখানি ছবি,তাতে আঁকা শহর, গ্রাম।

সমস্ত দলটি নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। শনক আশ্রমের নীচে, বড় একটি পাহাড়, তলায় গুহা। এটিই শনক আশ্রম: ভেতরে একটি পাথরের আসন, পাশেই একটি ছোট জানালা। শনক মুনির আশ্রম এটি। প্রায়-সামনেই ক'টি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামলে দেখা যায় নদীর উৎস মুখ বলে কথিত স্থানটি, অল্প একটু জল। পাশে পাথর কেটে ছোট ছোট দুটি ঘরে নন্দী (ষাঁড়)।

এসে দাঁড়ালাম কালো বড় ষাঁড়টির সামনে। ধ্যান-গম্ভীর মুখে সে বসে আছে, অতীতের স্মৃতি নিয়ে। তার চোখের কালো তারায় ঝকঝক করছে বর্তমান আর ভবিষ্যতের মায়া। একখণ্ড প্রকাণ্ড বড় পাথর কেটে গড়া 'বুল'। নন্দী। এরই নামে পাহাড়টির নাম 'নন্দী হিল'।

মাথার উপরে তখন সূর্য্য এসে দাঁড়িয়েছে। দীনেশ বলল এবার যাওয়া যাক। চক্রবর্তী সায় দিয়ে বললেন

হ্যা হ্যা বলা যাক। একটি পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে-পড়লাম। দুপাশে কাউ গাছ। সবুজ ঘাসের আস্তরণ, দূরে পাহাড়টা আকাশের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে। এক একটা খবরের কাগজ পেতে বসে পড়লাম। টিফিন কেরিয়ারটা খোলা হল, দীনেশ হোটেল থেকে নিয়ে এল ইডলি বড় বোণ্ডা! হাসি ঠাট্টার ভেতর আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সাঙ্গ করলাম। নতুনদা কফির অর্ডার দিয়ে এল। এবার সুরু হল গল্প। লাল্টু, টিনু ছোট্ট একটি পাঞ্জাবী ছেলেকে নিয়ে মেতে উঠেছে। বিনয় মেয়েটিকে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল—ওই শুভ্রলোক কে? তোমার ভাই বুঝি? মেয়েটির মুখটি একটু লজ্জারাঙা হয়ে গেল, মাথা নিচু করে বলল, না, আমার স্বামী, দীনেশ ওর বন্ধু।"

বিনয় একটু লজ্জায় পড়ে গেল। বোঝাতে চেষ্টা করল আমরা মাথায় সিঁদুর দেখে সধবা কি কুমারী বুঝি, তোমার সিঁদুর না থাকায় বুঝতে পারিনি।

দুপুর গড়িয়ে আসছে, নন্দী হিলসের গাছগুলির পাতা কাঁপছে, একে এ ঠাণ্ডা জায়গা, তাতে একটু একটু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বেলা সবে ওটা সাড়ে তিনটা। আবার সকলে উঠলাম। কাউ-এর ক'াক দিয়ে চললাম এগিয়ে। পৃথিবীর কথা ভুলে গেছি সে কত দূরে হাও। সবুজ গাছের ক'াক দিয়ে পাহাড় হাতছানি দিচ্ছে। চারিদিকে গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, বড় গাছের পাতার ফাঁকে পাখী ডাকছে, আমরা এসে দাঁড়ালাম একটি পাঁচিল ঘেরা জায়গায়। জায়গাটির নাম—Tipu's Drop. জায়গায় জায়গায় ফাঁক। টিপু এখান থেকে প্রাণদণ্ডে অভিযুক্তদের নীচে ফেলে দিতেন। নীচের দিকে তাকালাম, উঃ, মাথা ঘুরে যায়। ওখানে পড়লে গায়া শরীরের আর কিছু থাকবে না।

হাত ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠি, পৌনে চারটে। ওরে বাবা। এখন আবার পৃথিবী ডাক দিচ্ছে। চারটের বাস চলে যাবে। ছোট্, ছোট্।

কোনরকমে তাড়াহুড়ি নেমে আসছি। শেষ সিঁড়িটাতে দাঁড়িয়ে দেখি বাসটা ভরে গেছে। দীনেশরা দৌড়ে গিয়ে কোনরকমে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ল। মোটা শরীর নিয়ে বৌদি এগোতে পারলেন না, বিনয়ের প্যাণ্টের ক্রিজ ভেঙে যাবে। রথীন আর আমি কি করি। অত ভীড়ে চক্রবর্তীও এগোতে নারাজ। চোখের সামনে দিয়ে বাসটা চলে গেল! আর বাসও নেই। এক গাড়িওলাকে ধরি—যাবে নাকি? সে বলল—'পাঁচটার পর', অতক্ষণ দেরী করতে মন সায় দিল না। বাসওলা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বলল চিকবালপুর অবধি যাব ৩০ টাকা নেব।

একটার পর?

—জী সাব।

আস্তে আস্তে সকলের চোখে নেমে এল চিন্তার কালো ছায়া। ফিরে যাব কি করে! "সাব"। পিছনে ফিরে তাকালাম। একটী লোক, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা ছেঁড়া জামা, পিঠে আমাদেরই বোঝা। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি চিনিয়ে দেওয়া আর আমাদের বোঝাগুলি বহন করা ছাড়া ওর যে অন্য ভূমিকা আছে ভাবিনি। খানিকটা আগেই ও আমাদের খাদ্যাবশিষ্টগুলি নিয়ে খাচ্ছিল। ও কি বলে, সবাই উৎসুক। 'পথ আছে।' পথ! ফিরে তাকাই। পথ আছে, পিছন দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে, আমার সঙ্গে চলুন, বাসে উঠিয়ে দেব। —কতক্ষণ লাগবে, বৌদি জিজ্ঞেস করেন। "আধঘণ্টা" 'আর চল মুসাফির, চল মুসাফির, চল মুসাফির চল', ভাঙা গলায় আনন্দে গেয়ে উঠি। পথ পেয়েছি চল মুসাফির। চলেছি। ও চলেছে সামনে, আমরা পিছনে। টিনু ওর কাছে।

Tipu's Drop এর ওপাশে পথ। লেখা আছে গোপন পথ। বোধ হয় এটা ছিল রাজা-মহারাজাদের গোপন পথ। বিনয়ের সঙ্গে চলেছে লাল্টু। সকলেই ক্লান্ত, সকলেই শ্রান্ত তবুও উপায় নেই ফিরতে হবে। কিছুটা সিঁড়ি তারপর সোজা। আবার সিঁড়ি। ক্লান্ত দেহ, খাওয়াও তেমন কিছু হয়নি, তবুও চলেছি। ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল, আপন ঘরে। ফিরে চলেছি আমরা পাথরে গড়া সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে। বলছিনা, বললে পা ধরে যায়। ১০০, ২০০, ৩০০, জোর গলায় ঘোষণা করছি। ৫০০, ৬০০, ৭০০, নাঃ, পা আর চলেনা। ভিম ধরে এসেছে। আরও কত, আরও কত। হঠাৎ গলা থেকে বেড়িয়ে এল "দুর্গম গিরি কান্তার মরু—।"

গলা ছেড়ে সবাই গান ধরি, আর সিঁড়ি ভাঙি। বৌদি পড়েছেন পিছিয়ে "চলে আসুন" চীৎকার করে ডাকি। "আর কত।" সবে ১০০০ হল, আরও ১৪০০ হাজার সিঁড়ি। গলা চড়িয়ে উত্তর দি। নীচে দুধারে গভীর খাদ। একটা গাছের ডাল হেতে নিয়েছি। তাতে ভর করে চলেছি। টিটুকে কাঁধে চড়িয়ে গাইড এগিয়ে গেছে। দূর থেকে ডাকছে—আইয়ে। উত্তর দি—আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী। বিনয়দা পাল্টুকে নিয়ে এগিয়ে গেছে। এত পরিশ্রম ওর সয়না, বোধ হয় রেগেই গেছে। দাদা দাঁড়িয়ে গেছেন বললেন—"প কাঁপছে।" বৌদি এসে আমার কাঁধ ধরেন। নহু বলে চলে আসুন। গলা ছেড়ে বলি—১৪০০ হাজার। বৌদি বলে "আরও ১৪০০।" পা কাঁপছে তবু চলেছি, গলা শুকিয়ে আসছে তবু চলেছি। সামনে শঙ্খা। ফিরতে হবে, তাই চলেছি মন চিত্তে গীতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থৈথৈ তাতা থৈ থৈ।

গলায় গান, কাঁধে বৌদির হাত, হাতে ভাঙা ডাল। সিঁড়ি ভাঙছি, ভাঙছি আর ভাঙছি। ২০০০ হাজার রবীন চীৎকার করে উঠল। 500 more ? দাদা উত্তর দিলেন। বৌদির কষ্ট যেন সবচেয়ে বেশী। আর পারি না ভাই, তবুও যেতে হবে। ডালটা বৌদির হাতে দি। উনি হেসে ধরলেন। নামছি, নামছি, নীচে, ঐ ঐ নীচে সেই পরিচিত পৃথিবী।

আঃ! পৃথিবী, লাল মাটী, আঃ, দুহাতে ভরে নিলাম কিছুটা মাটী। কোথায় বাস ? গাইডকে পুছি। একটু দূরে। কত দূরে ? 'একটু' আবার পথ ! আবার ! উঃ, সব দেহ ক্লান্ত শ্রান্ত। আবার হাঁটা। মাঠ ছেড়ে এলাম গ্রামে। দুচারটে বাড়ী চোখে পড়ল। একটী বৃদ্ধা বসেছিল, তার ভাষার কি বলল জানিনা। গাইডকে বলি 'আর কত দূর' 'ঐ' আবার হাঁটা ১½ মাইল তখন চলে এসেছি, আর কত ? 'থোড়া' আরও এক মাইল কি তার কিছু বেশী পথ পার হয়ে এলাম নন্দীগ্রাম। বাস এখানেই পাওয়া যাবে। ছটায় বাস। ছাড়তে দেরী আছে একটু। ততক্ষণ বসি না! বৌদি ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসে পড়লেন সামনের দোকানের বেঞ্চিতে।

আমি বলতে পারলাম না, সামনের ঐ মন্দিরটা। উঁচু চূড়া উঁকি দিচ্ছে। রথীনকে বলি চল দেখে আসি।

প্রকাণ্ড মন্দির। সুন্দর কারুকার্যময় পাথরে গড়া মন্দির। কই সরকারী বই তো এর কথা লেখেনি। তাই দর্শকও কম। মন্দিরের সামনে দুটি প্রকাণ্ড বড় পাথরের চাকা। তার অর্ধেকটা মাটীতে প্রোথিত। সামনের মন্দিরের পাথরের গায়ে নানা রকম মূর্ত্তি খোদাই করা। নিখুঁত ছন্দে আঁকা! মন্দিরটী অনেকগুলি মন্দিরের সমষ্টী কেন্দ্র। পশ্চাতে একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড। চারিপাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে নানা মূর্ত্তি। মন্দিরদ্বারে কিন্তু গোপুরম্ চোখে পড়ল না। পূজারী বললে এটী ভোগনন্দীশ্বর মন্দির। চোল, পল্লব রাজাদের সময় ও শেষে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময় তৈরী। তন্ময় হয়ে মন্দিরটী দেখছিলাম। সে কতক্ষণ! হঠাৎ কানে এল বাসের শব্দ। যাঃ! ছুটে চলি। বাসের কাছে এসেছি দেখি দাদা আসছেন—"কী, কোথায় ছিলে ? বাস চলে গেল।" মুখে বিরক্তি। কি যে কর!" "বাস চলে গেল !" —না যাবে না! আমাদের জন্য গাড়ী দাঁড় করিয়েছে। এখানকার পুলিশকে বলে খুঁজিয়েছি।" তাই তো! তন্ময় হয়ে কতক্ষণ ছিলাম। সবাই চলে গেছে। দাদা আমাদের জন্য নেমে পড়েছেন। চাওলাকে আবার চা দিতে বলি। আবে ঐ তো আর একটা বাস। অন্য না কালী। চা খাওয়া হল না, চল চল। চা পড়ে রইল, বাসে উঠলাম।

———

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিশ্বাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে তাঁর হাতে আঁকা মেয়েদের অসংখ্য ছবিতে। যোগাযোগ উপন্যাসে কুমুর বর্ণনায় কবির মুগ্ধ মনোভাব ক্ষণে ক্ষণে কি সুন্দর ছন্দেই না ফুটে উঠেছে। মেয়েদের এমন মহীয়ান্ করে শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, কোন দেশের কোন সাহিত্যেই দেখানো হয়নি। মেয়েদের রূপ বর্ণনা আমরা সাহিত্যজগতে এসে অনেক পেয়েছি, কিন্তু তার সঙ্গে কবির হাতে আঁকা ছবির তুলনাই হতে পারে না। কবির বর্ণনায় দেহ দেহাতীতের সন্ধান দিয়েছে, সীমার মাঝে যে অসীমকে কবি সর্বত্র দেখেছেন সেই অসীমকেই কবি দেখেছেন নারীর দেহের রূপের মধ্যে। আর সবাই নারীর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন, কবির বর্ণনায় পেয়েছি অরূপের সন্ধান। কবি যেন নারীর মধ্যে দেখেছেন

"অরূপ তোমার রূপের আলোয়
হৃদয় ভরপুর।"

বাংলা দেশের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় যে নারীকে আমরা দেখেছি, তারাও ঠিক রূপের সীমানা পার হয়ে অরূপের রাজ্যে পা বাড়াতে পারেনি। তাদের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কথা বলেছেন, অনেক যায়গা নিয়ে অনেক বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু সে সমস্তই তার স্থূল রূপের বর্ণনা। স্থূলকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম, রূপকে অতিক্রম করে অরূপকে সেখানে আমরা খুব কমই পেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা সবাই সুন্দরী মেয়ে, প্রফুল্লর রূপ দেখে ভবানী পাঠক তাকে দস্যুদলের নেত্রী করবার জন্যে নির্বাচন করলেন। রূপ না থাকলে নেতৃত্ব করবার মত ব্যক্তিত্ব থাকে না। রূপ নারীকে ব্যক্তিত্ব দান করে।

দুর্গেশ নন্দিনীর আয়েষা ও তিলোত্তমা সুন্দরী মেয়ে। একজন পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য্যে চলচল, আর একজন বিকাশোন্মুখ মুকুলের মাধুর্য্যে অপরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র বয়সভেদে নারীর এই দুই রূপের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

বন্য প্রকৃতির মধ্যে প্রতিপালিতা সুন্দরী নারীর আরণ্য-সৌন্দর্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে মুগ্ধ করেছিল। নারীর আরণ্য সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পেয়েছি কপালকুণ্ডলার বিপুল এলোচুলের পটভূমিতে তার অপরূপ ছবিতে।

কিন্তু এত সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনা সত্ত্বেও আমাদের মন পূর্ণ তৃপ্তি পায়নি। রূপ সৌন্দর্য্যের জগতে আমরা নারীর সম্পূর্ণ রূপকে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমরা সেই সম্পূর্ণতা পেলাম রবীন্দ্র-

কাব্য জগতে। এখানে নারী অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিতা। সে তার রূপ নিয়ে পার হয়ে গেছে রূপের সীমানা। সে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে ভাবরূপে, যেখানে যা কিছু সুন্দর তার মাঝে।

'শাজাহান' কবিতায় কবি লিখেছেন—সুন্দরী প্রিয়া আজ কোথায় আছে? সে আছে

"যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে
পূর্ণিমায় চামেলীর দেহহীন লাবণ্য বিলাসে
ভাষার অতীত তীরে।
কাঙ্গাল নয়ন যেথা—
দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।"

রবীন্দ্রনাথের নারী-রূপের বর্ণনায় আমরা যেন নারীকে সমগ্র বুকে নিয়েছি এমন মনে করতে পারিনা, মনে হয় যেন অনেক খানি না বোঝার আকুতি, না বলার বেদনা থেকে গেল। সংস্কৃত আলংকারিক শ্রেষ্ঠ রচনার লক্ষণ বলতে গিয়ে বলেছেন তার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার কথা। শ্রেষ্ঠ কবি যতখানি বলেন তার চেয়ে না বলার আভাস থাকে অনেক খানি বেশী। তাই আমরা দেখি অন্য রূপকার সাহিত্যিক যেখানে রূপ বর্ণনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে নারীর রূপের বিশাল ব্যঞ্জনা দেখিয়েছেন।

এই রকম ছবি দেখেছি আমরা যোগাযোগ উপন্যাসে কুমুর রূপে। কবি কিন্তু নারীকে আভরণে সুন্দর দেখেননি, সাজে সজ্জায় নারীকে তাঁর ভাল লাগেনি। সাজ এবং আভরণ রূপকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্ন করে এই ছিল কবির মত। তাই চিরকুমার সভায় অক্ষয় বলছে পূরবালাকে—আমি ভাবলাম সাজেও যখন একে মানিয়েছে, তখন সৌন্দর্য্যে না জানি কত শোভা হবে। কবি লিখেছেন—

"বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে?
নিজের রূপ কি নিজে চুরি করি লবে?"

আভরণ, সাজসজ্জা রূপকে চুরি করে নেয়, তাকে ঢেকে ফেলে। কবি লিখেছেন—

"তুমি অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু সিঁথিস কবরী বাঁধিয়ো
তুমি না কহিয়া কিছু—
আপনার কাজ—
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো
কাজল বিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো।"

সচেষ্ট রূপ-সজ্জার চেয়ে অনায়াস মাধুরীই নারীর মধ্যে কবিকে মুগ্ধ করেছে। কবি কল্পনা বিলাসী, নারীরূপের মধ্যে কবির কল্পনা যেখানে বাধা পায়নি সেখানে কবি আপন মনের মত রূপ আপনার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। সাজে সজ্জায় কবির চোখে দেখা দিয়েছে অবাধ কল্পনার বাধা।

ঠিক এই কারণেই কবি অভিনয়ের বেলায় বিস্তৃত নিখুঁত বাস্তবের অনুকারী মঞ্চ-সজ্জার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলেছেন এরকম বাস্তবের অনুকৃতিতে দর্শকের কল্পনা বাধা পায়। সাজ-সজ্জা দিয়ে সমস্ত সুসম্পন্ন করে তুলতে চেষ্টা করলে কল্পনার জন্যে যথেষ্ট জায়গা রাখা হয় না। তাই সাজের ত্রুটির মধ্যেই সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। সজ্জার অসম্পূর্ণতার রন্ধ্র দিয়েই রূপকে ছাড়িয়ে অরূপের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হতে বাধা পায় না।

যোগাযোগ উপন্যাসে আমরা কুমুর এমনি ভূষণহীন রূপের অপরূপ বর্ণনা পাই—এখানে মনে পড়ে যায় ভূষণ-বিহীন রূপের পূজারী সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও একজন ছিলেন। তিনি হলেন ভবভূতি। রামচন্দ্র সীতার রূপ মনে করে রেখেছেন কোন্‌রূপে? না—

"নিরাভরণ সুন্দর শ্রবণ পাশসৌম্যং মুখম্।"

সীতার সেই নিরাভরণ সুন্দর মুখ খানি শ্রীরামচন্দ্রের মনে পড়ছে, যেখানে তার কানে নেই কোন আভরণ, মুখে নেই প্রসাধনের প্রলেপ, সেই সহজ সুন্দর সৌম্য প্রশান্ত মুখখানি বিরহীর প্রাণকে বেদনায় উদ্বেল করে তুলেছে। সাজে এনে দেয় এক চটুল চপলতা, মুখের সৌম্যতাকে দেয় নষ্ট করে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—কুমু সবে স্নান করে এসেছে, তখনো জামা পরেনি, শুধু ভেতরে একটা সেমিজ। মাথার উপরে ভিজে চুল ঘিরে শাড়ীর

লাল পাড়টি। কখনো বা—কুমু কাপড় ছেড়ে একখানি সাদাসিধে কালো ডুরেশাড়ী পরে এসেছে —মনে হচ্ছে যেন ওর দেহটিকে ঘিরে কালো রেখায় স্বর্ণা কেবলি বয়ে চলেছে কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। কুমুর কণ্ঠের অতুলনীয় নিটোল কোমলতাকে ঘিরে একটি সোনার হার। কুমুর হাতে সাবেক কালের মকর-মুখো মোটা সোনার বালা। দেখে মনে হয় যেন ওর অতুলনীয় দুখানি হাত এই ঐশ্বর্য্যকে গৌরব দান করেছে। কুমুর দুখানি হাতের বর্ণনায় কবি লিখেছেন—"সমস্ত দেহের বাণী যেন ওইখানে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।" স্নানের ঘর থেকে কুমু বাইরে আসতে গিয়ে কি যেন দ্বিধা ভরে স্নানের ঘরের দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার একখানি হাত দরজার একটি পাল্লার উপরে —কবি তার একটি বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—যেন একখানি অপরূপ ছবি।

কবির এই রূপ বর্ণনা, এই মুগ্ধদৃষ্টি পরম শ্রদ্ধা ও পরম বিস্ময়ের।

সাধারণ গৃহকর্মের মধ্যে নিরতা মেয়েকে কবি অসাধারণ সুন্দর বলে দেখেছেন। চিরকুমার সভায় শ্রীশ নৃপবালার যে ছবিখানি কল্পনার নেত্রে দেখে মুগ্ধ হয়েছে সেহল, নৃপবালা দুপুরের বিশ্রামের অবকাশে মাটিতে মাদুর পেতে বালিশের ওয়াড় সেলাই করছে। অবনত মুখে বসে সূঁচে সুতো পরাচ্ছে। পিঠের ওপরে ভিজে চুল মেলে দেওয়া।

নারী তার সমস্ত মনখানি এমনি সাধারণ কাজের মধ্যে মগ্ন করে দেয়। তার সেই মগ্নতার ছবিখানি কবিকে মুগ্ধ করেছে।

কবিকে তাঁর দিন শেষের শেষ সন্ধ্যায় যে ঘাটের আলো দেখাবে সেও ওই নারী। কবি তাঁর নাতনীকে বলেছেন—বিদায় নিয়ে যাবার দিনে ঘাটের আলো তুমিই আমাকে দেখাবে।

ঘাটের পারে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলা দেশের একটি পরিচিত বিদায় দৃশ্য। নদীবহুল বাংলা দেশে মানুষ নৌকা করে যাওয়া-আসা করে। যখন ঘাট থেকে নৌকো ছাড়ে তখন প্রবাসযাত্রীকে প্রিয়জনেরা আলো নিয়ে তাকে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে যায়। তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকো দেখতে পাওয়া যায় ততক্ষণ তারা আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর নৌকোর মধ্যেকার প্রবাসী যাত্রী যতক্ষণ ওই আলো নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে না যায়, ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে। প্রিয়জনের বিদায় বাণী ওই আলোর মধ্যে দিয়ে তার কাছে এসে পৌঁছতে থাকে।

পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবার দিনে নারীর ভালবাসাই মানুষকে তার দূর যাত্রার পথে পাথেয় দান করে। ভালোবাসাই মানুষের পথ চলবার পাথেয়। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ চলবার উৎসাহ পায়না। যতদিন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ততদিন নারী নানারূপে পুরুষকে আপনার স্নেহে অভিষিক্ত করে রাখে। এ জীবন থেকে বিদায় নিয়ে যাবার দিনেও নারীর ভালোবাসা, তার বিদায় অশ্রুই মানুষের জীবনের সম্বল। নারী পুরুষের জীবন ও মরণকে তার ভালোবাসা দিয়ে ধন্য করে রাখে।

কিশোর দিনের একটি মধুর স্পর্শ কবির মনে পড়ে। কোন এক কৈশোরিকা সেদিন কবির হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিল, আমি হাত দেখতে জানি। হাত দেখে সে বলল—"তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন।" কবি জানতেন এ অপবাদ একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু তা নিয়ে কবির নালিশ ছিল না এইজন্যে যে ওই কিশোরীর হাতের স্পর্শের আনন্দের মধ্যেই কবি তাঁর সত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কবি লিখেছেন—আমি যেন কবিতার একটি পদ, খুঁজে বেড়াচ্ছি তার অন্য পদটিকে দুটি পদের মিলন হলে যেমন কাব্যের সুরটি বেজে ওঠে তেমনি নারীর সঙ্গে মিলনে জীবন কাব্যের সুরটি সুসম্পূর্ণ হয়ে বেজে ওঠে। কবির প্রেম গিয়ে মিশেছে পূজোতে। কবি লিখেছেন—

সোজা যায় বুঝা—
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।"

এই জন্যই রবীন্দ্ররচনার মধ্যে থেকে প্রেম আর পূজোকে দুটো ভাগ করা চলেনা। প্রেম আর পূজা তার মধ্যে মিশে গেছে। নারী যেন একাসনে আসন নিয়েছে ভগবানেরই সঙ্গে, কবির জীবনে।

রূপের সম্পূর্ণতা কবির মনে কামনার বদলে পূজোর মনোভাব জাগিয়ে তোলে—কবি এই কথা বলতে চেয়েছেন তাঁর 'বিজয়িনী' কবিতায়।

নারী তার পরমাশ্চর্য্য রূপ নিয়ে স্নানের জন্যে

অচ্ছোদ সরোবরের পথে চলেছে। মদন তার পথে বসে রইল তাকে কামনার শরে বিদ্ধ করবে বলে। নারী স্নান সমাপন করে নগ্ন দেহে যখন সোপানে উঠে দাঁড়াল, তখন ওই রূপের পরিপূর্ণ মহিমা দেখে মদনের তীর ও ধনু বিজয়িনীর পায়ের তলায় খসে পড়ল তার হাত থেকে।

পরিপূর্ণ রূপ, কামনার তীব্রতা দূর করে দিয়ে তার জায়গায় ভক্তির গভীরতা জাগিয়ে তোলে, কবির নিজের জীবনের এই উপলব্ধি এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। [ক্রমশঃ

মোপাশাঁর গল্পে নারী

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

গী দ্য মোপাশাঁ। ছোট্ট একটি নাম। অথচ কোটি কোটি মানুষের রক্তে যা চাঞ্চল্য আনে। বুকে আনে উন্মাদনা।

মোপাশাঁ পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর আসন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আদিতে না হোক একেবারে প্রথম সারিতে।

ছোট গল্পের যাদুকর মোপাশাঁ। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এত বড় প্রতিভা খুব কম দেশেই দেখা গিয়েছে। ১৮৭৩ সালে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভা ফ্লবেয়ার মোপাশাঁর মধ্যে প্রতিভার যে কুঁড়ি দেখেছিলেন তাই কালে শত-দলের মত নিজেকে মেলে ধরেছিল। ফ্লবেয়ার এবং তুর্গেনিভকে আদর্শ করে সাহিত্যক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। এবং তাঁদের চেয়ে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করেছেন বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না।

লোকপ্রিয় মোপাশাঁ। সর্বদেশের লোকই তাঁর গল্প পড়তে ভালবাসে। মোপাশাঁর এই জন-প্রিয়তার প্রধান কারণ তাঁর গল্পের বৈচিত্র্য। এত বৈচিত্র্য অন্য কোন লেখকের গল্পে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সমালোচকরা চেখভকে মোপাশাঁর ঊর্ধ্বে স্থান দিলেও তাঁরা এই বিষয়ে একমত হবেন যে চেখভের গল্পে মোপাশাঁর মত বৈচিত্র্য নেই। প্রখ্যাত জোসেফ কনরাড যে বলেছেন—He is never dull,—এ-কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। আর আনাতোল ফ্রাঁস মোপাশাঁকে এই বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—Nothing is lacking in this robust and masterly storyteller.

মোপাশাঁর লেখনী অজস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে নতুন নতুন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে। মোপাশাঁ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষের মনের গহন গভীরে নেমেছেন ডুবুরির মত আর অজস্র মণিমুক্তা উপহার দিয়েছেন তাঁর প্রিয় পাঠককে।

এত দরদ ও সহানুভূতি নিয়ে তিনি মানুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়। আর তাঁর শিল্পচাতুর্য? তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

মোপাশাঁর অসংখ্য গল্পে আমরা নানা নারী-চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সব ক'টি চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল—আপন মহিমায় মহিমান্বিত। মোপাশাঁ তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে এত নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ কেমন করে পেলেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

বিখ্যাত ইউসলেস্ বিউটি গল্পটির কথা ধরা যাক। গল্পটির কেন্দ্রচরিত্র সাতটি সন্তানের জননী ত্রিশ বৎসরের সুন্দরী যুবতী। গল্পের যখন আরম্ভ তখন সেই সুন্দরী আর সূতিকা গৃহে যেতে বীতস্পৃহ। সূতিকা গৃহে তার ঘৃণা জন্মেছে। সে তখন পৃথিবীর অন্য সাধারণ রমণীর মত বাঁচতে চায়। জীবনকে উপভোগ করতে চায়। আর আপনার দেহ-সৌন্দর্যকে বুঝি সেই শোভনাংগী সর্বাগ্রে স্থান দেয়। তাই সে তার স্বামীর কাছে অনুতপ্ত হয়েও পশ্চাৎপদ হয় না। আর এমনি সে-কথা যাতে তার নিজেরই চরিত্র মসীলিপ্ত হয়। চার্চে খৃষ্টের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে—কাউন্টের (তার স্বামী) সাতটি সন্তানের মধ্যে একটি সন্তান প্রসূতিজ। তবে কে সেই সন্তান সে-কথা বলতে সে অস্বীকার করে। এই কথা সেই মুহূর্তেও তার সন্তানের মস্তক স্পর্শ করে বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। তার স্বামী মানসিক যন্ত্রণার ভোগে এরই ফলে। এইভাবে সে স্বামীকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তার দেহ-সৌন্দর্য

অটুট থাকে। লোকে তার রূপোপভোগ করে এবং প্রশংসা করে। অবশেষে দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে মানসিক যন্ত্রণায় কাতর স্বামীর কাছে সে রহস্যের অবগুণ্ঠন খোলে। বলে যে সে পূর্বে মিথ্যা বলেছিল এবং এ কাজ সে করেছিল আর সন্তান গর্ভে ধারণে তার প্রবল অনীহা থেকে।

আমাদের দেশে এমন চরিত্র সম্ভব? তবে মনে রাখতে হবে যে মোপাসাঁ যাদের কথা লিখেছেন তারা সবাই ফরাসী। এই গল্পটি পড়ার পর ঐ সুন্দরী রমণীর স্বামীর মত আমাদের মনেও একই প্রশ্ন জাগে—ক্যান্ এ মাবার স্পিক্ লাইক্ ছাট্?

ভূমি রঁমা গল্পটিতে তিনি দেখিয়েছেন একটি বিধবাকে যার দেহে জরা অথচ মনে তিনি নবীনা। (মহাভারতে বর্ণিত চ্যবন-কন্যার কথা মনে পড়ে যায় না কি?) তিনি প্রেমব্যাকুলা অথচ মুস্কিল এই যে তাঁর প্রণয়ী জুটছে না। তাই এই লোলচর্মবৃদ্ধা রমণীটি প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর চাকর-চাকরাণীকে প্রেমিক-প্রেমিকার অভিনয় করতে বলেন। সেই প্রণয়-নিবেদনের দৃশ্য তিনি দুচোখ ভরে দেখেন আর দেখেন। তাঁর মনে পুরানো স্মৃতির উদ্রেক হয় এবং তিনি শান্তি পান। ফ্রয়েড্ যে বলেছেন (মহাভারতেও প্রায় একই কথা আছে) 'কোন ক্যাসেই নারীর প্রণয় বাসনা লুপ্ত হয় না' এ গল্প তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাদাম জয়েল ফিফি এবং ২৯নং বেড্ গল্প দুটিতে মোপাসাঁর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসংগে মোপাসাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায় হবে না। আর এও ত এক হিসাবে সত্যি যে ছোটগল্পে লেখক নিজেকেই নতুন করে সৃষ্টি করে থাকেন।

মোপাসাঁ যখন উন্মাদ হন তখন তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ফ্রান্সের সংগে জার্মানীর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং তিনি দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মাদাম জয়েল ফিফি গল্প সম্পর্কে আরও একটি কথা আছে। এই গল্পটি মোপাসাঁর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের বহু প্রশংসিত রচনা। এই গল্পের নায়িকা এক ইহুদী বারবণিতা। চারজন প্রুশিয়ান সৈন্যের চারজন মর্মসহচরীর মধ্যে সে ছিল অন্যতমা। মাদাম জয়েল ফিফির (কোন মেয়ের নাম নয়—একজন সৈন্যকে তার সহকর্মীরা ঐ নামে ডাকত) ভাগ্যে সে পড়েছিল। মাঃ ফিফির নিষ্ঠুর আচরণ সে সহ্য করেছিল। কেননা সেই অত্যাচার ত কেবল মাত্র দৈহিক নির্যাতন—যা সে সহ্য করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সে সহ্য করতে পারে নি মানসিক অত্যাচার। মাঃ ফিফি যখন বলেছিল, ফ্রান্সের সব নারীই তাদের অধিকারে তখন সে প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, সে নারী হিসাবে নিজেকে দাবী করে না, কেননা সে ত বেশ্যা। প্রুশিয়ানরা বেশ্যা ছাড়া ফ্রান্সের আর কাউকেই ভোগ করার উপযুক্ত নয়। এই কথা শুনে কাউন্ট তার গালে চড় মেরেছিল। দ্বিতীয় চড় মারবার আগেই সে মাঃ ফিফির ভবলীলা সাংগ করে দিয়েছিল একটি ছুরির আঘাতে এবং পলকের মধ্যে সে অন্তর্হিত হয় সেখান থেকে। এই সাহসিকাকে এক দেশ-প্রেমিক বিবাহ করেন। গল্পটির শেষ করেছেন মোপাসাঁ এইভাবে, অ্যাণ্ড হি মেড্ এ লেডী অব্ হার। গল্পটির রচনা-চাতুর্যের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

২৯ নং বেড্ গল্পের কেন্দ্রচরিত্র ইরমা নামে একটি নারী। ফ্রান্সের এক পদস্থ সামরিক কর্মচারীর প্রণয়িনী সে। ক্যাপ্টেন ইরমাকে রেখে যুদ্ধে যোগ দেয়। জার্মানদের সংগে যুদ্ধান্তে ফিরে সে শোনে যে তার প্রণয়িনী হসপিটালে ২৯ নং বেডে এবং ইরমা দুরারোগ্য যৌনরোগে আক্রান্ত। ক্যাপ্টেনের মন তা বিশ্বাস করতে চায় না। তাই সে ছোটে হসপিটালে। গিয়ে দেখে তার আদরের সুন্দরী ইরমা কংকালসার হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে এবং সত্যিই তার গণোরিয়া হয়েছে। ক্যাপ্টেন ঘৃণাবোধ করে। কেননা ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতকালে জার্মান সৈন্যরা ইরমার দেহ সম্ভোগ করে এবং ইরমাকে তারা পুরোপুরি অধিকার করে নেয়। ইরমা তাদের বাধা দেয় নি। এই বাধা না দেওয়ার পেছনে যে মনোভাব ছিল তাই ইরমা ব্যক্ত করে ক্যাপ্টেনকে—তোমরা জার্মানদের কি আর ক্ষতি করেছ? তোমার চেয়ে বেশী করেছি আমি—ঢের ঢের বেশী। আমি তাদের বিষিয়ে মারব বলেই নিজের দিকে তাকাই নি।" তার দুরারোগ্য যৌনব্যাধি

জার্মানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার সংকল্পের মধ্যে ইরমার দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইরমার শেষ উক্তিটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। আর এ হেন মনোভাব বুঝি নারীর পক্ষেই সম্ভব।

দি ভেন্দেত্তা গল্পটি একটি পৃথিবী বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে নারীর সীমাহীন নিষ্ঠুরতার প্রতি আলোকপাত করেছেন মোপাসাঁ। গল্পটি একটি বিধবাকে নিয়ে। বিধবার সংবেদন নীলমণিকে নিকোলাস নামে একটি লোক খুন করে পালিয়ে যায়। বিধবা কসম খায় যে সেএই হত্যারপ্রতিশোধ নেবে। সে তার কুকুরটিকে দিনের পর দিন শিক্ষা দেয় কেমন করে আততায়ীকে হত্যা করতে হবেএবং এই পর্বের যে বিবরণ মোপাসাঁ দিয়েছেন তার তুলনা নেই। বিধবার সামনে কুকুরটি তার পুত্র-হন্তাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে। আর সে তাই দেখে এবং এই ভাবে তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করে বাড়ী ফিরে এসে বহুদিন পর সে সুখনিদ্রায় রাত কাটায়। নারীর কেবল কুসুম-কোমল রূপ দেখতেই আমরা সচরাচর অভ্যস্ত। তাই এহেন বজ্র-কাঠিন্য আমাদের অভিভূত করে।

Clochette গল্পে এমন একটি নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যার জীবনে বসন্ত একবারই এসেছিল, এবং সেই প্রথম প্রেমের কথা স্মরণ রেখেই সে তার কৌমার্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল আজীবন। এখানে মনে রাখা দরকার যে এই গল্পের নায়িকা ফরাসী দেশের।

দি কল্স জেম্স্, দি ভেনাস্ অব্ ব্রান্ডিয়া ও হাউ হি গট্ ড লিজিয়ন অব্ অনর—গল্প তিনটিতেই ছলনাময়ী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। প্রথমটির নায়িকা রূপসী নারী যাকে তার স্বামী প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিল এবং বিবাহ করেছিল। এই নারীর অনেক গুণ—প্রধানতঃ সে সুগৃহিণী ছিল। আর তার স্বামীর মতে তার অনেকগুণের মধ্যে প্রধান দোষ থিয়েটার দেখা এবং নকল অলংকার কেনা ও পরার দিকে তার অত্যধিক ঝোঁক। সে প্রতিদিন নিত্য নতুন অলংকার দিয়ে তার শোভন তনুদেহটি সাজাত। যাই হোক, তাকে নিয়ে তার স্বামী খুব সুখেই ছিল। কিন্তু এত সুখ কি আর সহ্য হয়। মাত্র আট-দিনের রোগে ভুগে সেই সুন্দরী মারা গেল। তার স্বামীর অবস্থা তারপর থেকে শোচনীয় হয়ে উঠল। সে তার পত্নীর স্মৃতি ভুলতে পারছিল না। ক্রমশঃ সে গরীব হয়ে পড়ল। বাজারে তার অনেক দেনা। তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়ে একদিন সে তার স্ত্রীর কুটো অলংকার নিয়ে দোকানে গেল। অলংকারের দোকানে মৃতা স্ত্রীর স্বামীর জন্য চরক অপেক্ষা করছিল। সে শুনল অলংকারগুলো একটাও কুটো নয় বরং খাঁটি জিনিষ। দাম শুনে ত তার চক্ষু চড়ক। আরও জানল এসবই একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের দেওয়া উপহার। অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে পত্নীবিরহ-বিধুর ভদ্রলোকটির মনের কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

দি ডায়মণ্ড নেক্‌লেশ গল্পটি বিশেষ কারণে বাংলাদেশের পাঠকবর্গের সুপরিচিত। গরীবের বড়লোক আত্মীয় যেমন বাঞ্ছিত নয়, তেমনি বোধ-হয় সুন্দরী স্ত্রীও। এই গল্পের নায়িকা এক কনিষ্ঠ করণিক-বধূ। সে সুন্দরী। (মোপাসাঁর গল্পে সুন্দরীর একটু ছড়াছড়ি নয় কি?) তার তনুদেহটি নানা আভরণে সাজাতে তার সাধ যায় কিন্তু সাধ্যে কুলায় না। সে সমাজে মেলামেশা করতে পারে না এবং সে কারণে তার ভক্তেরও অভাব। স্পষ্টতঃই সে এই কারণে অসুখী। অবশেষে একদিন নৃত্যে যোগদানের সে সুযোগ পায়। কিন্তু সুযোগ পেলে হবে কি, তার যে উপযুক্ত পোষাক নেই। অগত্যা স্বামীর সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দিয়ে তার পোষাক তৈরী হয়। অতঃপর প্রশ্ন এসে পড়ে মানানসই অলংকারের। সেই সুন্দরী মুক্তোর হার জোগাড় করে তার বান্ধবীর কাছ থেকে। পার্টিতে যোগ দেয়। সবকিছুই ভালভাবে কাটে। কিন্তু মধুরেণ সমাপয়েৎ হয় না। কেন না মুক্তোর হারটি খোয়া গেল। দোকান থেকে অবিকল ঐ রকমের একটি মুক্তোর হার কিনে সে তার বান্ধবীকে ফিরিয়ে দেয়। এখানেই সব শেষ হয় না। কেন না ঐ দম্পতিকে দশবৎসর ধরে কষ্ট করে সেই দেনা শোধ করতে হয়। এবং পরে একদিন সেই মহিলা তার বান্ধবীর কাছ থেকে জানতে পারে যে বান্ধবীর হারটি ছিল নকল।

গল্পটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এর মূল বক্তব্য আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

দি সিগনাল গল্পটিতে নারীর এক বিচিত্র মনস্তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছেন মোপাশাঁ। অভিজাত মহিলাটি তাঁর ঘরের জানালায় বসে লোক চলাচল দেখতে ভালবাসেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁরই ঘরের অপর দিকের জানালায় বসে একটি মেয়ে রাস্তার লোকদের ইসারা করছে। বুঝতে তাঁর কষ্ট হলনা যে মেয়েটি খারাপ। রাস্তা থেকে ঐ মেয়েটির ঘরে লোক আসত এবং আনন্দ উপভোগ করে চলে যেত। কেন জানিনা, ঐ বিপথগামিনীর মত ঐ অভিজাত মহিলার মনে ঐ প্রকারের অংগভংগী করার বাসনা জাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ মেয়েটির মত হাসলেন, মাথা নাড়লেন। এবং এসবই তিনি করলেন জানালার ধারে বসে। মেয়েটিকে অনুকরণ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। হয়ত বা ছিল। একটি সুন্দর যুবক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। যখন ঐ সুপুরুষটি তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন। কেননা এই ব্যাপার তাঁর স্বামীর কর্ণগোচর হবার সম্ভাবনা। যুবকটিকে তিনি বাড়ী থেকে বিতাড়িত করতে পারলেন না। এদিকে তাঁর স্বামীর ঘরে ফেরার সময় আসন্ন। তাই ঐ অভিজাত মহিলাটি নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। যুবকটি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে প্রস্থান করে।

ভদ্রমহিলাটি এই ঘটনা তাঁর এক বান্ধবীকে বলছিলেন। অবশেষে বললেন—এই অর্থ নিয়েই তাঁর ফ্যাসাদ হয়েছে এবং তিনি কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। বান্ধবীর পরামর্শ ভিক্ষা করলেন। মহিলাটির বান্ধবী বললেন যে ঐ অর্থ দিয়ে সে যেন তার স্বামীকে কিছু উপহার দেয়।

শুধুমাত্র শেষ কথাটি দিয়েই বান্ধবীর মনের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন ছোটগল্পের যাদুকর।

আর এই গল্পের নায়িকার মুখ দিয়ে মোপাশাঁ যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে—" I believe that we women have the souls of monkeys. I have been told (and it was a physician who told me) that the brain of a monkey is very like ours. Of course we must imitate some one or other, we imitate our husbands when we love them, during the first months after our marriage and then our lovers, our female friends, our confessors when they are nice, We assume their ways of thought, their manners of speech, their words, their gestures, every thing."

কথাগুলো ভেবে দেখবার মত।

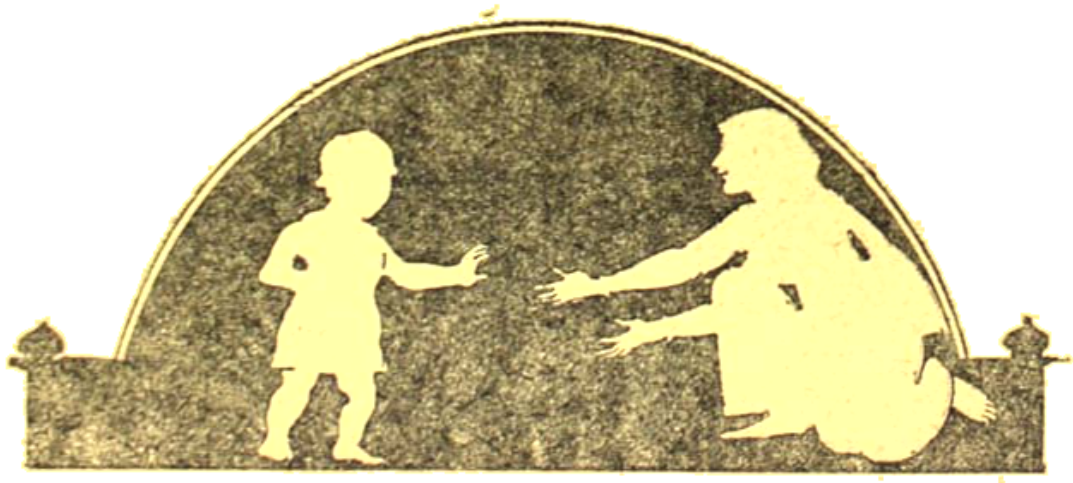

নববর্ষ প্রশস্তি

নববর্ষের প্রথম আলোকে মুখরিত মন্দির
জ্ঞান গরিমায় ধ্যান মহিমায় আনন্দ গভীর।
হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধা ক্রমিক—এ দেবভূমির দীপ্ত প্রেমিক,
জাগ্রত কোন চেতনা অলক প্রার্থিত বন্দীর।
নববর্ষের প্রথম প্রকাশে সুন্দর মন্দির।

দিকে দিকে ধ্বনি মুক্তির জাগে কাকলি কণ্ঠে সুর,
ঘুম ভাঙা পাখি উচ্ছলছল আবাস ভরপুর।
প্রভাতী পথের চকিতে পন্থা, বর্ণালীময় সোনালি সন্ধ্যা
সুরসাধনার সেতারের তারে সীমাহারা গভীর।
নববর্ষের প্রথম প্রদোষে আলোকিত মন্দির।

কথা: শ্রীরামেন্দ্রনাথ মল্লিক সুর: শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক স্বরলিপি: শ্রীযুক্তঅরুণ লেখা মল্লিক

‖ ম ধ - | ণর্সর্ঋর্ঋ ‖ র্ঋর্ঋর্ঋ | র্সর্তর্সর্ঋণ ‖ র্স - - | - - - - - ‖
- • বর্ ষের প্রথম আ • লো • • কে • , • • • •
ধ ণ র্স | স - র্সর্ঋ ‖ ণসণ | ধ - - - ‖ ধ ণ ণ | ণ ণ ণর্স ‖
মু খ রি ত • ম ন্দি • • • র্ জ্ঞা • ন গরিমায়
ধ স ধ | ম ম ম - ‖ ধ ঋ - | স ঋ সঋ ণ ‖ স - - | - - - - ‖
ধ্যা • ন মহিমায় আনন্ দ • ম • ন্ গী • • • • র্
স ঋ ম | স - মা - ‖ ম ধ ধ | ণ ণ র্স - ‖
আ ন ন্দ • ম • ন্ গী • • • • র্

II সর্সর্স | র্গ ণধ | ধমম | মঝঝ - | সঝ ণ | স- - - I
ছ ন্দ ভক্ তি • শ্রদ্ধা ক্র • মি • • • • • ক্

সঝ স | ঝম মম | ম- - | -ধ ধ - | মধ ধ | ধ-ধণ I
এ • • দে • বভূ মি • • • • • ব্ ধী প্ ত প্রে • ম •

ধণর্ঝ | র্স- - - | র্সর্ঝর্ঝ | র্ঝ-র্ঝ- | র্সর্ঝর্ম | র্ম-র্ঝর্স I
• • • • • ক্ আ • গ্র ত • কো ন্ চে ত • না • অ ল

র্গণর্স | র্স-র্ঝর্স | ণর্সণ | ধ- - - | ধ ধণ | ণ-ণণ I
ক • • প্রা বধি ত হ ন্ • ধী • • • ব্ ন র • ব্ যে ন

ণধ ণ | ণণণ - | ণ-ধ | ণধ ণর্ঝ | র্স- - | - - - - I
প্র থ ম প্রকা শে • হ ন্ • দ্র র • ম ন্ দি • • • • • ব্

ধণ ণ | ণ ণণর্স | ধর্সধ | ম ম ঝ - | ঝ ঝ - | সঝ সঝ ণ I
জা • ন গ রিমায় ধ্যা • ন ম হি মা য় আ ন ন্ ধ • ম • ন্

স- - | - - - - | সঝম | ম- ম- | মধ ঝ | ণণর্স- II
ধী • • • • • ব্ আ ন ন্ ধ • ম ন্ ধী • • • • • ব্

II মমর্স | র্গ ণধ | ধধম | মঝ ঝঝ | ঝ- - | ঝ- - - I
দি কে • দি • কে • ধ্বনি • ত্ ত্রি ভা • • গে • • •

সঝম | মঝ ঝস | সঝস | ণ- - - | ধ ণ | ণ- ণণ I
কা কি কণ্ ঠে • স্ব • • • • • ঘুম্ ভা ঙা • পা খী

ণস স | স-সস | সঝঝ | ঝস ঝণ্ | স- - | - - - - I
উ ড্ ছ ল • ছ ল আ • শা সে • ত্ত র পু • • • • ব্

সঝ ম | মধণঝ | র্স- - | - - - - I
আ শা সে • ত্ত র পু • • • • • ব্

স সণ | ণধ ধম | মমঝ | ঝঝ ঝস | সঝণস | - - - - I
প্র ভা • ত্রী • প • থের • চ কি তে • শন্ • থা • • • •

স • ঝ | ঝ • ঝঝ | সঝম | মঝ ঝ - | - সঝ ন্ | স- - - I
ব ন্ধ্যা নী • ন ন্ন সো মা লি স ন্ ধ্যা • • • • • • • •

স ঝম | ম ম ম- | মধ ধ | ধ ধ ধ ধ | ধ ণ ধ | ণ- - - I
সু ন্ • সা ধ না ন্ সে ভা • রে ন্ত ভা বে সী মা হা রা • • •

-র্স ধ | ণণর্স- | র্সর্ঝর্ম | র্মর্ঝর্ঝর্স | সর্ঝণর্স | - - - - I
• • • • • • • • সী মা • হা • রা • গণ • ডি • • • ব্

ধ ণণ | ণণণর্স | ধর্সধ | ম ম ঝ - | ঝ ঝ - | সঝ সঝ ঝ I
জা • ন গরিমায় ধ্যা • ন ম হি মা য় আ ন ন্ ধ • ম • ন্

স- - | - - - - | সঝম | ম - ম - | ম ধ ধ | ণ ণ র্স - II II
ধী • • • • • ব্ আ ন ন্ ধ • ম ন্ ধী • • • • • ব্

থাট বা মেল

অর্চনা মিত্র।

"থাট" অথবা "মেল" সঙ্গীত জগতে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অথচ, 'থাট'কে, সকলেই প্রায় অবজ্ঞা করে থাকেন। কারণ, এদের এতটুকুও সুর মাধুর্য্য নেই, মানুষের মনকে এরা আনন্দ দিতে পারেনা। তবুও এদের প্রয়োজন আছে। এরা না থাকলে রাগ-রাগিনীরা প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করতে পারবেনা।

সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত বেঙ্কটমখী, গণিতের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন যে থাট বা মেল বাহাত্তরটী হতে পারে। যদিও আধুনিক যুগে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের প্রচারিত দশটী থাটই প্রচলিত।

'থাট', সাতটী স্বরের সমষ্টি মাত্র। 'মেল' সংস্কৃত শব্দ। বাংলা বা হিন্দীতে 'থাট' কথাটি সর্ব্বজন বিদিত। থাটের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে। যেমন—'থাট' সম্পূর্ণ জাতের হবে। অর্থাৎ, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ—সংক্ষেপে, সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বরের প্রয়োগ, থাটে অনিবার্য্যরূপে হবে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রচারিত দশটী থাটের নাম-হল—কল্যাণ, বিলাবল, খম্বাজ, ভৈরব, ভৈরবী, তোড়ী, মারবা, কাফী, আসাবরী ও পূর্বী।

প্রতিটী থাট থেকে, অসংখ্য রাগ-রাগিনীর জন্ম হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। এদের কয়েকটি করে সন্তানদের নাম দেওয়া হল।

১। বিলাবল—পটমঞ্জরী, দেশকার, দুর্গা, গুণকলী, নটী, ককুভা, মলুহাকেদার, ভবানী প্রভৃতি।

২। কল্যাণ—ভূপালী, হমীর, গৌড়সারং, চন্দ্রকান্ত, ছায়ানট, মালশ্রী, হিন্দোল, কেদারী শুদ্ধকল্যাণ প্রভৃতি।

৩। খম্বাজ—দেশ, তিলঙ্গ, ঝমঝমাবতী ইত্যাদি।

৪। ভৈরব—রামকেলী, কালিংড়া, প্রভাত, আহরী-ভৈরব, ঝীলক (১) শিবমত ভৈরব, গৌরী (১) প্রভৃতি।

৫। ভৈরবী—মালকৌশ

৬। তোড়ী—গুর্জরী

৭। আসাবরী—সিন্ধুভৈরবী, জৌনপুরী, দরবারী কানাড়া, ঝীলক (১), দেশী

৮। কাফী—পীলু, মেঘ, মিঁয়া কি মল্লার, সারং, মেঘমল্লার, শুদ্ধসারং, সামন্ত সারং, সুহা, মধ্যমাদি, সৈন্ধবী, ধনাশ্রী প্রভৃতি।

৯। মারবা—পুরিয়া, সাজগিরি, ভংখার, ললিত, বরাটী ইত্যাদি।

১০। পূর্বী—গৌরী (২), শ্রী, বাসন্তী, টংকী প্রভৃতি।

দশটী থাটের সন্তান-সন্ততি অনেক। এদের সন্তানদের মধ্যে এদের ছায়া স্পষ্টরূপে বা অস্পষ্ট-রূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন আসাবরীর সন্তান 'জৌনপুরী'তে, 'আসাবরীর' স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'দরবারী কানাড়া' শুনলেও, সে, যে 'আসা-বরীর' আমদ, বোঝা যায়।

'শ্রী' রাগে, 'পূর্বীর' ছাপ পাওয়া যায়। অনেক সময়, আবার এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন ভৈরবীতে 'কোমল রে' প্রয়োগ করা হয়, অথচ মালকৌশতে 'রে' বর্জ্জিত। ভৈরবীতে পঞ্চম অনিবার্য্য। অথচ মালকৌশে পঞ্চম নেই।

নীচে, দশটী থাটের আরোহ-অবরোহ দেওয়া হল।

কল্যাণ—সা, রে, গ, ম॑ প, ধ, নী, সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম॑, গ, রে সা।

বিলাবল—সা রে গ, ম, প, ধ, নী, সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

স্বরাজ—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

ভৈরব—সা রে, গ, ম, প, ধ, নী সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম, গ, রে সা।

ভৈরবী—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী, সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা

আসাবরী—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী সা॑—সা॑, নী, ধ পা, ম, গ, রে সা।

কাফী—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নী, সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

মারবা—সা, রে, গ, ম॑ প, ধ, নী, সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম, গ, রে, সা।

পূর্বী—সা, রে, গ, ম॑ প, ধ, নী, সা॑—সা॑, নী, ধ, প, ম॑, গ, রে, সা।

তোড়ী—সা, রে, গ, ম॑, প, ধ, নী, সা॑,—সা॑, নী, ধ পা, ম॑, গ, রে সা।

নোট—রাগ ও থাটের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন—থাট মারবাতে পঞ্চম প্রয়োগ হয়, কিন্তু রাগ মারবাতে পঞ্চম বর্জ্জিত। থাট সম্পূর্ণ জাতের হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। রাগ-রাগিণী সুর-মাধুর্য্যে অতুলনীয় কিন্তু থাট, সৃষ্টির গৌরবে মহান্।

নোট—কোমল চিহ্ন—রে, গ, ধ, নী, । চড়ার—সা॑ (ওপরের)

তীব্র মধ্যম—ম॑ শুদ্ধ মধ্যম—ম

হাতের কথা

সুরাচার্য

একটি অদ্ভুত লোকের হাতের কথা বলছি। তিনি ছিলেন এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান। পিতৃদেব জমিদার, এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আয় ভাল ছিল। কিন্তু পিতৃদেব ব্যবসা দেখলেন না। জমিদারীর আয় বসে বসে মহানন্দে খেতে লাগলেন। একটিমাত্র ছেলে, তিনি আদরের দুলাল হয়ে মানুষ হচ্ছিলেন। মাতা পিতা কেহই বিদ্যার কদর বুঝতেন না। কাজেই তাকে বিদ্যায় সুশিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহান্বিত ছিলেন না। বিদ্যালয়ে অবশ্য ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল, এবং গৃহে শিক্ষক রাখাও হয়েছিল। কিন্তু পড়ে কে? বাপের পয়সা ছিল, বাপেরও ছঁস ছিল না। কাজেই ছেলে স্কুল পালাতে লাগল এবং গৃহ শিক্ষকও বিরক্ত হয়ে দেখে ছাত্র বাড়ী নাই, তিনি তখন বাগানে সান্ধ্যভ্রমণ করছেন। বাড়ীতে একটা বৃদ্ধ কাকাতুয়া ছিল। সে অনেক কথা বলত। বাড়ীতে শিক্ষক মহাশয় ছড়ি হাতে ঢুকলেই বলত "খোকা, মাষ্টার এসেছে, পড়বি আয়।" খোকা তখন কোথায়? উধাও। কাজেই মাষ্টার কিছুক্ষণ বসে চলে যেতেন। কয়েকবার অভিযোগ করে মাষ্টার মহাশয় বুঝেছিলেন, তাঁকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে কেবল একবার হাজির হবার জন্যে। কাজেই বুঝতে পারছেন ঐ ছেলের বিদ্যা কতদূর গড়িয়ে ছিল।

(২) তাঁর বিদ্যা হয়নি বটে কিন্তু মাথা খাটতো অনেক ভাবে। উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর অদ্ভুত। যতরকমরকমারি শখের ছেলেরা করে, তিনি তার উপর দিয়ে যেতেন। কোনদিন ঘুঘনা-ওয়ালার ঘুঘনীর টিন লুকিয়ে রেখে মজা দেখছেন, কোনদিন চীনাবাদামের কাগজের পুঁটলী লুকিয়ে রাখছেন, কোনদিন কারও টিকি কেটে রাখছেন, কোনদিন সমস্ত আদায় কারও মাথে অল্প বস্তি ছড়িয়ে তার হাঁচির মজা উপভোগ করছেন। কোনদিন সাহেবরা যখন টেনিস খেলার জন্য কয়েকটি চুঁচো বাজী ছেড়ে দিয়ে তাদের খেলার লণ্ডভণ্ড অবস্থা উপভোগ করছেন। কালীপূজার সময় রকে বুড়োরা যখন নিশ্চিন্ত আরামে হুঁকো টানছেন তখন তাদের ছিপ ছাউই ছেড়ে দিচ্ছেন, ফলে কারের মধ্যে কেউ হুঁকো হাতে উল্টে পড়ছেন। এই সব কত নিত্য নূতন বদমাইসি করতেন যে তার ইয়ত্তা নাই। অনেক অভিযোগ অনেকে এনেছেন। ফলতঃ বাবস্থাও হয়েছে অনেক। তবে তাঁর খেয়াল নিয়ে তিনি ঠিকই চলতেন।

(৩) একটু বড় হোলে তখন এই সব দুষ্টামি কমে গেল বটে, তবে অন্য খেয়াল হতে লাগল। তাদের মধ্যে একটা ছিল ঘুড়ি। হঠাৎ রাত্রি ৮টার সময় খেয়াল হোল আমবাজার থেকে বালিগঞ্জ ছেঁটে আসা যাক। সঙ্গে এক সহচরের কাঁধে হাত দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বেড়াতে। প্রতি রাত্রে

১২টা পর্য্যন্ত তাঁর হাঁটার অভ্যাস কাজেই অসুবিধা ছিলনা। রাত্রি ১টার সময় খাবার সময়, রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত মশাগুলির মধ্যে হারিকেন জ্বেলে ডিক্‌সনারী পড়তেন। পরে শুয়ে পড়তেন। সকালে উঠতেন ১০।০টা। ১১টায়। তারপর চা খাওয়া, খবরের কাগজ পড়া, আড্ডা ইত্যাদি দিয়ে দুপর ১টায় মধ্যাহ্ন ভোজন পরম পরিতোষের সহিত। একদিন তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন নিমন্ত্রণে গত। বিকাল ৪টা নাগাদ্ শুনলেন তাঁদের একজন আত্মীয় মারা গেছেন। কাজেই খাবার দাবার ফেলা যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে বলেন "সে কি রে, খাবার দাবার কি ফেলতে আছে? লক্ষ্মী যে! নিয়ে আয় আমার কাছে।" তখন তিনি প্রোটা ৩৬ রকমী খাবার করলেন তরকারী সহ। চেহারায় পালোয়ান তেমন ছিলেন না, খাবার শক্তি ছিল কিন্তু অসাধারণ। তার অবশ্য আর একটি কারণ অনেক রকম খেলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। গল্ফিকা খেলেই শেষ পর্য্যন্ত প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাজী রেখে তিন টানে একটা সিগরেট শেষ করতেন, বিড়ি একটানে শেষ করতে পারতেন।

(৩) যতদিন তার মা বাবা জীবিত ছিলেন, কোন অসুবিধা ছিল না। তাঁরা গত হলে, দেখবার কেউ রইলে না, এবং যাঁরা দেখবার জন্য interest নিলেন, তাদেরও পাত্তা দিলেন না। কাজেই গৃহত্যাগী হয়ে এখানে সেখানে দিন কাটতে লাগলো, পরে শোনা যায় তিনি কুটপাতেই অনেক রাত্রি কাটিয়েছেন এবং শেষকালে কুটের ধারেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। যারা যাওয়ার সময় কিছু অর্থ ছিল যার দাম তখন ৫০।৬০ হাজার টাকা অথচ তিনি অদ্ভুত খেয়াল নিয়ে থেকে ভিখারীর মত জীবন সমাপ্ত করলেন। তার কোষ্ঠিটা আমার হাতে একবার এসেছিল, তাতে লেখা ছিল যে শেষ জীবন ভিখারীর মত কাটবে। অথচ কোষ্ঠি যখন তৈয়ারী হয়েছিল, তখন তিনি নেহাৎ বালক। এ ত গেল কোষ্ঠির ফল। আমি তার হাত দেখেছিলাম, ইচ্ছে ছিল একটা ছাপ নেবার, হয়ে উঠেনি। কিন্তু যেটুকু মনে আছে, তাতে তার হাতের রেখাগুলি ছিল এইরূপ :—

(১) জীবনীরেখা গভীর ও দীর্ঘ ছিল, একটী শাখা চন্দ্রের উচ্চস্থানেরদিকে প্রসারিত ছিল। মস্তিষ্ক রেখা মধ্যখানেবিধা বিভক্ত,দুইই চন্দ্রেরদিকে সরিয়েছিল. একটী চন্দ্রেরমধ্যস্থানে, দ্বিতীয়টী নীচের দিকে কব্জীর কাছ কাছি। হৃদয়রেখা কিছুটা উপরের দিকে অবস্থিত এবং শনির স্থান পর্য্যন্ত

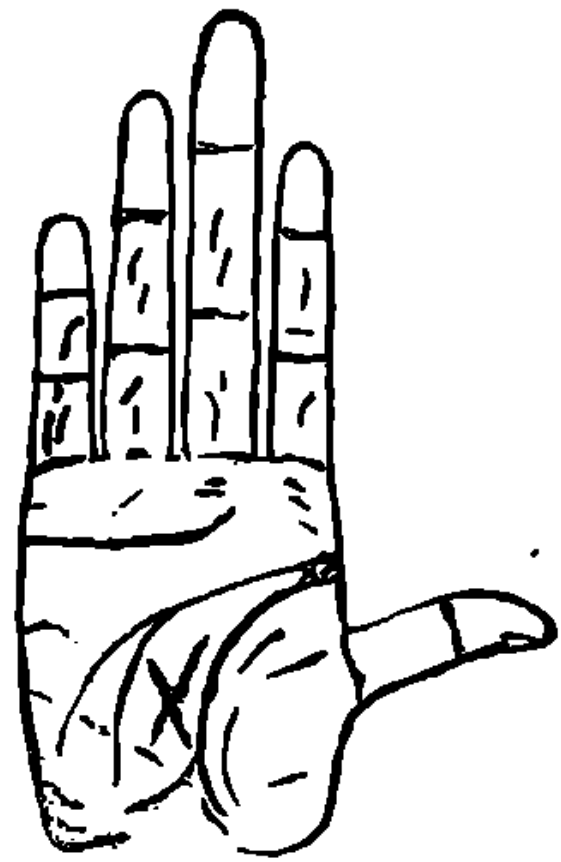

গিয়েছিল একাকী, কোন শাখা প্রশাখা না নিয়ে। রেখাটী অগভীর ও কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাভযুক্ত। দুই হাতেই কোন ভাগ্যরেখা ছিলনা, না ছিল স্বাস্থ্যরেখা। রেখাগুলি ছিল মোটা, ধারে ধারে ক্ষীণ শাখা রেখা অস্ফুট ভাবে পড়ে ছিল। মস্তিষ্করেখার নীচে মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্রে একটী বড় ক্রশ। পর্ব্বতের মধ্যে চন্দ্রের ক্ষেত্র সব চেয়ে উচ্চ, তাও সমান ভাবে নয়, ঢেউ খেলানো। বৃহস্পতির ক্ষেত্র অল্প পরিসরের। শনির কিঞ্চিৎ উচ্চস্থান, তাও রবির দিকে চলে পড়েছে। বুধ সমতল, মঙ্গল (Positive) আংশিক উচ্চ। শুক্র মোটামুটি।

(২) আঙুলগুলি মোটা মোটা, নখগুলি ছোট্টা, চওড়া। মধ্যমা ও অনামিকা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। বুড়ো আঙুল মাঝারি, কিন্তু Still চন্দ্রের স্থান কব্জীর দিকে নেমে এসেছে।

(৩) হাতের তেলো শক্ত ও কর্কশ ছিল, হাতের রং নিষ্প্রভ। রেখাগুলিরও উজ্জ্বল্যের অভাব ছিল, সবচেয়ে আকর্ষণীয়

ছিল—যথাস্থানে বিভাজক মস্তিষ্করেখা লগ্নমান চন্দ্রস্থানের উপর অবস্থিত।

(৮) চন্দ্র কল্পনার কারক, চন্দ্র কন্যার উপর গিয়ে পড়ায় কল্পনার প্রাবল্য ঘটেছিল। তার উপর মস্তিষ্করেখা মধ্যস্থলে বিভাজক হওয়ায় বিচার-বিবেচনার বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। উভয় শাখাই চন্দ্রের উপর পড়ায় কাল্পনিকতার আতিশয্য প্রায় সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল; বিশেষ করিয়া নীচের শাখাটি চন্দ্রের নিম্নমান দিয়া প্রায় কব্জীর নিকট আসিয়া পৌঁছায় ফলে উদ্ভট কল্পনাধারা তার মস্তিষ্কে চলিতে থাকিত। যে সব দুষ্টুমি করিয়া ফেলিতেন তা অনেক সময় অত্যাচারের আকার ধারণ করিত। কিন্তু কোনটাই Systematic নয়, নিছক খেয়ালের বশেই চলিতেন। ঠিক Criminal instincts ছিলনা, কারণ চুরি করা বা কাড়িয়া লওয়া এসব কিছু ছিলনা। বরং নিজের পয়সা খরচ করিয়া কোন বন্ধুকে পরিতৃপ্ত করিতে কার্পণ্য করিতেন না। কাহাকেও কায়দায় ফেলিয়া মজা উপভোগ করাই তাঁহার প্রধান আনন্দ ছিল।

(৯) হৃদয় রেখা শনির নিকট হইতে আসায় স্নেহপ্রবণতা কম ছিল। শনি ও চন্দ্র উভয় স্থান উচ্চ থাকায় আপন মনে অধিক সময় থাকিতেন এবং ছিন্ন ভিন্ন মলিন বেশধারী হইয়া কাটাইতেন। অথচ গা হাত পা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কম ছিল না। আর চৌবাচ্চা জল কেবল পায়েই ঢালিতেন। ঠিক খ্যাপা পাগল ছিলেন না। কোনরূপ ভুল বকিতেন না। বরং মনের মত কয়েকটি বন্ধুর সহিত আড্ডা মারিতে ও জল্পনা-কল্পনা করিতে দেখা যাইত। সরস্বতী পূজার তাদানের দিন এমন সং সাজিয়া বিকশায় বসিতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে যাইতেন যে তার নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব না বলিয়া দিলে চিনিতে পারিত না। এই সব রকমারি খেয়ালই ছিল তাঁর জীবনে। গল্পিকা সেবন এইরূপ এক খেয়ালের মধ্যেই আসিয়াছিল। পরে গল্পিকাই তাঁহাকে সেবন করিয়া ফেলিল।

(১০) বৃহস্পতির ক্ষেত্র মোক্ষগত থাকায় মান সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। ভাগ্যরেখা উদয় হতে না থাকায় স্বেচ্ছাচালিত হইয়া জীবন কাটাইতেন। জীবনের কোন লক্ষ্যই ছিল না। "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে"—এই ছিল তাঁর ভাব। আয়ু রেখা হইতে একটি শাখা চন্দ্রের উপর পড়ায় এই ভবঘুরের স্বভাবটির পাকা রং ধরিয়াছিল। মস্তিষ্করেখা ও হৃদয়রেখা পরস্পর অধিক দূরবর্তী হওয়ায় কোনরূপ সামাজিক বন্ধন, সংসার তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকের সহিত অবাধে মিশিয়া যাইতেন। বৃহস্থান হইতে কর্মকুশলতার কোন সাহায্য ছিল না। কাজেই জীবনটা একটা বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। মঙ্গলের ক্ষেত্রে বিরাট ত্রুটি ইহারই নির্দেশক।

(১১) এই যে অদ্ভুত খেয়ালের জীবন এবং এই যে শোচনীয় পরিসমাপ্তি তা কি করজনের লেখাদির দ্বারা পরিষ্কার ভাবায় লেখা ছিল না? কিন্তু পড়ে কে? মানে কে? আর পোষরাবার চেষ্টাই বা করে কে? তাই ত সংসারে এত অপচয় আর এত দুঃখ। সময়ে একটি কোঁড় দিলে অসময়ের বস্তাটি কোঁড়ের কাজে হয়, এটা অনেকেই বোঝেন না!

শ্রাবণ মাস কেমন যাবে?

শ্রাবণ মাসের গ্রহসংস্থান মন্দ নয়। বিশেষ করে রবি গ্রহ, বরুণ, প্রজাপতি ও বৃহস্পতি গ্রহের স্নেহদৃষ্টি পাচ্ছে, কাজেই রাজপুরুষের পক্ষে অনেক বিষয়ে শুভ। বরুণ ও প্রজাপতি গ্রহ নূতন ও অভিনবত্বের সূচক। কাজেই শ্রাবণ মাসের গোড়াতেই মানবের যে অভিনব অভিজ্ঞতা চন্দ্রগ্রহে পদার্পণজনিত ঘটে এই সাফল্যের মূলে রবিগ্রহের শুভ অবস্থা অনেকটা কারণ এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বৃহস্পতির স্নেহদৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞতা যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করে ফলবতী হবে এ অনুমান বা আশা করা যায়। রাহুগ্রহ বিরাট পরিবর্তনের কারক। শ্রাবণ মাসের গ্রহসঞ্চারের সময় রাহুর সহিত রাহুর যমজ নবম খুবই নিকট অংশে ছিল। কাজেই বিরাট পরিবর্তনের যুগ যে এই শ্রাবণ মাসেই ঘটল তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে Bank Nationalisation ও একটি বিরাট পরিবর্তন। রাহুর পরিবর্তন কতকটা

হঠাৎ হয় এবং তার সঙ্গে কিছু জ্বালা বা আলোড়ন থাকে। এটা বাদ দেওয়ার উপায় নাই।

চন্দ্রের অবস্থা খুব ভাল নয়। কারণ শনির দ্বারা বৈর দৃষ্টিতে আক্রান্ত। কাজেই জনসাধারণের উচ্ছ্বাস আশা ইত্যাদি বেশী করবার উপায় নাই। অবশ্য চন্দ্র রহিয়াছে স্বগৃহে এবং শুক্রের স্নেহদৃষ্টিতে। কাজেই জনসাধারণের কিছুটা সুযোগ সুবিধা আনন্দ হবেই। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, চন্দ্র, সব গ্রহ স্বক্ষেত্রে, কাজেই শ্রাবণ মাস অনেক বিষয়ে Epoch-making শুভ সূচনা করবে। শনি পুরাতন পন্থা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদির কারক, বৃহস্পতি গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কারক। গোচরে শনি বৃহস্পতি দুটি গ্রহই দুর্ব্বল। কাজেই অনেক পুরাণ পন্থা ইত্যাদি বজায় রাখতে পারে না, নূতনই অধিকার করবে নূতনের আবেগে। ফলের বৃদ্ধি হওয়ার তাদেরই জয় হবে। বীর, স্থির, বৃদ্ধ অথবা পুরাণ-পন্থী যাঁরা তাঁদের বেকায়দা চলবে। যাই হোক এখন ব্যক্তিগত ফলাফল আসা যাক্—

বৈশাখ—এই মাসে যাঁদের জন্ম তাদের শ্রাবণ মাস মধ্যমফলদায়ী দেখি। অবশ্য ১৭ই আগষ্ট থেকে রাহুর প্রকোপ আরম্ভ, তেজ বাড়বে। গৃহ বন্ধু মাতা এই সব সংক্রান্ত মনটা থাকবে বেশী ব্যাপৃত। বিদ্যালাভে মনঃসংযোগ করলে ভালই হয়। অধিক রাত্রে যে পড়ে গিয়েছিলেন এবার সেগুলি কমতে পারবে। শত্রু চিন্তাও দূর হবে অনেকটা, অর্থাগম ভাল দেখি। ছোট-খাটো ভ্রমণাদি সম্ভব। জ্ঞাতি আত্মীয় সংক্রান্ত চিন্তা করার কিছু নেই। তাঁরা ভালই manage করবেন। পেট যাতে ভাল থাকে সেদিকে নজর রাখবেন। দুশ্চিন্তা বেশী করবেন না। ভার যা আপনার মাথার তা তো এখন বহন করে যেতেই হবে, উপায় কি? ভাগ্য গড়তে বাধা ঠেলতে হচ্ছে ঠিকই। এই আগষ্ট পর্য্যন্ত Contract, agrement Correspondence স্বামীর বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য এই সব উদ্বেগের কারণগুলি থাকবে। তারপর বুদ্ধি ও তৎপরতার দরুণ, কাজ এগোতে পারবেন।

জ্যৈষ্ঠ—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই কাটবে। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন, ভোগ-বিলাস মন্দ হবেনা। কথার জোরে অনেক জায়গায় ভাল manage করবেন। এবার কর্ম্মে বড়াট এসে পড়ছে। কর্ম্মের বিস্তার হবে সত্যি, কিন্তু ডিঙ্গিক-ঘড়িক্ নানাবিধ কর্ম জীবনের সম্মুখে হাজির হবে। গৃহের ব্যাপারে এবার উদ্বেগের সূচনা। এই আগষ্ট পর্য্যন্ত সবকাজেই বাধা পাবার কথা, তারপর মুখের তোড়ে কাজ গুছিয়ে নিয়ে আনতে পারবেন। বন্ধুদের ব্যাপারে বেশী sensitive হবেন না। তবে সতর্ক থাকতে আপত্তি নাই।

আষাঢ়—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই। কর্ম্মের বড়াট থেকে এবার মুক্তি পাবেন। লটারীর যোগাযোগ এসে পড়ল। বন্ধুর ঘেড়েক ধরে Chance নিতে পারেন। চিন্তা যদি কিছু আসে ভয় খাবেন না। কারণ আপনি আছেন আপন দুর্গে। তবে অবরোধ-প্রতিরোধ মধ্যে মধ্যে হবেই। বিদ্যালাভ ও চর্চার চিন্তা এবার কমলো। জ্ঞাতি আত্মীয় প্রতিবেশী নিয়েই উদ্বেগ হাজির। গৃহ উৎপাৎ এবার কমবে। শেষের দশদিন নিজের মত চলে যাবে। নূতন বন্ধু লাভ হবে। আপনি যোদ্ধা বিনয়ী হলেও temper সপ্তমে উঠবে মাঝে মাঝে। কি দরকার বেকার মাথা গরম করে।

শ্রাবণ—আপনাদের শ্রাবণ মাস এক নূতন বার্ত্তা বা অবস্থার আনছে। অর্থাগম ভালই। বাড়ীতে কড়া নেড়ে টাকা দিয়ে যেতে পারে। সহজে যে টাকা আসার হচ্ছিল না, টপ করে এসে যেতে পারে। কিন্তু আপনার অর্থ চিন্তা ত কম দেখি না। প্রায় ছেড় বৎসর টাকার উদ্বেগ অশান্তি ভোগ করতে হবে। স্বাস্থ্য ও দেহের দিকে নজর রাখবেন। accidentএর সম্মুখিন হতে পারেন। চেষ্টা করে কিছু savings করতে পারেন, তবে বেশী হবেনা, এটা নিশ্চয়। জ্ঞাতি আত্মীয় নিয়ে উদ্বেগ এবার কমতে থাকবে। বৎসর ঘেড়েক এ বিষয়ে কর্কশায়ী কম গেল না। এবার বৈবাহিক কুটুম্ব নিয়ে কিছু উদ্বেগ এসে পড়ছে। বিবাহের যোগাযোগে নিজে বাদ সাধবেন না। হলে ভালই হবার কথা। যাঁদের বিবাহ হয়ে গেছে তাঁদের সন্তান লাভের যোগাযোগ দেখা যায়। যাঁদের সন্তান আছে তাঁরা তাদের জন্য কিছু সুব্যবস্থা করতে পারবেন।

ভাদ্র—আপনাদের শ্রাবণ মাসে ব্যয় বাহুল্য। কর্ম্মে সুখ সুবিধা অনেক পাবেন, তবে বেশী আতঙ্কিত থাকবেন

না। ছোটখিনিসকে বড় আকারে কল্পনা করে অনেক সময় অযথা দুশ্চিন্তা এনে ফেলবেন। এই ভাবের এইত এখন সুরু, বৎসর দেড়েক এইরকম চলবে। কাজেই কেন খামখা worry করা। স্থির হয়ে ঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নিজেই দেখতে পাবেন বৃথা দুশ্চিন্তা করছেন। বিবাহিত হলে পত্নীর বা স্বামীর শক্তি যোগাও, প্রবাসও বাড়বে। কাজেই তাঁকে তাঁর কর্মে বাধা সৃষ্টি না করে সাহায্য করার চেষ্টা করুন। যে ভার নিজের ক্ষমতায় কুলোচ্ছেনা, তাঁর হাতে তুলে দিন। তিনি দৌড়ঝাঁপ করে ঠিক manage করবেন। বেশী কাজ করলে পেজাজ অনেক সময় ঠিক থাকেনা। কাজেই তাঁর মুখের ঝাঁটা পেয়ে রাগ করবেন না। অর্থের উদ্বেগ এবার আপনার কমতে থাকলো। ঘর বাড়ী বা যান বাহন সংক্রান্ত কিছু ইচ্ছা অভিরুচি থাকলে তাঁর যা সামর্থ্য এগিয়ে যেতে পারেন। আর আপনার ভালই চলবে।

আশ্বিন—আপনাদের শ্রাবণ মন্দ কি? তবু ভয় ভয় ভাব, যেটা এতদিন ছিল, এবার সেটা কাটল। তবুও সতর্ক থাকবেন কারণ প্রজাপতি গ্রহ মাঝে মাঝে crisis সৃষ্টি করে বসেন। কর্মচিন্তা এখন আপনার প্রধান। মহানন্দে কাজে ডুবে যান। নিজের সামর্থ্য শক্তি বাড়বে। আয় ভাল হবে, কাপালও খুলবে। হেড বিক্রয় অক্ষুণ্ণ থাকবে। পেট ভাল থাকবেনা। হাবিজাবী খাওয়া এড়াবার চেষ্টা করবেন। বিবাহিত যাঁরা তাঁদের পত্নীর বা স্বামীর কাজের এবং দায়িত্বের ঝামেলা কিছু কমলো এবং কমতে থাকবে। এবার তাঁরা অনেকটা শান্তিতে থাকবেন। সেই পুরাণ হাসির রেখা মুখে কতকটা দেখতে পাবেন। সন্তান-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব উদ্বেগ এখনও চলবে বেশ কিছু দিন, ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

কার্ত্তিক—আপনাদের শ্রাবণ মাস কাজের দিকে ভাল। আয় নিয়ে অবশ্য এবার উদ্বেগ সুরু হোল। তেজ বিক্রয় বেশী দেখাবার চেষ্ট করবেন না। কারণ সেটা টেঁকবে না। পেটের দিকে নজর দিন। বেশী ভোজন করবেন না, উপরের লাগছে বলে। কারণ, দেখছি রসনা পরিতৃপ্তির দিকে মনটা ঝুঁকছে। বিবাহিত হলে দাম্পত্য জীবন ভালই। কিন্তু স্ত্রীর বা স্বামীর কিছু chronic দুর্ব্বলতা দেখা যাচ্ছে। একদিনে সারবে না নিয়মিত বহু নেওয়া প্রয়োজন। তিনিও কিছুদিন হোল গম্ভীর হয়ে বসেই আছেন, আরো কিছুদিন গম্ভীরই থাকবেন। কারণ তাঁর মাথায় এসে পড়েছে নূতন দায়িত্ব। জ্ঞাতি-আত্মীয় সংক্রান্ত উদ্বেগ এবার কমতে থাকলো, তবে ব্যয় এখনও চলবে তাঁদের কারণে। সন্তানদের স্বাস্থ্য বিদ্যা ইত্যাদি ভাল চলবেনা। বৎসর দেড়েক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। যাঁরা ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের লেখাপড়ায় মনসংযোগ কম দেখি। সামাজিক উৎসব আনন্দেই তাদের দিনটা কাটবে বেশী। কাজেই যাঁরা উত্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী তাঁরা অবহেলা করলে মনোমত ফল পাবেন না।

অগ্রহায়ণ—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই। এবার কর্মচিন্তা এসে পড়লো। যাঁরা ছোট এবং পিতা জীবিত, তাদের কর্মচিন্তার পরিবর্তে পিতৃচিন্তা এসে পড়ছে। পিতার উদ্বেগ অশান্তি দেখা যায়, এবং বৎসর দেড়েক থাকবে। স্থান পরিবর্ত্তন, গৃহ পরিবর্ত্তন, ভ্রমণাদি যোগ রয়েছে। বন্ধু-বান্ধবেরও পরিবর্তন হবে। যাঁরা ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের নূতন পাঠের দিকে মন যাবে। শরীর ভালই যাবে। নিজের দুর্গে বসে আছেন এরকম নিরাপত্তা বোধ করবেন। যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহ যোগ ভালই। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের দাম্পত্য-সুখ দেখা যায়। বৃদ্ধপ্রাপ্ত লোকের ধর্ম্মে মন পড়বে। আয়ের অংশও ভালই। অনেকটা দুশ্চিন্তা কাটলো এবার।

পৌষ—আপনাদের শ্রাবণ মাস মাঝারি। কর্ম্মের দুশ্চিন্তা এবার কাটলো, তেজ বিক্রয়ও বাড়ার দিকে। পারেন তো কিছু টাকা জমাবার চেষ্টা করুন। কারণ savingsএর যোগাযোগ দেখা যায়। ভাগ্যগঠনে বাধা আছে, উদ্বেগও এসে পড়বে। শরীরের দিকে একটু নজর রাখবেন। উপযুক্ত আহার করার চেষ্টা করুন। কোন-রূপ দুঃখ শোক তাপ পেতে পারেন। ভাল লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে, আপনার অনেক দিকে সুবিধে হতে পারে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকুন এবং পারেনত নূতন কিছু করার চেষ্টা দেখুন।

মাঘ—আপনাদের শ্রাবণ মাস খুব খুৎসই নয়। এবার বেশী খরচের দিকে পড়ে যাচ্ছেন। বৎসর দেড়েকে রাহু ও রাঘব বোয়ালের মত আপনার সঞ্চিত অর্থে খাবল মারবে। এবং সঞ্চয় না থাকলেও রেহাই নাই। যার

করিয়ে ছেড়ে দেবে। এতদিন বাইরে জোরে যে হাপট চালাচ্ছিলেন এবার সেই বাহুকে সংযত করুন। কারণ অধিক বিক্রম খাটবে না। সদ্‌বন্ধুর সংগে যোগাযোগ রাখুন, তাতে আপনার কাজ হবে বেশী। পড়াশোনার মন দিলে লাভ হবে, কাজ হবে। দুশ্চিন্তা, অর্থচিন্তার পক্ষেও সময়টা ভাল। আয় ভালই থাকবে। অধিক টাকার জন্য ছুটবেন না, কারণ ভুল schemeএ ফেঁসে যেতে পারেন।

কান্তন—আপনাদের শ্রাবণ মাস ভালই। এতদিন যে অত্যধিক ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল এবার তা কমবে। নিজের ভেতর প্রতাপও বাড়বে। Leadership, initiative এই সব দিক্ দিয়ে এগিয়ে যান। আপনি না চাইলেও আপনাকেই অনেকে সর্দার মানবে। যারা বেশী চালাকী করবে, আপনার দুয়ো খেলে বেঁটে হয়ে দৌড়বে। আপনার বুদ্ধি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখি। যারা কাজ করবে তাদের। অর্থ বিষয়ক সুরাহা হতে আরো সময় লাগবে, নভেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের পত্নী বা স্বামীর চিন্তা বাড়াতে পারে। কারণ তাঁরা থাকবেন কতকটা hypersensitive. তাঁদের মনে ফূর্ত্তি আনার জন্যে তাঁদের প্রয়োজন ও মনস্তত্ত্ব বুঝে ব্যবহার করবেন।

চৈত্র—আপনাদের শ্রাবণ মাস জোরদার না হলেও মন্দ নয়। যে কষ্টের আবহাওয়ায় ছিলেন এবার তা অনেকটা কাটলো। অবশ্য মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাবে ঠিকই। গুরু, মাতা, বন্ধু, বান্ধব এই সব ব্যাপারে ভালই। অর্থচিন্তা ভালই আছে এবং থাকবেও। তবে উপায়ও করবেন। হঠাৎ কিছু ধনপ্রাপ্তি বা অন্য কোন রকম লাভ সম্ভব। অবিবাহিত হলে বিবাহ প্রস্তাব আর ঠেলে ফেলে দেবেন না। বিবাহিতদের সন্তানস্থান ভাল নয়। একটা কিছু ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকবে। ধর্ম্মচিন্তায় ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ পাচ্ছেন না, বা সুযোগ থাকলে ইচ্ছা করছেন না। এর কোন্‌টা আপনি তলিয়ে দেখুন। মোটকথা এ বিষয়ে এখন অগ্রগতি নাই। শত্রুচিন্তায় লাভ কি? তাদের ক্ষতি করার চেয়ে আপনার ভাই তো বেশী। এবার হুড়-হাড় করে আপনার টাকা খরচের পালা সুরু হল। বৎসর ফেরেক ধরে নিতে পারেন।

প্রশ্ন বিচার ও উত্তর

১। **শ্রীকোমলেন্দু গুপ্ত**, কানপুর।

আপনার হাতে লাবধানতার প্রয়োজন অন্ততঃ ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত। একটি পোখরাজ ৪ রতি ধারণ করুন। প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায়, বা দুইবেলা ভক্তিভরে নবগ্রহস্তোত্র পাঠ করুন। কিছুকাল ছুটী লইয়া তীর্থস্থান ঘুরে আসতে পারেন। এক কথায় আপনার দৈববলে বলীয়ান্ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুশ্চিন্তা করে লাভ নাই। Practical হবার চেষ্টা করবেন, কারণ আমি দেখছি আপনি Idealistic ও ভাবপ্রবণ এবং ঝোঁকের মাথায় দুঃসাহসিকতা দেখান। আপনি মানুষ ভাল, কিন্তু একরোখা, তাই অনেক সময় বিপদ এসে পড়ে। যতটা liberal হয়ে adjust করতে পারবেন ততই ভাল। লঘুটে মধুসূদনের পুত্ত নাম কার্য্যকরী।

২। **এ. বসু**, উড়িষ্যা।

বিদ্যায় বিঘ্নবাধা আছে। সামাজিক আকর্ষণও আপনাকে পড়াশোনায় ভাল করে মন দিতে দেয় না। কিন্তু আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, আশাকরি একাগ্রতা নিয়ে এগোলে নিশ্চয়ই কতকটা কৃতকার্য্য হতে পারবেন।

ভবিষ্যতে চাকরী করতে পারবেন এবং চাকরী-জীবন গ্রহণ করলে ভালই উন্নতি করতে পারবেন।

৩। **শ্রীমতী এম্. ঘোষ**, চাকুরিয়া।

আগামী অক্টোবর মাস থেকে আপনার স্বামীর অর্থোপার্জ্জন যোগ ভাল, ১৯৭০ মার্চের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর চাকুরী বা অর্থোপার্জ্জনের কোন কর্ম্ম ঘটিবে।

আপনার গৃহলাভ বা ভূসম্পত্তি লাভ যোগ আছে। ৩১।৩৮ বৎসর বয়সে ঘটিতে পারে।

৪। **শ্রীকল্যাণ ব্যানার্জী**, শালকিয়া, হাওড়া।

১। আপনার বিদেশ ভ্রমণ যোগ আছে।

২। আপনি উচ্চপদস্থ বা সম্মানজনক চাকুরী পাবেন। ভাল চাকুরীর যোগ দেখা যায় প্রায় দুইবৎসর বাদে।

৫। **শ্রীপ্রভাস চন্দ্র কাব্যতীর্থ**, জ্যোতির্বিনোদ শিলদা, মেদিনীপুর।

১। ধর্মস্থান মধ্যম, অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ পার্থিব জীবনের আকর্ষণ বিলক্ষণ আছে। ধর্মচর্চা, ধর্মভাব আপনার আছে : ঐহিক সুখ আশা যত ত্যাগ করতে পারবেন ততই আধ্যাত্মিক উন্নতির রাস্তা খোলা পাবেন।

২। গোচরে শনির অবস্থান চন্দ্র হইতে ভাল থাকিলেও নৈসর্গিক আয়কারক রবি আক্রান্ত। কাজেই পিত্ত রক্ত, বক্ষ সংক্রান্ত দৌর্বল্য ঘটিতে পারে। ইহার পরেও শনির অবস্থান চন্দ্রাপেক্ষা ভাল থাকিবেনা। কাজেই স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে যতটা সম্ভব নিয়মাদি পালন কর্তব্য। অথবা দুশ্চিন্তা করবেন না। তাতে স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি। দীর্ঘায়ু হইবার পূর্বে সুস্বাস্থ্যই অধিক প্রয়োজন। কাজেই প্রাতঃ-ভ্রমণাদি সুরু করুন। আপনি লগ্ন লেখেন নাই। আপনার মেষ লগ্ন হলে পোখরাজ ধারণ করুন। বৃষলগ্ন হলে গোমেদ এবং নাভিলগ্ন উপকার করবে।

৬। **শ্রীঅরুণকান্তি দে**। কলিকাতা ৩০।

১। আপনার চাকুরীতে যথা যাহিত্ব ও পরিশ্রম যথেষ্ট দেখিতেছি। আপনি নিজেও খাটিতে পরাঙ্মুখ নন্। চাকুরীতে আপনার নিশ্চয়ই উন্নতি হবে, তবে দেরীতে। ধৈর্য ধরে থাকুন।

২। সাহিত্যিক হিসাবে যশস্বী হতে পারবেন। গোড়ায় সুযোগ সুবিধা না পেলেও হতাশ হবেন না। সাহিত্যে আপনার স্বাভাবিক অধিকার আছে দেখছি।

৭। **শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**, কলিকাতা ৫৭

১। আপনার মেজদাদার প্রথম কন্যার বিবাহযোগ পড়ে গেছে। চেষ্টা করে যান্।

২। ১৯৭১এর মধ্যেই বিবাহ হয়ে যাবে আশা করি। অধিক বিলম্ব হলে ১৯৭২ ধরে নিতে পারেন। কোষ্ঠী মিলিয়ে বিবাহ দেবার চেষ্টা করবেন। কারণ মেয়েটির জন্মচক্রে ভৌম দোষ আছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী ও সৎ-স্বভাবা। উদর পীড়া দেখা যায়। গলার রোগ মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে পারে।

কয়েকটি কথা। প্রশ্ন অনেকে দুটির বেশী করেছেন। কেহ কেহ চিঠি লেখার সময় দেননি। কেহ কেহ জন্মচক্র পরিষ্কার ভাবে লেখেননি। কেহ লগ্ন বা রাশি লিখতে ভুলে গেছেন। কেহ জন্মচক্র দশা ইত্যাদি না দিয়ে কেবল জন্মসময় ইত্যাদি দিয়েছেন যার ফলে আমাকেই সব করতে হয়েছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা বা লাহিড়ী মহাশয়ের Ephemeris হইতে কৃত জন্মচক্র দশা ইত্যাদি পাইলে তবেই আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে। চিঠিতে ডাকটিকিট পাঠাচ্ছেন লিখে, ডাকটিকিট দিতে কেহ কেহ ভুলে গেছেন। সেক্ষেত্রে ভাগ্যবশেই উত্তর দিয়েছি আলাদা উত্তর দিইনি। ভবিষ্যতে উত্তর মিললে সংবাদ জানালে কৃতার্থ হব।

যাঁরা ডাকটিকিট দিয়েছেন তাঁদের কাহারো কাহারো উত্তর আলাদা গেছে এবং বাকী আছে।

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি ?

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দেবেন সুরাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাঁদের জন্মচক্র, গ্রহের স্ফুট, বিংশোত্তরীর দশা বা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri's Ephemenis বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ সুরাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটীর বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না: এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন। অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটী ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি 'কুপন'-এ দুটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

আপনি যদি প্রশ্নের উত্তর গোপনীয় ভাবে চান তাহলে ডাকটীকিট ও ঠিকানা সহ ভারতবর্ষ-এর ঠিকানায় অনুরোধ জানাবেন। সেক্ষেত্রে সুরাচার্য্য মহাশয় সরাসরি আপনাকে উত্তর দেবেন। পত্র লেখার সময় ও তারিখ পত্রে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপ ও পাঠাতে পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্ঘাটনের সহায়তা হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না ; Stamp padink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink, Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভুষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে মুখ খারাপ হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও সুরাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় বা গুরুতর, বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন যাচ্ঞা করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক। কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন।

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা ?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধতে পারবো কি ?" "দেনা শুধতে কত সময় লাগবে ?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এই সব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যই ব্যাকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক ভাবে মিলে গেলে সুরাচার্য্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

ভারতবর্ষ আষাঢ় **গ্রহ-জগৎ**

ছঁশিয়ারী

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি একটি করি
হিংসার হিংসা গড়ি
চলিয়াছ কোন্ মোহে হে বৈজ্ঞানি।
প্রাণ হত্যা করিবারে
ধ্বংসমূলী সাধনায়
কেবা তোমা দিল অধিকার ?
একি তবে তত্ত্বের বিলাস ভ্রূকুটি !
না: ? রাষ্ট্রীয় খাতিরে শুধু
অনিচ্ছায় ইচ্ছার প্রয়াস ?
যে-সাধনা একদিন করেছিল
প্রকৃতির অতলান্ত রহস্যের
দ্বার উদ্ঘাটন—
লেগেছিল সাত্ত্বিক মানব কল্যাণে
কেন তারে ঠেলে দিলে
ভীষণের প্রলয় আননে !
ঘটাবোনা বুঝি ভ্রম !
চেতনার মহানন্তায়
জেগে উঠে পুনরায়
ফিরে যাও মঙ্গলের সাড়া
সেই বাণী শুনে হোক
মানবের মন-আত্মহারা।

———

বর্ণ সুষমায় ও বয়ন বৈচিত্রে অতুলনীয়

বাংলার তাঁত বস্ত্র

উৎসবে এবং নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করুন

॥ সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান ॥

০ ওয়েস্ট বেংগল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড ;
৬৭, বস্ত্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ও

—ঃ শাখা কেন্দ্র ঃ—

০ গভর্ণমেণ্ট সেলস্ এম্পোরিয়াম্
৭১, লিনড্‌সে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ১২৮।১, বিধান সরণী, কলিকাতা ;
১২৯।১।এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা ; ১৮।এ, গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড (সাউথ), হাওড়া।

। তাঁত শিল্প বাঙালীর রুচি ও কৃষ্টির প্রারক ও বাহক ।

পশ্চিমবংগ সরকার প্রচারিত

কিশোর জগৎ

ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল—

শ্রীজ্ঞান

এই কিছুকাল আগেই এক অভূতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য, অবিস্মরণীয় ঘটনা যে ঘটে গেল তা তোমরা সকলেই জান! ঘটনাটি হল চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ! যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের আর এক জগতের মাটিতে পদক্ষেপ! বিশ্বের বাইরে এই যে পদক্ষেপ এ ছিল এতদিন শুধু মানুষের কল্পনায়। এ যে কখনও বাস্তবে সম্ভব হবে তা বোধ হয় বেশীর ভাগ কেউই বিশ্বাস করত না। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডও সংঘটিত হল এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এ যে কত বড় ব্যাপার তা তোমরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছ। এ হচ্ছে এক অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার এক অসাধারণ সাফল্য। আর এই সাফল্যের শেষ শুধু কি এইখানেই? না, এ শুধু প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এ খুলে দিল নতুন দিগন্ত, দিল নতুন পথের সন্ধান। এর পর মানুষ ছুটে চলবে বিশ্বের বাইরে দূর হতে দূরান্তরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে! এই পৃথিবীর মানুষের পদাঙ্ক পড়বে বিভিন্ন গ্রহের মাটিতে! দূর হবে নিকট। হয়ত অসীম আলোক-বর্ষের সীমাহীন দূরত্বেও গ্রহজয়ী মানুষ একদিন পাড়ি জমাবে! আজ হয়ত এ অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সময়ে প্রমাণিত হবে যে এও সত্য হল।

যুগ যুগ ধরে যে চাঁদ পৃথিবীর মানুষকে আলো দিয়ে আসছেই শুধু নয়, নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে চলেছেও, সেই অজানা রহস্যময় চাঁদ আজ মানুষের কাছে যেন ধরা পড়ে গেছে। তার রহস্য এবার ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত

হতে চলেছে। এর পর আরও মানুষের পদক্ষেপ পড়বে চাঁদের বুকে। পরে এই চাঁদকে মধ্যবর্তী "ষ্টেসন্" রূপে ব্যবহার করে বিশ্বের মহাকাশচারীরা দূরান্তরের গ্রহে পাড়ি দেবার চেষ্টা করবে।

চাঁদের পর মঙ্গল গ্রহের দিকেই মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের নজর রয়েছে। কারণ চাঁদের পর পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ হল মঙ্গল এবং অনেকের ধারনায় মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক সাদৃশ্যও নাকি আছে, আর মঙ্গলগ্রহে জীবন থাকাও সম্ভব। তাই মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের মাটিতে একদিন মানুষ নামবার চেষ্টা করবেন,তবে তার এখনও দেরী আছে। কিন্তুদেরীথাকলেও মানুষ যে মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহে পদক্ষেপ করবে সে বিশ্বাস আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি তোমাদের তো বটেই, আমাদের জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর মহাকাশচারীরা মঙ্গলের মাটিতে পদক্ষেপ করবে, আর ধীরে ধীরে এই লোহিত-গ্রহের রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হবে—জানা যাবে তার রক্ত রংয়ের কারণ, আর জীবন সেখানে আছে কি না।

একদা এই চাঁদ ও মঙ্গলকে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। তাঁদের সঙ্গে সমতালে বিশ্বের কয়েকজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকও তাঁদের অসাধারণ দূরদৃষ্টির সাহায্যে এই দুটি গ্রহকে নিয়ে সৃষ্টি করে গেছেন সার্থক সাহিত্যও! তাঁরা আজ নেই ; কিন্তু তাঁরা কল্পনায় যা দেখে গেছেন ও লিখে গেছেন আজ বাস্তবে প্রায় তাই সত্য হতে চলেছে! ফরাসী সাহিত্যিক জুল ভার্ণ ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক। তাঁর প্রায় শতবর্ষ আগে লেখা গ্রহান্তর গমনের গল্পের ও সাগরের নীচে সাবমেরিনের চিত্তাকর্ষক কাল্পনিক কাহিনীর অনেক কিছুই আজ সম্ভব হতে চলেছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক এইচ, জি, ওয়েলস্‌ও তাঁর চমকপ্রদ কাল্পনিক গল্পের মধ্য দিয়ে চাঁদে যাওয়া, অন্য গ্রহের জীবের পৃথিবীতে আগমন প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে লিখে গেছেন। এঁরা কেউই কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না ; কিন্তু তাঁদের কল্পনাশক্তি ও দূরদৃষ্টি এতই প্রখর ছিল যে তাঁরা বহুকাল আগেই যেন ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন মানুষ কিভাবে মহাকাশ পরিভ্রমণ করবে। জুল ভার্ণ-এর লেখা থেকেই আজকের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা প্রেরণাই শুধু লাভ করেন নি,—শোনা যায় জুল ভার্ণ-এর কাল্পনিক মহাকাশযানের গঠন থেকেই নাকি আজকের মহাকাশযানের সার্থক পরিকল্পনা হয়েছে। জুল ভার্ণ মহাকাশে ভারহীনতা প্রভৃতি অনেক তথ্য তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে প্রচার করে গেছেন। তোমরা, যারা জুল ভার্ণ ও এইচ, জি, ওয়েলস্‌-এর লেখা গল্প এখনও পড়নি, তারা বইগুলি জোগাড় করে পড়ে ফেল। পড়লেই বুঝতে পারবে তাঁদের কল্পনা ও দূরদৃষ্টি কত প্রখর ছিল। এইসব পুস্তক পাঠ করলে তোমাদের কল্পনাশক্তিও বৃদ্ধি পাবে, আর দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণাও লাভ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক সাফল্যের তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পিছনে পড়ে আছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে আমাদের দেশের তরুণরা মহাকাশ ভ্রমণের দুঃসাহসিক সুযোগ লাভ করবে না, একথা বলা চলে না। কে জানে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় তরুণদেরও ডাক পড়বে আর্মষ্ট্রং, এলড্রুইন্, কলিনস্-এর মতন মহাকাশে পাড়ি জমাবার জন্য! আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় তরুণরা সাহস, শক্তি ও বুদ্ধিতে কোনও দেশের তরুণদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। শুধু সুযোগের অভাবে ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই তারা পিছিয়ে পড়ছে, আর কুটিল রাজনীতি ও ছলনীতির জালে তারা জড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃত শিক্ষা, সুযোগ ও সর্বোপরি সুষ্ঠু নেতৃত্ব পেলে তারাও এগিয়ে চলতে পারবে বিশ্বের সকল প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে সমতালে।

আজ মহাকাশে যেন বাজছে দুন্দুভি, মহাকাশ যেন ডাকছে পৃথিবীর মানুষকে তার বুকের অসীম রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যে! তোমরা তরুণের দল, তোমাদের কানে কি সে ডাক পৌঁছাচ্ছে না? তোমরাও প্রস্তুত হও ভবিষ্যতের জন্যে, ধ্বনিত হোক তোমাদের কণ্ঠে বিদ্রোহী কবি নজরুলের গান :

ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্—

চিত্রগুপ্ত

নানা-ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে যে কত সব বিচিত্র রহস্যময় আশ্চর্য মজার কারসাজি দেখানো সম্ভব, তার কিছু কিছু হদিস তোমাদের ইতিপূর্বেই দিয়েছি। এবারেও তোমাদের তেমনি-ধরনের আরেকটি অভিনব ভৌতিক-লোকদীপক কারসাজির কথা বলছি। এবারের এই মজার খেলাটির নাম হলো—"ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনি"। এ খেলাটির কলা-কৌশল রপ্ত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় এবং খেলা দেখানোর জন্য যেসব রাসায়নিক উপকরণ জোগাড় করা দরকার, সামান্য চেষ্টা করলেই সেগুলি তোমরা অল্প-স্বল্পে সহরের যে কোনো বড় ওষুধের বা রাসায়নিক পদার্থের দোকানে কিনতে পাবে। কাজেই সেই সব টুকিটাকি উপকরণ সংগ্রহ করে ছুটির অবসরে বিচিত্র রহস্যময় এই "ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনি" জ্বালিয়ে-তোলার কারসাজি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের ধাঁধা তাক্ লাগিয়ে দিতে চাও তো চটপট লিখে নাও—এ খেলার সহজ-সরল কলা-কৌশলটুকু।

ছোটবেলা থেকেই তোমরা সকলেই তো লোকের মুখে এবং গল্পের বইয়ের রহস্যময় ভৌতিক আলোর আলো জ্বলার নানান্ আশ্চর্যকর-অদ্ভুত সব কাহিনী শুনেছো আর পড়েছো। সহর থেকে দূরে গ্রামের প্রান্তে নির্জন-নিরালা জলা-জঙ্গলের মাঝে রাতের অন্ধকারে হাট-বাজারের কাজকর্ম সেরে মেঠো পথ ধরে ঘরে ফিরে যাবার সময় কত লোক যে আচমকা ভূতুড়ে-ভাস্কর আলোর রহস্যতঃ সঞ্চালিত রোশনি আলো জ্বলে উঠতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে কিংবা চেতনা হারিয়েছে এমন অনেক কাহিনী হামেশাই শোনা যায়—কিন্তু নিজের চোখে এ সব অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ বরাতে বড় একটা ঘটে না। কাজেই এমন অদ্ভুত কাণ্ড চোখের সুমুখে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ যখন মিলছে তোমাদের রাসায়নিক বিজ্ঞানের দৌলতে, তখন নিজেরাই হাতে-কলমে পরখ করে জেনে রাখো—এই ভৌতিক লীলার আসল রহস্যটুকু।

তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, তাদের সম্ভবতঃ ভালোই জানা আছে যে অক্সি-বায়ুর সংস্পর্শে এলে 'ফসফরাস্' নামে রাসায়নিক পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বাষ্পাকারে মিশে যায়। এই রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে, বিজ্ঞানের রহস্যময় প্রক্রিয়ায় বাষ্পের রঙ নীলাভ-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে···অন্ধকারের মাঝে অদ্ভুত রেখার আলোর রোশনির মতো। তবে সে রোশনি হয় ক্ষণস্থায়ী···মাত্র বিভিন্ন দুটি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ কালটুকুর জন্য···বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বিলীন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নীলাভ আলোর উজ্জ্বল রোশনিও হয় অদৃশ্য। তাই বিজ্ঞানের এই বিচিত্র রহস্যময় কারসাজি-টুকুর সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই, তাঁদের কাছে এ ঘটনা অলৌকিক ব্যাপার বা ভৌতিক কাণ্ডের সামিল বলেই অনুমান হয়। আসলে কিন্তু, আলেয়ার এই নীলাভ-আলোর রোশনি জ্বলে ওঠার কারণ—'ফস্ফরেটেড্ অক্সিজেন গ্যাস' অর্থাৎ, ফসফরাস্ আর অক্সিজেনের বাষ্পাকারে সংমিশ্রণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক-গবেষকেরা বলেন যে পচিল জলা-জঙ্গলে যখন জৈবিক আর উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি ক্রমশঃ পচে ও গলে গিয়ে রূপান্তরিত হয়, তখনই সৃষ্টি হয় বিচিত্র-রহস্যময় এই 'ফস্ফরেটেড্ অক্সিজেন গ্যাস'। 'ফস্ফরাস্' বা 'ক্যালসিয়াম্ ফস্ফাইড্' পদার্থ সংগ্রহ করার অসুবিধা ঘটলে, দেওয়ালীর সময় বাজারে 'চটপটি' নামে যে বাজি পাওয়া যায়, সেই জিনিষ জলে গুলে নিলেই সহজেই 'ফস্ফরাস্' মিলবে।

কিন্তু এ সব তো বিজ্ঞানের তথ্য পরিচয়···আপাততঃ শোনো—তোমরা নিজেরা কি উপায়ে এমনি "ভূতুড়ে-আলোর আজব রোশনি" সৃষ্টি করতে পারবে, তারই হদিশ দিই।

এ-ধরণের 'ফস্ফরেটেড, অ'শ্বজেনের গ্যাস' জ্বালিয়ে তোলার দুটি উপায় আছে।

প্রথমটি হলো—সংবাচর রাসায়নিক গবেষণাগারে যেমন ব্যবহার হয়, এমন একটি লম্বা নল বসানো কাঁচের একটি 'ফ্ল্যাস্কের' (flask) বা কাঁচ-কুপীর ভিতরে খানিকটা ফস্ফরাস্ আর জল মিশিয়ে জ্বলন্ত বাতি বা স্পিরিট-ল্যাম্পের আগুনের তাপে ফোটালে কিছুক্ষণ বাদেই ঐ নলের মুখে উত্তাপহীন বিচিত্র এক-ধরণের নীলাভ উজ্জ্বল আলোর শিখা নজরে পড়বে। তবে ঘরটি অন্ধকার থাকলেই এই শিখা দৃষ্টিগোচর হবে—দিনেরবেলা কিম্বা বিজলীবাতির আলোয় এ-শিখার রোশনি সহজে চোখে দেখা যাবেনা। কাজেই ঘরে বসে "ভূতুড়ে আলোর" এই "আজব রোশনি" পরখ করে দেখবার সময়, সারা কামরাটি অন্ধকার থাকা প্রয়োজন—নাহলে এ কারসাজির মজাটুকু মোটেই জমবেনা।

এ কারসাজি দেখানোর দ্বিতীয় এবং আরো চমকপ্রদ মজার উপায় হলো—আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এ-কারসাজি দেখানোর আগেই বিকালে দর্শকদের দৃষ্টির অগোচরে বাড়ীর বাগানে কিম্বা কাছাকাছি কোনো মাঠে ছোট একটি গর্ত খুঁড়ে, সেই গর্তের ভিতরে অল্প-পরিমাণে খানিকটা "ক্যালসিয়াম ফস্ফাইড্" (Calcium Phosphide) ভরে রেখে, আলগাভাবে বালি-মাটি (বালি মেশানো মাটি) ছড়িয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর সন্ধ্যার পর বা অন্ধকার রাতে দর্শকদের সামনে খেলার আসরে (অর্থাৎ সেই গর্তের সামনে) হাজির হয়ে ইতিপূর্বে বিকালে বালি-মাটি ছড়িয়ে ঢেকে রাখা সেই গর্তের উপর খানিকটা জল ছিটিয়ে দিলেই আবছা আঁধারের মাঝে সকলেই সচকিত হয়ে লক্ষ্য করবেন যে আলেয়ার আলোর মতোই অলৌকিক অদ্ভুত 'ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনির' নীলাভ উজ্জ্বল শিখা বিচিত্র রহস্যময় লীলায় জ্বলছে নিভছে আর এপাশে ওপাশে ছুটে বেড়াতে সুরু করে দিয়েছে।

এই হলো—"ভূতুড়ে আলোর আজব রোশনি" খেলাটির আসল রহস্য।

আগামী বারে এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-বিচিত্র বিজ্ঞানের খেলার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

মনোহর মৈত্র

১। সময়ের হেঁয়ালী :

গ্রীষ্মের রাত···তবুও গরমে চোখে ঘুম আসছে না। শয্যায় চুপচাপ শুয়ে রয়েছি···পাশের দালানে দেয়ালের গায়ে টাঙানো ঘড়ির পেণ্ডুলামের অবিরাম দোলনের একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছে কানে—টিক্-টিক্-টিক্। দেয়াল-ঘড়িটি পুরোনো আমলের···প্রতি আধ-ঘণ্টা অন্তর টং করে শব্দ রাখে এবং প্রত্যেক ঘণ্টায়ও সশব্দে বেজে সবাইকে জানিয়ে দেয় সময় কত হলো। ঘুম আমার ভেঙেছে রাত বারোটা দশ মিনিটে।···তার-পর থেকে সমানে জেগেই রয়েছি···কতক্ষণ—তার কোনো হদিশ মেলে না। বলতে পারো—রাত ঠিক ক'টা বেজেছে, তার সঠিক হদিশ জানতে হলে, আরো কতক্ষণ আমায় এমনিভাবে জেগে থাকতে হবে ?

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের চিত্ত ধাঁধা :

লেখা-পড়া শিখে তোমরা সবাই তো দিনে-দিনে বেশ বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হয়ে উঠছো। কাজেই বুদ্ধি খাটিয়ে বলো তো দেখি কোনো একটা খাটকে খাটো করতে হলে, সেটিতে কি যোগ করা দরকার ?

রচনা : চিন্তাহরণ মজুমদার (কানপুর)

৩। মাঠে খেলার মাঠের টিকিট-ঘরের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো একরাশ লোকের মাঝে তুমিও রয়েছো। কখন তোমার সুযোগ মিলবে টিকিটঘরের গারদের ভিতরে গিয়ে বসবার। লাইনের সুমুখ দিক থেকে গুণলে হয় দশম এবং পিছন দিক থেকে যদি গোণো, তাহলে হচ্ছে একাদশ। হিসাব কষে বলো তো দেখি সেই লাইনে মোট কত জন দাঁড়িয়ে রয়েছেন ?

মৃণাল চৌধুরী (রাঁচী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বিশেষ কারণে এই সংখ্যায় গত মাসের "ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম-ধাম প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো না। আগামীসংখ্যায় যথা-রীতি সেগুলো প্রকাশিত হবে।

॥ চিত্রে চুম্বন ॥

শ্রী'শ'—

ভারতীয় চলচ্চিত্রে এবার চুম্বন দৃশ্য দেখা যাবে। আর শুধু চুম্বনই নয়, তৎসহ নগ্নদেহও দৃশ্যমান হবে। খোসলা কমিটি এই চুম্বন দৃশ্যের ও নগ্নদেহ দেখানর সপক্ষেই রিপোর্ট দিয়েছেন। সুতরাং শীঘ্রই এই সব দৃশ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে দর্শক-জনতাকে (এখন জনতাই তো সব) পরিতৃপ্ত করবে। খোসলা কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে ভারতীয় সংস্কার, সংস্কৃতি ও সমাজের মোহ থেকে মুক্ত করে তাকে আরও প্রগতিশীল বা progressive করে তুললেন। "জয়, খোসলা কমিটির জয়"—বলে উর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করতে ইচ্ছা করছে এবং তৎসহ "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি (যা সব ব্যাপারেই চলে থাকে) দেবারও প্রবল বাসনা জাগছে। ধন্য এই খোসলা কমিটি, ধন্য তার বিচার ও বিবেচনা। তাঁরা ঠিকই ধরেছেন চুম্বন ও নগ্নদেহ দেখাতে না পারলে পরিচালকরা ঠিকমত তাঁদের ভাবকে প্রকাশ করতে পারেন না; অর্থাৎ এই সব দেখাতে না দেওয়া মানে পরিচালকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা,—এবং তা করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম, বিশেষ করে এই গণতন্ত্রের যুগে। সুতরাং ('ইনক্লাব' ধ্বনি সহ) আজকের এই গণতন্ত্রকে সেলাম জানিয়ে খোসলা কমিটি অনুমতি দিয়েছেন যে পরিচালকরা তাঁদের ভাবপ্রকাশের সহায়করূপে চুম্বন ও নগ্নদেহ চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করতে পারবেন। আর আপামর দর্শক সাধারণ, বিশেষ করে সামনের শ্রেণীর দর্শকজনতা বিপুল উল্লাসে 'সিটি' বা শিষ, করতালি, চেয়ার চাপড়ান (উল্লাস বেশী হলে কয়েকটি চেয়ার ভাঙতেও পারে) প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে দৃশ্যগুলি যে তাঁদের ভাল লাগছে বোঝাতে চাইবেন। আর পিছনের শ্রেণীর দর্শক সাধারণের মধ্যে উপবিষ্ট সকন্যা পিতা, ভগিনীসহ ভ্রাতা ও

পুত্রসহ মাতা প্রভৃতি পরিবারের সকলেই নিশ্চয়ই এই সব বাস্তব দৃশ্য (এখনকার বস্তুতান্ত্রিক জগতে নাকি বাস্তব সব কিছুই বহুমূল্য) অতি আগ্রহ-আনন্দে উপভোগ করবেন, আর হয়ত পরস্পরের গা টেপাটেপি করে দৃশ্যগুলির তারিফও করবেন। আ-হা-হা—এই সব দৃশ্য যেন আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। রূপালী পর্দ্দায় যা দেখান হবে তা ভাবতে পারলেও লিখতে কলম সরল না (সেন্সরের ভয় এখনও আছে তো, কিছুদিন পরে আর অবশ্য থাকবে না) তাই শুধু প্রেক্ষাগৃহের একটু বর্ণনা দিলাম।

ইতিমধ্যে খোসলা কমিটির এই যুগান্তকারী (নগ্নযুগের সূচনা হচ্ছে কি না।) অভিমতকে নানা জনে নানা মতে অভিহিত করছেন। কয়েকজন প্রখ্যাত পরিচালক এটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। নায়করা নায়করাও একে সোল্লাসে অভিনন্দিত করেছেন (চুম্বন দৃশ্যে নায়িকাকে চুম্বনের অধিকার তো তাঁদেরই, আর নগ্নদৃশ্যে তাঁদের নগ্ন হবার বোধহয় দরকার হবে না ; কারণ দর্শকরা কুমারদের নগ্নদেহ দেখতে যে বিশেষ আগ্রহী হবেন বলে তো মনে হয় না। সে ক্ষেত্রেও সেই নায়িকাদের নিয়েই টানাটানি। সুতরাং নায়কদের উল্লসিত হওয়াই তো উচিত)। তবে কয়েকটি নামী নায়িকা এর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে ফেলেছেন। (এর জন্যে তাঁদের "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে ধিক্কার দেব কি না ভাবছি)। সংবাদপত্রে চিঠি-পত্র লিখেও কিছু কিছু বে-আক্কেলে লোক এই অপরূপ রিপোর্টের বিপক্ষতাচরণ করছেন। (এই সব ভারতীয় সংস্কৃতি, শোভনতা ও শালিনতার প্রতি এখনও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের "পুঁজিবাদী", মানে সংস্কারের পুঁজি আগলে রয়েছেন এইরকম একটা কিছু বলে আর কি চিহ্নিত করে শাস্তিবিধান করা উচিত নয় কি ?)

যাই হোক, আমরা এখন ভারতীয়,বিশেষ করে বোম্বাই চিত্র-নির্ম্মাতাদের পরবর্ত্তী চিত্রগুলির অপেক্ষায় দিন গুনছি। এতদিন সেন্সরের কাঁচি এড়িয়ে তাঁদের চিত্রগুলি প্রায় অর্দ্ধনগ্ন হয়ে এসেছে আর জড়াজড়িও প্রায় চুম্বনের কাছাকাছি চলে এসেছে। এবার যখন অনুমতি পাওয়া গেল তখন বোম্বাই চিত্র চুম্বন ও নগ্নদৃশ্য সম্বলিত হয়ে যে কি অপরূপ রূপে রূপায়িত হয়ে উঠবে তাই ভেবেআমরা আনন্দে, উল্লাসে, উৎসাহ, উদ্দীপনায় শিহরিত হচ্ছি, আর ভাবছি ধন্য আমরা, এই মহাপ্রগতির যুগে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি বলে। আমাদের সন্তান সন্ততিগণও ধন্য,—এই প্রগতির যুগে জন্ম-গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই তো এই সব মহান্ দৃশ্য চিনাবাদাম চিবোতে চিবোতে ও আইসক্রীমের আস্বাদ নিতে নিতে বন্ধু ও বান্ধবীসহ দেখতে পারবে।

আজ শুধু দুঃখ হয় আমাদের স্বর্গত পূর্ব্বসূরীদের জন্য। তাঁরা আগে জন্মে ফেলেছিলেন বলেই না এই সব মহান্ দৃশ্য দর্শন থেকে বঞ্চিত হলেন! খোসলা কমিটির এই রিপোর্টের কথা তাঁরা যদি জানতে পেরে থাকেন (তাঁদের পক্ষে জানা খুবই সম্ভব; কারণ তাঁরা তো হাওয়ায় খবর পান !) তাহলে তাঁদের অনেকেই হয়ত কবরের মধ্যেও ওলট্-পালট্ খাচ্ছেন, আর যাঁরা ভস্মীভূত হয়েছেনতাঁরা হাওয়ায় হাহাকার করে ফিরছেন। তবে মনে হয় এ সব দৃশ্য দেখার লোভ তাঁরা সম্বরণ করতে পারবেন না। চর্ম্মচক্ষে দেখার সুযোগ না পেলেও, তাঁদের ও-জগতের চক্ষে ভারতীয় চিত্রের এই "প্রগতিশীল" দৃশ্য সমূহের রসাস্বাদনের জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই প্রেক্ষা-গৃহে ভীড় জমাবেন। (তাঁদের তো আর টিকিট লাগবেনা। আর "সিট"-এও তাঁরা বসবেন না, আর অদৃশ্য বলে তাঁদের ভীড়ে আমাদের অসুবিধাও হবে না।) তবে একটা ভয় এই যে এই সব দৃশ্য দেখার আনন্দের আতিশয্যে তাঁরা আবার প্রগতিশীল ছোকরাদের স্কন্ধে ভর করে না বসেন। তাহলেই কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হয়ে যাবে। খোসলা কমিটির রিপোর্ট সেই নৃত্যেরই আয়োজন করছেন বলে মনে হয়, অতএব সাধু সাবধান !

ফ্রাসোঁয়া ত্রুফোঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রীমতী চন্দ্রিকা সেন

প্রঃ। আমেরিকার চলচ্চিত্রের উৎকর্ষতার সম্বন্ধে আপনি চিত্র পরিচালক হিসাবে কি অভিমত পোষণ করেন?

উঃ। আমেরিকার পরিচালকদের তুলনায় অন্তরা তো বটেই, এমন কি আমি নিজেও বেশী বিচার-বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন বলে মনে করি। মার্কিনী চিত্রের বর্বরতা এবং স্থূলতা নকল করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের মধ্যে মেলভিল ঐ পথ অনুসরণ করে শিল্পের ক্ষেত্র থেকে বিপথগামী হয়েছেন।

চলচ্চিত্রকে জনগণমনোরঞ্জনকারী শিল্প হিসাবে স্বীকার করি কারণ আমরা সকলেই আমেরিকার চলচ্চিত্রের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। আমার মনে হয় আমরা হিচকের (Hitchcock) আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। অল্প সংখ্যক জনপ্রিয় প্রযোজকের মধ্যে হিচকক অন্যতম। আমার বক্তব্যকে আরও একটু স্পষ্ট করে উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি Resnais তাঁর বক্তব্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন। "Vertigo" অথবা "Marienbad" এ কার্যাকরী উদ্ভাবনী শক্তি অথবা মানসিক উত্তেজনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

আজকাল লোকে হঠাৎ কোন ছবি দেখতে যায় না। তারা সেই সব ছবি দেখতে যায়, যার কথা তারা খুব শুনেছে। এই নির্বাচিত দর্শকদের ৩ শি, ৬ পে. টিকিটের প্রবেশ মূল্যের উপর নির্ভর করে ৫০,০০০ হাজার পাউণ্ড খরচ করে তোলা ছবির খরচ তোলা সম্ভব পর কি? যদিও-হঠাৎ-ঢুকে পড়া দর্শক ও সিনেমা নিয়মিত দেখতে অভ্যস্ত দর্শককেও আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে আনা উচিত। একটি চিত্রের কথা ধরা যাক্ Les Bonnes Femmes, এই ছবির চরিত্রগুলির সাদৃশ্য যুক্ত ব্যক্তিরা অতি অবশ্যই এই ছবিটি দেখতে যাবে। কিন্তু সঠিক বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিষয়টিকে বিচার করতে বা রসোপলব্ধি করতে পারবে না। Chabrol-এর এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে অন্যভাবেও ছবি করা যেতে পারে। একই ছবির একই ঘটনা বিষয়বস্তু বা কলা কৌশলের দিক দিয়ে অন্যভাবে দর্শকদের নিকট উপস্থাপিত করা যেতে পারে। অপরাধ সংঘটিত না করেও শঙ্কাকুল মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করা যায়। দর্শককুলকে বেশী আবিষ্ট করে Chabrol তাঁর বক্তব্য রাখতে পারতেন।

Les Bonnes Femmes ছবিটি ধরা যাক্ যদি হিচকক্ করতেন, তা'হলে কি কি পরিবর্ত্তন আমরা আশা করতাম?

প্রথমতঃ তিনি ছবিটির এই রকম একটা বিরাট গম্ভীর নাম না দিয়ে সাধারণ একটা নাম রাখতেন। যেমন—The shop girl vanishes.

ছবি আরম্ভ হোল। একদিন কাঁচা সোনা ঝরানো সুন্দর সকালে দোকানের প্রথম মেয়েটি দোকানে এলো না। কিন্তু তা'কে বাড়ীতেও পাওয়া গেল না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। Surprise.

যখন দ্বিতীয় মেয়েটি এলো তা'কে মোটর সাইকেলের আরোহী শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করছে। Horror. যখন তৃতীয় মেয়েটি এলো তখন কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা। দর্শক তখন জানে ঐ মোটর সাইকেলের আরোহীই হত্যাকারী, মেয়েটি নয়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার কিছু দূরে গমন, গাছের ছায়ায়, লেকের ধারে প্রেমালাপ ইত্যাদি।

সর্বশেষে যখন চতুর্থ মেয়েটি এলো, তখন তা'কে ঠিক সময় রক্ষা করল তার প্রেমিকপ্রবর এবং হত্যাকারী নিজের মোটর সাইকেলেই নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনলো। Chabrolকে সমালোচনা করছি না। আমার মতে এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্ত্তি, তবু আরও ভালো করে গল্প বল্লে আরও দর্শক মনোরঞ্জনে সক্ষম হোত; এটাই আমার বক্তব্য।

ছবি করাটাকে ফুটো নৌকার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সব সময় মনে হচ্ছে এই ডুবে যাবে। ফ্রান্সের ভাগ পরিচালকদের আবির্ভাব বেশ একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব ও হলিউডের সঙ্গে তুলনা-মূলক সমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই মুহূর্তে এই মন্দার বাজারে কোন ছবি রূপ করার চাইতে ছবি না করা ভালো বলে মনে করি।

Orson Weles কখনও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে ছবি করেন না। এবং নিজগুণে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন। তিনি প্রতি চার বৎসর অন্তর The Trialএর মত ছবি আমাদের উপহার দেন। অন্ততঃপক্ষে বিশ্ব-বিখ্যাত ১৫ জন অভিনেতা অভিনেত্রী Orson Welles-এর ছবিতে কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। Resnais-ও একই পর্যায়ে একদিন উন্নীত হবেন বলে মনে করি। Raoul Levyকে দর্শকরা Orson Wellesকে দিয়ে Marco Polo পরিচালনা করাবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন—ও'কে দিয়ে আর কিছু হবে না। এখন Raoul Levyতাঁকে রোজ অনুরোধ করছেন Christian Jaque যা আরম্ভ করেছিলেন সেই Marco Polo, ওয়েলস্ যেন শেষ করেন।

আমেরিকানদের একটা জিনিস অনুকরণ যোগ্য। তাদের প্রত্যেকটি বিভাগে তারা জানে কি ভাবে প্রাণচাঞ্চল্য আনতে হয়। চিত্রনাট্য-গুলি সাধারণতঃ খুবই উঁচু স্তরের হয়। আমি সম্প্রতি Philip Yordan-এর লেখা একটি চিত্রনাট্য পেয়েছি। সবকিছু সেখানে আছে, এমনকি পরিহাসটুকু পর্য্যন্ত। একটি পংক্তিও তার পরিবর্ত্তনের দরকার নেই। যে কেউ চিত্রনাট্য ফেলে ছবি তুলতে আরম্ভ করতে পারে। আমে-রিকার সিনেমাগুলি সব চেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপের সংমিশ্রণে তৈরী।

পরিশেষে আমি বলব ছবি নির্মাণ ব্যাপারে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

অবশ্য একথাও স্মরণে রাখা দরকার সকলে আবার এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতার যোগ্যও নয়। অনেক নূতন চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা আসেনি এবং তারা অনেক ভুল করে বসে। অনেক ছবির সম্পাদনা দেখি অত্যন্ত ত্রুটি-পূর্ণ। এর কারণ আত্মতুষ্টি, বিচার শক্তির অভাব, অলসতা। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে যে ফ্রান্সে ভাল চিত্র কাহিনীকারের এবং প্রযোজকের বেশ অভাব আছে। সুতরাং এক-জনকে একাকী বহু দায়িত্ব ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেটা আমেরিকার পরিচালকদের ক্ষেত্রে হতে হয় না। পরিশেষে প্রত্যেক দর্শকের রুচি-জ্ঞান এখন বেড়েছে এবং তাদের জন্য আরও ভালো, আরও উন্নত, আরও আকর্ষণকারী ছবি করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

• • • • •

অনিবার্য্য কারণবশতঃ "সাগরপারের রূপসী চলচ্চিত্র" বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে পুনরায় যথারীতি প্রকাশ করা হইবে।

সম্পাদক—পট ও পীঠ

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

জীতু চৌধুরী—জাহাজ হাবার রোড—কলিকাতা

এক সংবাদে দেখলাম উত্তমকুমারের ৬১-৬২ সাল বাবদ এক লক্ষ নব্বই হাজার সাতশো পনের টাকা আয়কর বাকি পড়েছে। এই যদি বাকি হয় উনি দিয়েছেন কত?

○ ইনকামট্যাক্স অফিসারই বলতে পারেন।

• • •

তোলানাথ ঘোষ—তারিণ বাবুকানাথ রোড কলিকাতা

পরিণীতায় শৌমিত্রর পাশে সৌম্যশ্রী একেবারেই বেমানান নয় কি?

○ অশোককুমারের পাশে সুচিত্রা সেন অথবা হৈমন্তীমালা যদি বেমানান না হয়ে থাকে তবে শৌমিত্র-সৌম্যশ্রীই বা বেমানান হবে কেন?

• • •

কল্পনা ছাজদার—রসরাজ ঘোষ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

কমল মিত্র যাত্রায় আসরে নামলেন কেন?

○ তাঁর প্রয়োজনে।

• • •

শিশির ভট্টাচার্য্য—নারকেলডাঙা নর্থ রোড, কলিকাতা

গুণী গাইন বাঘা বাইন বাপির কিস্সা কেইভ্যালে কোন পুরস্কার পেলনা কেন?

○ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা নেই বলেই।

• • •

কল্যাণ রায়—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড—কলিকাতা

"সজাকর কাঁটা" "ছিন্নে বেড়াল" "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" প্রভৃতি ছবিগুলির খবর কি?

○ কোন খবর নেই।

• • •

গীতা ব্যানার্জি—মহিম হালদার ষ্ট্রীট—কলিকাতা

ভগবানের ঠিকানাটা কি বলতে পারেন?

○ পারি, কিন্তু বলবনা। আজকের মানুষ যেভাবে এর উপর হস্তক্ষেপ করতে ছুটেছে তাতে ভগবানের ঠিকানা জানলে ওঁকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর সিংহাসন দখল করবার জন্যে ভয়ানক রকমের একটা যুদ্ধ বেধে যাবে। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, ভগবানের ঠিকানা বলে দিয়ে খামোখা যুদ্ধ বাধাই কেন? মাপ করবেন।

• • •

রতন ব্যানার্জি—সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

অগ্রগামী পরিচালিত বিদ্রোহিত লয়ের নায়িকা দীপা চ্যাটার্জি শৌমিত্র চ্যাটার্জির স্ত্রী নাকি?

○ উত্তমকুমারের নায়িকা শৌমিত্র চ্যাটার্জির স্ত্রী? আপনার কল্পনার জোড় আছে বলতে হবে। না উনি, অন্য দীপা চ্যাটার্জি।

• • •

আনোয়ারা খান—রসরা চাকা

আমি চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে চাই। আমার বয়স বাইশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট ওইঞ্চি। ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছি। সাম্প্রতিক কালের তোলা একটা ছবি পাঠালাম। আপনার কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক উত্তর পেলে কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করব।

○ এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। তাছাড়া চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে আপনার এখানে আসার দরকারটাই বা কি? চাকাতেই তো বিস্তর ষ্টুডিয়ো আছে শুনেছি। ওখানেই চেষ্টা করুন না কেন!

• • •

পত্রলেখা ব্যানার্জি—লেক ভিউ রোড—কলিকাতা

গতবারের আমার প্রশ্নের 'নটী বিনোদিনী'র ওপর হতে ইনভার্টেড কোমা তুলে নেওয়া হলকেন? কলকাতার পেশাদার মঞ্চে যে কটি নাটক অভিনীত হচ্ছে তাদের নাম দিয়ে প্রশ্নটা করেছিলাম। "দিপী আওর" জিনিষটা কি? ওটা দিলীপের আওর না দিপী আওর? না কমপোজিটারের চুলুনির খেসারৎ?

০ কমপোজিটার মশাই, এ প্রশ্নের উত্তরটা দয়া করে আপনিই দিন।

• • •

নারায়ণ চন্দ্র মন্ডী—রামগড় কলোনি যাদবপুর কলিকাতা

এইবারের সংখ্যা: করেকটি সত্যসত্যই ভালো প্রবন্ধের জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।

০ সত্যি বলছেন, না ঠাট্টা করছেন? মজাদার কেচ্ছাকাহিনী ছাড়া এখন আর অন্য কিছু লোকে পড়ে বলে তো আমার মনে হয় না। অবশ্য গরম গরম রাজনৈতিক বুলি থাকলে অন্য কথা। যাই হোক ভালো লেগেছে জেনে আমরা সুখী হয়েছি এই কথা জেনে যে ভালো জিনিষের ভালো পাঠক এখনও আমাদের দেশে আছেন।

• • •

লালমোহন সাহুখাঁ—কাশীপুর রোড—কলিকাতা

উত্তমকুমারের জীবনী নিয়েই 'The Guru' নাকি?

০ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাটা খুবই প্রয়োজন। কিছু লোকসংখ্যা না কমলে এ দুনিয়ায় থাকা আর সম্ভব নয়।

অমল মিত্র—বেলপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট—কলিকাতা

সন্ধ্যা রায় এবারে বম্বে যাচ্ছেন শক্তি সামন্তর পরবর্তী ছবিতে শাম্মী কাপুরের বিপরীতে অভিনয় করতে। বাংলা দেশের নায়িকাদের বম্বে চালান করে দিয়ে বোম্বাই মার্কা নায়ী, সায়রাবানুকে এদেশে আনানো ভালো হচ্ছে কি?

০ বাংলাদেশের শিল্পীদের দরকার পয়সা, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের দরকার ইজ্জৎ। নিজেদের মধ্যে অপসে অদল-বদল করছেন ওঁরা। যতদিন না আবার বেশ কিছু নতুন শিল্পী তৈরী হচ্ছে ততদিন আমাদের চুপ করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

• • •

সুবোধ মন্ডী—পাটওয়ার বাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা

সায়রাবানু নাকি পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছেন?

০ ঠিক জানিনা। শুনেছি চিকিৎসার জন্যে দিলীপ-কুমার ওকে নিয়ে বিদেশে গেছেন।

• • •

শান্তিশেখর ব্যানার্জি—পোড়ামাতলা—নবদ্বীপ

একাধিক পুরুষের সম্ভোগে নারী পতিতা হয় যদি, তবে অহল্যা, কুন্তী, তারা, দ্রৌপদী, মন্দোদরী প্রভৃতি নারীরা সতী বলে পূজনীয়া হন কেন?

০ পুরুষ সম্ভোগে নারী কোনদিনই পতিতা হয় না। অর্থের বিনিময়ে যৌবন বিক্রি করাটা যাদের পেশা তাদেরই পতিতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—এই পাঁচজন পুরাণ-কথিত নারী বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ কারণে ঐরূপ হতে বাধ্য হয়েছিলেন (দেবতুল্য গুরুজনের আদেশে)। ওঁদের সঙ্গে বাস্তবের সাধারণ নারীর তুলনা করলে ভুল করা হবে।

শ্রীপতি সরকার—সুরেশ সরকার রোড—কলিকাতা

অতি ব্যস্ত নায়িকা মাধবীর হাতে নাকি মাত্র একখানি ছবি? এর চাইতে মানে মানে Retire করলে মানও বাঁচতো পেটও ভরতো। নয়কি?

০ Retire করবার কোন প্রশ্ন আসে না শিল্পীর জীবনে। আলোর পরে অন্ধকার, অন্ধকারের পর আবার আলো এইটাই মানব জীবনের চিরন্তন সত্য।

• • •

শংকর বসু—আশুতোষ মুখার্জি রোড—কলিকাতা

অরুনা ভৌমিকের সঙ্গে .....এর সম্পর্ক কি?

০ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না। এই ধরণের কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না।

• • •

মাসুদ মজুমদার—মনোমোহন পাণ্ডে রোড, কলিকাতা

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি ইত্যাদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যবে নিজেদের মধ্যে মারামারি করার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি তিন চারটে চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন যেখানে যে সকল প্রযোজক কালোটাকা দিতে না পেরে ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারছেন না তাদের ছবিগুলি সেখানে দেখান হয় তবে সবদিকেই সুরাহা হয় নাকি?

● আপনার প্রস্তাবটা খুবই যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এভাবেও বিশেষ সুফল হবে বলে মনে হয় না। কারণ প্রদর্শক, পরিবেশক, প্রযোজক, শিল্পী,টেকনিসিয়ান ইত্যাদি চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি বিভাগেই এত বেশী দুর্নীতি ঢুকিয়ে গেছে যে এই শিল্পকে বাঁচাতে গেলে একমাত্র রাস্তা হচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করা। অন্যথায় বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যতে আর কোন চিহ্নই থাকবে না।

• • •

তাপসী সরকার—লালা লাজপৎ রায় সরণি—কলিকাতা

• • • •

কাগজে দেখলাম মহিলা শিল্পী মহল দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে গরচা লেনে একখানি বাড়ি কিনেছেন। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু শিল্পীকে সেখানে আশ্রয়ও দেওয়া হয়েছে। কারুর কাছ হতে কোনরকম ভিক্ষে না নিয়ে এইভাবে একটি মহৎ প্রচেষ্টাকে তাঁরা যে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছেন তার জন্য মহিলা শিল্পী মহলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি আমার হয়ে তাঁদের কাছে এই খবরটা দয়া করে পৌঁছে দেবেন কি?

○ নিশ্চয়ই দেব।

• • • •

তারি ছবি আঁকি

শ্রীপথিক

মনের দুয়ার খুলি কে এলো আবার?
রোধিতে পাইনা তবু তারি অনিবার।
কতদিন কত সুখ এসেছিল দ্বারে,
আকুল হৃদয় নিয়ে ডেকেছে বারেবারে।
ধরেছে আঁখিলোর সকরুণ নয়নে,
নেমেছিল বিষাদ সন্ধ্যা তার জীবনে।
সাড়া তবু দিই নাই তার আহ্বানে
রুদ্ধ ঘরে ছিনু সেথা সদা অলসশয়নে।
ভেবেছিনু প্রয়োজনে কি জানি কি চাবে
হয়তো বা নিঃস্ব করে সব নিয়ে যাবে।
শেষে ফিরে গেছে অকারণে অবেলায়।
ফিরেছি বিফল তারে হেলায় খেলায়।

আজ সে কায়া নয় ছায়া হয়ে এসেছে।
সে মুক্ত হৃদয় আজ আমারে ঘিরেছে।
মনে ভাবি কেবা সে কার-কথা ভাবি?
ফিরায়ে দিয়েছি যারে তবু কেন—
তারি ছবি আঁকি?

———

চন্দ্র বিজয়—

মার্কিন মহাকাশচারী ত্রয়ী নেল্ আর্মষ্ট্রং, এড্ উইন্ অল্ড্রিন্ ও মাইকেল কলিন্স্ চন্দ্র জয় করে অর্থাৎ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে ফিরে এসে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন! চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের এই অবতরণ বিশ্ব-ইতিহাসের এক বিশেষ ঘটনা-রূপে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। চন্দ্রের মাটিতে এর আগে আর কখনও কোনও মানুষের পদস্পর্শ হয়নি, এই প্রথম মনুষ্যপদচিহ্ন লাঞ্ছিত হল চন্দ্রের অস্পৃষ্ট মৃত্তিকা!

আবহমানকাল ধরে মানুষ চাঁদকে দেখে আসছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখেছেন দূরবিক্ষণের সাহায্যে, আর সাধারণ মানুষ দেখে আসছে কল্পনার নানা রং মিশিয়ে। পুরাণে, কিংবদন্তীতে, রূপকথায়, কবিতায়, সাহিত্যে সর্বত্রই এই চাঁদকে নিয়ে কত কথাই লেখা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা চাঁদের সত্যকে উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করে এসেছেন, আর কবিরা কল্পনার কুহেলিকা সৃষ্টি করে চাঁদকে আরও অস্পষ্ট, আরও কুহেলিকাময় করে তুলেছেন। আবার জুল্ ভার্ণ ও এইচ, জি, ওয়েলস্ তাঁদের সার্থক সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের বিজ্ঞান-ভিত্তিক বর্ণনা দিয়ে পাঠক-মনোরঞ্জন করে গেছেন।

আজ সেই চাঁদ মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এরপর জ্যোতির্বিজ্ঞান আরও এগিয়ে চলবে। মানুষ চন্দ্র জয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। সে ধাপে ধাপে আরও এগিয়ে চলবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। চন্দ্রবিজয় তার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহের লাল মাটিতে হয়ত মানুষের পদক্ষেপ হবে! আর্মষ্ট্রং, অল্ড্রিন্, কলিন্স্-এর মতন আরও কত মহাকাশচারী বীরেরা বিঘ্ন-বিপদ পায় হয়ে,দুঃখ-বরণ তুচ্ছ করে বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা উড়িয়ে ভবিষ্যতে গ্রহান্তরে যাত্রা করবেন। তাঁদের আমরা এখন থেকেই জানিয়ে রাখছি আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, আর এই সঙ্গে জানাই এই তিন মার্কিন মহাকাশচারী বীরকে আমাদের আন্তরিক অভি-নন্দন ও অভিবাদন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন—

ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি রূপে শ্রীভি, ভি, গিরি নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। এইবারকার এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিশেষ উৎসাহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে। ইতিপূর্বেকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আবহাওয়া শান্তই থাকত এবং সাধারণ লোকে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিত না। এর পূর্বের তিন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ডঃ জাকির হুসেন-এর নির্বাচন সাধারণভাবেই সমাধা হয়েছিল, কিন্তু এইবারকার নির্বাচন এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করে কংগ্রেস দলের মধ্যে দুটি পক্ষ হয়ে যাওয়ায়। এক পক্ষ ভূতপূর্ব উপরাষ্ট্রপতি ও নির্দল প্রার্থী শ্রী ভি, ভি, গিরিকে এবং অপর দল লোকসভার স্পীকার ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে সমর্থন করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ কংগ্রেসের অনেকেই শ্রীগিরির পক্ষ সমর্থন করায় এবং বামপন্থী দলগুলিও শ্রীগিরিকে ভোট দেওয়ায়, শ্রীগিরি দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোটের গণনায় শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

আমরা নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরিকে তাঁর এই নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অভিনন্দন ও অভি-বাদন জানাচ্ছি এবং তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য কামনা করছি।

কংগ্রেসে কোন্দল—

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, যার ঐতিহ্য অতুলনীয় এবং অতীতে যার ত্যাগে ও শৌর্যে, নেতৃত্বে ও পরিকল্পনায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই ঐতিহ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক কংগ্রেস বিশ বৎসর ক্ষমতাভোগের পর, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্দ্বন্দ্বে এমন স্তরে এসে পড়েছিল যে, কংগ্রেস দল ভাগ হয়ে যাবার পর্যায়ে পড়েছিল। অবশ্য বিরদমান দুই পক্ষের শেষ মুহূর্তে কিছু শুভবুদ্ধির উদয় হওয়াতে শেষ পর্যন্ত এই দল ভাগ ঘটেনি। কিন্তু এই অপ্রীতিকর সংঘর্ষ যে তিক্ততা রেখে গেল তা সহজে দূর হবে বলে মনে হয়না এবং হয়ত তা সুদূরপ্রসারীও হতে পারে।

তবে ঘনমেঘের পিছনেও যেমন সূর্য্যালোকের ক্ষীণ রেখা থাকে এবং মন্দ থেকেও যেমন অনেক সময় ভাল হয়, তেমনি এই দ্বন্দ্ব থেকেও মনে হয় ভাল কিছু হতে পারে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল এখন সর্বপ্রকারে চেষ্টা করবেন সাধারণের ভাল হয় এরকম কাজ বেশী করে করবার জন্যে (অবশ্য আগেও তাঁরা সে চেষ্টা করতেন, তবে এখন আরও বেশী করে করবেন)। আর তাঁর বিরোধীপক্ষ তাঁদের সে প্রচেষ্টায় বাধা দিয়ে জনতার কাছে অপ্রিয় হতে চাইবেন না। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা এখন বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই জনপ্রিয়তাকে ভাল ভাবে কাজে লাগাতে পারলে অবশ্যই দেশের ও দলের মঙ্গল হবে।

তবে এই খোলাখুলি বিরোধের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যের নিষ্পত্তি না করে আপোষে সকল সমস্যার সমাধান করে নিতে পারলেই বোধ হয় ভাল হত। যাই হোক, আশা-করি কালের প্রভাবে এই মনোমালিন্য কেটে গিয়ে আবার সকলে এক হয়ে একযোগে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারবেন।

বিধান সভায় বিক্ষোভ—

এবারকার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্ষাকালীন বাজেট অধিবেশন প্রায় শেষ হতে চলল। অধিবেশন সচরাচর যে রকম হয়ে থাকে সেইরকম প্রায়ই তপ্ত আবহাওয়ায় ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে চলেছিল। বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস দল, দলনেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে শক্তিশালী সরকার পক্ষ যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যোঝবার চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধার্থবাবু প্রমুখ কংগ্রেস পক্ষের কয়েকজনের বক্তৃতা বেশ যুক্তিপূর্ণ ও জোরাল হয়েছিল। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের দুই যোদ্ধা নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু এবং আরও কয়েকজন নেতা বিরোধী পক্ষের আক্রমণের যোগ্য উত্তর দিয়েছেন তাঁদের জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে। মাননীয় স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযোগ্য দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সভা পরিচালনা করেন। বিরোধী কংগ্রেস পক্ষ একাধিকবার সভাকক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে বিশেষ অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি এই অধিবেশনে। কিন্তু ৩১শে জুলাই অপরাহ্নে ঘটেছে এক অভূতপূর্ব্ব অঘটন। তাকে শুধু অপ্রীতিকর বা অঘটন বললে কিছুই বলা হয় না। ঐ দিন অপরাহ্নে বিধান সভার অধিবেশন চলাকালীন একদল ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ বিধান সভা ভবনে ঢুকে পড়ে বিষম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। পূর্ব্বের এক গণ্ডগোলে নিহত তাঁদের এক সহকর্মীর মৃতদেহ ঐ পুলিশ দল শোকযাত্রা করে নিয়ে আসেন, কিন্তু হঠাৎ তারা যেন ক্ষেপে গিয়ে বিধান সভা ভবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে সব কিছু তছনছ করতে আরম্ভ করে। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড আর কখনও কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। যাই হোক, পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথোপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান করা হয়।

সংবাদপত্র ও স্বাধীনতা—

সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গেই তুল্য এবং এই স্বাধীনতা সকল গণতান্ত্রিক সভ্যদেশেই চলিত আছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা মানেই গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করা। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় সেইরকমই ঘটবার যেন উপক্রম হয়েছিল। গত ৮ই জুলাই অপরাহ্নে "আনন্দ বাজার পত্রিকা" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" সংবাদপত্রদ্বয়ের অফিসে একদল ছাত্রনামধারী চড়াও হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তারা কয়েকটি মোটরগাড়ীর ও সংবাদপত্র অফিসের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। ঐ সংবাদপত্রদ্বয়ের পরিবেশিত

সংবাদ ঠিকমত বা তাঁদের মনোমত নয় বলেই নাকি এই আক্রমণ! যাই হোক, এই আক্রমণ আর বেশীদূর গড়াইনি এবং সুখের কথা দলমতনির্বিশেষে সকল নেতারাই এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার ওপর ভবিষ্যতে আর জোরজুলুম করা হবে না বলেই আমরা আশা করি এবং জনপ্রিয় সরকারকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানাই।

অগ্নিসংযোগ—

জেরুসালেম্-এর সুপ্রসিদ্ধ আল্ আক্সা মসজিদটি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। খবরে জানা গেছে যে এক বিকৃতমস্তিষ্ক অষ্ট্রেলিয় যুবক নাকি এই অগ্নিসংযোগ করেছে। কি কারণে যে সে ঐ দুষ্কার্য করেছে তা জানা যায় নি। কিন্তু কার্যটি যে কত গর্হিত ও অন্যায় হয়েছে তা সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজের বিক্ষোভ থেকেই বোঝা যায়।

ধর্মের ওপর আঘাত কোনও জাতিই সহ্য করতে পারে না। অতীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এইরকম তাদের ধর্ম-স্থান অপবিত্র করণের লাঞ্ছনা বহুবার সহ্য করতে হয়েছে। তাই আমরা এর যাতনা বোধ করতে পারি। বিশ্বের চতুর্দিকে এবং ভারতের নানা স্থানে এইজন্য প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের উচিত এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং দোষীর কঠোর শাস্তিবিধান করা। সকলের ধর্মকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা উচিত এই কথাটি সকল ধর্মাবলম্বীরা মনে রাখলে এই সকল গর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হবে না।

আবার বন্যা—

আবার বন্যার জল বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষতি যাতে আর বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সত্বর সব কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। আর এই বাৎসরিক বন্যার কবল থেকে এ দেশকে কি করে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধেও রাজ্যসরকারসহ সকল দল ও মতের লোককে একত্রে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে এই উৎপাত থেকে এদেশের লোক চিরতরে নিষ্কৃতি পায়।

শিল্পী সতীন্দ্রনাথ লাহা—

প্রখ্যাত শিল্পী ও শিশু-সাহিত্যিক সতীন্দ্রনাথ লাহা দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোকে প্রস্থান করেছেন। চিত্রশিল্পীরূপে শিল্পী মহলে ও লেখকরূপে সাহিত্য জগতে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ছোটদের "পাঠশালা" পত্রিকা তিনি সম্পাদকরূপে পরিচালনা করতেন। তাঁর আঁকা বহু রঙ্গিন চিত্র "ভারতবর্ষ" ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অঙ্কিত "পদ্মবনা" চিত্রটি শিল্পরসিক মহলে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে। তিনি ধনীর দুলাল হয়েও শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় অকুণ্ঠ পরিশ্রম করে গেছেন। শিল্প সাধনাই তাঁর দান বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

অধ্যাপক অক্ষয় জীবন বসু—

বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রখ্যাত অধ্যাপক অক্ষয় জীবন বসু কিছুকাল আগে পরলোক গমন করেছেন। সদা হাস্যময় ও সুমিষ্ট স্বভাবের অধিকারী অধ্যাপক বসু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই শুধু প্রিয় ছিলেন না, সুলেখক হিসাবে তিনি সাহিত্যিক মহলেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর বহু রচনা "ভারতবর্ষ" ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি যেমন বিদগ্ধসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তেমনি তাঁর সরল রচনাগুলিও সাধারণ পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সঙ্গে বহুকাল লেখকরূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতন সহজ, সরল শান্ত ও জ্ঞানী মানুষ আজকের সমাজে ক্রমশই বিরল হয়ে আসছে।

তাঁর এই অকস্মাৎ বিয়োগে আমরা স্বজন বিয়োগ বেদনা বোধ করছি এবং দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

বিজ্ঞপ্তি

নূতন ও পুরাতন বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকার
লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে আগামী শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন
সংখ্যা একত্রে "শারদীয়" সংখ্যারূপে
প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশিত হইয়াছে

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হুগলী জেলার দূর অভ্যন্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তার জীবনের একটিমাত্রই মন্ত্র ছিল, 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।'

সারা বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা জুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারি—এদের কলঙ্কিত হিসেবে স্তিমিত আর গণিকা। অন্যদিকে যুদ্ধোত্তীর্ণ কল্যাণে উদ্দাম ভোগবাদের প্রমত্ত উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আঘাতের পর আঘাতে সমস্ত পুরানো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা শ্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে রাত্রি এসে গেল—কলকাতার 'গ্রেট কিলিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডোবা তার হ'ল না।

এত যে অন্ধকার আর নৈরাজ্য তবু এরই অন্তর্লোকে কোথায় যেন আলোর ক্ষীণ একটি ধারা ধীরে ধীরে বইছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে বসল। সেখান উনিশ শতকের রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ সেই ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য তাঁদের উত্তরাধিকার তার ওপরে এসে পড়েছে।

জীবিকার খোঁজে যে যুবক এসেছিল, কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধান দিয়েছে।

এই বিশাল ঐতিহ্যী উপন্যাস সাম্প্রতিক কালের একটি অনন্য সংযোজন।

দাম—দশ টাকা

এই লেখকের আরেকটি উপন্যাস : **নোনা জল মিঠে মাটি** (দ্বিতীয় সংস্করণ) দাম : ৮৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

REG. NO. C. 679—BHARATVARSHA, [illegible]—34-1744, [illegible]—Publication, Cal.
Price——Single Copy—Rs. 1/25, Subscriptions Annual—Rs. 15/-, Half-yearly—Rs. 7/50.

— প্রকাশিত হইল —

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কলের নূতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

একদিকে কালজীর্ণ পুরাতন জমিদারী-তন্ত্রের পতন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নূতন যান্ত্রিক যুগের উত্থান। প্রাচীন আরণ্যক পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তর! হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দে কম্পমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোদুল্যমান একদল নর-নারী। তারকবন্ধু আর অতুল কামার, অশোক আর প্রীতি, ভুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর পান্থ দাস, কারিগর আর মিষ্টি, অবিনাশ আর মিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর রাঙী, সতীশ আর এমোকালী, সনাতন আর গঙ্গামণি—এ রকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক'রে এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন।

চেনা-জানা পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা

—অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জনবধূ ৫-৫০

কাজল গাঁয়ের কাহিনী (২য় সং) ৫,

মণিবেগম (৩য় সং) ৬-২৫

কুমারী মন (২য় সং—ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৩-৫০

জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যেরভৃঙ্গ সংযুক্ত ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশ-কোষের মূল ভাল হইবে কেশবৃদ্ধি ও কেশপতন অনুর যাইবে ও চুল পাকা বন্ধ করিতে সাহায্য করিবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

তা ম তা ম উ প ন্যা স ও গ ল্প-গ্র ন্থ

অবাই বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০

তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০

নীলকণ্ঠী ৫৲

সহোদর ২·৭৫

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

কিংবদন্তি ২·৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্ত্তন ৪৲

রামগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲

হারানো খাতা ৩৲

পুষ্পলতা দেবী

মালিমার অঙ্ক ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

আনাংসি জীর্ণানি ১৫৲

জীবন-কাহিনী ৪-৫০

কুমারী মন ৩-৫০

গৌড়জনবধূ ৫-৫০

মণিবেগম ৩-২৫

আজকাল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

ভাস্কর

রুল্‌ অফ সি ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

শত্রাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

মজলিসিনীর খাল ২-৫০

নরীমাধব চৌধুরী

দেবাত্মানন্দ ৫৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲

নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲

সুধা হালদার ও সপ্তর্ষি-দাস ৩-৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲

একটি নির্মম হত্যা ২-৫০

অপ্রস্তুত পৃথিবী ৫৲

একটি আত্মা-হত্যা ৩৲

অন্ধকারের দেশে ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০

মুক্তির আদায় ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মহত্যার অধিকার ৪৲

সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

নবিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অয়ং-সিদ্ধা ৩৲

ফুলের মাশুল ৩-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিচিত্র মানব ৫-৫০

কার্‌টুন ২-৫০

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

গল্প ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ফুলের ফসল ২৲

খেয়ালের খেসারৎ ২৲

বংশধর ২৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২·৫

অমরেন্দ্র ঘোষ

পাহাড়ীদিয়ার বেদেনী ৩৲

দক্ষিণেশ্বর মিলন ২৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরাজ-বৌ ২·৫০ রামের সুমতি ১·২৫ বিন্দুর ছেলে ১·২৫

পথনির্দ্দেশ ১·২৫

সমরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭·৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২·৭৫

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিচক্রের সেরা ৪·৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪·৫০

পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২·৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪·৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২·৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩·৫০ পঞ্চভূত ২·৫০ বিন্দের বন্দী ৫৲ মায়া পৃথিবী ৩৲ দ্বায়াপথিক ৩৲

চূয়াচন্দন ৩·২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২·৫০ কলরব ২৲

প্রিয়বান্ধবী ৪৲

কয়েকটি আউন্স মাত্র ৩৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চরাজ ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

অবকাশ পাঞ্জাবী ৩৲

বনফুল

শিকতামহ ৬৲

অগ্নীশ্বর ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

— ❁ বিবিধ গ্রন্থ ❁ —

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ২৲

৺শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ

প্রবর্ত্তক সত্যেন্দ্র নাথবসু ২-৫০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে মহাজীবন (জীবনী) ৩৲

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-অনুলিখিত

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩৲

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সচিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১ম খণ্ড (২য় সং)—৭৲ ২য় খণ্ড—৮৲

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ৭৲

পদাবলী-পরিচয় ৫৲

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

পরায়ণ (পরলোক-তত্ত্ব) **১-৫০**

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সিরাজদ্দৌলা ৬৲

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত

জাহানারার আত্মকাহিনী ৩-৫০

কঙ্কালের উইলের সমালোচনা ২৲

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-সোপান ৪'৫০

শ্রীকিরণনারায়ণ বর্ম্মকার প্রণীত

বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী ৬-৫০

মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। সচিত্র।

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ধর্ম্ম-পরিচয় (১ম) ২৲

ডাঃ বিমলকান্তি সমদ্দার প্রণীত

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫'৫০

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

নবভারতের বিজ্ঞানসাধক ১-৭৫

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অনূদিত

যারবেদা মন্দির হইতে

মহাত্মা গান্ধী রচিত "From Yervadir Mandir" গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। দাম—১'৫০

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

শ্রমিক বিজ্ঞান ৫'৫০

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান (সচিত্র) ৫৲

রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লীশ্বরী (সচিত্র) ২৲

রজিয়ৎ ও নূরজাহানের জীবন-কথা।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত

কোন্ পথে? ২-৫০

আটটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

ঝুমুরশ্রী ৩-৫০

উপন্যাস হিসাবে উপাদেয়।

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রণীত

পঞ্চাশের পরে (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) **২-৫০**

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

মানবতার সাগর-সঙ্গমে (সচিত্র) **৬৲**

বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ৪৲

নবেন্দু ঘোষ সম্পাদিত

মেঘদূত ৭৲

ওমর খৈয়াম ৭৲

দুইখানি অনুপম কাব্য-গ্রন্থ। সচিত্র।

কান্তকবি রজনীকান্তের

আনন্দময়ী ১৲

শেষদান ১-২৫

বহুদিন ধরিয়া বাঙালী জাতিকে যুগপৎ হাস্যরস ও উচ্চভাবের প্রেরণা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

=শৌখিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চপ্রশংসিত নাটকসমূহ=

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিরাজ-বৌ ২৲
বিন্দুর ছেলে ২৲
রামের সুমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

কল্কি ৪৲, প্রফুল্ল ৪৲, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ১-৫০, নল-দময়ন্তী ২৲
বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

যোগেশ চৌধুরী প্রণীত

কেদার রায় ৩৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ঈশাপেত্ত রাণী ১-৫০
কর্ণার্জ্জুন ৩৲, ফুল্লরা ২৲,
পুণ্যাশা ১-২৫, অঞ্জনা ০-৩৭

অমর সরকার প্রণীত

মসনদে মোজাফ্ফর ২৲

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

মিটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গেবর্গী ৩৲, পথের শেষে ও
ঘষিতা (একত্রে)—৪-৫০

দেবলাদেবী ৩৲

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

ভক্তিনারায়ণ কর্মকার

পতিব্রতিনী সতী ১৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নর-নারায়ণ ৩৲,
প্রতাপ-আদিত্য ৩৲,
আলমগীর ৩-৫০,
রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীষ্ম ২-৭৫।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

দুর্গাদাস ২-৫০, বিরহ ২৲
নূরজাহান ৪৲, মেবার-পতন ৪৲
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲
চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ পুনর্জ্জন্ম ১-০০
সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীষ্ম ২-৫০, শাজাহান ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে
দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲
হর-পার্ব্বতী ১-২৫
সিরাজদ্দৌলা ২-৫০
শুভ্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মাট্য-গুচ্ছ ৪-৫০

রাতকাণা—বীররাজা এবং বুধের মত একত্রে।

কানাই বসু প্রণীত

গৃহ-প্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, কালীর রাণী ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মন্ত্রা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲
জীবনটাই নাটক ২-৫০, ধর্ম্মা ২৲,
কারাগার, মুক্তির ডাক ও মন্ত্রয়
(একত্রে) ৩-৫০
গিরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল
ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲
ধর্ম্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর
প্রেম, আজব দেশ (একত্রে) ৪৲
একাঙ্কিকা ৫৲ নবএকাঙ্কিকা ৩৲
কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ-
পর্ণা—রাজনটী—রূপকথা
(একত্রে) ৩৲

সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা—
দেবাসুর (একত্রে) ৩৲
মহাভারতী ২-৫

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজক ১-২৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ৩৲, পথিক ২-২৫

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

মন্ত্র-শ্যাপ্তি ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভুল ১৲

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৭৬

লেখ-সূচী

১। হিন্দুধর্ম: একটি ব্যাখ্যা (প্রবন্ধ)
শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২২৭
২। পতিতা ও পতিত পাবন (ব্যঙ্গচিত্র)
শ্রীদিলীপ কুমার রায়
৩। কঠোপনিষদের সাধন পথ (প্রবন্ধ)
শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। ওয়া মুশী ওয়া রেজা (কবিতা)
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ... ২৩১

লেখ-সূচী

৫। অমর তীর্থ অমর নাথ (প্রবন্ধ)
শ্রীনরেশ চন্দ্র বসু ২৩২
৬। স্বপ্ন-আঘাত (কবিতা)
দিলীপ গুপ্ত ২৪৯
৭। মনের মধ্যে মন (গল্প)
শ্রীসবিতেন্দ্র ভদ্র ২৫০
৮। ঋগ্বেদ কাব্যানুবাদ
পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভাবতী ... ২২৪

লেখ-সূচী

৯। জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস (প্রবন্ধ)
শ্রীননী ভট্টাচার্য্য (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) ২৫৬
১০। মেঘদূত-মাধুরী (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত ২৫৯
১১। অসংসারী (উপন্যাস)
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬০
১২। পেকটিন্ (প্রবন্ধ)
ডাঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৬৯
১৩। কবীর হাজমদল (গল্প)
আবু আতাহার ২৭১

লেখ-সূচী

১৪। কিশোর জগৎ
(ক) ভক্তি ও ভগবান-শ্রীজ্ঞান
(খ) মেঘ বাদলের খেলা
স্বপন বুড়ো ২৭৬
(গ) স্মৃতিপূজা—শ্রীকৃষ্ণিরচন্দ্র শুকুল ২৭৮
(ঘ) মানুষের ত্রাণ শক্তি
গৌর আদক ২৭৮
(ঙ) অচিন পথের যাত্রী
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী ২৭৯
১৫। সুলতার মন (গল্প)
তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮২

—প্রকাশিত হইয়াছে—
অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,
কর্তৃক সম্পাদিত
বঙ্কিমচন্দ্রের
কপালকুণ্ডলা ৩,
গিরিশচন্দ্রের
প্রফুল্ল ৪৲ জনা ৪৲
দ্বিজেন্দ্রলালের
চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ সাজাহান ৪৲
মেবার-পতন ৪৲
সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিকতম উপন্যাস
সরোবর
সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল।
অভাবগ্রস্ত একটি ছোট্টসংসার—তার তরুণ সম্পত্তীর জীবনে পড়েছে নৈরাশ্যের ছায়া। দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ তাদের দুটি মনের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া ক'রেছে—তাদের পারস্পরিক আকৃতিকে যেন সফল হ'তে দিচ্ছে না। জীবনের মূল্যায়নে তাহ'লে কি ঐশ্বর্যের স্থানই সব চেয়ে উ? 'সরোবর'-এ পাওয়া যাবে তারই উত্তর।
দাম—২·৭৫
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬

লেখ-সূচী

১৬। আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বর (প্রবন্ধ)
শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ ২৮২

১৭। আনন্দ (কবিতা)
শুচিস্মিতা দাশগুপ্তা ২৯০

১৮। ঘরবাড়ী সঙ্গীত (প্রবন্ধ)
শ্রীজয়দেব রায় ২৯১

১৯। বন্দরের বন্ধন (উপন্যাস)
অরুণ কুমার বসু ২৯৩

২০। গ্রহজগৎ
সুধাচার্য্য ২৯৭

২১। গোঁফ ও রত্নাবলী (গল্প)
সমীর চট্টোপাধ্যায় ৩০৪

২২। বিচিত্র বিশ্ব
শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য ৩১০

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-সোপান

শরীরং ব্যাধিমন্দিরং—অর্থাৎ আমাদের শরীর বিবিধ ব্যাধির আবাস গৃহ। সেজন্য সাধারণ অট্টালিকার ন্যায় মধ্যে মধ্যে জীর্ণ ও অসুস্থ শরীরেরও মেরামতী বা চিকিৎসা দরকার। সুতরাং তার মিস্ত্রিগিরি বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সকলেরই কিছু-না-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন।

একদেশে জন্ম-মাওয়ায় মানুষ হওয়া ভারতীয়দের জন্য এই দেশের প্রকৃতিদত্ত ভূমি-ভরিয়া যে ঔষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতি ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমাদের পক্ষে তা-ই যে সর্ব্বোত্তম বিধান, এতে আর সন্দেহকি? প্রবিতবশঃ কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের যাবতীয় গুরুত্ব তত্ত্বগুলি সরল বাঙলার সুসংবদ্ধভাবে সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন।

প্রতি গৃহস্থেরই গৃহে রাখার উপযোগী অত্যাবশ্যক গ্রন্থ।

দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের

ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও চাঞ্চল্যকর অপহরণের তদন্ত-বিবরণী

মেছুয়া হত্যার মামলা

১৮৮০ সনের ১লা জুন। মেছুয়া থানায় এক সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড ও রহস্যময় অপহরণের সংবাদ পৌঁছাল। কলুয়ার শয়নকক্ষ থেকে এক ধনী গৃহস্বামী উধাও আর সেই কক্ষেরই সামনে পড়ে আছে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মুণ্ডহীন দেহ। এর পর থেকে শুরু হ'লো পুলিশ অফিসারের তদন্ত। সেই মূল তদন্তের রিপোর্টই আপনাদের সামনে ফেলে দেওয়া হ'য়েছে। প্রতিদিনের রিপোর্ট পড়ে পুলিশ-সুপার যে মন্তব্য করেছেন বা তদন্তের ধারা সম্বন্ধে যে গোপন নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তাও আপনি দেখতে পাবেন। শুধুতাই নয়, তদন্তের সময় যে রক্ত-লাগা পর্দা, মেয়েদের মাথার চুল, নূতন ধরনের দেশলাই-কাঠি ইত্যাদি পাওয়া যায়—তাও আপনি এক্সিবিট হিসাবে সবই দেখতে পাবেন। কিন্তু সকলকের অনুরোধ, হত্যা ও অপহরণ-রহস্যের কিনারা ক'রে পুলিশ-সুপারের যে শেষ মেমোটি ডায়েরির শেষে সিল করা অবস্থায় দেওয়া আছে, সিল খুলে তা দেখার আগে নিজেরাই এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন কিনা তা যেন আপনারা একটু ভেবে দেখেন।

বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন টেকনিকের বই।

দাম—ছয় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

নিরাট পরিবর্তন

ইউবিআই এর জনগণের মাপকাঠিতে
ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী, চাষী, খুচরা দোকানদার, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য অল্প লেনদেন ব্যাপারে ওঁদের যে গুণটি প্রধান বলে গণ্য হয় তা হল ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা, যার অর্থই হল

- কারিগরি বিদ্যা
- পরিচালন পারদর্শিতা
- উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবায় বিপণন-ব্যবস্থা
- ব্যক্তিগত সততা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
হেড অফিস : ৪, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

UBF 248-69

অনুরূপা দেবীর

— অমর সাহিত্য-সাধনা —

গরীবের মেয়ে (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲

পথের সাথী ৩৲ **বাগ্‌দত্তা** ৫৲

রামগড় ৪-৫০ **হারানো খাতা** ৩৲

যে মহিয়সী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। স্বষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্ত-বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা,

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ

হিন্দু ধর্ম ঃ একটি ব্যাখ্যা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ় ১৩৭৬ এর ভারতবর্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে আদি হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি উত্তর বা মধ্য এশিয়াতে পরে উহা উত্তর পশ্চিম ভারতে আগমন করে এবং বর্তমান হিন্দুধর্মের রূপ ধারণ করে। আর্যগণ বাহির হইতে ভারতে আগমন করেন এই পাশ্চাত্য মত শৈলেন বাবু গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর্যগণ যে বাহির হইতে আসিয়াছেন ইহার কোনও প্রমাণ নাই। সেই জন্য কেহ বলেন মধ্য এশিয়া হইতে, কেহ বলেন মধ্য য়ুরোপ হইতে, কেহ বলেন স্কান্ডিনেভিয়া হইতে কেহ বলেন বাল্টিক হইতে। আর্যজাতি যে ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারত বনপর্ব ৮২ ১০৫ শ্লোকে আছে

"অথো পঞ্চেতু বাক্যস্য হ্যবধারণ লোকপ্রসিদ্ধ্যা
ব্রহ্মর্ষয়ঃ বিপ্রথ্যাতা ব্রহ্মবর্তে সমন্ততঃ।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "অতঃপর বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে যাইবেন যেখানে প্রথম ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়া-

ভারতবর্ষ

কার্তিক—১৩৭৬

ছিল।" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।১১।১২,১৩, বাক্যে আছে যে প্রথমে ব্রাহ্মণ, তাহার পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছিল। এজন্য বুঝিতে পারা যায় যেখানে প্রথম ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয় সেইখানে আর্যজাতির প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নারদ বলিয়াছিলেন যে দেবিকা হইতে, দীর্ঘসত্র, সেখান হইতে বিনশন যাইবেন যেখানে সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যে দেবিকা কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী কোনও তীর্থ। মনু ২।২০ শ্লোকে বলিয়াছেন যে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী ব্রহ্মর্ষি দেশেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল লোক নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে,—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্, পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥

শৈলেন বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সত্য প্রেম পবিত্রতা কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে কিভাবে জীবনে সত্য প্রেম পবিত্রতা আসে। তিনি যে মনে করিয়াছেন যে হিন্দুরা ব্রত, উপবাস, পূজা, দান, করে এই ভাবিয়া যে ইহার দ্বারা ঈশ্বরকে ভুলাইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে, ইহা তাঁহার বুঝিবার ভুল। হিন্দুরা ব্রত, উপবাস, পূজা দান প্রভৃতি করে এই উদ্দেশ্যে যাহাতে জীবনে সত্য-প্রেম-পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাতে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব হইবে। আমরা যে কর্ম করি তাহার উপর আমাদের চরিত্রের গঠন হয়। শাস্ত্রে যে কর্ম করিতে বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা চরিত্রের উন্নতি হয়। এজন্য ভগবান গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে কোন্ কর্ম কর্তব্য কোন কর্ম অকর্তব্য নহে এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ"। আমাদের বুদ্ধি এ বিষয়ে প্রমাণ নহে কারণ আমাদের বুদ্ধির ভুল হইতে পারে। ভগবান গীতা ১৮।৩০, ৩১, ৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন যে যাহাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধি তাহারা ঠিক মত বুঝিতে পারে কোন্ কার্য করা উচিত, কোন্ কার্য করা উচিত নহে, যাহাদের রজোগুণ বেশী তাহারা ঠিক মত তাহা বুঝিতে পারে না, যাহাদের তমোগুণ বেশী তাহারা বিপরীত বুঝে, অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে। আমাদের সকলের অল্প বেশী রজো গুণ এবং তমোগুণ আছে এ জন্য আমাদের ভুল হইবার সম্ভবনা আছে। কিন্তু শাস্ত্র বাক্যে ভুল হইতে পারে না। গীতাশাস্ত্র শব্দ ব্যবহার হইয়াছে আচার্যরা তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শাস্ত্র দ্বিবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। স্মৃতি অর্থাৎ বেদমূলক ঋষি প্রণীত গ্রন্থ। বেদ মনুষ্য রচিত নহে। মনুষ্য রচিত হইলে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা থাকিত। বেদ যে ঈশ্বর প্রণীত তাহার প্রমাণ স্বরূপ আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩ এর ভাষ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৪।১০ এর বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্, বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ" অর্থাৎ সেই মহা পুরুষের (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসের ন্যায় ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিবেদ আবির্ভূত হইয়াছে পুনরায় ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৭ এর ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, "ন শাস্ত্রাৎ ঋতে ধর্মাধর্ম বিষয়ং বিজ্ঞানং কস্যচিৎ অস্তি" অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যতীত কাহারও ধর্মাধর্ম বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ।
জীবের অস্থি আর বিষ্ঠা যে হয় শঙ্খ গোময়।
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৬

(প্রমাণ জ্ঞান লাভের উপায়। শ্রুতি বেদ।) স্মৃতির মধ্যে মনুসংহিতা একটি প্রধান স্মৃতি। বেদ বলিয়াছেন "মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় (হিতকারী) (যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্—তৈত্তিরীয় সংহিতা (২।৭।১০।২)। শ্রীমদ্ভাগবত ১।৪।২০ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "ইতিহাস পুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে" ইতিহাস (অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণকে) পঞ্চম বেদ বলা হয়। ইহারা বেদের ন্যায় প্রামাণিক।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, যেখানে শাস্ত্রের সহিত বিবেকের বিরোধ হয় সেখানে বিবেক মানা উচিত, কারণ বিবেক ঈশ্বরের বাণী। কিন্তু বিবেক ঈশ্বরের বাণী হইলে সকলের বিবেক একরূপ নির্দেশ দিত। কিন্তু তাহা হয় না। হিন্দুর বিবেক বলে ঈশ্বরের মূর্তি করিয়া পূজা করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, খৃষ্টান ও মুসলমানের

বিবেক বলে, এইভাবে পূজা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন না তিনি ক্রুদ্ধ হন। ইহা সত্য যে হিন্দুর শাস্ত্র এবং খৃষ্টান বা মুসলমানের শাস্ত্রে বিরোধ দেখা যায়। ইহার সহজ মীমাংসা এই যে হিন্দু হিন্দুর শাস্ত্র অনুসরণ করিবে, খৃষ্টান খৃষ্টান শাস্ত্র, মুসলমান মুসলমান শাস্ত্র। ইহা সুবিদিত যে আরঙ্গজেব অনেক হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া ছিল, কিন্তু শিবাজি কোনও মসজিদ ভাঙ্গে নাই।

হিন্দুধর্ম্মের নিয়মগুলি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সত্য এখনও আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে তাম্র পাত্রে জল রাখিতে হয়। প্রথমে ডাক্তার মনে করিতেন ইহাতে জল বিষাক্ত হইবে (copper poisoning) এখন ডাক্তাররা জানেন তাম্র পাত্রে জল রাখিলে জলের অনিষ্টকর জীবাণু মরিয়া যাইবে, এ জন্য তাম্র নির্ম্মিত নলে জল রাখিয়া sterilize করা হয়। হিন্দুধর্ম্মের কোনও নিয়মের সহিত বিজ্ঞানের মিল না হইলে বুঝিতে হইবে যে বিজ্ঞান এখনও পূর্ণ সত্য লাভ করে নাই।

শৈলেনবাবু বলিয়াছেন কঠোপনিষদের উপাখ্যান বাদ দিতে হইবে। কিন্তু ঐ উপাখ্যানের মধ্যে অনেক ধর্ম্ম তত্ত্ব নিহিত আছে। নাচকেতা প্রথম বর চাহিলেন পিতার প্রসন্নতা, দ্বিতীয় বর চাহিলেন যজ্ঞ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে, তৃতীয় বর চাহিলেন আত্মতত্ত্ব বিষয়ে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পিতার প্রসন্নতা সর্বপ্রথম প্রয়োজন, তাহারপর দেবতাদের আরাধনা করা প্রয়োজন, তাহার পর আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

ধর্ম্মের সার তত্ত্বের মধ্যে শৈলেনবাবু শঙ্করাচার্য্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ইহা অদ্বৈত মত। অন্য মতের আচার্য্য ও সাধুগণ ইহা স্বীকার করেন না। যথা রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও মধ্বাচার্য্য ইহা স্বীকার করেন নাই।

শৈলেনবাবু পূজা, ব্রত, উপবাস, দানের উপর কটাক্ষ-পাত করিয়াছেন। কিন্তু গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (৯.৩৪ শ্লোক)—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈব মাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥

এখানে ভগবানকে পূজা ও নমস্কার করিতে বলা হইয়াছে। পুনঃ ভগবান বলিয়াছেন, (৯.৩৩) অনিত্য মসুখং লোক-মিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ অর্থাৎ জগৎ অনিত্য ও দুঃখময়, এখানে যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তখন আমাকে পূজা কর।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্॥
(গীতা ১৮.৫)

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে। ইহারা মনীষীদের চিত্ত শুদ্ধ করে।

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষোলো

"রবীন্দ্রনাথ ও বলনা চমকার আগেই শুধু মা-র মুখেই নয় আরো অনেক বন্ধুর মুখ শুনেছিলাম এই ছেলেটির অসহজ ভজনের কথা। অনেকেই তাকে উপাধি দিয়েছিলেন 'প্রতিভ'।"

"শুধু আমি কেন তার গান শুনতে যাই নি—পরে বলছি। আগে বলি ওর মা কুন্তীর কথা।

সাহুকর গান শুনে না শুধু যে মন্ত্রিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন তাই নয়, আশ্রমে ফিরেও বলতেন তার অনিন্দ্যকান্তি মধুর কণ্ঠ ও অসকল ভাবরসের কথা। ওর টানেই তিনি যেচে গিয়ে কুন্তীর সঙ্গে আলাপ করেন, কারণ কুন্তী মন্ত্রিয়ে আসত না। কেন—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। মা-কে ধরণী পেয়ে কুন্তী তার দুর্ভাগ্যের সব কথাই খুলে বলেছিল। সব কথা বলবার সময় হবে না, তবে তার সারমর্ম এই:

কুন্তী ছোট-ঘরের মেয়ে হলেও ছেলেবেলা থেকেই ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উচ্চশিল্পী। ওর বাপ কলকাতায় জুতোর ব্যবসায় যথেষ্ট উপায় করত। মা-ও ছিল মেয়ে অন্ত প্রাণ। ফলে কুন্তীর মাথা বেশ একটু গরম হয়ে ওঠে—আরো এই জন্যে যে, ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকার বৃত্তি পেয়ে আই-এ তে ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়।

"ও গান গাইতে পারত ও চমৎকার। প্রতিভা বলতে যা বোঝায় তা নয়, তবে ওর সুরেলা মধুর ও দরদী কণ্ঠ শুনে সকলেরই মন আর্দ্র হয়ে উঠত। স্বভাবে ছিল ও বিষম উচ্চাশিল্পী ভাবত ও প্রে-ব্যাক গায়িকা হ'য়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। 'ছোট ঘরের মেয়ে! হুঃ! মানুষ বড় হয় বুদ্ধিতে ও কৃতিত্বে মনে মনে কি বলে জান'...এই ধরণের কথা কলেজে ওর সহপাঠিনীদের মুখেও শুনতে শুনতে ওর স্বাভাবিক অহঙ্কার পুষ্ট হয়ে ওঠে। ও পণ নেয় এক, বিবাহ করবে না; দুই নিজের পায়ে দাঁড়াবে; তিন গান গেয়ে নাম করবে।"

অমিত টোকে! "ওর গুণের কথা বললে তো ভাই, ফলিয়েই, কিন্তু রূপের কথা চেপে গেলে কি ইচ্ছে করেই?"

ভীষ হাসে! "না রে ভাই, কারণ আগুন যে ছাই চাপা থাকে না এটি হ'ল একটি আপ্তবাক্যেরই সামিল। বলতে কি, ওর রূপই ধরেছিল ওর কাল। ঠিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু ওর ছিল সেই অনির্দেশ্য সম্পদ, 'চার্ম'—যার সংজ্ঞা দিয়েছেন খ্যাতনামা নাট্যকার ব্যারি—তাঁর 'what Every woman knows' নাটকে। বলেছেন: 'If you have it, you don't need to have anything else; and if you don't have it, it doesn't much matter what else you have.'

অমিত হাসে: "জানি। এ-নাটকটি আমি বিলেতে মঞ্চে দেখছিলাম। তবে এর বাংলা নামটাও সার্থক—চটক। আমি একদা কেম্ব্রিজে এক সভায় এ-নাটকটির এমেচার স্টেজে অনুবাদ করেছিলাম!

চটক তোমার যদি থাকে, তবে না থাকলে
কোন কিছুই আর—
থাকবে না কোনো পরোয়া—
অপিচ চটক যদি না থাকে তোমার,
আর সব কিছু থাকলে ও এ-ধরায়
আসবে না কোনো কাজেই লো বালা, হায়!"

ভীষ হো হো করে হাসে! "এমন না হ'লে দরদী! তাই তো থেকে থেকে তোর সঙ্গি চাই রে দাদা! হ্যাঁ, ওর ছিল এই চটক, বিশেষ ক'রে গড়ন আর কালো চোখের চাউনিতে। কিন্তু না, প্রগল্‌ভতায়ও বাড়াবাড়ি ভালো নয়। তাই শোন।

"যৌবনশ্রী, গুণ, বুদ্ধি, চটক এই সম্পদ চতুষ্টয় আছে যে-বালার তার মাথা তো একটু গরম হবেই ভাই। ফলে হ'ল ওর বিদর্ঘর অহঙ্কার। আর তাতেই ডুবল। হ'ল কি, উনিশ বছর বয়সে যখন ও বি-এ পড়ছে তখন ওদের ঘরে অতিথি হ'য়ে আসে এক সুদর্শন সাধু। শুধু সুদর্শন নয়,তার ওপর চমৎকার গাইয়ে তথা কথক, যাকে বলে gift of the gab—বিশেষ ক'রে হিমালয়ের নানা গল্প বলার আর্ট। কুন্তী ছেলেবেলা থেকেই ছিল 'রোমান্টিকা' বিশেষ করে ভ্রমণের রোমাঞ্চ ওর মন টানত দারুণ। হিমালয়ের সম্বন্ধে কত বইই যে পড়েছিল ইংরেজি ও বাংলায়। মনে মনে ঠিক করেছিল বি এ পাশ করার পরেই কোনো বন্ধু বা বান্ধবী পর্যটকের সঙ্গে যাবে কেদারবদরী অমরনাথ এমন কি তিব্বতের কথা ভাবতেও ও ভয় পেতনা। এহেন মেয়ের কাছে এল এক সুপুরুষ 'চার্মিং' সাধু হিমালয় যার নখদর্পণে তার উপর সে ভজন খাইতও চমৎকার। বলতে কি, কুন্তী ওর কাছে ভজন শিখতে শিখতেই ওর প্রেমে পড়ে যায়। একেবারে over head and ears যাকে বলে।

"সাধুটি ছিল ভাকসাইটে লম্পট তথা ধূর্ত্ত। ওকে ভুলিয়ে ওর গহনার বাক্স হাতিয়ে ওকে নিয়ে গেল হরিদ্বারে সেখানে ওকে বিবাহ করে হিমালয়ের নানা তীর্থে নিয়ে যাবে কথা দিয়ে। তারপরে সে অনেক কাণ্ড সব না-ই বললাম। শুধু ট্রাজিডির শেষ অঙ্কটির কথা বললেই চলবে। সে ওর গহনার বাক্স নিয়ে আর একটি মেয়েকে ভুলিয়ে ওকে পথে বসিয়ে দিল চম্পট মাসখানেকের মধ্যেই।

"কুন্তী চোখে অন্ধকার দেখল। ভাগ্যক্রমে এক বৃদ্ধ সাধু যিনি ওর গান শুনে ওকে ভালোবেসেছিলেন তিনি ওকে আশ্রয় দিলেন তাঁর কুটিরার পাশে একটি খালি কুটিরায়।

কুন্তী তখনকার মতন মাথা গুঁজবার একটা জায়গা পেয়ে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু সাধুর ভিক্ষান্নে ভাগ বসাবে কেমন করে? ভিক্ষার 'পরে ওর বিদর্ঘর ঘৃণা। সাধু ভেবেচিন্তে ওকে কয়েকটি মন্দিরে গানের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু গান করে সে যা পয়সা পেত তাতে অর্ধাশনে থাকতে হত। ও সেলাইয়ের কাজ জানত। নানা পরিবারের মেয়েদের জন্যে জামা সেলাই করে কিছু উপায় করা সুরু করল। কোনোমতে কায়ক্লেশে দিন গুজরান হত। কিন্তু হায়রে, মাস তিনেক পরে ও আবিষ্কার করল ও গর্ভবতী। সঙ্গে সঙ্গে, রটে গেল সর্বত্র মেয়েদের কলঙ্কের খবর বাতাসেরো আগে ছোটে, সব দেশেই। ফল হল যা হবার—মন্দিরে গান করা ওর বন্ধ হ'ল, মেয়েরাও ওকে আর কোন কাজ দিত না। অভিমানিনী মেয়ের গর্ব চূর্ণ হ'ল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সব আশার আলোই নিভে গেল।

"একমাত্র পথ ছিল—কলকাতায় ফিরে যাওয়া। কিন্তু বলেছি ও ছিল প্রকৃতিতে স্বাবলম্বিনী, চাইত, নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তাই ও ঠিক করল—আত্মহত্যা করবেই করবে। কারণ এভাবে সকলের চোখে ঘৃণ্যা অস্পৃশ্যা হয়ে বাঁচবার কথা ও ভাবতেই পারত না। বৃদ্ধ সাধুটি ওকে বোঝাতেন—আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা করা তাঁর সাধ্যের বাইরে ছিল। শেষে একদিন সকালে ব্রহ্মমুহূর্তে স্নান ক'রে ফিরে মহানন্দে বললেন 'মা বিখ্যাত দয়াল মহারাজ দেবপ্রয়াগ থেকে কাল নেমেছেন, আছেন তাঁর এক শিষ্যের কাছে। চলো, আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' কুন্তী বেঁকে বসল: 'না, কোনো মহারাজের কাছেই আমি ভিক্ষা করব না।' সাধুটি বললেন মিনতি ক'রে 'কিন্তু তাঁকে গান শোনাতে বাধা কী? ওঁর কৃপায় অনেক নিরন্নেরই অন্নসংস্থান হয়েছে ভিক্ষে না ক'রেও, তোমারও হ'য়ে যেতে পারে তো।"

"কুন্তী একটু ভেবে বলল: আচ্ছা।

"গুরুদেব সেদিন সকালে ভাগবতের পাঠ দিচ্ছিলেন। মাত্র ছিল চারজন ধর্মার্থী শুনছিল চাতালে ব'সে। সাধুজির সঙ্গে কুন্তী উপস্থিত হ'তেই গুরুদেব উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে পাশে বসালেন। তারপর কুন্তী তাঁকে প্রণাম ক'রতে কোমল কণ্ঠে বললেন: 'একটি গান গাও তো মা!'

"কুন্তী আশ্চর্য হ'য়ে তাঁর চোখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: 'ভয় নেই মা। আমি ভিক্ষে দেব না। তুমি গাও।" কুন্তী আরো আশ্চর্য হ'য়ে একটি তুলসীদাসী ভজন সুরু করল। গাইতে গাইতে মূর্ছা।

"জ্ঞান ফিরে এসে দেখে—সে একটি খাটে শুয়ে। শিয়রে গুরুদেব। তিনি ওকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'মা, আত্মহত্যা ক'রে কারুর কোনদিন দুর্ভোগ কাটে নি। দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কেবল একটিমাত্র উপায় আছে: অনুতাপে শুদ্ধিলাভ করে ঠাকুরের চরণে শরণ নেওয়া—দ্রৌপদীর প্রার্থনা: ত্রাহি মাং কৃপয়া দেব! শরণাগতবৎসল! কুন্তী চমকে উঠল কিন্তু বলল: 'সাধুজি, আমি মিথ্যা বলতে চাই না, তাই বলতে পারব না আমি সত্যি অনুতপ্ত। যাকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছিলাম তাকে স্বামী বলেই বরণ করেছিলাম সে সব কথা—' গুরুদেব থামিয়ে বললেন: 'সেসব কথা সাধুজি আমাকে খুলে বলেছেন। তুমি তাকে ভালোবেসে কোনো পাপ করো নি মা, কিন্তু বাপমাকে না বলে তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছ। তোমার এতই যদি সাহস হবে বাপ মাকে খোলাখুলি বললে না কেন সাবিত্রীর মত—ইনিই আমার স্বামী জীবনে মরণে? মা, পাপের নানা রূপ আছে, কিন্তু একটি অতি কদাকার রূপ হল অহংকারী স্বেচ্ছাচার, কারুর কাছেই নত হতে না চেয়ে চলা আমার ভুল হতেই পারে না। তোমার দারুণ অহংকার হয়েছিল—তুমি নিজের পথ একাই কেটে চলতে পারো ভেবে। কিন্তু স্বৈরাচারের সমাপ্তি রসাতলে। অনুতাপের তর্ক এখন থাক, তুমি শুধু ভাগবানকে ডাকো ব্যাকুল হয়ে। বলো—প্রভু, আমি যদি ভুল করে থাকি ক্ষমা করে ঠিক পথের দিশা দাও। আমি আত্মঘাতী হতে চাইছিনু গর্ববশে—তুমি রক্ষা করো। যদি মন-মুখ এক করে এ-প্রার্থনা করতে পারো—দেখতে পাবে অচিরেই নির্দিশায় শুধু যে পথ পাবে তাই নয়, পাথেয়ও মিলবে।'

কুন্তী শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'সাধুজি, আমি অহংকারে অন্ধ হয়েছিলাম। কলেজে সংস্কৃতে পড়েছিলাম: অজ্ঞান-তিমিরান্ধকে যিনি জ্ঞানের শলাকা দিয়ে চোখ ফুটিয়ে দেন—তাঁরই নাম গুরু। আমি আপনাকে গুরুবরণ করতে চাই—আপনিই আমাকে দৃষ্টির দিয়েছেন বলে। আপনি যদি আমাকে দয়া করে দীক্ষা দিয়ে ধন্যা করে নিতে রাজী হন তবে আপনাকে আমি—' গুরুদেব বললেন হেসে: 'অত দ্রুত নয় মা। দীক্ষা চাট্টিখানি কথা নয়, তার জন্যেও প্রস্তুতি চাই। সবকথা তুমি এখন বুঝতে পারবে না, তাই শুধু বলি—তোমার উচ্চাশা এখনও খুব প্রবল, তুমি চাও গান গেয়ে নাম করতে।' কুন্তী বলল 'এ উচ্চাশাও কি অন্যায়?' গুরুদেব বললেন 'না, সংসারীর পক্ষে এ-উচ্চাশা তার বিকাশের মস্ত সহায় হতে পারে, অনেক সময়ে হয়েও থাকে। কিন্তু যোগার্থীর পক্ষে সাংসারিক ধনজনযশ-মানের লোভ বিষ। মা, দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলার উপমাটি স্মরণ করো। যদি দীক্ষা চাও তবে শুধু ঠাকুরকে চাইতে হবে, আর কিছুই নয়। এ-চাওয়াও মনে ফুটে ওঠে না তাঁর কৃপা বিনা। আর সবচেয়ে বড় কথা ভোগের ইচ্ছা প্রবল হলে দীক্ষা নিয়ে অনেক সময়েই উল্টো উৎপত্তি হয়।' কুন্তী বলল 'ভোগের ইচ্ছার কারণ কী?' গুরুদেব বললেন 'শুধু তাঁকে ডাকা আর ডাকা আর ডাকা। প্রার্থনা: ঠাকুর, ভোগের পথে তৃপ্তি নেই, অমৃত নেই—আছে যে-যোগের পথে আমাকে সেই পথেই নিয়ে চলো। ব্যস, শুধু এইটুকু। শুধু তাঁর নামগান আর প্রার্থনা।' কুন্তী কেঁদে বলল: 'কিন্তু শুধু নামগান করে চলবে কেমন করে সাধুজি? প্রাণে বাঁচতে হবে-তো। আমার যে অবস্থা তাতে বেশ্যাবৃত্তি বা ভিক্ষা ছাড়া বাঁচার কোনো পথ নেই। কিন্তু বেশ্যা বা ভিখিরি হয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো।' গুরুদেব খুশী হয়ে ওকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'আমি কাল ফিরছি দেবপ্রয়াগে, তুমি চলো আমার সঙ্গে। আমি তোমার সব ব্যবস্থা করব—কারণ তোমার সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার কোনো ভাবনা নেই মা, আর আমার কথা যদি শোনো তো তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে না, কথা দিচ্ছি।'

"ওকে তিনি নিজে সঙ্গে করে এনে দেবপ্রয়াগে এক কুটিরায় রেখে ওর ভাসুরকে রঘুবীরকে মোতায়েন করলেন। সে ছিল লক্ষ্ণৌয়ের পাশ করা ডাক্তার। কুন্তীকে দিলেন আশ্রমে কিছু সেলাইয়ের কাজ। এছাড়া এখানে ওখানে গান করেও সে কিছু পেত।

"যথাকালে শাহনু ভূমিষ্ঠ হল। কুন্তী কেঁদে বলল 'এখন এ-শিশুর হাঙ্গাম পোহাবে কে গুরুদেব?' গুরুদেব ওর কান্নায় কান না দিয়ে বললেন: হাঙ্গাম নয় মা,

তারক—তারক। হ্যাঁ, ও এসেছে তোমার দুর্দিন কাটিয়ে সুদিন আনতেই, বলছি আমি, পরে মিলিয়ে নিও। বড় সুলক্ষণ শিশু, লাখে না মিলয়ে এক। বলে ওর 'শান্তনু' নামকরণ করে বললেন: নবজাতকের আর যা যা দরকার সবই তিনি জোগাবেন। তবে উপস্থিত কিছু-দিন সিধে-র ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নেই।'

"কুন্তীর ফের মন খারাপ হ'য়ে গেল। বলল; 'গুরুদেব, সিধে তো ভিক্ষেরই নামান্তর। আপনি যদি আমাকে দীক্ষা দিতেন তাহ'লে অধিকন্তু সব গোলই চুকে যেত, কারণ গুরুর কাছে শিষ্যা সন্তানের চেয়েও বেশি, তাই গুরুর দান হ'য়ে ওঠে বর দান, ভিক্ষা দান নয়। কিন্তু আপনার শিষ্যা না হ'য়ে সিধে নেব কেমন ক'রে?' গুরুদেব বললেন; 'এ যাত্রা তুমি ভুল বলো নি মা, কিন্তু তোমাকে আমি দীক্ষা দেব কথা দিতে পারি যদি তুমি আমার কথা শুনে চলো।' কুন্তীর মুখ আলো হ'য়ে উঠল। বলল হেসে; 'কী আনন্দ! দীক্ষা পাব আপনার চরণে? কিন্তু কবে গুরুদেব?' গুরুদেব হেসে বললেন; 'মা, তুমিই একটি কীর্তন গাও; "যাই, ধৈর্য, রহ ধৈর্যম্—আমাদের ঘরোয়া প্রবচনটি আরো সরেস—সবুরে মেওয়া ফলে। তুমি এখন সাত পাঁচ ভেবে মনের বাজে খরচ না ক'রে ঠাকুরকে ডেকে যাও। মায়ের বীজ বুনলে দীক্ষার দিনও এগিয়ে আসবে।'

"কুন্তী মহানন্দে রঘুনাথ মন্দিরে ফের গান গাইবে ঠিক করল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল শান্তনুকে নিয়ে—ওকে রাখবার কাছে। গুরুদেব বললেন একটি ধাত্রী রাখবেন, কিন্তু কুন্তী রাজী হ'ল না। বলল; 'আমি আপনারগলগ্রহ হ'য়ে আছি গুরুদেব, কোনো কাজেই লাগি না, দীক্ষাও পাই নি আজো। এক্ষেত্রে আশ্রমের ভার বাড়াতে পারব না ধাত্রী রেখে। শান্তনু একটু বড় হ'লে তখন মন্দিরে গাইব—সেই ভালো।' গুরুদেব মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না।

"কিন্তু ফোঁকালো মেয়ে তো—তার ওপর রোখালো। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই গুরুদেবের অনুমতি না নিয়েই রঘুবীরকে সাফ ব'লে দিল; 'আমার আর তারেক করতে হবে না কারুর—'I Can take care of myself,'

"দর্প এলেই দর্পহারী উঁকি মারেন। রঘুবীর প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গেই সেবপ্রয়োগের কয়েকটি ডাকসাইটে দুষমন লাগল ওর পিছনে। শেষে একদিন রাতে ওর কুটিরের দোর ভেঙে ঢুকল এক মাতাল। সোজা এসে কুন্তীকে ভেংচে নাচতেই কুন্তী তার হাত কামড়ে ধরল। সে ধরণার 'উঃ' ব'লে ওকে ছেড়ে দিতেই কুন্তী ঘরের কোণে বঁটি নিয়ে দাঁড়ালো ধনরঙ্গিণী মূর্তিতে। মাতাল ঘরোয়ের নেশা ছুটে গেল।

'বাপরে।' ব'লেই চম্পট।

"পরদিন গুরুদেবের কাছে সব বলতেই তিনি বললেন কুন্তীকে: 'তোমাকে কি বলি নি মা, আমার কথা শুনে চলবে? আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে রঘুবীরকে ডিসমিস করার নাম কি কথা শোনা? কিন্তু সে যাক্, মেজাজোচারের ফল যখন হাতে হাতে পেয়েছ তখন তোমাকে আর ধমকাব না। কেবল দুদিন হ'ল তোমার পাশে ঐ যে চাষা বউটি তুলেছি, সেখানে আমার এক শিষ্যকে পাঠাব। তুমি না কোরো না। আমি খবর পেয়েছি ওরা তোমাকে লুটে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। দুতিন জন যদি হঠাৎ এসে চেপে ধরে মা—'ব'লে হেসে—'তখন আর বঁটিতেও সামাবে না।'

"রঘুবীর যেতে চাইল না ফের কুন্তীর রক্ষক হ'তে। কিন্তু প্রসাদ বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। বলল: 'আমি ওদের শায়েস্তা ক'রে দেব গুরুদেব। কিছু ভাববেন না।' গুরুদেব ভেবে চিন্তে মত দিলেন, কিন্তু একটু দোমনা হ'য়েই, কারণ আর কেউই এগুতে চাইল না এ-সংকটে।

"তারপর ঘটল অনেক কিছু। সব, বলার সময়ও নেই, দরকারও দেখি না। তাই শুধু বলি—প্রসাদ নিজেকে মহাবলী ভেবেই ডুবল। ফের ঐ যাকে বলে দর্পচূর্ণ। ঘটল এক রীতিমত নটেক, লীলাময়ের লীলার পার কে কবে পেয়েছে তাই To cut a long story short, প্রসাদ পড়ে গেল কুন্তীর প্রেমে, আর সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীরও মন উঠল দুলে। এর বেশী বললে পরচর্চা হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই শুধু বলি: কুন্তী ছোঁওয়া দিয়েও ধরা দিতে রাজী হ'ল না, বলল প্রসাদ ওকে বিবাহ না করলে আত্মসমর্পণ করবে না কিছুতেই।

"প্রসাদ পড়ল মহা ফাঁপরে। দশবৎসর সাধনা ক'রে নিজেকে আকুমার ব্রহ্মচারী তথা কামজয়ী মহাসাধক ব'লে

পরিচয় দিয়ে শেষে এক ছোঁট জাতের পতিতা মেয়েকে বিয়ে করলে সমাজে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? অথচ এদিকে কুন্তীর মোহও ওকে বেশ ঘায়েল করেছে ভুলবার মতই। ওর উভয় সঙ্কটের কথা আর বলিয়ে নাই বললাম।"

অমিত বলল: "কিন্তু প্রসাদ যদি কামনয় না ক'রে থাকে তবে গুরুদেব তাকে মোহিনী যুবতীর রক্ষকের পদে মোতায়েন করলেন কেন? তিনি কি জানতেন না—এপথে রক্ষক কত সহজে ভক্ষক হ'য়ে দাঁড়ায়?"

"পরে শুনেছিলাম রঘুবীরের কাছে যে, গুরুদেব তাঁর নিজ প্রসাদকে এ-পিছল পথে ঠেলতে। নন্দন হেসে আমাকে বলেছিল যে, মহতরা কখনো কখনো শিষ্যদের পরীক্ষাও করেন তো। প্রসাদ বড় বেশি আঁক করত সে কামনয় আকুমার ব্রহ্মচারী—তাই তিনি হয়ত চেয়েছিলেন ওকে একটু শিক্ষা দিতে। তবে গুরুদেব যে ঠিক কী ভেবে ওকে কুন্তীর চৌকিদারে পদে বাহাল করেছিলেন আমরা কেউই নিশ্চিত জানি না তাই। কারণ মনে রাখিস এ প্রায় ন বৎসরের আগেকার কথা—যখন পাণ্ডু ছিল কচি শিশু। আমরা সেবপ্রয়াগে আসি—যখন পাণ্ডু পাঁচবছর বয়সে সবে গান গাওয়া সুরু করেছে। মনে পড়ে, বা বলছিলাম এর পরে প্রসাদকে যে বেশ কিছুদিন ভুগতে হয়েছিল একথা সকলের কাছেই ফাঁশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এসব ফালতো কথা আর না। তোর মন খারাপ ক'রে দিতে তো এ-গল্প ফাঁদি নি, তুই মনে জোর পাবি ভেবেই বলা। তাই এ-অধ্যায় আর ক'দিনে না বলে প্রসাদের মোহভঙ্গের পরে কি হ'ল।"

"একটু বোসো ভীষদা। প্রসাদের মোহভঙ্গ হ'ল কি তোমাদের গুরুদেবের কৃপাই বলবে?"

"ওরে খল সংশয়ী! আমাকে দিয়ে কী বলিয়ে নিতে চাচ্ছিস শুনি? যে, গুরুকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়? কিন্তু তোর ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি নি। কেবল বলব—সাধারণ ভাবে, ধরা ছোঁয়া না দিয়ে—যে, গুরুকৃপায় যে অঘটন ঘটে, প্রতি সাধকেরই একটি অকাট্য অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে অঘটনটি ঘটল কী ভাবে তাও আজ বলব না তোকে কিছুতেই—তুই কের অবিশ্বাসের হাসি হাসবি। তাই শুধু বলব—গভীর মনস্তাপের পরে প্রসাদের মুমতি ফিরে এল—বহু সাধনার ফলে-পাওয়া বিবেকের তাড়ায় ও বাইরে অনেকের কাছে নানা অর্থদণ্ড বসলেও গুরুদেবের কাছে কিছুই না লুকিয়ে সব খুলে বলল। কিন্তু হ'লে হবে কি, একটা ক্ষোভ ওর মনে বাসা বাঁধল যার ফল পরে হয়েছিল শোচনীয়—কিন্তু যাক্ সেকথা, উপস্থিত কুন্তীর কথাই বলি একটানা।

"প্রসাদকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনার পর—যাকে বলা যায় ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসার পরের পর্বে—গুরুদেব তাঁর এক গুরুত্ব দায়িত্ব সোপা, শিষ্যকে মোতায়েন করলেন কুন্তীর তদারক করতে। ফলে তখনকার মত অন্ততঃ ওর সমস্যার একটি সুরাহা হল।"

ভীম হেসে হেসে বলে; "এম-এ তে আমাদের পাঠ্য ছিল সেক্সপীয়রের হ্যামলেট। তাঁর একটি কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল;

when sorrows come they come not single spies, But in battalions.

বেচারী কুন্তীর জীবন এ-উক্তির প্রত্যক্ষ ভাষ্য। একটা বিপদ কাটে তো আর একটা চড়াও হয় সৈন্যদের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে। নৈলে কে ভেবেছিল যে, প্রসাদ প্রবীণ সাধক হ'য়েও এক একান্ত অসম্ভাবনার পিছনে এভাবে লাগবে কোমর বেঁধে? এখানে ওখানে ওর চিত্ত-চাঞ্চল্যের খবর রটেছিল—রটবেই তো—ছোট শহরে এ-জাতের শ্রুতিরোচক খবর বাতাসেরো আগে ছোটে, কে না জানে? ফলে ও অগ্নিশর্মা হ'য়ে যত্র তত্র ব'লে বেড়াতে লাগল যে, কুন্তী শুধু পতিতা ও অস্পৃশ্যাই নয় আর ওপরে ডাকসাইটে মিথ্যুক, তাই প্রসাদের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সে অম্বিয়ের পাণ্ডাদের তথা এক শাস্ত্রীপুরুষের কাছে—যাঁর কথা পরে বলছি—গিয়ে বলল যে, কুন্তী মিথ্যা বলেছে যে, সে বিধবা। পাণ্ডু জীবন্ত, আর কুন্তী বেশপথা—না, পরিকারও বয়স, নৈলে কি যোগীদের প্রলুব্ধ করতে যায়?

"গুরুদেব আমাদের প্রায়ই বলেন যে, আমাদের স্বভাব এমনিই অনমনিতে ভরা যে, উল্টে-পাল্ট ঘটনা আমরা যুগপৎ সমান আগ্রহেই বিশ্বাস ক'রে বসি। তাই প্রসাদের চিত্তচাঞ্চল্য নিয়ে হাসাহাসি করা সত্ত্বেও বহু পরচর্চাপ্রিয় যাত্রী পাণ্ডা—বিশেষ করে মেয়েরা—মিথ্যেযোগী বক-ধার্মিককে কুন্তী প্রত্যাখান করেছে, বেশ হয়েছে, যেমন

ছুছুর তেমনি ছুন্তর'—ইত্যাদি বিদ্রূপ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ক'রে বসল যে, দৈবিনী দেবপ্রয়োগে এসেছে যোগীদের যোগভ্রষ্ট করতেই—ছি ছি! ধিক্। তবে দেখ্—প্রসাদকে ভণ্ড ব'লে হাসাহাসি করতে যাদের বাধল না, তারাও কুন্তী বেচারীকে এতটুকুও সাবাস দিতে রাজী হ'ল না যে, সে প্রসাদকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও না বলতে পেরেছিল!

অসিত বলে: "আহা, বেচারী মেয়ে! তবে তুমি তো ভাই জানো—পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ঢের বেশি সইতে হয় একই অপরাধে।"

ভীম হেসে বলে জানি বলে "জানি বলে জানি দাদা, জানি হাড়েহাড়ে। গল্পটা আর একটু এগুলেই বুঝতে পারবি সে কেমন জানার মত জানা।"

বলে মুখে আর একটা পান পুরে ভীম বলে চলে: "প্রসাদের প্রপাগাণ্ডার ফলে কুন্তীর পক্ষে বাইরে বেরুনোও হয়ে উঠল দুর্ঘট। এমন কি, আমাদের আশ্রমে এলেও গুরুদেবের নানা শিষ্যা আপত্তি করত। তাদের কথায় অবশ্য তিনি কান দিতেন না, কিন্তু ভাগবত পাঠের সময় যখন মেয়েরা আঙুল দিয়ে কুন্তীকে দেখিয়ে ফিসফাস করত তখন সবাইকেই একটু বিপন্ন হতে হত। তাই গুরুদেবকে বলে কুন্তী শেষটায় আশ্রমে আসাও ছেড়ে দিল। অতঃপর গুরুদেবকেই সময় করে প্রতি সপ্তাহে যেতে হল তার কুটিরায় ভাগবত বা গীতার পাঠ দিতে—রঘুবীর চন্দন ও আরো দুএকটি শিষ্যকে নিয়ে যারা কুন্তীর দুঃখে দুঃখ পেত।

"রঘুনাথজির মন্দিরেও সে আর গাইত না?"

"তুই ভালো প্রশ্ন করলি! বলি নি—প্রসাদ সর্বত্র প্রপাগাণ্ডা করে বেড়াত কুন্তীর নামে। একথা সত্যি, কুন্তীকে একটা মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল যে, সে বিধবা। কিন্তু মানুষের এমনি স্বভাব যে ভাই যে সে উঠতে বসতে মিথ্যা বললেও কাউকে মিথ্যা বলতে দেখলে বিষম ক্ষেপে ওঠে। কাজেই কুন্তী মৃদুভাষিণী হয়েও বিধবা বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে এতে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের দল আগুন হয়ে উঠলেন—ওর সত্যি সত্যিই পথে ঘাটেও মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠল। তবে ও পড়তে ভালোবাসত ভাই কতকটা বেঁচে গেল, কারণ গুরুদেব তাঁর লাইব্রেরি থেকে নানা সদ্‌গ্রন্থ পাঠাতেন, ও পড়ত মন দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও ভালো করে পড়া সুরু করল, বিশেষ করে ভাগবত পড়তে। বাকি সময়টা নবজাতককে নিয়েই কাটত—আনন্দেই বলব। বাধাই হয়ে দাঁড়ালো ওর বিকাশের সহায়।

"কিন্তু এর পরে হানা দিল কের এক নতুন বিপদ—ঐ সেই কুরুক্ষেত্র সৈন্যদের মতনই আচমকা। বেগতিক দেখে সেই ঘরোগাঙ্গি সরে পড়লেন।

"কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? সদ্‌গুরু যার সহায় আত্মরিপু তার কী করবে? হল কি, গুরুদেব প্রসাদ-ঘটিত এই কেলেঙ্কারির কয়েক মাস আগে আশ্রম থেকে আধমাইল দূরে চারবিঘে জমি কিনে দুটি ঘর তুলেছিলেন। জমিটিতে নানা শাকসব্জির চাষ বসিয়েছিল এক নিপুণ মালী—সস্ত্রীক। কিছু ফলের গাছও ছিল—আর আভা পেয়ারা লেবু···। গুরুদেব কুন্তীকে মালীর পাশের ঘরে মোতায়েন করলেন সহকারিণী মালিনী। এতদিনে বেচারী মেয়ের একটা স্থায়ী মতন ব্যবস্থা হল। পক্ষপ্রবীর অবিশ্যি আপত্তি করেছিল, কিন্তু গুরুদেব তাদের কৃষ্ণকণ্ঠে ধাবড়ানি দিলেন: 'কে কোথায় কী করছে না ভেবে নিজের সাধনায় চরকার তেল দাও।'

"কুন্তী উপস্থিত আর একটা আবর্ত থেকে নিস্তার পেল বটে—অন্ততঃ তখনকার মত, কিন্তু মুস্কিল হ'ল—এর পরে তার মন কিছুতেই আনা যাবতে চাইল না ব'লে। নীতিবাগীরা তাকে এ জন্যে দোষ দেবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে উদ্দেশ্য মনে পুষে এসেছে, সে নৈতিকতার নিষেধ মানতে চায় না। বলেছি কুন্তী দশবারো বৎসর বয়স থেকেই গাইতে পারত চমৎকার। ঠিক প্রতিভা বলা যায় না, তবে ওর মধুর সুরেলা ও ধরদী কণ্ঠের গানে সকলেরই মন ভিজে উঠত। ওর উদ্দেশ্য ছিল ও পেশাদার গায়িকা হবে। সে-আশায় ছাই পড়লেও গান গেয়ে নাম করবার উচ্চাশাকে ছাড়তে পারল না। প্রথম প্রথম রঘুনাথজির মন্দিরে গান গেয়ে খাতির পেত ব'লে কিছুটা খুশী ছিল, কিন্তু যখন ভ্রষ্টা ব'লে ঠেলে দিয়ে পাওয়া ওকে মন্দিরে আসতে বারণ ক'রে পাঠাল তখন

• বেদনা বিপদ যবে দেয় হানা—হায়
দুরন্ত সৈন্যের সম আসে দলে দলে।

ও দুঃখে ক্ষোভে নিরাশায় কেবলই ভাবত—আত্মহত্যা করা ছাড়া আর পথ নেই। এক কথায় এ-ভাবে সবার অলক্ষ্যে থে'কে শুধু এক বাগানে মালিনীর নীরস কাজে ওর মন বসল না।

"গুরুদেব অন্তর্যামী, ওকে আশ্বাস দিলেন যে, ফের ওর সুদিন আসবে যদি ঠাকুরকে সত্যি ডাকতে পারে। ও প্রার্থনা সুরু করল—নামরূপও। কিন্তু তবু কোথাও গান গাইতে না পেয়ে ও সর্বদাই মনমরা হ'য়ে থাকত। গুরুদেব তখন ওকে মাঝে মাঝেই আশ্রমে ডেকে ওর গান শুনতেন আশ্রমের সঙ্গে। কিন্তু দুচার দিন পরে প্রসাদ ভাগাড়ি দিয়ে বিবাকর পিশাকী রাখীর ও বিষ্ণুদাসকে বিমুখ ক'রে তুলল। ওরা ডেপুটেশনে এসে গুরুদেবকে বলল কোরাসে যে, মেয়েদের গান শুনলে ওদের সাধনার ক্ষতি হয়। গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন পরাবলীর কীর্তন শুনে যে কেউ ডুবেছে এমন কথা কখনো শুনি নি। তবে যখন আমাদের সাধনার ক্ষতি হয় না তখন আমরা শুনব।

"অতঃপর কুণ্ঠীর কীর্তন শুরুদেব শুনলেন চন্দন ও রঘুবীরের সঙ্গে। আমি ও মা তখনো দেবপ্রয়াগে আসি নি।"

"শান্তনু তখন কত বড় ?"

"তিন কি চার বৎসর। রঘুবীরের মুখে শুনেছি গুরুদেব তাকে কী যে আদর করতেন, কখনো কখনো কোলে করে খাওয়াতেন, বলতেন 'ও এসেছে তাই ঘরে চাঁদের আলো—মা-র ভ্রান্তি হবে।'

পঞ্চপ্রবীর আরো জলে উঠে বলত যা তা। তবে ধরা ছোঁওয়া দিয়ে নয়। ধাবে বলে লুকিয়ে কাদা ছোড়া।

গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল : পাঁচবছর বয়স থেকেই শান্তনু গাইতে আরম্ভ করল। বছর না ঘুরতেই কত গানই যে শিখে ফেলল সে এক অবাক কাণ্ড। দেখে অনেকেই বলত 'প্রতিভা'। গুরুদেব বলতেন 'আরো বেশি, ওর সন্ন্যাসযোগ আছে—born yogi যাকে বলে।'

"গুরুদেব প্রায়ই উদ্ধৃত করেন পরমহংসদেবের একটি বিখ্যাত উক্তি। এক নিঃস্ব তাঁর কাছে এসে একবার বলে 'ঠাকুর, আমার কেহ নেই।' তাকে ঠাকুর, খোলা হেসে হাততালি দিয়ে বলছিলেন 'তুমি ধন্য, কারণ যার কেউ নেই, তার ঠাকুর আছেন।'

অসিত হেসে বলে "কথাটা আমাদের কৃষ্ণঠাকুরও বলেছিলেন তাঁর পাটরাণী রুক্মিণী দেবীকে—তবে খোলা হেসে নয়, মুচকী হেসে :

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বৎ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়ঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে!

অর্থাৎ কিনা—

রাণী, অকিঞ্চন আমি গো ভালো, অকিঞ্চনে বাসি
তাই ধনীরা প্রায় পুজে না হায় আমাকে উচ্ছ্বসি"।"

তীব্র হাততালি দিয়ে বলে : "বা বা! Parallel passage যাকে বলে! আর কথাটা সত্যিও বটে, মানতেই হবে। নৈলে কি অকিঞ্চন কুন্তীকে আশ্রয় পাবার জন্যে আসতে হ'ত প্রথম এক অকিঞ্চন গুরুর আশ্রমে—পরে আরো অকিঞ্চন শিশুপুত্রের প্রতিভার আওতায়? আর প্রতিভা ব'লে প্রতিভা—তার একবার মাত্র পাঁচবৎসরের শিশু প্রতিভি—"

অসিত বলে : "তবে প্রাডিজিরা তো শিশুই হয় দাদা। জার্মানিতে—যেখানে প্রতিভিদের দেখা মেলে সবচেয়ে বেশি ওদের নামকরণটাও তাই বেশি মানায় : wunder-kind, কিনা অদ্ভুত শিশু—wonder child, যথা মোজার্ট—যিনি চারবৎসর বয়স পিয়ানে বাজাতেন, বীটোভেন যিনি ন' বৎসর বয়সে kappelmeister কিনা conductor হয়েছিলেন, শুবার্ট, হুমেল, মেণ্ডেলসন কিন্তু যাক গে এসব ফালতো কথা, তোমার গল্পটাই চলুক।"

"তুই মর্মবধের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভালোই করেছিস, কারণ আমি সত্যিই জানতাম না শিশুরা এত অল্পবয়সে প্রতিভাবান হ'তে পারে। তাই আরো অবাক্ হ'তাম শান্তনুর গান শেখার অদ্ভুত কৃতিত্বে। আর শুধু কারিগরির, নানা আলাপের কৃতিত্বই নয়, গায় সে যে কী দরদ দিয়ে! রঘুবীরের কাছে শুনেছি—রঘুনাথজির মন্দিরে তার গান শুনতে ভিড় জ'মে যেত তার পাঁচ ছবছর বয়স থেকেই। তাই তো এমন কি দুর্ধর্ষ শাস্ত্রীজীও তাঁর অনুগত পাণ্ডারাও শান্তনুকে মন্দিরে গাইতে দিতে আপত্তি করেন নি—তার প্রসাদে তাঁরাও বেশ দুপয়সা কামাতেন ব'লে। ঐ একরত্তি ছেলে যা পালা পেত তার অর্ধেক তাঁরা ভাগ বসালেও মা ও ছেলের চ'লে যেত স্বচ্ছন্দেই—কুন্তীর ভিক্ষা করতে হয় নি একদিনও। এই সূত্রে একবার ভেবে দেখ

তাঁর লীলা—বলে না, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।' যে ছেলে এসেছিল অবাঞ্ছিত অতিথি হ'য়ে—গা-র চলার পথে কাঁটা—সেই কিনা দেখতে দেখতে ফুটে উঠল গোলাপ হয়ে—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে!"

অসিত বলল: "তোমার উপমাটি জুৎসই হয়েছে মানতেই হবে যদিও এটি তুমি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে ধার করেছ। কেবল একটা কথা মনে হচ্ছে আমার—" ব'লেই থেমে: "না, থাক সেই দাদা, সংশয়ী ব'লে আমার যে-দারুণ দুর্নাম রটেছে, আশীর্বাদ করো—তার দুর্ণ সরল বিশ্বাসীর ছোঁয়াচে তার বক্রকাঁটাও ভক্তি গোলাপ হয়ে ফুটে উঠুক তোমার গুরু ভক্তির আশ্বাসিতে ছোঁয়ার দিতে দিতে।"

ভীষ খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে: "শুধু তোমাদের জোরেই কি কাঁটার গোলাপ ফোটে দাদা! চাই বিশ্বাসের নিষ্ঠার সাধনা। কিন্তু তোর বাধছে ঠিক কোথায় বলবি? শান্তনু যে গান গেয়ে কুন্তীকে ভিক্ষা করার গ্লানি থেকে বাঁচিয়েছিল একি ঠাকুরের করুণার একটা অকাট্য প্রমাণ নয় বলতে চাস্?"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "আমি যা বলতে চাই গুছিয়ে বলা খুব সহজ নয়। তাই থাক এ-তর্ক। তাছাড়া আমার সংশয় কাটল বা না কাটল—কী যায় আসে বলো?"

ভীষ চম্‌কে ওঠে: "যায় আসে না? বলিস কি তুই? আমাদের তীর্থ পথের সবচেয়ে বড় বাধা যে-সংশয় —Lion in the path—তাকে জয় করতে না পারলে লক্ষ্যসিদ্ধি হবে কেমন ক'রে শুনি? তাই বল্ তুই, যা প্রাণ চায়।"

অসিত বলে: "আমার কোথায় বাধছে তাহ'লে খুলে বলি শোনো। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, করুণা মাঝে মাঝে ওপর থেকে আলোর আশীর্বাদের মতন উড়ে এলেও তারপরেই যে কেন আঁধারের অভিশাপ নিচে থেকে আসে। কালো হ'য়ে ছেয়ে আসে—তার কি? কাঁটা গোলাপ হবার পরেও কেন যে তরুক গোলাপের মধ্যে ঢুকে পড়ে গাচাকা হ'য়ে থাকে, ফলে গোলাপের গোলাপ হ'য়ে ওঠা স্থায়ী হয় কই? দাদা, সংসারে ত্রিতাপদগ্ধ জীব ঠিক কী চায়? শোক পেয়ে একটু সান্ত্বনা পাবার পরে আরো বেশি শোক পেতে আরো গভীর সান্ত্বনা পেতে, না বীতশোক হ'য়ে জীবন্মুক্তের পদবী পেতে? এক কথায়, বুদ্ধদেবের ভাষায়, দুঃখনিবৃত্তি। না শোনো ভীষদা, আমাকে তুল বুঝো না, লক্ষ্মীটি! আমি মানি—করুণা নিঃস্বকে আশ্রয় দেয়, ভক্তি দুর্বলকে বল যোগায়, সাধনার পথের বাধা কাটে, সুমতি দুর্মতির প্রলোভন থেকে রক্ষা করে। কিন্তু করুণা ভক্তি সাধনা সুমতি বিকায় কোন্ হাটে বলবে? আরো একটা কথা বলি ভয়ে ভয়ে—যখন চাগিয়ে দিয়েছ বলতে 'যা প্রাণ চায়', কথাটা এই যে শান্তনু পেয়েছিল গুরুদেবের করুণা, কুন্তী ভক্তির পাথেয়—এ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, কারণ জানি তুমি সত্যনিষ্ঠ, বিবেকী তেবেচিন্তেই কথা বলে থাকো। কিন্তু খতিয়ে দাঁড়ালো কী? ওদের পথের বাধা কি কাটাল, না বাধার পর বাধার দুর্নাম ভাসে গিরিশ ঘোষের ভাষায় 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল!' কোন্‌টা?"

"তুই চাস সস্তা উপন্যাসের happy ending—ক'নে কাটার সঙ্গে সঙ্গে নায়ক নায়িকার মিলন—ধানিক পতন—যার পরে ভাবো শুধু সুখস্মৃতিতেই হেসে খেলে রামধনুর ডানা উড়িয়ে গান গেয়ে চলবে: 'যে দেখেছি যা শুনেছি তুলনা তার নাই।' আমার মনে হয়, জীবনবিধাতা কোনোদিনই মানুষের জীবনকে এভাবে চালান নি, আজও চালাচ্ছেন না। গুরুদেবের শ্রীমুখে এই কথাটি শুনে এসেছি যে, প্রেমের সাধনার বহু বাধা জয় ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রে কৃতকৃত্য হ'তেই ঠাকুর আমাদের জীবনের আখড়ায় পাঠিয়েছেন ধীর হ'তে। যে এ-সাধনা বরণ করে সে-ই কেবল পদে পদে বাধা ডিঙিয়ে শেষে মনের প্রাণের কাঁটাবনে সাজানো বাগানের পত্তন ক'রে ধন্য হ'তে পারে। কিন্তু এ ধন্য হবার পথ তো একটানা আয়োস আহ্লাদের পথ নয় ভাই। বহু সংশয়ের অন্ধকার, শোকতাপের কাঁটাবন, নীরসতার মরু পার হ'য়ে তবে মানুষ অমৃত হয় প্রেম মন্ত্রে দীক্ষা নিলে। এ-দীক্ষা নিতে যে নারাজ তারও গতি হবে—কেবল অনেক জ্বালাযন্ত্রণায় নাকাল হ'য়ে তবে।"

অসিত করুণ হাসে: "কিন্তু প্রেমভক্তির পথেও কি মানুষ ভয় নাকাল হয় ভীষদা?"

ভীষও হাসে: "হয় বৈ কি ভাই, ভুক্তভোগী মাত্রেই

মানবে। কেবল ভক্তির পথে নাকাল হওয়ায় বেসুর ও বেতাল একটু ভিন্ন। কারণ সাধক যখন সাধনার পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে তখন বিষয় বা বেলেও একটি কথা জানেই জানে—যে, প্রেমের ঠাকুর বাইরে প্রকট না হলেও অন্তরে আছেন পতিতকে পাবন করতে সান্ত্বনা দিয়ে, বল দিয়ে—সবচেয়ে বড় কথা: দিশা দিয়ে ঠিক পথে চালাতে। এক কথায় ভয়ের ভূমিকম্পেও সে অভয় পায়।"

"ঠিক কী ভাবে—একটু খুলে বলবে ভাই? আমি সত্যিই জানতে চাই।"

ভীষ একটু ভেবে বলে: "গুরুদেব পরচর্চা করতে মানা করেছেন বলেই বাধছে—তা হোক, এ তো ঠিক পরচর্চা নয়, তুই যখন অবুঝ সংশয়ী হলেও খাঁটি জিজ্ঞাসু। তাই শোন্: তোর চ্যালেঞ্জের জবাবে যেবই দেব—যার ফলে হয়ত তুই দেখতে পাবি—গুরুকে ভালবাসলে কী ভাবে অচিরাও সেই প্রেমের প্রেরণায় টাল সাম্‌লে আসক্তির চালুপথ ছেড়ে মুক্তির ঊর্ধ্বপথে চলবার শক্তি পায়।

"বলেছি—প্রসাদ কুন্তীর পাশের ঘরে থেকে পাহারা-ওয়ালা হয়ে ছিল মাসখানেক। হল কি, ক্রমশঃ কুন্তীর যৌবনশ্রী, কণ্ঠ, হাবভাব, চটক, চাহনি গড়ন তাকে একেবারে উতলা করে তুলল, একথাও বলেছি। যেটুকু বলিনি সেটা এই যে, সে কুন্তীকে নানা লোকবাক্যে ভুল বোঝাতেও সঙ্কোচ বোধ করেনি। আর কী সাংঘাতিক লোকবাক্য: যথা, নীরসতায় মধ্যে নরনারীর একটু স্পর্শ চাওয়ার ফলে যোগ হয়েই হয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে এমন আভাষও দিয়েছিল যে, অন্তরে সে স্পষ্ট শুনেছে যে, কুন্তীই তার শক্তি। এইতেই কুন্তীর মন দুলে উঠেছিল—শুধু তার 'যৌবননিকুঞ্জে' ঘুমঘাগানিয়া পাখী' নিরন্তর ডাকত বলে নয়—রঙিন আশার সোনার সকাল জীবন তাকে সবচেয়ে নরম জায়গাটিতে ঘা দিয়েছিল বলেও বটে। এ-রঙিন আশার স্বরূপটি হয়ত আমরা পুরুষেরা ঠিক ধরতে পারব না, কেন না আমাদের মন ঠিক কুমারীদের মতন রংবিলাসী নয়—কিন্তু এটুকু বুঝতে আমাদেরও বেগ পাবার কথা নয় যে, ও গভীর বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল—যখন যাকে ওর কুমারী হৃদয় বিশ্বাসের তিলক ও প্রেমের মালা দিয়ে অন্তরে বরণ করেছিল সে-ই হানল ওকে মর্মান্তিক শক্তিশেল—শুধু যে ওকে পথে বসিয়ে পালালো তাই নয়—পালালো আর একটি মেয়ের সঙ্গে। আলো ওর চোখে সত্যিই কালো হয়ে গেল।

"কিন্তু যৌবনের রঙিন কামনা মরেও মরে না। তাই একটু একটু করে ফের ও জল্পনা কল্পনা সুরু করল কোনো সৎ প্রেমিককে নিয়ে নীড় বাঁধার। যুবক প্রসাদ ওর এই অতৃপ্ত কামনায় তারে ঘা দিয়েই ওকে চঞ্চল করে তুলেছিল, ভরসা দিয়ে যে, কুন্তীই তার শক্তি, তাই সে ঠিক করেছে যে সে একটি চমৎকার আশ্রম গড়ে তুলবে ওকে আশ্রমমাতার পদবী দিয়ে। কোথায় এ নব-আশ্রম পাতবে বলে নি, কেবল বলেছিল উপস্থিত একথা গোপন রাখতে—এমন কি, গুরুদেবকেও যেন না বলে—'মন্ত্রশক্তি বিনা সিদ্ধ হয় না ভাগবতে আছে—ইত্যাদি। (ক্রমশঃ)

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টম মন্ত্র (১।২।৮)

মন্ত্র—ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো,
বহুধা চিন্ত্যমানঃ
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্
হ্যতর্ক্যমণু প্রমাণাৎ ॥

অর্থ—"অবর" মানুষের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ইনি (=এই আত্মা) সুবিজ্ঞেয় হ'ন না, কারণ বহুভাবে ইঁহাকে চিন্তা করা হয়। অবর ছাড়া অন্য শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্বারা উপদিষ্ট না হইলে আত্মতত্ত্বে গতি নাই।

ব্যাখ্যা—কোন "অবর" মনুষ্য ইঁহাকে ভাষায় জ্ঞাপন করিতে পারিবে না যাহাতে অপরে সে উপদেশ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্য আচার্য্যের পক্ষে আত্মার উপদেশ সহজ নহে। আচার্য্য স্বয়ং দেবতা হওয়া চাই; তবে ত তিনি দিবেন ও আমরা পাইব। কারণ "অবর" বলিতে সেই সকল মনুষ্য যাঁহারা আত্মার কাছ হইতে বর পান নাই বা তাঁহার দ্বারা বৃত হ'ন নাই। তবে মনুষ্য যদি পরা বরের (মুণ্ডক উপ, ২।২।৮ দ্রষ্টব্য) দৃষ্টিলাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি তাঁর প্রেরণা দ্বারা বাক্যের কতক যোজনা করিতে পারেন যাহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিরও জানিবার রুচি জন্মাইতে পারে। সে রুচি না থাকিলেত জানা যায় না। কিন্তু মনুষ্য আচার্য্য সাধারণতঃ আত্মার বার্ত্তা কেন দিতে পারেন না? তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া বলেন, অনেক মেপে জুপে গভীর চিন্তা করে বলেন। আত্মা যেমন অব্যক্ত, সেইমত তিনি অচিন্ত্য (গীতা ২।২৫)। যে মানুষ ভেবে চিন্তে বলে "ভালবাসি" বা "চিনি" সে কি যথার্থ ভালবাসে বা চেনে? যে চেনে না ও আর একজনের কাছ হইতে জানিয়া বলে সে কোনমতে জানাতে পারে কিন্তু চেনাবে কেমন করিয়া? আর যে আত্মাকে চিনিয়াছে সে ত আত্মা হইয়া গিয়াছে, আর মনুষ্যপদবাচ্য নহে। তাই প্রকৃত আচার্য্যকে দেবতা বলা হয়, কেহ কেহ পরম দেবতা বলেন সত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। আর একটা কথা। চিন্তার মূল্য কতখানি? চিন্তা করি মন দিয়া। মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব ইহা অনিত্য। আত্মা নিত্য, তাহাকে অনিত্য বস্তু কি করিয়া স্পর্শ করিবে? প্রাণ সে হিসাবে নিত্য, তাহার মানব জীবনে ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। যখন সে আসে, একেবারেই আসে, যখন সে চলিয়া যায় একেবারেই যায় ও মানুষ মৃত্যু মুখে পড়ে। তাহা ছাড়া প্রাণ অপাপ; তাহাকে কোন কালেই পাপ স্পর্শ করে না (বৃহ উপ, ১।৩।৭), বাক্য ও মনকে পাপ স্পর্শ করে। যে অপাপ সেই শুদ্ধ স্বরূপ আত্মাকে পায় ("শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্", ঈশ, উপ ৮ মন্ত্র) তাই প্রাণই আত্মার সমীপে অগ্রসর হইতে পারে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "মন দিয়ে যাঁর নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যাই"। (এখানে কবির ইঙ্গিত মত গানের মধ্যে মন বাক্য ও প্রাণের সুসঙ্গত সমন্বয় পাওয়া যায়।) তাই কেবলমাত্র মন দিয়া মনের কাছে আত্মার বার্ত্তা কোন মতেই জানান যায় না। কিন্তু যাঁহার প্রাণ আছে ও সে প্রাণের দ্বারা, আত্মার দয়ায়, তাঁহার (আত্মার) ভাষা ও ভাব আয়ত্তে পেয়েছেন, তিনি তাহা জ্ঞাপন করিতে পারেন। কিন্তু সে রকম শ্রোতা পাইলে ত? যিনিই হইবেন, তাঁহার মধ্যে

বক্তাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নিজের প্রাণ দিয়া শিষ্যের প্রাণের সেই স্পন্দন জাগাইতে হইবে যাহাতে শিষ্য সেই প্রাণস্পর্শী ভাষা ও ভাব ধরিতে পারেন। এইরূপ অবস্থা সেই গুরু সৃজন করিতে পারিবেন যিনি শিষ্যের সহিত নিজকে অভেদ দেখিবেন। (মাতা যেমন শিশুকে চুম্বন করিয়া তাহার মুখে মাতৃ ভাষার স্পন্দন জাগান)। নিজের খাওয়ার অন্ন শিষ্যের মুখে তুলিয়া দিতে পারিবেন। নিজের মনের অস্থিরতা ও গোপন ভালবাসা শিষ্যের সত্তায় ইনজেকসনের (injection এর) মত ঢালিয়া দিতে পারিবেন। নিজের জীবনের প্রতি মায়া থাকিবে না, শিষ্যের প্রাণ বাঁচাইতে উন্মুখ হইবেন। যদি প্রয়োজন হয়, নিজ দেহ ছাড়িয়া শিষ্যের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার করিবেন। যমের মত গুরু ছাড়া কে ইহা করিবে? নচিকেতার মত শিষ্যও কোথায় পাওয়া যাইবে! ইহাও যেন মনে হয়, আত্মার সংযোগ আত্মার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। নচেৎ সাম্পরায় মেধা যে জনহীন হইয়া যায়। মনুষ্য গুরু যদি নিজের শক্তি দ্বারা শিষ্যের অন্তর জয় করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে যাদুবিদ্যার মত, কিছুটা ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা অস্থায়ী হয়। শিষ্যের অন্তরে কোথাও একটু অন্ধকার রহিয়া যায়, যাহা আবার সর্ব্বগ্রামী হয়। তাই মনুষ্য গুরু তর্ক দ্বারা শিষ্যকে অধিকার করিতে পারেন না। আলো বাহির হইতে আসিলে কি হইবে, অন্তরে যদি আলোক গ্রহণ করিবার সামর্থ্যের বিকাশ না হয়।

বাহিরের আলো ঠাঁই পায় না।

নবমমন্ত্র (১।২।৯)

মন্ত্র—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্য নৈনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥

অর্থ—হে প্রিয়তম, এই মতি তর্কের দ্বারা লভ্য নহে। তার্কিক ভিন্ন "অন্য" দ্বারা উপদিষ্ট হইলেই সুজ্ঞান লাভ হয়। নচিকেতা, তুমি সত্য ধৃতিবান্। তোমার মত প্রশ্নকারী যেন আমাদের কাছে আসে।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে আত্মাকে কি প্রকারে লাভ করা যায় তাহা বলা হইতেছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বলা হইল যে বাদানুবাদ (socratic method) দ্বারা এ কাজ সম্ভব নহে। যিনি তার্কিক নন, যিনি তত্ত্ব হিসাবেও ব্যবহারিক জীবনে (in theory as well as practice) আত্মা ছাড়া কিছু জানেন না, অর্থাৎ আত্মাকেই সুচারুভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অনুরাগও বীতরাগে ইঙ্গিতের মত তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন অর্থাৎ অনুমোদন বার্ত্তা দিতে পারিবেন। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে ঘোষণা করা হইল যে নচিকেতা আত্মাকে জানিয়াছেন বলিলে কম বলা হইবে, তিনি আত্মাকে চিনিয়াছেন সত্যের সাহায্যে ও ধৃতি দ্বারা (by adherence to truth) এবং সেই উপলব্ধি হইতে বিচ্যুত হইতে চান না। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে যম বলিতেছেন এক্ষণে তাঁর নিকট হইতে শুধু অনুমোদন (verification) পাবার জন্য নচিকেতা সচেষ্ট, আর কিছু নয়, এবং এইরূপ প্রশ্নকারী শিষ্যই আদরণীয়।

আত্মজ্ঞানের পথগুলি জানা হইল। কিন্তু সবচেয়ে বড়কথা যমরাজ এইমন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম নচিকেতাকে প্রেষ্ঠ বা "প্রিয়তম" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নচিকেতা হইলেন যমের প্রেয় এবং যম হইলেন নচিকেতার শ্রেয়। এইরূপ যুগল-মিলন যেখানে হয় সেই খানেই আত্মার প্রসার উপলব্ধ হয় এবং উভয় পক্ষ একযোগে সংসারেই আত্মধাম প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। প্রেয় এবং শ্রেয়ের এই অভেদ ভাব আত্মার রাজ্যের আভূষণ। নচিকেতাকে শিষ্য হইবার জন্য শ্রেয়ের পানে যাইতে বলা হইয়াছিল। অথচ যমরাজ মনে মনে শিষ্যকে কাছে পাইবার জন্য তাহাকেই প্রেয় বলিয়া জানিতে ছিলেন; তাহা এক্ষণে সুস্পষ্ট হইল। অতএব আমরা বলিব শিষ্য শ্রেয়ের জন্য আকুল হ'ন কিন্তু গুরু যেন শিবারূপ প্রেয়ের জন্য পাগল হ'ন। তবেই আত্মার অনুসন্ধান সার্থক হয়।

এইরূপ হইলে আত্মা সেখানে সংবুদ্ধি রূপে প্রকাশ হ'ন উভয়ের অন্তরে। বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে বিকশিত হয় শূন্যতার দিকে। বুদ্ধি যোগ হইলে বুঝিতে হইবে, যিনি সৎ তিনি উভয় অঙ্গে কৃপা করেছেন পূর্ণতা লাভের জন্য। সেই পূর্ণতা যে

গুরুর নিকট হইতে প্রকট হইবে, জানিতে হয়, তাঁহার মধ্যে সৎ যিনি তিনি পূর্ব্ব হইতেই শিষ্যের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাই সাধারণতঃ বলা হয়, শিষ্যের বুদ্ধি থাকা চাই এবং গুরুর সৎ-বুদ্ধি থাকা চাই। কিন্তু যম পূর্ণ সত্যটি প্রকৃত আচার্য্যের মত জানাইয়া দিলেন যে গুরু ও শিষ্য উভয়ের সৎবুদ্ধি থাকা চাই।

উভয়পক্ষের সৎবুদ্ধি থাকিলে, উপদেশের কৌশলেরও প্রয়োজন হইবে না। আত্মা যেমন "ঈক্ষণ" দ্বারা জগৎ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন, সেইরূপ গুরু দৃষ্টি দ্বারা শিষ্যের মধ্যে চক্ষুদান করিতে পারেন। বহুদিনের সাক্ষাৎ বা জানা শোনার প্রয়োজন হয় না। অনেক চিঠি পত্র বা ধর্ম্ম পুস্তকের ভার কোন পক্ষকেই বহন করিতে হয় না। কেবল গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করিলে, সতৃষ্ণ নয়নের দৃষ্টি পাত হইলেই সেই শুভ দৃষ্টিতে গুরু ও শিষ্যের হৃদয়ের আদান প্রদানের সঙ্গেই নূতন জগতের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। দিব্য ধামের যাত্রী-দের দৃষ্টির মধ্যে যে ভাষা ও ভাব থাকে তাহাকেই আধ্যাত্মিক ভাষা ও ভাব বলিয়া জানিতে হয়। তাহারই বিনিময় সে দেশে চলে, একজনের আর একজনের সঙ্গে। কারণ মূলতঃ তাহারা অভিন্ন, একই পরমাত্মার যুগলরূপে আবির্ভাব।

এইরূপ দৃষ্টির মধ্যে মোহ নাই, কামনা নাই, লোভ নাই, মান অভিমান নাই, আছে শুধু আত্মদানের প্রাচুর্য্য। গুরু শিষ্যের নিকট আত্মদান করেন, শিষ্য গুরুর কাছে আত্মদান করেন। সে দেশ ধন্য হয়, যেখানে এইরূপে গুরু শিষ্যের মহা-মিলনে, পরমাত্মার সুর দেশবাসীর শ্রবণে ও জ্ঞানে নূতন স্রোতে প্রবাহিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ওরা কুলী ওরা রেজা •

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

গড়ছে ওরা গড়ছে
পৃথিবীটা ওরা গড়ছে,
ভাঙছে পাথর ভাঙছে,
দুর্গমে পথ ভাঙছে
প্রান্তরেতে নগর,
বনেতে গ্রাম
নিত্যই ওরা গড়ছে।
চৈত্রের রোদ শ্রাবণের ধারা
মানে না গো ওরা মানে না,
বাধা বিপদের সামনে দাঁড়াতে
এতটুকু ভয় জানে না।

ওরা কুলী, ওরা রেজা
প্রাণের আবেগে তাজা,
যারা পায় তাই খেয়ে বেঁচে রয়
আরো চাও বলে কাঁদে না।
শত যাতনার মাঝেও ওদের
হাসতে কখনও বাধে না।

গড়ছে ওরা গড়ছে,
বিশ্ব ধরার সুপ্ত কুটীর
ধাত্রে শস্যে ভরছে,
অনটনে আর অনাদরে কত
ঘরে ঘরে, ওরা মরছে।

কোন ম্যানেজার ইনজিনিয়ার
পঠনে করেছে সরদারি,
তার নাম লেখা ফলকে ফলকে,
হয়েছে ধরায় বিস্তারি।

কত কুলী কত রেজা যে মরেছে
বন-পাহাড়ে প্রান্তরে,
তার খতিয়ান আছে বল কোথা,
কেবা জানে তার অন্ত রে?

• মধ্যপ্রদেশের মেয়ে কুলিদের রেজা বলে।

অমরতীর্থ অমরনাথ

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

তুষারতীর্থ অমর নাথ। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষার উদয় তোরণ। কত সাধু কত তপস্বীর পদরেণুতে পূর্ণ—অমরনাথ। কেদার বদরীর ন্যায় বৎসরের ছয়মাস দর্শনের সময় নয়, শ্রাবণী পূর্ণিমায় একটি দিন মাত্র দর্শন—তারপর নিশ্চল, নিথর প্রস্তরের বুকে জাগে না সাড়া, পথ মুখরিত হয় না যাত্রীর কোলাহলে, অথের হ্রেষারবে।

১৯৬৬-র অগাষ্ট। কাশ্মীর সরকারের প্রচার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই বৎসর পথ ভালো থাকায় পুরা অগাষ্ট মাস অমর নাথের পথ খোলা থাকবে। এই সুযোগ ছাড়তে মন রাজী নয়। সহধর্মিণী দুর্গম বিপদ সঙ্কুল পথে পা বাড়াতে রাজী নন্, বিশেষতঃ পাঁচ বৎসরের কন্যার কথা চিন্তা করে। কিন্তু আমি যে শুনি সারা আকাশে বাতাসে তাঁর নিমন্ত্রণ। মন আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না ঘরের মধ্যে, তাই ভেসে পড়ি একাই দুর্গমের হাতছানিতে, আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধবদের শত বাধা নিষেধের গণ্ডীকে উপেক্ষা করে। ব্যতিক্রম আশ্চর্যরকম ছোট মাসীমা। আশীর্বাদ করে বলেন মন যখন যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে তখন ঘরের কথা, সংসারের কথা চিন্তা করিস্ না। যেটুকু ইতস্ততঃ করছিলাম, মাসীমার কথায় সেইটাও মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ যাত্রার আগের দিন এক ভাইপো সমীর কুমার ঘোষ ওরফে কানু ও তার বন্ধু নিরঞ্জন ভৌমিক আকস্মিক ভাবে আমার সঙ্গী হয়ে ট্রেনে উঠে বসলো।

২২শে অগাষ্ট শিয়ালদহ থেকে পাঠানকোট এক্সপ্রেসে যাত্রা। পথের সঙ্গী ট্রেনের সহযাত্রী শিকদার বাগান ষ্ট্রীটের মিঃ ভাদুড়ী ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর এক ভাই ও তার স্ত্রী। এই সর্বপ্রথম হিমালয়ের বুকে যাত্রা করছেন তাই ভাবনা ও চিন্তার অবধি নেই। মিথ্যা স্তোক বাক্য দিয়ে লাভ নেই, তাই বলি এই পথ দুর্গম শুনেছি এবং তার জন্য প্রস্তুতও হয়ে এসেছি, কিন্তু কি কি নতুন উপসর্গ দেখা দেবে তা এই পথে বলা শক্ত। ২৪শে অগাষ্ট ভোরবেলা পাঠানকোট পৌঁছাই। ষ্টেশনের বাইরেই সরকারী ও বেসরকারী বাস-যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। যাঁরা ট্রেন ভাড়ার সঙ্গে বাসের ভাড়াও জমা দিয়েছেন তাঁদের জন্যই কেবলমাত্র সরকারী বাসের ব্যবস্থা।

সেকালে কাশ্মীরে যাবার অনেকগুলো পথ-ছিল, সেগুলো এখন সব পাকিস্থানের মধ্যে। সুতরাং আমরা যে পথ দিয়ে যাব, সেটা নতুন তৈরী করতে হয়েছে। জম্মু অবধি রেল লাইন ছিল। সেটাও এখন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। তার বদলে বাস হয়েছে। প্রচলিত নিয়মানুসারে পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর। সেখান-থেকে পহলগাঁও। কিন্তু এইবৎসর পাঠানকোট থেকে পহলগাঁও এর জন্য সরাসরি বাসের ব্যবস্থা হওয়ায় এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। ফলে সময় ও অর্থ দুটোরই সাশ্রয় হোল।

পাঠানকোট থেকে যখন বাস ছাড়লো তখন প্রায় ৯টা। পথ এ দিকে সমতল। মাঝে মাঝে সামরিক গাড়ী আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় ভারতের সব প্রজেক্টের মডেল তৈরী করে রাখা হয়েছে। গাড়ী একটা সেতুর ওপর দিয়ে চললো। তলায় শুকনো নদীর বুকে অঢেল নুড়ি। শুনলাম এই "রাভী"। বাস ছুটে চলেছে। তার আগে আগে মন। মাঝে মাঝে সেনা নিবাস। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায় জম্মু। মধ্যাহ্নের স্নান আহারের জন্য প্রায় এক ঘণ্টার বিরতি। পুনরায় যাত্রা। মাঝে মাঝে বাস দাঁড়াচ্ছে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় কাটিয়ে রাস্তা

তৈরী করা হচ্ছে। আমাদের বাসে সিকদার বাগানের ভাদুড়ী দম্পতি ছাড়া বিহারের একলক্ষ পতি চলেছেন, সঙ্গে এক মোসাহেব। হঠাৎ একটা পাহাড় কাটলো আমাদের বাসের সামনে। মোসাহেবতো ভয়ে এক লাফে বাসের সামনে। কিন্তু সকলে হেসে ওঠায় বল্লেন লালাজী কি রকম ভয় পেয়েছিল, সেইজন্যই না লাফিয়ে তাঁকে ধরতে গিয়েছিলাম। এই মোসাহেবের লা-লা-জী-ই ডাকটা এখনও কানে বাজে। কুর্দে বৈকালিক চা পানের জন্য বাস থামলো, তখন ঘড়িতে ৪টে বাজে। আধঘণ্টার পর বাস আবার চল্ল। টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন অঝোরে ঝরছে। বাটোটে যখন পৌঁছুলাম তখন সূর্য্যের আলো ম্লান হলেও একেবারে মুছে যায়নি। রাত্রি-বাস আজ এখানে। সাধারণতঃ যাত্রীরা কুর্দে অথবা বাটোটে রাত্রিবাস করেন। কুর্দের জল হাওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর। এখানে বন্দী করে শেখ-আবদুল্লাকে রাখা হয়েছিল। এ খবর শোনালেন বাসের ড্রাইভার শম্ভু সিং। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ড্রাইভারী করছে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। গল্প গল্পে কখন আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে বুঝতেও পারি নি। বাটোটে বাস থামতেই কাকু ছুটলো রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে। ভালো ডাক-বাঙলো আছে। থাকবার অসুবিধা নেই, কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা বাইরের হোটেলে করতে হোল। পরদিন চা পানের পর যাত্রা। চীনাব নদীর ওপর সামরিক কর্তৃপক্ষ নতুন পুল তৈরী করেছেন। বাস সেই পুল পার হয়ে এসে থামলো রামবাণ পাহাড়ের পাদদেশে। পুলের ফটো নেওয়া নিষেধ বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে। চীনাব নদীতে প্রচুর কাঠ ভেসে যেতে দেখলাম। শুনলাম জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে চিহ্ন করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মালিক সেই চিহ্ন ধরে সংগ্রহ করে নেয়। আধ-ঘণ্টার পর বাস ছাড়লো। এবার এলো সেই বিখ্যাত বানিহাল টানেল। নতুন বানিহাল সুড়ঙ্গ ৭২০০ ফুটের মাথায়। পথ কমে গেছে ১৮ মাইল। এই নতুন সুড়ঙ্গের আগে আরও ওপর দিয়ে যাবার পথ ছিল।

কিন্তু বরফে বেশীর ভাগ সময় সেইপথ ঢাকা থাকায়, যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হোত। যাই হোক ঘড়ি ধরে এই সুড়ঙ্গটুকু পার হতে পুরো পাঁচ মিনিট লাগলো। গাড়ী যখন একদিক দিয়ে ঢোকে অপর দিকের মুখে লাল আলো জ্বালিয়ে অন্য গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ করা হয়। ভেতরে হলদে আলো জ্বালায় রাস্তা দেখবার সুবিধা হয়। পাহাড়ের গা দিয়ে দু'ধারে অঝোরে জল পড়ছে। গাড়ি এসে এবার থামলো ইসলামাবাদে, এখানে কাশ্মীরী জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। সহরের সব কিছুই ইসলামাবাদে লভ্য। মধ্যাহ্ন ভোজের পর পুনরায় যাত্রা। বেলা ৩টায় পহল গাঁও এ পদার্পণ।

পহল গাঁও। প্রথম গ্রাম, না দুস্তর প্রস্তরের বেড়া ডিঙিয়ে মেষ পালকের বেশধারে সাক্ষাৎ মিলতো—সেই মেষ পালকদের গ্রাম। নীল বর্ণা লীডার নদীর তীরে ছোট্ট সহর পহলগাঁও। চোখে কল্পনার কাজল মেখে দেখা নয় সত্য সত্যই পহল গাঁও অপরূপা। প্রস্তরে প্রস্তরে গগন ভেদী গর্জনে সফেন উন্মত্তধারায় বয়ে চলেছে লীডার নদী, জল তার নীল বর্ণ। নীল ধারা থেকে লীড্‌ধার তা থেকেই লীডার কি? সে প্রশ্নের জবাব ভাষাতত্ত্ব-বিদদের জন্য তোলা রইল। যাই হোক বহু দেশ পর্য্যটনকারীর মুখেও পহলগাঁও এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি।

পরবর্ত্তী কাজ ট্যুরিষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা। পূর্বেই আমাদের প্রয়োজনীয় তাঁবু, মাল বইবার কুলি, চেয়ার ইত্যাদির জন্য চিঠি দেওয়া ছিল। তার উল্লেখ করতেই অফিসার বল্লেন পাশেই অনেক দোকান আছে। আপনাদের প্রয়োজন মত জিনিস দেখে নিন। পার্শ্বের সহযাত্রীটি বললেন আমি যে টাকা পাঠিয়েছিলাম মাদ্রাজ থেকে? অফিসারটি বললেন—টাকা ফেরৎ নিয়ে নিন। তিনি বললেন আপনারা ব্যবস্থা করে রাখবেন বলেই টাকা পাঠিয়ে ছিলাম, নইলে আপনারা সহরে পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিলেই পারতেন, শুধু শুধু যাত্রীদের এ হয়রানির প্রয়োজন ছিল না। বিভিন্ন যাত্রীদের নানান অভিযোগ। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখে নেমে পড়লুম পথে। দুধারেই ভাড়া দেবার জিনিসের দোকান। একটি দোকান থেকে ডবল ফ্লাই তাঁবু (১০'×১০') ২০, টাকা হিসাবে দুটি ৫'×৫' ত্রিপলের টুকরা ৫, লিঃ ১০, টাকা দিয়ে ভাড়া করলাম। খাট, চেয়ার, টেবিল ও চাকরের ন

বলতেই বললো, যারা পহলগাঁও এ লীডারের ধারে থাকে তাদের জন্য ঐ সব ভাড়া দেওয়া হয়, অমর নাথ যাত্রীদের নয়। ইুরিষ্ট অফিসারের সঙ্গে যোগা-যোগ করেও ব্যর্থ হই। সুতরাং ঐগুলি ঘাড়ে করে লীডারের একেবারে কিনারায় আস্তানা গাড়লাম। একজন কুলি এসে তাঁবু টাঙিয়ে দিয়ে গেল। কাকু ও নিরঞ্জনের খুব উৎসাহ। ওরা টাঙাবার কলা কৌশল দেখে নিল। কারণ দু'দিন পর থেকেই নিজেদের রোজ তাঁবু খাটাতে ও তুলতে হবে। আগে থেকেই রিহার্সাল দেওয়া সুরু হোল। ত্রিপলের টুকরা দু'টির ওপর হোল্ড অল বিছিয়ে বিছানা, নতুবা মেঝের ঠাণ্ডায় অসুখের সম্ভাবনা। পহলগাঁওএ বেশশীত। নদীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা, হাতে বেশীক্ষণ রাখলে হাত অসাড় হয়ে যায়। বহু যাত্রী আমাদের মত তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ হোটেলের এত অত্যধিক চার্জ যে সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। তাঁবুতে বিছানা বিছিয়ে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে নদীর বিভিন্ন ভঙ্গীমার নৃত্য দেখি আর কুলু কুলু ধ্বনি নয় ভীম গর্জনে তার আর্তনাদ শুনি। একজন তাঁবুতে মালপত্তর পাহারা দেয়, বাকিরা পাঞ্জাবী হোটেলে রাত্রের আহার সেরে আসে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির বিরাম নেই।

পরদিন ঘুম ভাঙালো আজানের শব্দে। বাইরে বেরিয়ে দেখি সকালের মিঠে রোদ সারা জায়গায় তার আসন পেতেছে। তাড়াতাড়ি উঠে ভিজে জামা কাপড় রোদে শুকুতে দিই। অগণিত যাত্রী নদীর জলে স্নান করছে, জামা কাপড় পরিষ্কার করছে। বিভিন্ন ব্যাপারী শাল, আপেল, গহনার পাথর নিয়ে তাঁবুতে তাঁবুতে ঝিক্রি করছে। প্রাতঃ-কৃত্যাদি সারার পর কাকু ও নিরঞ্জন চা খেতে হোটেল গেল। ফিরে এসে খবর দিল একটী মাল বইবার জন্য ঘোড়া ৫০৲ দিয়ে ও একজন কুলি ৩০৲ দিয়ে ভাড়া করে টাকা জমা দিয়ে এসেছে। রাস্তায় রাস্তায় যাত্রীর ভিড়। কেহ ঘোড়ায় চড়ায় অভ্যস্ত হচ্ছেন, কেহ বা কেডস্ পরে হাঁটছেন। শুকনো ফল, মিষ্টি অর্থাৎ এলাচদানা জাতীয় জিনিস, মেওয়া, আখরোট, শুকনো নারকেল ইত্যাদি পূজার সামগ্রী হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। অনেকটা কোলকাতায় পূজার বাজারে যত রাস্তার ফেরিওয়ালা বসার মত দোকান পাট বসে গেছে। মাইকে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে যে শুভযাত্রা আগামী ২৭শে অগাষ্ট প্রত্যুষে সাড়ে তিনটার সময়। ছড়ি সাহেব ঐ সময় যাত্রা করবেন। সকলেই যেন প্রস্তুত থাকেন। প্রত্যেকেই যেন চাল, ডাল আলু পেঁয়াজ কেরাসিন তেল, মোমবাতি ইত্যাদি সঙ্গে রাখেন। কারণ পথে কিছুই পাওয়া যাবে না। যাদের সঙ্গে বেশী টাকা আছে তারা নিকটস্থ ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারেন। সামান্য অর্থের পরিবর্তে অমর নাথের পথের অপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ইুরিষ্ট বুরো অফিসে জমা রাখা যায়। মোবাইল ভ্যান থেকে মাইকে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে কখন কি ভাবে যাত্রা হবে। মালপত্র কি ভাবে রাখবেন। চোরেদের থেকে সাবধানে থাকবেন। তাঁবু খালি রেখে কেউ যাবেন না ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছড়ি যা সঙ্গে যাবে গোছগাছ করে বাকি সব ইুরিষ্ট অফিসের জমা দিয়ে এলাম। যাত্রার জন্য মনেরও একটা প্রস্তুতি আছে। আমরা দেহমন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে পরদিবসের প্রতীক্ষায় রইলাম। কি ভীষণ উত্তেজনা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কাকুকে আগেই বলেছিলাম যে রাত সাড়ে তিনটার সময় বেরোতে পারব না। সকাল হলে চা-টা খেয়ে যাত্রা করব। যাত্রীরা কবে কোথায় থাকবে তার নির্দিষ্ট তালিকা পূর্বেই প্রকাশ করা হয়। সরকার হতে সেই ভাবেই সামরিক সৈন্য পুলিশ ডাক্তার, আলো ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা রাখা হয়। যাত্রীরা নির্দিষ্ট দিনে না পৌঁছাতে পারলে সমূহ বিপদ। কারণ সকালে একটা পুরো সহর বসলো, পরদিন সকালেই সেই সহরকে ভেঙে যাত্রা। বিলম্বে বা অগ্রে গমনের অর্থই কোন জিনিস না পাওয়া ও পথঘাটে বিপদের সম্ভাবনা। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে কি বিস্ময়কর এই ক্যানভাস্ সহর যা প্রত্যেক বিশ্রাম-স্থলে গজিয়ে ওঠে আর ভোরের সঙ্গেই মিলিয়ে যায়।

শনিবার ষাদশী তিথি। পহল গাঁও থেকে যাত্রা সুরু হোল। রাত ৩৷৷ টায় ছড়ি সাহেব যাত্রা করলেন। তাঁর যাত্রার সঙ্গে কাড়া, নাকাড়া, শিঙা যে ভাবে বেজে উঠ্‌লো তাতে তখুনই যাত্রা

না করলেও, উঠে অন্ধকারের মধ্যেই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ফেলতে বেড়িয়ে পড়লাম। কারণ বিছানায় শুয়ে থাকলেও ঘুম আর আসবে না। কর্মী হোল, মাল পত্র বেঁধে বসে আছি কুলি বা ঘোড়াওয়ালার দেখা নেই। তাঁরা এলেন প্রায় সাড়ে সাতটায়। ঘোড়ার পিঠে তাঁবু ও বেডিংটা চাপিয়ে দিলাম। কুলির মাথায় আমাদের খাবারের জিনিসপত্র ও একটা স্যুটকেশ, চাপিয়ে দিলাম। কিন্তু কুলি বল্ল এত ভারী জিনিস পত্র সে একা নিয়ে যেতে পারবে না শেষ মুহূর্তে অনন্যোপায় হয়েই আর একটা কুলি করলাম। কেদার বদরী পথের ন্যায় এখানের কুলীরা সেই রকম কষ্ট সহিষ্ণু নয় এবং বেশী মালের অজুহাতে পথে দেরী করাটাও এদের স্বভাব। প্রায় আটটার সময় অমরনাথজীর নাম স্মরণ করে যাত্রা করা গেল। ঐ সব মাল ছাড়াও আমার সঙ্গে দুটো ক্যামেরা, থার্মোস, কাকুর পিঠে হ্যাভার স্যাকে ওষুধ পত্র, নিরঞ্জনের কাঁধে জলের বোতল ও দূরবীণ। কাকুর ও তার বন্ধু নিরঞ্জন একত্রে গল্প করতে করতে এগোতে লাগলো, আমি পেছনে আস্তে আস্তে চল্লাম। কেউ ডাণ্ডী করে, কেউ ঘোড়ায়, কেহ বা পদব্রজে চলেছে। সকলেরই লক্ষ্য পরবর্ত্তী আস্তানা—চন্দনবাড়ী। মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ছোট ছোট গ্রাম পথের প্রান্তে। মাটি লেপা কুঁড়ে ঘরের মধ্য থেকে লাল টুক্ টুকে আপেলের মত রঙ আর রঙীন পোষাক পরে মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। এক ভদ্রলোক ঘোড়ায় করে যাচ্ছিলেন হঠাৎ কি হোল ঘোড়া যাত্রীকে মাটিতে ফেলে দিল। ভদ্রলোক অল্পের জন্য খাদে পড়া থেকে বেঁচে গেলেন। সাবধানে চলেছি। ডাণ্ডীর হাত থেকে বাঁচিয়ে ঘোড়ার কাছ থেকে শত হস্ত না হলেও দূরে দূরে হাঁটছি। একটা পাকদণ্ডী দিয়ে উঠতে গিয়ে ঠোকর লেগে থার্মোস টা ভেঙ্গে গেল। কাকুদের দেখতে পাচ্ছি না। ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। জলতেষ্টা পাচ্ছে। জলের বোতল নিরঞ্জনের কাছে। তৃষ্ণায়, ক্ষুধায় রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে যেতে লাগলো। সঙ্গে যে আপেল ছিল তাই খেলাম। আশ্চর্য্য রকম জলতৃষ্ণা কমে গেল। এখানে কেদার বদরীর মত মাঝ পথে থামবার উপায় নেই। ধুঁকতে ধুঁকতে ১৩কিলোমিটার পায় হয়ে দূরে চন্দন বাড়ীর লাল টালি দেওয়া ঘর দেখতে পাই। আর দেখি নদীর উপর একটি ছোট্ট সাঁকোর ওপর কাকু বসে আছে। আমায় দেখে বল্লে—তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তাঁবু খাটিয়ে রান্না শেষ করে নিরঞ্জনকে বসিয়ে রেখে এসেছি। এই হাজার হাজার তাঁবুর মধ্যে আমাদেরটা খুঁজতে কষ্ট হবে বলে এইখানে অপেক্ষা করছি। তাঁবুতে এসে যে টুকু মেজাজ গরম হয়েছিল, গরম দুধ লিকর ও তারপর ঘি দিয়ে ভাত খেয়ে তা ঠাণ্ডা হোল, কাকুদের ওপর রাগ হলেও বকতে পারলাম না। বৃষ্টির বিরাম নেই। তার মধ্যেই একবার পলকের জন্য রোদ উঠলো। ঘুরে ঘুরে আশপাশটা দেখে এলাম। কুণ্ডু বাবুর যাত্রীদের জন্য ঐ ঝড় জলের মধ্যেও ছাঁকা তেলে আলু ভাজা হচ্ছে দেখে লোভ লাগতে লাগলো। তাঁবুর পর তাঁবু—পা বাড়াবার উপায় নেই। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সারবার জন্য জায়গার অভাবে স্ত্রী পুরুষ লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে যে যেখানে পারে বসে যাচ্ছে। ফলে তাঁবুর মধ্যেও গন্ধে টেঁকা ভার। বাইরে বেরোলে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়। এই অসুবিধাটা চন্দন বাড়ীতে যতটা ভোগ করেছিলাম অন্যত্র ততটা নয়। কারণ যাত্রীনিবাস থেকে একটু দূরে থাকতাম। খাওয়া দাওয়ার পালা চুকলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আজকে রাতের মত নিশ্চিন্দি।

রবিবার, ত্রয়োদশী তিথি। সকাল ৭টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজকে যাত্রার অন্যতম কঠিন পরীক্ষা 'পিস্যুর চড়াই' পার হওয়া। এর সম্বন্ধে এত লোকের কাছথেকে এতবেশী শুনেছিলাম যে পিস্যুর চড়াই পার হওয়ার সময় কিন্তু অতটা কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় নি। পাহাড়ে ওঠবার পথে নরম মাটি, ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছড়িয়ে আছে। সেই পাথরে পা পড়লে পা হড়কাতে বাধ্য আর তার অর্থই একেবারে খাদে নেমে যাওয়া। বিশেষ করে যারা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছেন তাদের করুণ অবস্থা দেখলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। দুঃখ হয় কি বিপদজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরা এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন, আর হাসি পায়, মৃত্যু ভয়ে তারা কেউ ঘোড়ার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরছেন,

কেউবা ভয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পদব্রজে ওঠবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের অসহায় দৃষ্টি ও হাস্যকর পরিস্থিতি উপভোগ করবার মত। আমরা যতদূর সম্ভব এই পথ ত্যাগ করে ছোট ছোট গাছের ডাল ধরে, অনেকটা বাঁদরের এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফ দেওয়ার মত উপরে উঠতে লাগলাম। এতে পরিশ্রম একটু বেশী হলেও তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম, প্রায় পাঁচহাজার ফুট ওপরে একটা উপত্যকায়। সেখানে একটু বিশ্রাম করে আবার চলতে শুরু করলাম। পথ যদিও সমতল এবার তবে সঙ্কীর্ণ ও সুদীর্ঘ। এই উপত্যকাটিকে "যাজপাল" বা যজ্ঞপাল বলা হয়। ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটেছে। ছোট্ট ছোট্ট নাম-না-জানা ফুল, কিন্তু তাদের রঙের বাহার মনকে টানে। এখন মাটির ওপর দিয়েই হাঁটছি। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে বিরাট খদ। মধ্যখানে ৮।১০ ফুট চওড়া রাস্তা। কিন্তু রুক্ষ প্রান্তর ছাড়া সামনে কিছু দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। পিঁপড়ের মত সারি সারি লোক চলেছে। গতকাল কাকুরা এগিয়ে যাওয়ায় খুব অসুবিধা হয়েছিল। আজ ওরা এগিয়ে গেলেও একেবারে দৃষ্টির বাইরে যাচ্ছে না। হাত নেড়ে ইসারা করলে এগোচ্ছে নয়ত আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই ভাবে এগোতে এগোতে হঠাৎ যেন দিগন্তের পূর্ববার খুলে গেল। চোখের সামনে মস্তকে তুষার কিরীট পরে নগরাজ হিমালয়, আর তার পাদদেশে নীলাভ বর্ণ বিশাল হ্রদ। একটি তুষার নদী হ্রদে নেমেছে, আর একটি বেরিয়ে গেছে হ্রদ থেকে। পাহাড়ের কোলে হ্রদের পাঁচটি মুখ। কেউ কেউ বাসুকির পাঁচ মাথার সঙ্গে এর তুলনা করে বলেন যে বাসুকি এখানেই ছিলেন। বহু যাত্রী স্নান করতে নেমে গেলেন প্রায় এক মাইল উৎরাইয়ের পথে। কিন্তু পিঠে ভারী ক্যামেরা নিয়ে ঠিক সাহস হোল না সেই জল স্পর্শ করে আসতে। দু'একজন সাধকের শ্রবণ বৃত্তান্তের মধ্যে পড়েছি তাঁরা এই জলে সাপ বিচরণ করছে দেখেছেন। সে কথা কতদূর সত্য জানি না।

খুব হাওয়া দিচ্ছে। বেশ শীত করছে। এই অবস্থায় বায়ুখানে এসে পৌঁছালাম। শেষ নাগ থেকে বায়ুখান প্রায় দেড় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ঘড়িতে তখন প্রায় দুটো। কাকু তাঁবু টাঙাবার জায়গা পছন্দ করে জিনিস পত্র রেখে নিরঞ্জনকে বসিয়ে ফিরে এল। বায়ুখানে প্রবেশ পথে একটা পাথরের ওপর বসে বসে আমি ক্ষণে ক্ষণে মেঘ ও রৌদ্রের সঙ্গে শেষ নাগের রূপ পরিবর্তন অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম। এই সঙ্গে চোখ রাখছিলাম আমাদের মালবাহীকুলি বা ঘোড়া আসে কি না। সকালেই সেই এক গ্লাস হরলিকস্ ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। দূরে দোকানে খাবার রয়েছে। কিন্তু তার দাম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মনকে সেদিক থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। বেলা ৩টা, ৪টে গড়িয়ে ৫টা বাজল। তবু কারুর দেখা নেই। বসে বসে শেষ নাগের শোভা নিরীক্ষণ করি আর মানস পটে ভেসে ওঠে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কথা। বোধ হয় এই রকম শোভা দেখছিল আমার মতই কোন হতভাগ্য। এদিকে আকাশে যে মেঘ এসে ভিড় করেছে সেদিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামলো, তার সঙ্গে তুষারপাত। দেখতে দেখতে সেই তুষারপাতে উদ্‌ভ্রান্ত যাত্রীরা সমাধিস্থ হোল, চিরদিনের মত। খবর কে পাঠিয়েছিল জানি না, সাহায্য এসে মৃতদেহগুলো টেনে বের করা ছাড়া আর কোন সাহায্যে লাগেনি। সেই থেকে একদল মিলিটারী, ডাক্তার প্রতিবছর আসে যাত্রীদের সঙ্গে। এইসেই বায়ুখান। ঠাণ্ডায় সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। ক্ষিধের জ্বালায় হাতে গড়া গরম রুটি শুধু কিনে খেলাম সন্ধ্যে হয়ে গেল তখনও কারুর দেখা নেই, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ খাবারের ঝুড়ি, বেডিং ইত্যাদি নিয়ে কুলি দুটো এলো। শুনলুম কর্তৃপক্ষ পিসু চটি আগে যাত্রীদের পার করিয়ে, তারপর কুলি ও তারপর ঘোড়াওয়ালাদের ছেড়েছে। ফলে এই বিলম্ব। কিন্তু তাঁবু তো ঘোড়ার পিঠে। তাঁবু এলো যখন তখন প্রায় রাত ৯টা। রান্না কিছু করা যায় নি, ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটে। গ্লাস ভর্তি হরলিকস্ ও বিস্কুট খেয়ে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লাম। সেই দিন রাত ভোর যাত্রীরা এসেছে। তাঁবু জিনিস পত্রের অভাবে বহু যাত্রীকেই খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি রাতের তারারা তখনও টিপ টিপ করছে। উঠে পড়লাম।

আস্তে আস্তে ফর্সা হোল। জিনিস পত্র গুছিয়ে নিয়ে কুলি ঘোড়া সব ছেড়ে দিলাম।

আজ সোমবার চতুর্দ্দশী তিথি। বেরোতে যাব এক পাঞ্জাবী মহিলা এসে কেঁদে পড়লেন। তাঁর পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করতেই বললেন যে ভোরবেলা ঐ বরফগলা নদীতে স্নান করে বেরিয়েছেন। কোন ওষুধ থাকে তো দিতে বললেন। পাশের ভদ্রলোকদের কাছ থেকে এক কাপ গরম দুধ চেয়ে এনে তাতে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খেতে দিলাম, তাতে যন্ত্রণার কিছু উপশম হোল। তখন তিনি বললেন আমরা যদি তাঁকে একটু ওষুধ দিয়ে কিছুক্ষণ সেবা করি তিনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে যাবেন। আমাদের বেরোতে এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে। তখন নিরঞ্জনকে পাঠালাম হাসপাতালে খবর দিতে। নিরঞ্জন ষ্ট্রেচারই দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল। মহিলাকে সেই ষ্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ডাক্তারকে সব বলে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রমহিলা চীৎকার করতে লাগলেন,বাবুজী! আমাকে ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু এ পথে পেছনে তাকালে চলে না। এগিয়ে যেতে হবে। মানুষ বড়ই স্বার্থপর হয়ে ওঠে। আজ কিন্তু কিছুদূর চলবার পরই বুকে ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। মাঝে মাঝে থামি, কাকুরা আমায় উৎসাহ দেয়, আবার পথ চলি কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হওয়াতো দূরের কথা আরও বেড়ে যেতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে আমরা একটা উঁচু টিলার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এর নাম মহাগুনস্, ১৪০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এত উঁচুতে অক্সিজেন ছাড়া আসার জন্য নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। তাঁবু টাঙ্গিয়ে একটা ছোট হাসপাতাল এখানে তৈরী হয়েছে। প্রয়োজনে লোককে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশ দেওয়া আছে যেন যাত্রীরা এখানে অপেক্ষা না করেন, তাড়াতাড়ি এই উচ্চতা থেকেনেমে যান। সুতরাং পাচালিংনেমে পড়লাম। এইখানে পাঞ্জাব থেকে আসা একদল কলেজের ছাত্রের সঙ্গে দেখা। তার মধ্যে একজন বাঙালী ছাত্রও ছিল। সারা রাস্তা তারা গল্প গুজবে, নাচে গানে সরগরম করে পথ চলছিল। ক্রমে ক্রমে পথ সরু হয়ে এলো। আর চোখের সামনে এক দুড়ি ভরা শুকনো নদী দেখলাম। নদীর বিস্তীর্ণ চর পার হয়ে ভৈরব পর্বতের পাদদেশে পৌঁছালাম। এই পঞ্চতরণী। আজ এইখানেই রাত্রিবাস। পঞ্চতরণীতে তাঁবুর মধ্যে বসে যাত্রী প্রবাহ দেখছি। ঘোড়া ছুটিয়ে গুর্জ্জরা আসছে। ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের ধুলোয় সূর্য্য ঢাকা পড়ে যাবার মত। ইংরাজী ছবিতে যেমন রাস্তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে আসতে দেখি—ঠিক সেই দৃশ্য। কোলকাতায় গিয়ে খবর দেব out door shooting এর জন্য। আজ মাইকে আগামী কাল অমরনাথের দর্শন কি ভাবে হবে বারে বারে নির্দেশ দিচ্ছে। ঘোড়া এখানেই থাকবে। ঘোড়ায় করে কেউ আর যেতে পারবেন না। ডাণ্ডী বেলা দশটার পর যাত্রা করবে। ভোর তিনটা থেকে যাত্রীদের যাবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার, পূর্ণিমা তিথি। আজ রাত তিনটের মধ্যেই উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। সঙ্গে একজন কুলিকে মালবাহক হিসাবে নিলাম বাকি জিনিসপত্র তাঁবু সব ঘোড়াওলা ও আরে-একটি কুলির জিম্মায় রইল। ক্যামেরা দুটো,স্নানের জিনিস, পূজা সামগ্রী, ঘাসের চটি সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে রাত চারটেয় বের হয়ে পড়লাম। কিছুদূর যাবার পরই দেখি বিরাট এক লাইন পড়ে গেছে। আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। দেখি যে একদিকে পাহাড় বরফে ঢেকে আছে অন্য দিকে অতল খাদ। মাঝে দেড়ফুট দুফুট জায়গা। বরফে পিচ্ছিল পথ যাত্রীদের মৃত্যুমুখে আহ্বান জানাচ্ছে। খাদের দিকে তিন চারজন মিলিটারী দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের পথটুকু পার হতে সাহায্য করছেন। মাঝে মাঝে, পা যাতে না হড়কে যায় গাঁইতি দিয়ে পথটুকু কুপিয়ে দিচ্ছেন। আস্তে আস্তে পথটুকু পার হলাম। এইরকম পিচ্ছিল পথ প্রায় একশো ফুট। রাস্তা আজকে সর্বত্র পিচ্ছিল। কোথাও কাদা, কোথাও বরফ। ক্রমে ক্রমে বরফের রাজ্যে এসে পড়লাম। যেন বড় একটা গুহার মধ্য দিয়ে হাঁটছি। চারধারে বরফ। ক্রমে সেই বরফের রাজ্য পার হয়ে এক ক্ষীণকায়া নদীর ধারে এসে পড়লাম। পাথরের মধ্য দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে,এরই

নাম অমর গঙ্গা। দূরে বেশ কিছু লোক স্নান করছে। আমরা বুঝতে পারলাম গুহার কাছে এসে গেছি। সুতরাং একটু দূরেই সেই হাঁটুজলের মধ্যে একটা মগে করে জল তুলে মাথায় ঢেলে স্নান করলাম। প্রথম মগ ঢালবার পর মনে হোল মাথাটা বোধ হয় অবশ হয়ে গেছে। যাই হোক, স্নানের জামা কাপড় কুলির কাছে রেখে ঘাসের চটি পায়ে দিয়ে এগোতে লাগলাম। গুহাটী বেশ একটু ওপরে। যাত্রীরা সার বেঁধে উঠে যাচ্ছে। গুহার তলায় নদীর ধারে বসে তর্পণ করলাম। তারপর তিনজনে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে গুহায় প্রবেশ করলাম। গুহাটা একশো ফুটের মত লম্বা ও ত্রিশফুটের মত চওড়া। শিক দিয়ে গুহার মুখ ঘেরা। একটা শিকের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা যায়। গুহাটা দু'ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ ১৫ফুট চওড়া ও ৫০ফুট লম্বা একটা চাতাল, তার ওপর দুটো ধাপ উঠেই আবার একটা চাতাল। প্রথম জায়গায় বহু সাধু সন্ন্যাসী বসে জপ করছেন, হোম করছেন। দ্বিতীয় জায়গায় উঠে দেখি একটা লম্বা বেদী। তার ওপর কয়েক খণ্ড লাল কাপড়ের টুক্‌রো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঢাকা দেওয়া আছে। তার ওপর ফুল, বেলপাতা দিয়ে লোকে পূজো করছে। কিন্তু অমরনাথের তুষার লিঙ্গ মূর্ত্তি কৈ? শুনলাম এবার পূর্ণিমা এগিয়ে পড়ায় তুষার লিঙ্গ গলে গেছে! মূল অমরনাথের কয়েক ফুট দূরে গণেশ, ভৈরব, পার্বতীর তুষার লিঙ্গের স্থান। মন হতাশায় ভরে গেল। এতকষ্ট করে এসেও মূর্ত্তিদর্শন হোলনা। যে মূর্ত্তি দর্শনকরে স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চল হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইচ্ছা মৃত্যু বর পেয়েছিলেন সেই মূর্ত্তি অদেখা রয়ে গেল। যাই হোক সঙ্গের পূজা সামগ্রী দিয়ে পূজো, করলাম তারপর তিনজনে একত্রে "শিবাষ্টক স্তোত্র" পাঠ করলাম। ঘুরে ঘুরে একটু দেখে অমর গঙ্গার জল, গুহার খড়ি মাটি ইত্যাদি সংগ্রহ, করে ফটো তুললাম। দুঃখের বিষয় ভীড়ে বৃষ্টির মত জলের ধারার মধ্যে ফটো আশানুরূপ হলো না। এবার ফেরার পালা। আর রইল না এগিয়ে চলার উত্তেজনা। আজই পহল গাঁওএ ফিরে যাব। বেলা ১২টার মধ্যে পঞ্চতরণীতে ফিরে এলাম। খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পহল গাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। মহাগুনসে যখন এসে পৌঁছলাম তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হোল। আরও জোরে চলতে লাগলেম। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কাল করে বৃষ্টির ধারা নামলো। কাকু, নিরঞ্জন ও আমি তিনজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আগে থাকতেই স্থির ছিল আবহাওয়াখারাপ হলে বাস্‌-যানেই আজ রাত্রিবাস করব। অন্ধকারে কখন এসে বাস্‌যানে পৌঁছে গেছি বুঝতে পারি নি। হঠাৎ আমার ও কাকুর নাম কেউ চেঁচিয়ে ডাকছে শুনে থমকে গেলাম। টিলাটার ওপর উঠে দেখি নিরঞ্জন। বল্ল প্রায় একঘণ্টা ধরে আপনাদের খুঁজছি। জলে ভিজে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে তারপর কাকুকে খুঁজতে বের হলাম। অনেক কষ্টে প্রায় এক ঘণ্টার পর কাকুকে পেলাম। শুনলাম সে থানায় গেছিল আমাদের জন্য লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। থানা থেকে বলেছে আজতো ফেরবার দিন নয়, আপনারা ফিরেছেন কেন? এর দায় দায়িত্ব আমাদের নয়। যাইহোক লোক, দড়ি, টর্চ প্রভৃতি কাকুর সঙ্গে শেষ অবধি থানা থেকে দিয়েছিল। তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলাম। শীতে মনে হোল শরীরের কোন অংশে সাড় নেই। বারোআনা একটাকা দিয়ে বড় বড় গ্লাস গরম চা গলায় ঢেলেও শীতের কাপুনির হাত থেকে রেহাই পেলাম না। পরদিন শুনলাম গতকালের তুষার ঝড়ে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। বহু ঘোড়া ঠাণ্ডায় মরে গেছে। পরদিন পুনরায় যাত্রা। পথে বহু ঘোড়া মরে পড়ে আছে দেখলাম। দুই তিনটি মৃতদেহ সামনে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল। বেলা ১২টার মধ্যে চন্দন-বাড়ী, বেলা ৩টার মধ্যে পহলগাঁও পৌঁছে গেলাম। চন্দন বাড়ীর পর বহু স্থানে যাত্রীদের সরবৎ, পুরি তরকারি দিয়ে অভিথি সেবা করা হচ্ছে। পহল-গাঁও-এর প্রায় প্রবেশ পথে এক স্থানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে পুরি, তরকারি, মিষ্টি, চাইনি প্রভৃতি খুব যত্নের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। এই এলাহী ব্যাপার দেখে ভেতরে একটু খোঁজ খবর করলাম। একজন কাশ্মীরী লক্ষপতি ব্রাহ্মণ নিজ তত্ত্বাবধানে খাবার করিয়ে অভিথিদের সেবা করছেন। সব-চেয়ে ভালো লাগলো তাঁর শুভ্র চেহারার সঙ্গে

শুভ্র মনের পরিচয় পেয়ে। পহলগাঁও থেকে জিনিসপত্র নিয়ে তাঁবু প্রভৃতি কেয়ৎ দিয়ে সেই দিনই শ্রীনগরের পথে যাত্রা।

অমরনাথ দেখে এলাম। দেখে এলাম বলে ভুল হবে কেন না স্বাভাবিক তুষারলিঙ্গের দর্শন পাইনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা যাঁরা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় গেছিলেন তাঁরা কিন্তু পূর্ণ মূর্ত্তি দেখে এসেছেন। তবে কি চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে এই তুষার লিঙ্গের সত্তা সত্যই যোগ আছে। জানি না। তবে পথের সৌন্দর্য্য মনকে ভরিয়ে দিয়েছে। পুনরায় যাবার ইচ্ছে ও এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে এসেছি যা স্বামীজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন। স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, তুমি হয়ত বোঝো নি ঠিক, কিন্তু তীর্থযাত্রা তুমি করেছ এবং এর ক্রিয়া চলবে আর ফল তুমি পাবে। পরে তুমি আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবে। যখন ফললাভ হবে।

স্তব্ধ-আঘাত

দিলীপ দাশগুপ্ত

সেই স্বর্গ বহুবার চরণের তলে
ঐশ্বর্যের উপহারে—অনুরাগে—বহু অশ্রুজলে
আমাকে তপস্যা ক'রে গেছে স্তব্ধ হ'য়ে।

যজ্ঞের তিলক নিয়ে, সর্ব শোক স'য়ে
প্রভালোক দীপ্ত তেজে আমি সর্বক্ষণ
নিজে স্রষ্টা হ'য়ে তাই করেছি বপন
আমার সৃষ্টির বীজ : নব স্বর্গধামে
শুনেছি যে জয়ধ্বনি আমারই সে নামে।
কটুগন্ধী কুসুমের মালা কণ্ঠে পরিনিতো নিজে।
তবুতো বাসনা কীট সুন্দরকে ব্যথা দিয়ে কী যে
বিস্তারণ-তীর থেকে ভুলে থাকা অতীতের ব্যথা
জীবন-জোয়ারে এনে অশান্তের দীর্ঘ আকুলতা
তোলাতে চেয়েছে হায়!
চেয়ে দেখি বসন্তের কান্না ভেঙে যায়
আমার আনন্দ ঘন হাসির আকাশে।
আর চারপাশে
সুধাপাত্র শূন্য ক'রে প্রত্যাখ্যাতা কোন সর্বনাশী
নাগিণীর বিষ ঢেলে হাসে এক মোহময়ী হাসি।

তবুতো অটল আমি। স্বর্গ আর ঈশ্বরের বুকে
সুকঠিন বজ্র ঘাত হেনে যাই বিপুল কৌতুকে।
লজ্জাগুলো ছুঁড়ে দেই—সঙ্গে দেই তথু অপমান
তাই নিয়ে পাখীরা গেয়ে ওঠে প্রেম-জয় গান।

মনের মধ্যে মন

শ্রীসমীরণ রুদ্র

আগের অনেক কিছু চিত্তগ্রাহী জিনিসের মতো আড্ডাও যেন দিন দিনই কমে আসছে। যাক্, সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র চারজন সভ্য ক্লাবে উপস্থিত ছিলুম—আমি, সারদা, বরদা, এবং অনীশ। শ্রাবণের আকাশ জলে আকাশ নক্ষত্রহীন ছিল। আর বাইরে বৃষ্টির নীল'ঘরী সুর। অনীশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল "যেয়া ঘেন্না যত কেচ্ছা কি বড়লোকের ঘরে? গরিব মানুষেরা তাই ঢের ভালো। গরিবের ঘরে অত কেলেঙ্কারি নেই। উনপাঁজুরে লক্ষ্মীছাড়া এক মাষ্টার ঐ হল ছেলের গৃহ শিক্ষক গো, তারই সঙ্গে কেমন জুটে গেছে দেখতে ঘরের মিস্ত্রী। অনীশ একটা ভাল কার্বের ইঞ্জিনিয়ার। সে একাধারে জীবন শিল্পী, প্রেমিক, বিপ্লবী এবং রূপকার। ওর কথা কিছু বুঝতে না পেরে আমরা সকলেই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালুম। অনীশ ফের বললে "মালতীকে তোমরা চিনলে না? কত বড় ঘরের মেয়ে। বাপ নামকরা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন যারা গেছেন। বাপের অঢেল পয়সা। মেয়েকে স্কুল ও কলেজে কত পড়িয়েছেন। মেয়ে অনেক বিদ্যেও শিখেছে নাকি। কিন্তু বড় মাড়ি ঐ বিদ্যের মুখে। আর মাষ্টারটাই বা কি রকম ভদ্রলোক। এম-এ পাশ! এর নাম তুই শিক্ষিত। এক ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী ও বৌ, তার সঙ্গে তুই ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে অবৈধ প্রেম করলি! পরস্ত্রীকে সোহাগ জানালি! সুখের সংসার নষ্ট করে দিলি!"

একটু থেমে একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অনীশ আবার বলল "এই দেহ যখন পবিত্র, এই দেহের অনুশীলন যখন সুখদায়ক। তখন একে লজ্জাকর ভাবে কালো কালি মাখানোর কি প্রয়োজন বলতে পার? একে নোংরা করার অধিকার কারো নেই। এই দেহমন্দিরে ভগবানের বাস, একে অপবিত্র করে কি লাভ? আমি জীবন শিল্পী। আমি রক্তগোলাপের স্বপ্ন দেখি। আমি আশাবাদী, নোংরামি ভালবাসিনে।"

সারদা একটা ভাল কলেজের অধ্যাপক। খালি চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বলল "অনীশ ঠিকই বলেছে। আজকের দিনে যে বিরাট অশান্তি আর অস্থিরতা বিশ্বসংসারে হাহাকার এনে দিচ্ছে সেটার মূলে হল লোভ আর কাম। যাকে বলে কামার্ততা আর ভোগলোলুপতা। একে ক্ষমা করা যায় না। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় জীবনজিজ্ঞাসা হল এই যে সংযম না কামকে আমরা জীবনে বড় স্থান দেবো?" আমি খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলুম। আমার মনে হল আজ বৃষ্টির নূপুরে বুঝি কাঁদছে এ যুগের তাপদগ্ধ বেদনা। বরদা হল সাংবাদিক। এক টিপ নস্য নিয়ে সে বলল "সত্যই বাঙালীর সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, শিল্পে সর্বত্র আজ একটা শৃঙ্খলাহীন উদ্ভতপনা এবং অসহনীয় অস্থিরতা ব্যাধির মত বা সামুদ্রিক ঝড়ের মত বিপর্যয় পর বিপর্যয় সৃষ্টি করছে ও করেছে। এর সঙ্গে আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা এবং যুবশক্তি প্রমত্ত হয়ে প্রমত্তের মত নাচতেও পারি অথবা এর সঙ্গে মানুষের শুশ্রূষায় আমাদের ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে আমরা বদ্ধপরিকর হতে পারি আত্মদানও করতে পারি। জানিনা কোন্‌টা হবে আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। দেশের যুবশক্তি এ নিয়ে ভাবুন এবং এর উত্তর দিন।" আমি এতক্ষণ চুপ করে বসে ওদের কথা শুনছিলুম। এবং আমি বললুম "আমাদের কৃষিভিত্তিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বদলে আজ শিল্পভিত্তিক এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা রূপ নিচ্ছে। সেই সঙ্গে এসে পড়েছে মানুষের জীবনের নব মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ অশ্লীলতা অথবা শ্লীলতা? একথা আমিও তোমাদের সঙ্গে এখন এক-বাক্যে স্বীকার করছি। কিন্তু ঐ শিক্ষিত ও আদর্শচ্যুত

যাওয়ার আর তার অনন্ত রঙ্গিনী এবং স্বপ্ন সঙ্গিনী প্রভা নায়ীর কথা ও কাহিনীটা আগে শোনাও। অনীশ, তুমি ঐ মেয়ের বিষয়ে কিছু আলোকপাত কর। অনীশ বলল "মালতীর স্বামী সুমধনাথ যৌবনে রূপবান ও গুণবান ছিলেন। কি সুন্দর তাঁর গায়ের রং যেন সর্বঅঙ্গে গোলাপের আভা বেরুচ্ছে। এমন রাঙা ঠোঁট সচরাচর পুরুষের হয়না। চোখের পাতায় যেন কাজল মাখানো। মাথাভর্তি ঘন কালো কোঁকড়া চুল। এখন যদিও বা প্রৌঢ়, তবুও বুকের গড়ন যেন ছেনি দিয়ে কুঁদে বার করেছে। আর গুণ? এম-এতে উনি ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এর পরই নিজ গুণে মোটা মাইনের সরকারী চাকরী পেলেন। এই সময়তেই ওঁর মালতীর সঙ্গে বিয়ে হল। ছেলেবেলা থেকেই সুমধ নামের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। তার কারণ হল উনি সত্যের অনুপম পূজারী। আমি চিনেছি ওঁর জীবনের সোনার মত নিষ্কলঙ্ক সততা, আমি জেনেছি ওঁর আগুনের মত পাপদাহকারী পবিত্র চরিত্র, এবং আমি দেখেছি ওঁর নির্ভর দুর্বার কর্মশক্তি। সরকারের আবগারী বিভাগের উনি সর্বময় কর্তা ছিলেন। কিন্তু কোনদিন একপয়সাও কারো কাছ থেকে ঘুষ উনি নেননি। দুর্নীতির মরণ ফাঁদে কোনদিন উনি জড়িয়ে পড়েন নি। আশ্চর্য ছিল ওঁর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সততা। এই মানুষকে কিন্তু মালতীর পছন্দ হয়নি।"

নায়রা বলল "প্রেম সেই আদিকাল থেকে কখনো অতীন্দ্রিয়তায়, কখনও বা কামকেলির উদ্দামতায়, কখনো হৃদয়ের গভীরতায়, কখনও বা যৌবনবৃত্তির তাড়নায় বিভিন্নরূপ ধারণ করেছে। এখানে তো আমরা দেখছি যৌনবৃত্তির তাড়না যে। এখানে সেই কামকেলির উদ্দামতা। এ হল নোংরামি। যাকে বলে নৈতিক অধঃপতন, উচ্ছৃঙ্খলতা। পরকীয়া প্রেমের দায়ে মানুষ পারেনা এমন কাজ নেই। বিশেষ করে মেয়েমানুষ। অভিসারিকা রাধাই তার সাক্ষী। রাধারা চিরকাল এই পথেই চলে। না কি বলো তোমরা?" বরদা বলল "এ হল রুচির কথা। স্বামী মাত্রই যে স্ত্রীর প্রিয় হবে এমন কোন কথা নেই। আর স্ত্রী মাত্রই যে সতীত্ব মেনে চলতে বাধ্য হবে এ কথাই বা কে বলবে?"

আমি বললুম "ঠিক বলেছ। স্বামী যেখানে ঠকায়, সেখানে একদিন, দুদিন, না হয় দশদিন—ব্যস্ ধরা পড়ে যায়। কিন্তু স্ত্রী,—সে ত মেয়েমানুষ। সে যদি চির জীবন ধরে ঠকায়—বুঝবে কার সাধ্যি? সে সন্তানকে দিব্যি দেয় ছোটবেলা থেকে ঐ যে অমুক দাঁড়িয়ে তোর সামনে, ওকে তুই 'বাবা' বলবি। তবেই না ভদ্রলোক বাবা হয়। কিন্তু অসতী মেয়ে ঠিকই জানে, সত্যিকার বাবা কে? এমন কি কেউ বুঝতে পেরেছে কোনোদিন? যে মেয়ের স্বভাব চরিত্র যত সন্দেহজনক, সে তত বেশী স্বামীর মন ভোলাতে চেষ্টা করে। তবে আশার কথা এই যে যাদে মেয়ে জাতটাই স্বাভাবিক ভাবে সৎ, আন্তরিক ও ধৈর্যশীলা হয়, সতী হয়। অসতী হয় লাখে দুএকটা। আমি বিশ্বাস করি নারীর আত্মা পৃথিবীর মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বে।"

বাইরে তখনো রিমঝিম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বাদল ধারার গান, কিছুক্ষণ, চুপ করে শুনে অনীশ আবার বলল "শোন তবে ঘটনাটা। উদ্ধত যৌবনের স্বাক্ষরে কলঙ্কিত একটি মেয়ের কথা। মালতীর স্বামী সুমধবাবু বাবা ছিলেন মস্ত বড় ডাক্তার, সুমধবাবু, এক ভাই উকিল, আর একভাই অধ্যাপক। সকলেই সুশিক্ষিত, সুউপার্জী। ওদের সুখের সংসার। বিদুষী মালতী এল ঐ বাড়ীতে যেন শুভ্র বিশ্বাস প্রতিমা,—সকলে মনে করলে মেয়েটার কি ডিগ্নিটি, কি প্রেসটিজ। স্বামীর বদলির চাকরী। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হবে। মালতীর বাসনা বা আদিখ্যেতা হল এই যে সেও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরবে। কেউ বুঝতে পারেনি তার কপটতা। ঘুরবে তা ঘুরুক। কিন্তু এইভাবে বাঘিনী ঐ বৌথ পরিবারে, সুখের সংসারে আগুন জ্বেলে দিলে। স্বামীর সঙ্গে সেই যে বাইরে গেল আর কোনদিন শ্বশুর বাড়ীতে ফিরলো না, স্বামীকেও ফিরতে দিলে না, সংসারে একটি পয়সাও কখনো পাঠালে না। শ্বশুর বাড়ীর কাকেও ওর পছন্দ হয়নি, ভাল লাগেনি। কেন? অথচ যে ভাই অধ্যাপক,

তাঁর স্ত্রীও খুব সুন্দরী ও বড় লোকের মেয়ে, সেই মেয়ে কিন্তু সকল দিয়ে মিশেমিশে বেশ হাসিখুসি হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে ঘর সংসার করতে লাগলেন, উকিল জামাইয়ের স্ত্রীও তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয়তা দিয়ে সেই সংসারের সকল সুখ দুঃখ ও বেদনার অংশ নিয়ে ছিলেন। তাঁর মনেও কোনও রকম মোহের প্যাঁচ ছিল না। বাক কয়েক বছর পর সুমধুরা নানা দেশ ঘুরে এবারে কোলকাতায় বদলি হয়ে এলেন। তখন মালতী বৌদির দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে স্কুলের ক্লাস এইটে পড়ে, তারপর মেয়ে সেও ক্লাস সিক্সে পড়ে, সবার যে ছোট সে ছেলে, সেও ক্লাস ফোরে পড়ে। বছর চারেক কোলকাতায় একটানা সরকার থেকে দেওয়া কোয়ার্টারে থেকে সুমধুরা আবার বাইরে বদলি হলেন। কিন্তু মালতী বৌদি আর কোলকাতার বাইরে যেতে চাইলেন না। উনি বল্লেন—"ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি হবে। আমি এদের নিয়ে কোলকাতায় বরঞ্চ থাকি। তুমি একাই যাও, ছুটিতে ছুটিতে এসে দেখে যাবে। সরকারী বাড়ী ছাড়তে হবে জানি। তা হোক। আমরা বাড়ী ভাড়া করেই থাকবো।" অগত্যা তাই হল। ভাল পাড়ায় ভাল বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। যথাসময়ে সুমধুরা চলে গেলেন কর্মক্ষেত্রে, মালতী বৌদি রয়ে গেলেন দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে কোলকাতাতেই। এরই কিছু আগে এসেছেন সেই মাষ্টার—ছেলেমেয়েদের পড়াবার ভার নিয়েই এসেছেন। নাম অনিমেষ। এম এ পাশ, সুন্দর বুদ্ধিমান প্রতিভাদীপ্ত ছেলে কিন্তু তার জীবনে এ সবের কার্যকরী মূল্য কিছু নেই। কারণ অনিমেষ অসৎ ও চরিত্রহীন। সে শীঘ্রই মনিব গিন্নীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেল। সুমধুরা চলে যাবার পর সে বাড়ীতে সর্বক্ষণের জন্য গৃহশিক্ষক অর্থাৎ হোল টাইম টিউটর হয়ে রইল। তাইতেই নাকি সুবিধা বেশী, অনেক সুযোগ। মনিব যখন বিদেশে গৃহশিক্ষক তখন ওটি ওটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল—শেয়ালের মতো। ধূর্ত লোভী শেয়ালের মতো হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছিল মনিব পত্নীর বিছানার দিকে। তা শেয়াল বেচারার আর দোষ কি বলো যদি স্বয়ং যাদিনীই তাকে ডেকে আনে সেবার ছলে একবারে নিজের

ওহার মধ্যে। মালতী বৌদির বেশবাস চিরদিনই ফ্যাশন দুরস্ত ছিল। কি রকম খেয়ালাগে দেখতে যখন যেটি উনি হৃদয়ের পুঁজি জড়োয়া গয়নার চেকে রেখেছেন। কি রকম খারাপ লাগতো তাই দেখতে যখন দেখতাম মাষ্টার মালতী বৌদির সঙ্গে লেপ্টে আছে আঠার মতো। আর ব্রহ্ম দৈত্যের মতো চেপে বসেছে মাষ্টার ওই বাড়ীতে যে বাড়ীতে ওর কোনদিন কোন অধিকারই নেই। সুমধুরার চোখে কতোদিন আমি দেখেছি অপরিসীম এক বেদনা, আর মালতী বৌদির চোখে?—দেখেছি সুমধুরার জন্য ঘৃণা, কিন্তু মাষ্টারের জন্য প্রশ্রয়। আমার বুকের মধ্যে ঝড় উঠতো। ভাবতাম সুমধুরার মতো এক মহান, ক্ষণজন্মা মানুষ, আর—তার বদলে একটা উল্লুক—একটা দু পেয়ে জানোয়ারকে মালতী বৌদির মতো একজন রুচিমতী মেয়ের ছিঃ ছিঃ ঐ শিক্ষিতা মেয়ের শেষে এই টেস্ট। অবাক লাগতো। সুমধুরা বুঝতে পেরেছিলেন সব, ওঁর আত্মীয় স্বজনেরাও টের পেয়েছিলেন সব। আড়ালে হাসাহাসিও করতেন এই নিয়ে। অপমানে লাঞ্ছনায়, এবং এই প্রকার সামাজিক অপযশে বেচারা সুমধুরার মাথা তোলবার উপায় ছিল না। কিন্তু ভারতীয় আচার ও নিষ্ঠায়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সুমধুরার, চিরদিনই অন্ধ শ্রদ্ধা। হিন্দুবিবাহকে তিনি অটুট মনে করেন। তাই কথায় কথায় স্বামী বা স্ত্রী বদল করা ওঁর রুচিতে বাধে। বিবাহ বিচ্ছেদ আনলেন না। অবশেষে তিনি ঐ পৈশাচিক নরককুণ্ড থেকে ওঁর বড় ছেলে ও মেয়েকে একদিন নিয়ে পালালেন। ছোট ছেলে মায়ের কাছেই রয়ে গেল। এর পর স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কিছু ছিল না। শুধু মাসে মাসে টাকা পাঠানো ছাড়া। উনি বাইরে বাইরেই কর্মস্থলে থাকতেন। না, বিবাহ আর উনি করেন নি। রক্ষিতাও রাখেননি। বলেছি তো আগেই যে ওঁর নৈতিক শুচিতা বোধ ছিল খুব উচ্চ। ওঁর মধ্যে আমরা সেই পরম পুরুষকে প্রকাশিত দেখতাম যিনি সত্যের সাধক। যিনি অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল, অন্তরে যিনি পবিত্র, এবং শান্ত, যিনি দুঃখে ও বিপদে একান্ত অবিচল, জীবনকে যিনি ভালবাসেন এবং মৃত্যুকে যিনি তুচ্ছ মানেন। ওঁর বড় ছেলে এখন ডাক্তার হয়েছেন। ভালঘরে সেই ছেলের

উনি বিয়ে দিয়েছেন। পুত্রবধূও খুব ভাল। শ্বশুরকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ওঁর মেয়ে কিন্তু ওঁর খুব প্রিয়, যাকে বলে গলার হার। মেয়েও বাপকে তেমনি ভালবাসে। বাবার সেবা ও যত্ন সব কিছু সে নিজের হাতে করে। মেয়ে এম এ পাশ করেছে। ভাল ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু বাপকে ছেড়ে মেয়ে কোলকাতার বাইরে কখনো যায়নি। তাই জামাই কোলকাতার বাইরে ভাল চাকুরী পাওয়া সত্বেও কোলকাতাতেই রয়ে গেছেন। মেয়ের নাম চিত্রিতা, জামায়ের নাম শান্তনু। শান্তনুদের কোলকাতায় নিজস্ব বাড়ি ও গাড়ি আছে। সুমথদার বড় ছেলের নাম সুশীল। সে ডাক্তারিতে খুব নাম করেছে, ভাল পসার জমিয়েছে। সুমথদা তিনখানি বাড়ী রিটায়ার করে কিনেছেন। প্রভিডেন্টফাণ্ডের টাকা অনেক পেয়েছিলেন। তাইতেই কিনেছেন। অবশ্য কিছু ছেলেও দিয়েছে কিছু জামাইও দিয়েছে। সেই বাড়ীর একখানি বড় ছেলে সুশীলকে উনি দিয়েছেন, একখানি মালতী বৌদি ও ছোট ছেলেকে দিয়েছেন। তারা সেই বাড়িতেই বাস করে। আর একখানি মেয়ে চিত্রিতাকে দিয়েছেন। মেয়ে জামাইএর তো নিজেদেরই বাড়ি আছে, তাই সুমথদা উপস্থিত অর্থাৎ যতদিন বাঁচবেন এই বাড়িতেই বাস করেন। ওঁর মৃত্যুর পর মেয়ে এই বাড়ি পাবে। আর এই বাড়ীতেই উনি আমাদের ক্লাবের জন্য একখানি ঘর বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিয়েছেন। তোমরা কেউ জানো না যে এই বাড়ি সুমথদার। তোমরা সকলে জানো যে বাড়িওলা হল শান্তনু বোস। ইনিই কিন্তু সুমথদার জামাই। সুমথদাকে আমি বলেছিলাম একখানি ঘরের জন্য। তা উনি বাইরের এই ঘর খানি আমাদের জন্য এক কথায় ছেড়ে দিলেন। আমায় বড় ভালবাসেন উনি। এই বাড়িরই পিছনদিকে উনি থাকেন। চিত্রিতা রোজ দুবেলা এসে বাপের খোঁজ খবর নিয়ে যায়। একটু শরীর ওঁর খারাপ হলেই চিত্রিতা তখন কয়েকদিন ধরে এখানে এই বাড়িতে বাপের কাছে থেকে যায়। নচেৎ বাবাকে টেনে নিয়ে যায় নিজেদের বাড়িতে। সেখানেই রেখে দেয় ওঁকে কয়েকদিন। বড় ছেলেও রোজ এসে দেখে যায় বাবাকে। পুত্রবধূও আসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। আসবার হুকুম নেই শুধু মালতী বৌদির। বৌদির সেই পাপের সঙ্গী মাষ্টার মশাই এখন কোথায় কেটে পড়েছে। বৌদির সেই উদ্ধত যৌবন এখন অস্ত নেই। প্রৌঢ়া। ওঁর বাড়িটা যেন পাথর পুরী, নিরানন্দ। কত বড় গর্হিত কাজ জীবনে উনি করেছেন তা এখন উনি বোঝেন, ঝড়ের মত উত্তাল হয়েছিল যে জীবন তা আবার ঝড়ের পরের অবস্থানীর মতই স্থির হয়ে গেছে। উনি অনুতপ্ত। সম্ভবতঃ অপ্রিয়ভাষী।"

সারদা বলল আজকাল বহুমেয়েই এই রকম বিপথগামিনী হচ্ছেন। পরে ভবিষ্যতে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। আমার ধারণা মেয়েদের মনের গতি একমুখী, তা একজনকে উজার করে দিলে আর এমন উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না যা নিয়ে বহুমুখী হওয়া যায়। আমার মনে হয় যিনি বিপথে যান, তিনি কোন একজনকে ফেলে আসা আত্মদান করতে পারেন না বলেই নানা জন নানা দিক থেকে তাঁকে টানে। এখানে মালতী বৌদি সুমথদাকে বোল আনা আত্মদান করতে পারেন নি। তাই ওঁর মন, ওঁর ভালবাসা একমুখী না হয়ে বহুমুখী হয়েছিল।"

বরদা বলল শুধু আমাদের বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ এই ছবি। বিগত কালের যা কিছু ভাল—যেমন শুচিতা, শুদ্ধতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সতীত্ব—সব খুলে, খসে, ভোঙে পড়ে যাচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্বই আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সমাজকে ভাঙতেই আমরা চেয়েছিলাম কারণ প্রাচীন সমাজ দৌষে অনেক কিছু হেয়ে মনে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভাইরে শুধু ভাঙাই আমাদের হল সে আর গড়া হল না। একথা যেন আজকের যুবশক্তি উপলব্ধি করেন।"

আমি বললুম "হ্যাঁ, মানুষের, ভূলোকে, বা অন্তর লোকেও মানুষ আজ নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা। ঈশ্বর, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি থাক বা না থাক আজকের বিবাহ অর্থাৎ আজকের ভালবাসাহীন চুক্তিসর্বস্ব নরনারীর মিলনকে নিষ্প্রাণ বলতেই হবে, আজকের জীবনের পথ যেন সেই মুখেই ছুটেছে। এ যুগ, অশান্ত, ক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত। কিন্তু আজ আর বেশী আলোচনা নয়। এখন ওঠা যাক। অনেক রাত হয়েছে। প্রায় দশটা বাজে। বৃষ্টিও

যেয়েছে। চলো আমরা যে যার বাড়ি যাই। আর যাবার আগে সুরথদার মত মহান পথ প্রদর্শককে আমরা প্রণাম করে যাই।"

বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আমার প্রস্তাবে সকলেই খুশি হয়ে রাজি হল আর বলল "আমরা ওঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে যাই চলো। অনীশ তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। আমরা এ বাড়ির ভিতরে কখনো যাই নি।"

আমরা গেলাম, গেট পেরিয়ে একটু বাগান। তারপর উঠোন, তারপর প্রশস্ত দালান, সেই সান বাঁধানো দালানে একটি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন সুরথদা, এক সৌম্য শান্ত প্রৌঢ় মূর্তি। মাথা ভর্তি সাদা চুল, জোছনার মতই স্নিগ্ধ, রজনীগন্ধার সুবাসের মতই মনোহর। আরো দেখলাম, একটু দূর থেকেই আমরা সকলে দেখলাম, তাঁর পায়ে মাথা রেখে বিস্রস্তভাবে পড়ে আছেন মালতী বৌদি। আর সুরথদা ওঁর মাথায় নিজের ডান হাতখানি রেখেছেন। এক সময়ের পূর্ণ যুবতী আজ প্রৌঢ়। অবশ্য এখানো রূপ সম্পূর্ণ করে যায়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁকে শান্ত ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। চোখের কোলে কালি, গলার চামড়া যেন ঢিলে। আমরা আর একপাও অগ্রসর হলাম না। ঐখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কানপেতে কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। ওঁরা আমাদের দেখেন নি। মালতী বৌদি আতুর কণ্ঠে বলছেন "আমি শুনলুম তুমি নাকি তীর্থ ভ্রমণে যাবে। তারপর আর কোলকাতায় ফিরবে না। কাশীবাস করবে। এই বয়সে ওখানে তোমার কে দেখবে? তাছাড়া আমি তো এখানে আর তোমাকে ছেড়ে একা থাকতে পারবো না। আমি শুধু তোমার সঙ্গে যাবো। আমাকে এই শেষ বয়সে আর দূরে সরিয়ে রেখো না। তোমার সেবা করবো অনেক দিনের এই আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ করো।" তাঁর দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছিল টসটস করে। তিনি আবার বললেন "তুমি এ অভাগীরে মার্জনা করো। দুঃখের তাপে অহরহ আমি এখন খাঁটি হয়েছি। শুদ্ধ হয়েছি। তুমি এবার ক্ষমা করো যত আমার খলন, পতন, ত্রুটি। আমি তোমার ভক্ত উপাসিকা। আমি জানি আমি তোমারই। তুমি আমারই। তুমি আছ তাই আমি আছি। তোমার অভাবে আমি অস্তিত্ব বিহীন, আমি তোমার মন, তুমি আমার দেহ। তুমি জ্যোতির্ময় আমার সত্তায়। তুমি জীবনে নিরাসক্ত যোগী। তুমি আমার সকল মাধুরীর প্রতীক। আমিতো আর কোনদিন তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। আমায় তাড়িয়ে দিও না।" অশ্রু দেখেই বুঝলাম তিনি সত্যই অনুতপ্ত। বুঝলাম বহির্মুখী কাম এখন অন্তর্মুখী প্রেম হয়ে গেছে! দেখলাম এক নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক কাম-হীন স্বর্গীয় প্রেমের ছবি। কারণ ব্যাকুলতাই যে প্রেম সাধনার প্রধান সোপান। এতে ভক্তির উদয় হয়েছে। মালতীবৌদির জীবন অমৃত হয়ে গেছে। সুরথদলকে তুলে ধরলেন মালতীবৌদিকে। নিজের কোঁচার খুঁট-দিয়ে মুছিয়ে দিলেন মালতী বৌদির চোখের জল। তারপর ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন "চলো তুমি আমার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে। চলো আমার সঙ্গে কাশীবাস করবে। এতে আমি খুব আনন্দ পাবো। আর আমাদের বিচ্ছিন্ন বাস নয়। একাগ্র চিত্তার দ্বারা তোমার আত্মশুদ্ধি হয়েছে। তুমি সত্য ও চিরন্তনের স্পর্শ পেয়েছ। আশীর্বাদ করি শিবম্ শান্তম্ ও সুন্দরমের সাধনা তোমার জয়যুক্ত হোক।"

একটু থেমে প্রশ্ন স্নিগ্ধহেসে তিনি আবার বললেন "আমি জানি মানুষের সাধনা সকল দুর্নীতিকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে। সব আবর্জনা, সব প্রবৃত্তি, আলিয়ে পুড়িয়ে মানুষইতো যোগাসনে বসতে জানে। আশৈলক ইতি-লুপনের ভিতর দিয়ে মানুষ চলে এসেছে শুধু একটি মাত্র তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য। তা হল এই নোংরা স্থূল কাম জর্জর মাংসপিণ্ডের বাইরে দেহাতীত কিছু একটা লক্ষ্যের দিকে এগোবার জন্য। তুমি বুদ্ধিকে প্রশস্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে হীন ও দরিদ্র বলে মনে করোনা, দুর্বল বলে মেনো না। দুঃখকে বরণ করো। সত্যকে সকলের উর্দ্ধে স্বীকার করো, আর ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো। এই আমার আশীর্বাদ।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুরথদা আবার বললেন "সত্যের ও সততার সঙ্গে নিয়ে যুগেযুগে বিরোধ হয়,

পরিবর্তন হয়, কিন্তু ওই মূল সূত্র অর্থাৎ তার চিত্তের ও মনের সত্য-অভিমুখিনতার কোন পরিবর্তন হয় না। মানুষের জীবন সত্য তাই মৃত্যুকে স্বীকার করে না। মৃত্যু থেকে সে অমৃতে যেতে চায়। অসত্য বা অসততা থেকে সে সত্যে বা সততায় যেতে চায়। সে বলে অসতো মা সদ্‌গময়'। তাই অমৃত পুত্রের কণ্ঠে সদাই ধ্বনিত হচ্ছে 'আমি বাঁচতে চাই, শুধু বাঁচা নয়—আমি সৎ হয়ে বাঁচতে চাই, আমি শুদ্ধ হয়ে বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচাও। তাই না মানুষের ইতিহাস এতো মহিমান্বিত।" তিনি চুপ করলেন। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে বৃক্ষের পাতায় কেঁপে উঠছিল তাঁর কথাগুলো। ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়ে উঠছিল। বেদনার গভীরে তাঁর এই জীবনানুভব। মনে হল প্রতীক্ষা এবং প্রার্থনার আলোকে বুঝি তাঁর জীবনদর্শন চিরভাস্বর হয়ে আছে। আমাদের চোখেও জল এল। আনন্দাশ্রু না বেদনাশ্রু তা আমরা জানি না। মনে হয় আনন্দের অশ্রুই। আমরা তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্যে ওখানে থেকেই বারবার প্রণাম জানিয়ে নীরবে নিঃশব্দে আমাদের বাড়ীর পথ ধরলাম। জীবনের দুস্তর মরু পেরিয়ে শ্রাবণ বর্ষার এই শুভলগ্নে ওঁদের আবার মিলন হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ম হিসাবে সুখ দুখ পায় কারো এতে সংশয়
কত সাধুজন বিনা অপরাধে দুঃখ কত যে পায়
তাই কেহ বলে ইহা ঠিক নয়
সৃষ্টির আগে বিভাগ না হয়
সৃষ্টির আদি বলে কিছু নয় ইহা জেনো ঠিক নয়
যা পাবার তাই লভিছে সকলে সুবিচার ঠিক হয়।
উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে (২।১।৩৬)
যুক্তির দ্বারা উৎপন্ন যে হয় এই নিশ্চয়
শাস্ত্রের মাঝে জ্ঞানী গুণী জন জেন এই কথা কয়
অনাদি যে এই হয় সংসার
সৃষ্টি প্রলয় হয় বারেবার
পূর্বজন্মে যেজীব যা করে সেই মত গতি হয়
বলি করজোড়ে কর হরিনাথ জীবে শিব জ্ঞানময়।
সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ (২।১।৩৭)
কলসের সব ধর্ম্মের উপপত্তি যে হয়
ঈশ্বর সেই জগতকারণ উপাদান নিশ্চয়
সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি
ধরে সেইজন লভিতে মুক্তি
তাঁহারি চরণ করহো শরণ অন্য উপায় নাই
হরিময় হোক সবার জীবন দুখীরে আনিও তাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত

—•— (ক্রমশঃ)

'জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস'

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য,
স্বাস্থ্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।

১৯৮০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিনটি জাতীয় পরিচ্ছন্নতা দিবস রূপে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটি পরিচ্ছন্নতা দিবস হিসেবে পালনের তাৎপর্য্য হলো, মহাত্মাজি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নায়ক যেমন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীকও তিনি। নিজের জীবনে ও যে কোন পরিবেশে পরিচ্ছন্নতাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। গান্ধীজীর জীবন চর্যার বড় একটা অঙ্গ ছিল···সমাজ থেকে সব রকম অপরিচ্ছন্নতা দূর করা। হরিজন পল্লীতে গিয়ে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাদেরই সঙ্গে ঝাড়ু হাতে কাজ করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি।

সুস্থ মন ও সুস্থ দেহ মানুষ মাত্রেরই কাম্য। দেহ ও মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। যে সমাজে দারিদ্র্য চিরসঙ্গী, মানুষের ন্যূনতম ব্যবহারিক প্রয়োজন যে সমাজে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, মুষ্টিমেয় ধনিক ও বণিক শ্রেণীর আগ্রাসী লোভ যেখানে অসংখ্য মানুষকে অমানবিক স্তরে যুগ যুগ ধরে রেখে চলেছে সেখানে দেহ মনের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগুতেই হবে। এ ছাড়া উপায় নাই। এই মূল প্রশ্ন সত্ত্বেও প্রশ্ন আছে যে পরিবেশে আমরা বাস করি, যে সব জায়গায় আমরা বেশীর ভাগ সময় থাকি, তা যদি পরিষ্কার না হয়, তবে মনই বা পরিচ্ছন্ন হবে কি করে? আর দেহই বা সুস্থ থাকবে কি করে? মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার উপর। দেহ ও মনের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ তাতো কিছু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়, যতটা ইহা নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা সাধ্য। অলসতা ও নিশ্চেষ্টতা কোন ওজর দ্বারা সমর্থিত হয় না। আসুন আমরা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে পরিষ্কার থাকার এবং পরিচ্ছন্ন অভ্যাস গড়ে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করি।

শিশুকালে নানা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে পরিচ্ছন্নতা বোধের অভ্যাস। এই অভ্যাসের গঠন নির্ভর করে প্রধানতঃ পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর উপর। তাঁদের প্রভাবে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তারই প্রভাব পড়ে পরবর্ত্তী কালে নাগরিকদের জীবনে ও পরিবেশে। সেজন্য ছোট বেলা থেকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নীতির অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অজেকাল দাঁতের পোকা, মাড়িফুলে রক্ত ও পুঁজ পড়া সব চেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ দাঁত ও মুখ ধুতে অবহেলা। মুখের ভেতর ভাল করে পরিষ্কার না রাখলে পরবর্ত্তীকালে নানা রকমে রোগ যেমন টনসিলাইটিস্, ডিস্‌পেপসিয়া, আরথ্রাইটিস, (Tonsilitis,Dyspepsia, Artheritis)হৃদরোগ-প্রভৃতির সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে যক্ষা রোগ বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এই রোগ প্রধানতঃ থুথু, গয়ের, শিকনি দ্বারা ছড়ায়। দেখা যায় কেহ কেহ ঘরের মেঝেতে ও দেওয়ালে, ট্রেনে বা কোন গাড়ীর মধ্যে থুথু ফেলছেন। ঐ থুথুতে যদি যক্ষার জীবাণু থাকে তবে ঐ জায়গার বাতাসে ধূলায় সে আশ্রয় নেয়, এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে অন্যের দেহে প্রবেশ করে। সেজন্য যে সব জায়গায় লোকে থাকে বা যাতায়াত করে সেখানে থুথু ফেলা কখনও উচিত নহে। থুথু ফেলার পাত্রে বা নর্দ্দমায় থুথু ফেলুন। কাশি বা হাঁচি হলে রুমাল দিয়ে নাক ও মুখ আলতোভাবে ঢেকে কাশবেন বা হাঁচবেন। কেননা নাক ও মুখ থেকে নির্গত নানা রোগের জীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাতাসে যে সব ধূলো

বালি ওড়ে তার খানিকটা আমাদের শরীরের ওপর এসে পড়ে। ঘামে লেপ্‌টে যায়। লোমকূপের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং ঐ সব জায়গায় ময়লা জমতে থাকে। নানা রকমের জীবাণুরা তখন ঐ জায়গায় বাসা বাঁধে। আর এই জীবাণুগুলি বৃদ্ধি পায় ময়লায় ও নোংরায়। কাজে কাজেই ঐ সব ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য প্রত্যহ আমাদের স্নান করা দরকার। সাবান দিয়ে স্নান করাই ভাল। শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে খোস, পাঁচড়া, দাদ, চুলকানি প্রভৃতি রোগে কষ্ট পেতে হয় না।।

রান্নাঘর ও খাবার ঘরের ভার গৃহিণীদের হাতেই থাকে, কাজেই এ বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ সতর্ক হবেন। শাকসব্জী প্রভৃতি যেখানে সঞ্চয় করে রাখা হয় সেই স্থানটি পরিষ্কার রাখা দরকার। শাকসব্জী ঘরের মধ্যে রাখবেন না। তাতে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে। খেতে বসার আগে ভালরূপে সকলকে হাত ধুতে হবে। ভোজবাড়ীতে খাওয়ার পর মুখ ধোয়ার প্রথা একরকম উঠে যেতে বসেছে। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যহানিকর। পরিবেশন করবার বাসনপত্র; চামচ প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা চাই। কেননা অপরিষ্কার জিনিষ থেকে রোগের বীজাণু সহজেই সংক্রামিত হতে পারে। যে কোন রান্না করা খাবার, কাটা তরিতরকারী, দোকানের খাবার ও ফল সব সময় ঢেকে রাখবেন। কাটা তরিতরকারীর খোলা বা পরিত্যক্ত অংশ, রান্নাঘরের আবর্জনা বা জঞ্জাল, খাবার ঘরের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাবার প্রভৃতি চাকা টিনের মধ্যে রেখে সময়মত নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বা স্যানিটারীর গাড়ী এলে ফেলে দিতে হবে। কেউ খেয়ে গেলে তক্ষুণি তা পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে আবর্জনা আমাদের প্রধান শত্রু, এই আবর্জনা নির্ম্মূল না করলে তার কুফলের হাত থেকে আমরা অব্যাহতি পাব না।

গ্রামের দিকে তাকালে আমাদের পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের ব্যতিক্রমই চোখে পড়ে। অথচ স্বাস্থ্যই গ্রামের লক্ষ্মী। গ্রামের যুবকেরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সারা গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসবে। এক এক দলে মিলে বিশুদ্ধ জলের জন্য জলকূপ বসানো, ঘরে ঘরে কুঁয়ো পায়খানা প্রবর্ত্তন করা নর্দ্দমা কেটে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা। ডোবা খানা, ডোবা ও গর্ত্ত ভরাট করা, গোবর বা আবর্জনা গর্ত্ত করে জমিয়ে মাটি চাপা দেওয়া, রাস্তা মেরামত করা, ঝোপ জঙ্গল কেটে তরিতরকারী বা ফলের বাগান করা এবং গ্রামের সর্ব্বত্র পরিষ্কার রাখা সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতার অতি প্রয়োজনীয় কাজ। প্রথমেই সচেতন হতে হবে ঘাটে, মাঠে, যেখানে সেখানে মল ত্যাগ না করার ব্যাপারে। মানুষের মলে নানারকম রোগের লক্ষ লক্ষ জীবাণু আছে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করতে হলেও মল মূত্রের পরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মলের মধ্যে যে সব রোগের জীবাণু থাকে তারা অতি সহজেই অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কলেরা (Cholera), টাইফয়েড (Typhoid), আমাশা (Dysentry), হুকওয়ার্ম (Hook Worms), ক্রিমি (Worms) প্রভৃতি রোগের জীবাণু মল থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি একটু সাবধান হই ও যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে রোগের জীবাণু না ছড়াই, তা'হলে আমরা এই সব রোগ বন্ধ করতে পারি।

কলেরা (Cholere), টাইফয়েড (Typhoid) ও আমাশা (Dysentry) রোগের জীবাণু সাধারণতঃ দূষিত জলের মধ্যে থাকে। পল্লীগ্রামে নদী, খাল বা পুকুর প্রভৃতির জল প্রায়ই দেখা যায় দূষিত। হয়ত গ্রামের কোন লোক কলেরা (Cholera), বা টাইফয়েড (Typhoid), বা আমাশা (Dysentry) রোগে ভুগছে, আর তার মলমূত্র সমেত কাপড় চোপড় পুকুরের জলে কাচা হচ্ছে, এবং ঐ পুকুরের জল খাওয়াও হচ্ছে। ইহা খুবই অন্যায়। গ্রামে যদি কোন জলকূপ না থাকে বা অকর্ম্মণ্য হয়ে যায় তবে পানীয় জলের জন্য আলাদা পুকুরের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। আর যখন কলেরা (Cholera), টাইফয়েড (Typhoid) বা আমাশা রোগ গ্রামে প্রবেশ করে, তখন খাবার আগে জল ফুটিয়ে নিলে এই সব রোগের জীবাণু মরে যায়। মানুষের মল মূত্র রোদে শুকিয়ে গেলেও হুকওয়ার্ম এবং ক্রিমি রোগের জীবাণু মরে না। মাঠের ধূলোর সঙ্গে মিশে লোকের শরীরে প্রবেশ করে। হুকওয়ার্ম এবং ক্রিমির জীবাণু খালি পায়ের গোড়ালি দিয়েই মানুষের দেহে প্রবেশ করে

ও সহজে রোগের সৃষ্টি করে। এই সব রোগের জীবাণু অতি সহজে ও ভালভাবে নষ্ট করা যেতে পারে। জমির স্তরে যে মাটি থাকে তাতে সহস্র সহস্র অন্ত জীবাণু বাস করে। এই জীবাণুগুলি কলেরা, আমাশা প্রভৃতি ব্যাধির জীবাণুগুলিকে নষ্ট করতে পারে। মাটিতে যে জীবাণু থাকে সেইগুলি মানুষের মলমূত্রের সঙ্গে মিশে কার্বন্ (carbon) হাইড্রোজেন (hydrogen) ও নাইট্রোজেন (nitrogen) প্রভৃতি পদার্থের সৃষ্টি করে ও রোগের জীবাণুগুলিকে মেরে ফেলে। মাটির জীবাণু দ্বারা রোগের জীবাণুকে নষ্ট করার শক্তিকেই সেপ্টিক্ এ্যাক্‌সন্ (septic action) বলা হয়। এই সেপ্টিক্ এ্যাক্‌সন্ (septic action) অনেক রকমেই হতে পারে। গর্ত পায়খানা এইভাবে রোগের জীবাণু নষ্ট করবার একটি সহজ উপায়। এই পায়খানা করতে ১২ ইঞ্চি চওড়া ও ১২।১৪ ফুট গভীর একটি গর্তের দরকার। এবং চারদিকে ঘিরে নিতে হয়। এই গর্ত পায়খানা পুকুর বা পাতকুয়ো থেকে অন্তত ৫০ ফুট দূরে করলে পুকুর বা পাতকুয়ার জল নষ্ট হতে পারে না। এই গর্ত পায়খানা ১৮ জন লোকের জন্য ৬মাস পর্য্যন্ত বেশ চলতে পারে। গর্তটি গভীর হওয়ায় জন্য কোন দুর্গন্ধ হয় না ও মশা, মাছি প্রভৃতির অত্যাচারও বন্ধ হয়।

সহর বা নগরের অপরিচ্ছন্নতা তো আজ চরমে উঠেছে। বহু পরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে অগণিত লোকের বাস। বহু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বস্তী অঞ্চল, নানারকম লোকের বাস এই সব অঞ্চলে, যাদের আচার ব্যবহার ও অভ্যাস বিভিন্ন প্রকৃতির। এই সব নগরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। নাগরিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হয়ে পড়েছি বহুলাংশে। ময়লা ফেলার নির্দ্দিষ্ট জায়গা থাকা সত্বেও এদিক সেদিক ময়লা ছিটিয়ে ফেলা, যেখানে সেখানে কফ্, থুথু ফেলা, ড্রেনের মধ্যে নোংরা ছাই, মাছের আঁশ, তরিতরকারীর খোসা প্রভৃতি ফেলা, রাস্তার ধারে শিশুর মল ফেলা এসব তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা আমরা দেখি এবং নিজেরাও করি। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন এই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমাদের নিজেদের ওপরই। আপনার বাড়ীর সব জঞ্জাল ও আবর্জনা একটি মুখ ঢাকা টিনে জমা করে রাস্তার আবর্জনা ফেলার জায়গায় বা কাড়ুদারের গাড়ী এলে সেখানে ফেলে দিতে পারেন। বাড়ীতে যদি পাকা পায়খানা থাকে তবে তাকে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক (septic tank) পায়খানায় পরিবর্ত্তিত করুন। নিজের বাড়ী এবং পাড়াপড়শীর বাড়ীর আশে-পাশেও যেন আবর্জনা নোংরা জমে না ওঠে সেদিকে নজর রাখুন। আমরা প্রত্যেকে যদি এই ভাবে একটু সচেতন হই তবে যেখানে সেখানে জঞ্জাল স্তূপ জমে উঠে সহরের নাগরিক জীবনকে এমন বিপর্য্যস্ত করে তুলতে পারে না। রাস্তার ড্রেন, আবর্জনা, পরিষ্কার করবার দায়িত্ব পৌর প্রতিষ্ঠানের হলেও সব সময় আমরা পৌর সভার উপর নির্ভর করে থাকবো কেন? কাড়ুদার জমাদার, ইত্যাদি পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে সহযোগিতা করে পাড়ার স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে আমাদেরই নজর রাখতে হবে। সভ্য জগতের মানুষ হিসেবে নিজের বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কি আমাদের সকলের নয়?

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসই, সামাজিক পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলে। প্রত্যেক নাগরিক যদি ব্যক্তিগত ভাবে, এ বিষয়ে কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারেন তবেই সমাজ ও সংসার আপনাতেই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বোধের চেতনার মাধ্যমেই সমষ্টি-গত বা সামাজিক পরিচ্ছন্নতার চেতনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব। আর তার থেকেই গড়ে ওঠে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন নগর, পরিচ্ছন্ন দেশ। তাই আমাদের এখন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

———

মেঘদূত-মাধুরী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কত শত বর্ষ আগে কবি কালিদাস,
সিপ্রা-তটে কুঞ্জ-ছায়ে তুলি' কলভাষ
সারস্বত যন্ত্র-যোগে মেঘদূত-গীতি
গেয়েছিলে উদ্বোধিতে পূর্ব-প্রেম-স্মৃতি
পুঞ্জিত যা' নর-চিত্তে হ'য়ে ধীরে ধীরে—
সঞ্জীবিত হয় শেষে মেঘান্ধ তিমিরে।
মেঘ-মল্লারের সাথে বিরহীর গান
দিনে দিনে তারাতুর করে শুধু প্রাণ ;
তা' যে কেহ কভু আর ভোলে সাধ্য নাই ;
যুগে যুগে কবি-কণ্ঠে বাজে নিত্য তাই।
এবে মেঘ-ভারে যবে মহাশূন্য ভরে,
'মেঘদূত'-দৌত্য-কথা শুধু মনে পড়ে।
এই গুপ্ত দৌত্য যা'র বাণীতে বিধৃত—
তাহারে কি হ'তে পারে এ বিশ্ব বিস্মৃত।

(২)

আষাঢ়-প্রারম্ভ-দিনে মত্ত মেঘ হেরি'
বপ্রক্রীড়ারঙ্গময় মাতঙ্গের মত
তা'রেই প্রেমার্ত প্রাণে দিলে দৌত্য-ব্রত ;
হায় যক্ষ—যক্ষ-শ্রেষ্ঠ, সহিল না দেরি।
আসিবে শ্রাবণ-মেঘ স্নিগ্ধ শূন্য ঘেরি'
শ্যাম-কান্ত, অনুদ্‌ভ্রান্ত, সম্প্রীতি-সন্নত,
পরিপক্ক, সেবা-দক্ষ ; সে নহে উদ্ধত ;
নাহি তা'র আষাঢ়ের প্রচারের ভেরি।
বিদগ্ধ দৌত্যের সে যে যোগ্য অধিকারী ;
বার্তা তা'র—প্রেমিকের, প্রিয়ার সান্ত্বনা।
প্রগল্‌ভ আষাঢ়-মেঘ আড়ম্বর ছাড়ি'
দৌত্য কি করিতে পারে ? দৌত্য যে সাধনা।
শ্রাবণের মেঘই পারে হ'তে মর্মচারী।
মেঘদূতে দৌত্য কোথা, সবই তো কল্পনা।

(৩)

মহাকবি কালিদাস মন্দাক্রান্তা-তালে
অমর প্রেমের কাব্য আনন্দে রচিয়া,
যুগ-যুগ-প্রবাহিত মানবের হিয়া
সুতৃপ্ত করিছে মর্ত্যে নিরবধি কালে।
যে বিরহে চিত্ত দহে, ভাব-স্বপ্ন-জালে
সে অতনু প্রেমে নিত্য রস-মূর্তি দিয়া
'রামগিরি'-'অলকারে' দিয়াছে ভরিয়া ;—
কল্পনার 'মেঘদূত' সেই বার্তা ঢালে।
প্রেমে তাপ, প্রেমে তৃপ্তি ; প্রেমে কাঁদে, হাসে
নর-নারী রঙ্গময় জঙ্গম ধরায় ;
প্রেম রেখা মৃত্তিকার যত ভার নাশে ;
স্বর্গে—মর্ত্যে গড়ে সেতু পূর্ণ মহিমায়।
তনুর বার্দ্ধক্য—নাশ আছে কাল-গ্রাসে ;
তনু-সার প্রেম কাব্যে অমৃত বিলায়।

(৪)

সহসা পড়িল মনে যক্ষ-যক্ষিণীরে।
রামগিরি-নির্বাসন-বিরহ যাপিয়া,
বর্ষান্তে আবার যক্ষ প্রেমাপ্লুত হিয়া
প্রিয়া-পাশে অলকায় আসিয়াছে ফিরে।
মেঘদূত যে বারতা দিলো প্রেয়সীরে
যক্ষের সে মর্ম-কথা সঙ্কেতে শুনিয়া
আশাবন্ধে এত কাল বিরহিণী প্রিয়া
যাপিয়াছে প্রেম-জীর্ণ বিশীর্ণ শরীরে।
নির্বাসন-বিরহাগ্নি দারুণ দহনে
পুট-পাক হ'য়ে প্রেম হোলো প্রেম-সার।
যাবধানে প্রেম-ধ্যান যুগল জীবনে
অবলুপ্ত করিল যে সকল বিকার।
প্রভু-শাপ—শাপ নহে,—বুঝিল দু'জনে ;
স্বাধিকার-প্রমত্ততা ঘটিবে না আর।

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তেইশ

মাস দেড়েক পরের ঘটনা। সমীরের সংসারে নতুন এক অঘটন ঘটল।

রোজ তারিখেই সমীর দুপুরে বাড়ী ফেরে বারোটা থেকে একটার মধ্যে, আবার আড়াইটে তিনটে নাগাদ বেরোয়। রেণু সেই অনুসারেই বীরে সুস্থে রান্না বাড়া করে, কিন্তু আজ সমীর হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী এলো ন'টার সময়। দরজার শব্দ শুনে রেণু দরজা খুলতেই সমীর বলে, দেখ, রেণু, যা বলেছিলুম, ঠিক তাই। এই দেখ, চিঠি এসে গেছে।

কিসের চিঠি দাদা, রেণু অবাক হয়ে সমীরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পিসিমার তাম্বরপো চিঠি লিখেছে, পিসিমা বৃন্দাবনে দারুণ অসুখ হয়ে পড়েছেন। তার অফিসের ছুটি নেই এবং বৃন্দাবন কলকাতা থেকে অনেক দূরও বটে, অতএব দিল্লী থেকে আমি যেন গিয়ে পিসিমাকে দেখাশুনা করি।

ওমা সেকি, পিসিমা এখনও কাশীতে ফেরেন নি ?

না। পিসিমার গুরুভাই সেই হাঁপানী কাশির বুড়োটা ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে গোছা গোছা টাকা মেরে দিয়েছে। সেইজন্যেই সে লিখতো, তার নামে টাকা পাঠাতে, তা নাহলে সে শা—লে জেলখানাতে জড়িয়ে পড়তো।

বলতে বলতে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে সমীর দৌড়ে গিয়ে কল ঘরে ঢুকলো।

রেণু কলঘরের দরজার এসে বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কি এখনই বৃন্দাবন যাবেন ?

ভোর থেকে জ্বর এলো হ্যাঁরে, যত আছে এখুনি দিয়ে দে, খেয়ে নিয়ে এখুনি বেরুতে হবে।

রেণুর তখন মাত্র ভাতটা হয়েছে, কোন তরিকারিও চড়েনি, এবং ভাত হওয়া ত দূরের কথা, চাল ধোয়া পর্যন্ত হয় নি। সে মনে মনে প্রমাদ গনলে।

তিন মিনিটের মধ্যেই সমীর স্নান সেরে দৌড়ে বেরিয়ে এল। রান্নার অবস্থা শুনে সমীর বল্লে, তবে থাক, দোকানে খেয়ে নেব।

রেণু বল্লে, দাদা; চট্‌পট্ পরোটা আর ডিমভাজা করে দেব ?

কতক্ষণ লাগবে, পনর মিনিটের মধ্যে করে দিতে পারবি ?

পারবো, রেণু দৌড়ে রান্না ঘরে গেল।

সমীর ঘরে ঢুকে জামাপ্যান্ট পরে টাকাকড়ি যা ছিল সব গুছিয়ে নিয়ে নিজের সেই পুরানো হ্যাতার স্যাকে লুঙ্গি গামছা ভরে জলের জারগাটায় জল ভরে একেবারে তৈরী হয়ে রান্না ঘরে খেতে এসে দেখলে রেণু থালা পেতে বাটীতে ডাল এবং গেলাসে জল দিয়ে ডিম ভেজে পরটা ভাজতে সুরু করে দিয়েছে।

খেতে খেতে সমীর বল্লে, কি ব্যাপার ভালো বুঝতে পারলাম না। পিসিমা সেই যে কাশী থেকে চলে এসেছিল আর কাশীতে ফেরেনি। তারপর পিসিমার অসুখের খবর কে একজন অচেনা লোক কলকাতায় তার ভাসুর-পোকে জানায়,সে আমার ঠিকানা জানে না তবে শুনেছিল, যে আমি অমুক ডিপুটী মিনিষ্টারের অফিসে কাজ করি। সেই মিনিষ্টারের ঠিকানায় তার কেয়ার-অফে আমার চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি চারদিন পরে ঘুরতে ঘুরতে আমার

অফিসারের বাড়ীতে কাল সন্ধ্যের পরে এসে পৌঁচেছিল। আজ সকালে ঐ চিঠি দেখে ও আমি অবাক্। অফিসারকে বলে দুদিনের ছুটি করিয়ে তাই তাড়াতাড়ি বাড়ীর চলে এলুম। এখন কি করা যায় বল দেখি?

রেণু বল্লে, নিয়ে আসুন। নইলে অসুস্থ লোককে কার কাছে রেখে আসবেন! আর না হয় ত আমি গিয়ে সেখানে থাকতে পারতুম, কিন্তু—

সে হয় না, তোকে দেখলেই পিসিমা ক্ষেপে যাবে। কিন্তু এলেও কি -

সে ভার আমার ওপোর দাদা, আমি পিসিমাকে ঠিক হাত করে নেব।

যেমন আমায় করেছিস্, হাসতে হাসতে সমীর উত্তর দিলে।

কি যে বলেন দাদা—

আহারাদি শেষ করে হাত ধুয়েই সমীর এক কাঁধে ঝোলা অন্য কাঁধে জলের জায়গাটা ঝুলিয়ে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় রেণুকে বলে, টাকাকড়ি কিছু ঐ টানার মধ্যে রইল, যা দরকার হয় নিস্। রেণু এর কোন জবাব দিল না, অস্ফুট কণ্ঠে শোনা গেল, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা দুর্গা দুর্গা।

সারা দিন ধরে রেণুর কাজের আজ অন্ত নেই। যে ঘরটায় রেণু থাকতো, সেই ঘরটাকে ভালো করে ঝেড়ে মুছে লেপ কম্বল সমস্তই বিছানা মধ্যে পেতে পিসিমার জন্য বন্দোবস্ত করে নিজের যৎসামান্য জিনিস রান্নাঘরের একটা তাকে গুঁজে রেখে বিকেল থেকে সে অপেক্ষা করে বসে আছে, কখন ওরা আসে। এমনি করে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যা দেখিয়ে রেণু শাঁখ বাজালে। এই শাঁখ সে এ বাড়ীতে আসার ক'দিন পরেই সমীরকে অনেক তাগিদ এবং খোসামদ করে আনিয়েছে। তারপর রাত্রি যখন ৯টা বাজলো তখন রেণু ভাবতে লাগল উনুনে আগুন দেবে কিনা? এতক্ষণে তার মনে মনে গভীর সন্দেহ হতে লাগলো, ওরা আজ রাত্তিরে ফিরবে কিনা? রাত্রি দশটার সময় রেণু কিছু চিড়ে নিয়ে সকালের ডাল মেখে লবণ দিয়ে সেই চিড়ে গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়লো। দি-বড়ি সবই ছিল বটে কিন্তু নিজের জন্য আর উনানে আগুন দিতে রেণুর ইচ্ছে হোল না।

রাত্রি তখন বোধ হয় এগারটা হবে, একখানা গাড়ী এসে ওদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালো। এখন বেশ গরম পড়ে গেছে রেণু আজ সমীরের ঘরের মেঝেয় তার বালিশটি মাথায় দিয়ে একখানা সতরঞ্চি পেতে খালি গায়েই শুয়েছিল। শোয়ার আগে সে অনেক ভেবেছিল, রান্নাঘরে শোবে কি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে, না, দাদার ঘরেই শোবে, কারণ দাদার ঘরে অনেক টাকা কড়ি থাকে এবং দুষ্টু লোকেরা নিশ্চয়ই খবর রাখে যে, আজ রেণু এ বাড়ীতে একলা আছে। তার একটু ভয় ভয়ও করছিল। কাজেই দাদার ঘর তালা বন্ধ রাখা নিরাপদ নয় মনে করে সে নিজেই এই ঘরে এসে শুয়েছিল। একটু সজাগও ছিল। বাইরে মোটরখানা দাঁড়িয়ে একটু গর্জন করে থেমে যেতেই রেণু উৎকর্ণ হয়ে রইলো। তারপর গাড়ীর দরজা খোলার শব্দ এবং তারপরেই বাইরের দরজায় সমীরের অভ্যস্ত করাঘাত।

রেণু ধড়মড় করে উঠেই দরজা খুলে দিলে। সমীর বল্লে, রেণু, বাইরে আয়ত, পিসিমাকে গাড়ী থেকে নামাতে হবে।

ওরা দুজনে ধরাধরি করে পিসিমাকে গাড়ী থেকে নামালে। পিসিমা কোনরকমে দুজনের ওপোর ভর দিয়ে ঘরে এসে ঢুকেই বিছানার দিকে যেতেই রেণু বললে, পিসিমার জায়গা ও ঘরে করে রেখেছি। ধরাধরি করে পিসীমাকে রেণুর ঘরের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েই সমীর দৌড়ে বাইরে গেল। গাড়ী থেকে পিসিমার পুঁটলি, লাঠি নিজের ঝোলা, ইত্যাদি সমস্ত নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে যখন এসে আবার পিসিমার ঘরে ঢুকলো, তখন পিসিমা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, একটু জল দেনা সমীর।

রেণু তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে গেলাসে করে জল আনতেই পিসিমা বললে, ওর হাতের জল আর কেন, তুই একটু দে না বাবা।

রেণু দু'পা পিছিয়ে গেল। সমীর রেণুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিজে তাড়াতাড়ি কুঁজোটা তুলে নিয়ে পিসিমার কাছে এগিয়ে এল। পিসিমা তার কম্পমান হাতে প্রচুর করে জল নিয়ে নিজের মাথায় ঘাড়ে দিয়ে বললে একটু জল খাব: অন্য গেলাস থাকেত তাইতে করে, না হয়ত আমার ঘটিটা ধুয়ে দে।

রেণু কাঠের মত জলের গেলাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো। সমীর তাড়াতাড়ি পিসিমার পুটলী থেকে ঘটি বার করে বললে, রেণু এটা ধুয়ে নেত, বলেই সামলে নিয়ে বললে, আচ্ছা আমিই ধুয়ে দিচ্ছি, বলে সেই কুঁজো নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ঘটি ধুয়ে আর ঘটি জল কুঁজো থেকে ঘটিতে ঢেলে পিসিমার কাছে নিয়ে এল। পিসিমা কাৎ হয়ে সেই ঘটিতে মুখ দিয়ে সামান্য একটু জল খেলেন। তাঁর ঠোঁট দুটো থরথর্ করে কাঁপছিল।

জল খেয়ে বিছানার ওপর পিসিমা একটু সুস্থ হয়ে বললেন, বাবা সমীর, তুই যে এমনি করে আমাদের সর্ব্বনাশ করবি, তা কি আগে জানতুম? আমি যে কাশীতে ফিরে আজ সেদুর না সে তো তোরই জন্যে। আঠারো টাকা মাসোহারায় কি আর কাশীতে আজকালকার বাজারে বেঁচে থাকা যায়। তা তুই যে টাকা পাঠিয়েছিস আর সেই মুখপোড়া যে এইভাবে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছে, তা আর আমি কি করে জানবো বল।

সমীর বললে, থাক্‌গে পিসিমা, ওসব কথা এখন থাক্, তুমি একটু সুস্থ হও।

আর সুস্থ! এখন যানে যানে যেতে পারলেই হয়। তোর এই অধঃপতন দেখার আগে গেলেই ছিল ভালো। কিন্তু তা ত আর হোল না। ভগবান যে সবটাই দেখাবেন আমাকে। একটু থেমে বললেন, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা, আমি আর কি বলবো বল।

সমীর বললে, পিসিমা এখন আর কোন চিন্তা কোরো না। এখন ভালো হয়ে ওঠো, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, রেণু কত ভালো মেয়ে।

সে বুঝে আর কাজ নেই বাবা, সে বুঝে আর কাজ নেই, পিসিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলেন। ও সব বোঝাবুঝি আর আমি কিছুই করতে চাইনা, কেবল এইটি কোরো, যে কদিন উঠতে না পারি, সে কদিন যেন ও আমার কাছে না আসে, আর আমার জল পথ্য যেন ও না ছোয়।

সমীর আর থাকতে পারলে না। বললে, পিসিমা কুঁজোর জলটা-ত ওই তুলে রেখেছিল।

তাত রাখবেই, তাত রাখবেই, ওই-ত এ বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা, তবে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখে ওর দেওয়া জলটা আর কি করে নিই বল: একটু থেমে বললেন, ও সমীর, তুই আমার শেষ জীবনে বড় দাগা দিয়ে গেলি বাবা, বড় দাগা—

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। রান্না চড়াবে কি না, তা কে জিজ্ঞাসা করার সাহস পর্য্যন্ত তার নেই, অথচ রান্নাকে আলাদা ডেকে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করবে, সেটাও পিসিমার সামনে অভাবনীয়। সে বেচারা আস্তে আস্তে পিছু হটে বাইরে বেরিয়ে জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে সমীরের ঘরের দরজা দিয়ে ওর ঘরে এসে সতরঞ্চি আর বালিশটে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রেখে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়।

সমীর একসময় দাঁ করে বেরিয়ে এসে বললে, কি রে উনানে আগুন-টাগুন আছে? রেণু ভয়ে ভয়ে বললে, উনান ধরাবে দাদা।

হ্যাঁ, ধরা। পিসিমার জন্যে বার্লি করতে হবে, আর আমারওত সেই সকালের পর থেকে আর কিছুই খাওয়া হয় নি।

কিন্তু বার্লি, এই পর্য্যন্ত বলেই রেণু থেমেগেল।

হা হা বার্লি। ভয় নেই আমি এক কৌটো বার্লি কিছু মিশ্রী এ সবই কিনে এনেছি। আমার ঐ ঝোলাটার মধ্যেই সব আছে। তুই আগে বার্লি করে পিসিমাকে দে, তারপর আমার খাবার করিস।

কিন্তু আমি করলে উনি খাবেন কি?

আমি নিয়ে গিয়ে ওকে দেখ'খন, বলব তখন আমি করেছি, বলে হাসতে হাসতে সমীর ও ঘরে ঢুকে নিজের ঝোলাটা নিয়ে বললে, পিসিমা, তুমি শোও আমি কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নিই।

তাই শোও বাবা, তাই শোও। উঃ কি কষ্ট, ভগবান। এত দুঃখও দিলে।

রেণু উনানে আগুন দিয়ে হাত ধুয়ে সমীরের ঘরে এসে ঝোলাটা নিয়ে মিশ্রী, বার্লি, লেবু সমস্ত বার করে নিয়ে গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই বার্লি তৈরী শেষ করে সমীরকে ইসারায় ডাক দিলে। সে পিসিমার বিছানার ধারে চেয়ার নিয়ে বসে আস্তে আস্তে কত কি সব কথা বলছিল। সমীর এসে একটুখানি অপেক্ষা করে

থালি নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বল্লে পিসিমা, বার্লি তৈরী করলুম।

পিসিমা বল্লেন, আহা বাবা, এই রাত্তিরে আবার বার্লি! তা করেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমায় যে গাড়ীর কাপড়,—ছাড়তে হবে যে।

পিসিমার পুঁটলী থেকে আর একটা খান বের করে দিতেই পিসিমা বল্লেন, ওগুলো সবই কাচতে হবে, সবই ত গাড়ীর কাপড় বাবা। তুমি আমার ঐ কেটের কাপড়খানা বার করে যাও, ঐটে কোমরে জড়িয়ে বার্লিটা খেয়ে নিই, আর বাকীগুলো সব কেচে দিতে হবে।

পবিত্র কেটের কাপড়টা কোনো কালেও বোধহয় কাচা হয় নি। সেটা থেকে এত দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে যে, সেখানা পুঁটলী থেকে টেনে বার করেই সমীর বল্লে, ওঃ, এটা যে ভয়ানক নোংরা পিসিমা।

পিসিমা ম্লান হেসে বল্লেন, কেটের কাপড় কি আর নোংরা হয় বাবা, ঐটে আমায় দাও। বলে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে সেখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে পরণের কাপড়খানা পুঁটলী পাকিয়ে ছেলের ফেলে দিয়ে কুঁজোর জলে হাত ধুয়ে বার্লিটা খেয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, উঃ, সেই দুপুরবেলা একটু মিশ্রীর জল খেয়েছিলুম, তারপর এই খাচ্ছি।

পিসিমাকে শুইয়ে দিয়ে সমীর বল্লে, তাই বুঝি পিসিমা গাড়ীতে জল পর্য্যন্ত খেলে না—

কি করে খাই বল বাবা, গাড়ীর চাকা যে কত নোংরা জিনিষের ওপোর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, গাড়োয়ান কি আর কিছু দেখেশুনে চালায়, না চালাতে পারে?

সমীর বল্লে, কিন্তু পিসিমা, এ বাড়ীতে এসেই যে তুমি জল খেলে, তাতে দোষ নেই?

ঐ সব তোমরা আজকালকারের ছেলেরা বড্ড কথার ছল ধরো। তখন কি করবো বল, আতুরে নিয়ম নাস্তি, এ ত আমাদের শাস্ত্তরেই আছে বাবা।

হাস্তে হাস্তে পিসিমার ছাড়া কাপড় আর পুঁটলীর সুঠী কাপড়গুলো নিয়ে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কলঘরে যেতেই রেণু কাছে এসে অস্ফুট কণ্ঠে বললে দাদা, ও সব নিয়ে কি করবেন?

কাচতে হবে।

রেণু ফিস্‌ফিস্ করে বললে, ওগুলো রাখুন ত, আমি কাচলেও চল্‌বে। আপনি আসুন। আপনার খাবার হয়েছে।

সমীর কাপড়গুলো কলঘরের দরজার সামনে রেখে রান্নাঘরের সামনে খেতে বস্‌লো। খেতে খেতে বললে তোর খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছে ত?

হ্যাঁ, রেণু অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলে।

কি করেছিলি? পরোটা? এ বাড়ীতে আসার পর থেকে সমীর রেণুর জন্য নিজের সঙ্গে একই রকম পরোটা করিয়ে তবে ছেড়েছে।

রেণু বললে, না, আমি আর কিছু করি নি। সকালের ডাল দিয়ে চাট্টি চিঁড়ে খেয়েছিলুম।

বলিস্ কি রে! ওঃ, কি মুচ্ছে তুই! আমি বাড়ীতে নেই বলে উনুনই ধরাস্ নি? কি করলি দারাদিন ধরে?

ঘুমালুম, রেণু হাস্তে হাস্তে উত্তর দিলে।

বেশ করেছিস্, তাহলে এখন খাবার করেছিস ত?

নাঃ, এত রাত্তিরে খাবো না।

সে কি? সমীর বিস্মিত হোল। তবে আমি আর খাবো না, এই চারখানা তুই খাবি। দাদার পাতে খেতে কোন দোষ নেই, আর এতেত মাছ ডিম কিছুই নেই।

ব্যস্ত হয়ে রেণু বললে, না না দাদা, ও আপনি খেয়ে নিন, ও আপনি—

স্মিতমুখে সমীর বললে, বেশ তবে আমি চুপ করে বসে রইলুম, তুই আগে নিজের খাবার কর তবে আমি খাব।

রেণু বললে, না দাদা, এ বড় অন্যায়।

নির্ব্বিকার মুখে সমীর বললে, এ রকম অন্যায় কাজ আমি করেই থাকি, তুমি আগে নিজের খাবার কর, তারপর আমি এগুলো খাচ্ছি।

বাবা বাবা, এত কষ্টও দিতে পারেন দাদা, বলে পরম তৃপ্তিমুখে রেণু ঘর থেকে কিছু আটা এনে জল ঢেলে সমীরের সামনেই মাখতে বস্‌লো। বললে, এবার যাও, এইত আমার খাবার করছি।

আহারাদি শেষ করে সমীর বললে, আজ আর পান নেই? সমীর এই কিছুদিন হোল পান খেতে সুরু

করেছে। হাঁ, আছে বইকি, আজ দুপুরের পান ত আপনি খান নি, একটু হেসে রেণু বললে কিন্তু দাদা, কাল সকালেই বাজার চাই, কারণ আজ বিকালেত আর বাজার করে আনেন নি।

সমীর বললে, আচ্ছা।

পিসিমার ঘরে গিয়ে সমীর দেখলে, পিসিমা ঘুমুচ্ছেন। আস্তে আস্তে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সমীর আবার রান্নাঘরে এলো। রেণুর তখন পরোটা ভাজা শেষ হয়ে গেছে।

সমীর বললে, শোবার ব্যবস্থা কোথায় করেছিস্‌রে?

সে আমি করে নিয়েছি, রেণু উত্তর দিলে।

আমার ঘরের মেঝেয় থাকতে পারিস্।

বাপরে, রেণু হেসে উঠলো। পিসিমা তাহলে—

সমীরও হেসে উঠলো। বললে, বুড়োমানুষকে নিয়ে বড় বিপদ সমীর। সিগারেট ধরালে বললে, সারাদিন সিগারেট খেতে পাইনি। এক গাড়ীতে আসছি যে।

থালায় করে পরোটা নিয়ে খেতে বসে রেণু বললে বেশ হয়েছে, অত সিগারেট খান কেন। একটু থেমে বললে, কিন্তু দাদা, পিসিমা যাই বলুন, আপনি যেন আমার জন্য ওঁকে একটাও কড়া কথা বলবেন না।

না রে না, কিন্তু তোর ওপোর দারুণ শাসন অনেক চলবে, সব সহ্য করতে পারবি ত?

হাসিমুখে। পিসিমার সেবা করবো, এ ত আমার সৌভাগ্য!

একটু চুপ করে থেকে সমীর বললে, ওঃ রেণু, তোকে আমি যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভগবান তোকে কি মাটী দিয়ে তৈরী করেছিল রে?

গোবরমাটী দাদা, একদম গোবর, বোধ হয় ষাঁড়ের নাদ! হাসতে হাসতে রেণু উত্তর দিলে। সমীর বললে, ঠিক তাই। ষাঁড়ের নাদ, যা দিয়ে বামুনের ছেলের পৈতে হয়, যেটা না হলে সত্যিকার ব্রহ্মচারী তৈরী হয় না।

রেণুর খাওয়া শেষ হওয়ার পর সমীর ঘর থেকে উঠে গেল।

বাইশ দিন পরে। ডাক্তারী চিকিৎসায় পিসিমা বেশ একটু শক্ত হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার পর ডাক্তার এসে ভালো করে দেখে বললেন, আর কোন গোলমাল হবে না, কাল দুটি ভাত খান না।

ওষুধ পত্তর? সমীর জিজ্ঞাসা করলে।

থাকনা ওষুধ আর কি দরকার? তবে ঐ বড়িটা আরও দিন পনের চালিয়ে যান। ফির টাকাগুলো পকেটে পুরে বাঙালী ডাক্তার নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

পরের দিন সকালে পিসিমার আদেশমত রেণু তোলা উনুন ধরিয়ে ভেতরের বারান্দায় ব্যবস্থা করে দিলে। পিসিমা নিজে কল থেকে জল ধরে কোনমতে নিজের স্নানটা চড়িয়ে দিলেন। সমীর সকালে ফলারীতি বেরিয়ে গেল।

রেণু দূরে বসে বললে, পিসিমা, এবারে দাদার একটা বিয়ে দিন। বুড়োবয়সে আপনি আর নিজে কাঁহাতক রাঁধবেন। এবার বৌ-এর রান্না ভাত খান।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পিসিমা বললেন, সবই ত হয়, আগে তুমি কালামুখী এ বাড়ী থেকে বেরোও, তবে ত। নইলে কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে এ বাড়ীতে ঢুকবে?

হাসিমুখে রেণু বললে, আমি ত তৈরীই আছি, পিসিমা। দাদা সংসারী হোন, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পিসিমা রেণুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, ও সব ছলনায় আমি ভুলিনা রে কানি, ও সব ছলনা আমার কাছে করিস নি। ও সব ঐ বোকাটার কাছে করিস। রেণু জানে, সমীর বাড়ীতে থাকলে পিসিমা তবু একটু ভদ্রভাবে কথা বলেন, কিন্তু সমীর বেরুলে পিসিমা রেণুকে গালাগালি না দিয়ে কোন কথাই বলেন না। তবে রেণুর সেগুলো এই কদিনেই অভ্যাস হয়েগেছে।

ঘুঁটেউলি এসে পাশের দরজা ঠেলে উঠানে ঘুঁটের ঝুড়ি নামালে। বললে, কৈঠা লেবে দিদিমণি?

রেণু বললে, হাঁ, আট আনার ঘুঁটে দিয়ে যাও।

রান্নাঘরের পাশে ছোট একটা চালা আছে, তার মধ্যে গুনে গুনে ঘুঁটে দিয়ে সে বললে, আট আনার দিয়েছি দিদিমণি।

রেণু সমীরের ঘর থেকে পয়সা এনে ঘুঁটেউলিকে দিয়ে দিলে।

এখানে ঘুঁটে কত করে, পিসিমা প্রশ্ন করলে।

আনায় তিনখানা, রেণু উত্তর দিলে।

ও বাবা, এত দাম ঐত ছোট ছোট ঘুঁটে! তা বাছা তুমি ত শুনে নিলে না।

ও ঠিকই দেবে।

হুঁ, যায় যাক, তার যাক তোমার কি, কাটে না ফোটে। বেশ আছিস কালামুখী, কোন দিনের নেই, পত্তর নেই, বেশ তুপয়সা বাগিয়ে নিচ্ছিস এখানে।

রেণু এ কথার কোন জবাব দিলে না।

পিসিমা উঠু হয়ে বসেছিলেন। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে পা-টা ছড়িয়ে বললেন, হ্যাঁরে কানি, সমীরের টাকা পয়সা সবতুই তোর কাছেই থাকে।

রেণু বললে, না, আমার কাছে থাকবে কেন পিসিমা। তাঁর টাকা তিনিই রাখেন।

তবে যে ঐ ঘুঁটের দাম দিলি?

খরচের টাকা কিছু আছে ও ঘরে, সেইখান থেকে দিলুম।

যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই, পিসিমা আপন মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। বেগতিক দেখে রেণু রান্নাঘরে চলে গেল। একটু পরে কিছু কাঁচা তরকারী আর বঁটি এনে বললে পিসিমা, তরকারী কি আমি কুটে দেব?

তোমার দয়া, পিসিমা উত্তর দিলেন।

রেণু কুটতে বসতেই পিসিমা বললেন, এখানে আলুর কি দর রে?

তা ত জানিনা পিসিমা

এ সব বাজার করে কে?

দাদাই করেন।

কেন তুমি দুবো হাতী গত্তর নিয়ে বসে থাকো, আর ও একলা মানুষ দুবেলা অফিস করবে, বাজার করবে, এতে কি তোমার ভালো হবে?

কি করবো পিসিমা, দাদা যে আমায় বাড়ী থেকে বেরুতে দেন না?

আর দাদা-দাদা করিস নি, ও সব কথা কানে শুনলেও পাপ। এক বাড়ীতে কি খাটতে খাটতে এ বাড়ীতে এসে রাণী হয়ে বসেছেন। আবার বগ্ করে চুল ছাটা হয়েছে।

বগ্ করে কি পিসিমা?

ঐ যে কি বলে বাপু আমি অতশত জানি না। ঐ মেমসাগীগুলো যেমন বগ্ করে চুল ছাঁটে, কমর কমর করে—

হেসে রেণু বলে, বগ করে ছাঁটি নি পিসিমা, সেই যে প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে ছিলুম, তারপর এই ক'মাসে এইটুকু আবার হয়েছে।

যা-ব্বা, আবার মাথা মুড়ুগে যা তুই যদি সত্যিই বিধবা হোস, তাহলে আবার অত মাথার বাহার কেন রে। এ দিকে ত রূপের ধুন্নলোচন; কানী কোথাকার! পিসিমা একটা বিশ্রীরকম মুখভঙ্গী করলেন।

তরকারী কোটা শেষ করে রেণু বলে, এ গুলো ধুয়ে আনি পিসিমা।

না বাবা রক্ষে কর, আমি নিজেই ধুয়ে নিচ্ছি।

পিসিমার জন্যে সমীর একটা নতুন বালতী কিনে এনেছিল। তাইতে এক বালতী জল ধরে সমীর যত্নে পিসিমাকে দিয়ে গেছে সকালে বেরোবার আগে। সেই জলে তরকারীগুলো ধুয়ে নিয়ে পিসিমা থালার ওপোর রেখে আপন মনেই বল্লেন, ওঃ, কি পাপের ভোগেই যে পড়েছি।

রেণু বলে, পিসিমা একটা কথা বলবো?

বলো।

রেণু নিজের বাঁ হাতের নখ গুলো দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে বলে, পিসিমা, আমি ভালো ঘরের মেয়ে, এবং আমি খারাপও নই, কিছুই নই। সমীর বাবুকে সত্যিই দাদার মত দেখি—

থাম্ থাম্, কালামুখী আর বলিস্ নি। যতই রোগে ভুগি না কেন চোখ আমার এখনও আছে। যেদিন প্রথম এলুম, সেদিন কি আমি দেখিনি? সমীরের ঘরের বাসর শয্যা পেতে কে শুয়েছিল? বাবু আসবে, হাত ধরে তুলবে, আদর যত্ন করবে—ছিঃ, আবার কথা বলতে এসেছে! রেণু তাড়াতাড়ি পিসিমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। পিসিমা আপন মনে বলে চল্লেন, আবার মিনিয়ে মিনিয়ে বলতে এসেছে আমি খারাপ নই। আমি আসাতে কানীর বুকখানা ফেটে যাচ্ছে, আমি কি বুঝি না! ওর মুখে বাধা পড়েছে গো, মুখে বাধা

পড়েছে। যত সব বিষ কুম্ভ পয়োমুখ! তুমি আমাকে এখেন বোকা বানাতে! একটু থেমে বল্লেন, কি করবো, বিধির বিপাক, বলে পড়েছি হারামের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে, আমার হয়েছে তাই। এ পোড়া অদৃষ্টে যে আরও কত কি আছে এই বলে পিসিমা আরও' সব কত কি গজ্ গজ্ করতে লাগ্লেন।

বেণু রান্নাঘরে এসে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বল্লে, ভগবান, সহ্য করবার ক্ষমতা দাও, যেন একবারের জন্যও কোন কটু কথা না বলে ফেলি। তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগ্লো। এক ঘণ্টার মধ্যে সে আর পিসিমার সামনে এলো না।

পিসিমার রান্না শেষ হয়ে গেছে। পিসিমার দুধের বাটী ও তরকারীটা নিজের ঘরের মধ্যে এনে রেখে আবার বাইরে এসে ভাতের হাড়ীটা নিয়ে ঘরে যেতে গিয়ে হঠাৎ দরজার কাছে বোধ হয় দুর্ব্বলতা বশতঃই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। একটা শব্দ হোল, উঃ।

বেণু ছোড়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে ভাতের হাড়িটা পড়ে গেছে তার উপর পিসিমা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। গরম ভাতের ভাপ উঠ্ছে চারদিক দিয়ে। বুড়ো মানুষ পাছে পুড়ে যান সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি এসেই পিসিমার হাত ধরে উঠিয়ে সযত্নে জিজ্ঞাসা করলে, পিসিমা, লাগে নি ত?

বেণুর হাতে ভর দিয়ে উঠেই পিসিমা হাউমাউ করে কেঁদে বল্লেন, কালামুখী, আমার ছুঁয়ে দিয়ে আমার ভাতটা নষ্ট করলি ত? বেণুকে ধরে কাঁপ্তে কাঁপ্তে একটু সরে গিয়ে বসে চীৎকার করে কেঁদে উঠে বল্লেন ওঃ কি শত্রুরই যে সমীর বাড়ীতে এনে পুরেছে। কতকাল পরে আমি আজ দুটি ভাত খাব সেই সকাল থেকে কানী যেন ছট্-ফটিয়ে মরছে। এখন হোলত, আমার ভাত খাওয়াটা ঘুচিয়ে দিলি ত? হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিমা বল্লেন, তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে ত? তবু আমি আমার ভাইপোর অন্ন খাচ্ছি, আর কারুর নয়।

পিসিমার চীৎকার বেশ একটু জোরেই হয়েছিল। বেণু ব্যস্ত হয়ে কি বলে যে পিসিমাকে স্তোকবাক্য দেবে ভেবে পাচ্ছিল না, কাছে দাঁড়িয়ে সে যেন ভয়ে কাঁপছিল, এমন সময় ভেতরের উঠানের খোলা দরজা দিয়ে এ বাড়ীতে এসে ঢুকলেন, পাশের বাড়ীর বাঁকুড়া জেলার সুপারিন্-টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী। তিনি এ বাড়ীতে এই প্রথম পদার্পণ করলেন, তবে এ বাড়ীতে যে সমীর বাবুর পিসিমা অসুস্থ হয়ে বৃন্দাবন থেকে এসেছেন, সে খবর তিনি দশ বারো দিন আগেই কর্ত্তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এ-বাড়ীতে সকাল সন্ধ্যে ডাক্তার আসায় পাড়ার সকলেই সমীরকে জিজ্ঞাসা করিত ব্যাপার কি? দুষ্ট লোকেরা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, আরও কত ডাক্তার আসবে, হয়ত শেষে ডাক্তার পর্য্যন্ত।

পাশের বাড়ীর গিন্নি এসে বিনা ভনিতায় রোয়াকে উঠে বল্লেন, ওমা, উকি, ভাতের হাড়ি কাৎ হয়ে ভাত ছড়াছড়ি. পিসিমা কান্নাকাটি করছেন, ব্যাপার কি?

পিসিমা তার মুখের দিকে চেয়ে তার অ'দরের চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে যেন কতকালের চেনা এই ভঙ্গিতে বল্লেন, এসো মা, এস। কি পাপের ভোগেই যে পড়েছি, তার আর কি বল্বো। এখন দেখ্ছি, এই করতেই সমীর আমাকে এখানে এনেছিল।

সেই গিন্নী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বল্লে, কি হোল, আজ? আমি কদিন থেকেই শুনছি, আপনি বৃন্দাবন থেকে অসুখ নিয়ে এসেছেন, ছেলেদের মুখ থেকে আপনার খবর সব পাই, কিন্তু পোড়া সংসারের কাজ চুকিয়ে এ এদিকে আসবার সময় আর পাই না। তা আজ কি হোল আপনার?

আর আমার বরাৎ। পিসিমা কপালে করাঘাত করে বল্লেন, আমার বৃন্দাবন যাওয়াও ওর জন্যে, আর এতদিন পরে আজ দুটো পথ্য করতে বসে গেছে; তা সেও ঘুচে গেল ওর জন্যে, বলে সামনের দাঁড়িয়ে থাকা নতমুখী বেণুর দিকে আঙ্গুল দিয়ে পিসিমা দেখিয়ে দিলেন।

কেন কেন, কি ব্যাপার? গিন্নী বেণুর দিকে কট্মট্ করে চেয়ে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তোমায় আর কি বল্বো মা, পিসিমা কান্নার সুরে বল্লেন, ঐ ভাইপোকে এতটুকু রেখে ওর মা গেল মরে। ওর বাপ ওকে আমার কাছে দিয়ে বল্লে, দিদি, তুমি যদি না দেখ, তাহলে এই একরত্তি দুধের বাছাকে বাঁচাতে পারবো না। তা কত্তা ছিলেন মাটীর মানুষ, তিনি বল্লেন বাপ্রে। সে কি কথা। তোমার নিজের পেটে ত

ভগবান কিছুই দিলেন না। ভাইয়ের ছেলেকেই নিজের করে নাও। তারপর মা, একপিঠ-কইতে একপিঠ চুঁইকে দিয়ে ঐ মা-মরা দুধের ছেলে মানুষ করে তুললুম। তিনটে পাশ করলে ঐ ছেলে, তারপর দেশ দেশ করে কংগ্রেসের কাজ নিয়ে জেল খাটলো, কত কি যে বিপদ গেল, তা আর কি বলবো। শেষে বাছক এই দিল্লীতে এসে ভগবানের কৃপায় ভালো চাকরী হোল, কিন্তু কোথা থেকে যে ঐ পাপ এসে ঘাড়ে পড়লো, তা আর কি বলবো মা। মাগী একবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতো, ও এসে বাছাকে ভুলিয়ে তার কাঁধে চড়ে চং করে গেল কিনা কাশীতে আমার কাছে আদর কাড়াতে। আমি মা সেখানে পাঁচটা ভদ্দরলোকের মধ্যে কাশীবাস করি, ভাগ্যে আমার ভাইপোরই এক বন্ধুর বউ আমাকে আগে থেকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছিল, তাই ওকে আমার ঘরে ঢুকতে দিইনি, নইলে আগে না জানলে ত ও সবই মজিয়ে দিয়ে আসতো। কি বল মা, লোকে বলে অভাস্তে সাপের বিষ তা আমারও হয়েছে তাই। তা সেই রাগে মাগী কিনা সমীরকে বলে আমার মাসোহারা বন্ধ করে দিলে। বেশু ইতিমধ্যেই ওখান থেকে পালিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে।

পাশের বাড়ীর গিন্নী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমস্তই শুনছিলেন পিসিমা থামতে তিনি বলেন: ও বাবা, এতদূর? তারপর?

তারপর মা, আমি ত আঁতান্তরে পড়লুম। আমি বুড়ো হয়েছি, ঠাকুর দেবতা আছে, অসুখ বিসুখ আছে, পাল পার্ব্বণে এটা ওটা খরচ আছে। আবার মা এক ভাসুরপো আছে, সে বেশ আমাকে আঠারো টাকা করে আর এই ভাইপো চাকরী হওয়ার পর থেকেই আমাকে দিত পাকাপ টাকা করে। ভাইপোর টাকাটাই মোটা টাকা। এটা বন্ধ হতে আমি মা দৌড়ে এলুম এই দিল্লীতে সে প্রায় ছ' সাত মাস হতে চল্লো। কত কষ্ট করে ভাইপোকে খুঁজে বার করলাম, তা সে কিনা গোল্লা ছাকিয়ে দিলে! কি করবো মা, বুঝলাম কালনাগিনী মন্তর দিয়ে বশ করে রেখেছে, ও আর কি করবে! বলে ওষ্টার মায়া আর পরুনির দয়া, এ পড়লে আর কারুর রক্ষা আছে! ঐ ভাসুরপোর মাসিক আঠারো টাকা বৃন্দাবনে তখন থেকে দুঃখু ধান্দা করে খাকতে দিয়ে বুড়ো বয়সে কি আর এত কষ্ট সহ্য হয়, তাই রোগে পড়ে গেলুম। তা আমার মা এখানে খবর দেওয়ার ইচ্ছেই ছিল না। আর এখানকার ঠিকানাও ত কেউ দেয় নি আমায়। আমাদের দেশেরই একজন লোক দয়া করে আমার ভাসুরপোকে চিঠি দিতে সে কত চেষ্টা করে তবে একে খবর দেয়। তখন, কি জানি দয়া করে ভাইপো গিয়ে আবার পিসিমা বলে আমায় নিয়ে এলো। তা আমি মা আসতে চাই নি। বলুন, তোমার ত সেই কালনাগিনী বলানো আছে, আমি যাবো না। তা ভাইপো বলে, না সে ভালো লোক সে আর কি করবে, এই রকম কত কি? তা দেখ, এখানে এই কদিনই বা এসেছি, তা ও যেন পারে ত আমাকে নখে তুলে দিয়ে মারতে যায়। জানি, ওর মুখে বাধা পড়ছে, তা আমি বলছি কি বাপু একটু সবুর কর, দুদিনের মধ্যে একটু উঠে দাঁড়াতে পারলেই আমি আবার চলে যাবো। আমি কি আর বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম সব তীর্থ ছেড়ে এই ম্লেচ্ছের দেশে ভ্রষ্টার সংসারে বসে থাকতে পারি। তা ঐ কানীর আর তর সইছে না। ও কিনা স্বচ্ছন্দে আমার ভাতের হাঁড়িটা ছুঁয়ে দিলে। বলো আমি ওর ছুঁটুকু পর্যন্ত নিই না, সকালে কল থেকে নিজে হাতে জল এনে তাতে চড়িয়েছি, আমার বাচ্ছা নিজ হাতে করে ঐ বালতীতে জল ধরে দিয়ে গেছে, এইসব করে বুড়ো মানুষ এই অসুস্থ শরীরে সারা সকাল ধরে বসে বসে রান্না করতে আমার ঘাড় পিঠ সব টনটনিয়ে গেল, আর এই বাড়া ভাত ছুঁয়ে দিয়ে ও কিনা স্বচ্ছন্দে আজকের খাওয়াটা আমার নষ্ট করে দিল। ওঃ, আর প্রায় এক মাস পরে পথ্য করবো, আর তাতে কিনা বাধা।

পিসিমা হাঁপাতে লাগলেন। পাশের বাড়ীর গিন্নী যথাসাধ্য স্তোকবাক্য দিয়ে রান্নাঘরের দিকে মুখ করে উদ্দেশে বেণুকে দু'চারটে কটু কথা শুনিয়েদেন, পিসিমা, আপনি যখন এসেছেন,তখন ঐ কানীকে দূর করে দিয়ে এবার ভাইপোর বিয়ে দিন, দিয়ে ভাইপোকে মানুষ করে তুলুন, আর একবার আপনাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, নইলে এমন ছেলে আপনার, সে কি এমনি করেই ভেসে যাবে!

আর ভেসে যাবে! পিসিমা কেঁদে উঠে বল্লেন, ওর কি আর পদার্থ আছে, ও একেবারেই শেষ হয়ে গেছে।

গিন্নী বল্লেন, কিছু শেষ হয়নি পিসিমার, পুরুষমানুষ কি আর শেষ হয়। ঐ মাগীকে তাড়িয়ে দিয়ে একটি ভালো মেয়ে এনে ভাইপোর বিয়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিসিমা কপালে হাত চাপ্‌ড়ে বল্লেন, ভাইপোকে বলেছিলুম, তা সে বলে কি জানো বলে ও কোথায় যাবে, ওর যে কেউ নেই।

পাশের বাড়ীর গিন্নীটি ব্যঙ্গ করে বল্লেন, ওঃ, দরদ দেখ একবার! কেন বাবা, আপনার ভাইপোর সাথে দেখা হওয়ার আগে ঐ কানী তো ঐ সামনের বাড়ীতে রান্না, বাসন মাজা সব কাজই করতো। ওদের আবার কাজের অভাব! কত বাড়ীতে ওর চাকরী জুটে যাবে। তা নয় একটা ভালো লোকের সংসার নষ্ট করে—

পিসিমা বল্লেন, কোন্ বাড়ীতে কাজ করতো মা, কোন্ বাড়ীতে?

গিন্নি বল্লেন, ও মা, তা বুঝি জানেন না! ঐ শিববাবুর বাড়ীতে, যে বাড়ীতে, আপনার ভাইপো সব প্রথম এসে দিন কতক ছিল। ঐ শিববাবুই ত ওর বন্ধু, ঐ বাড়ীতে ত ও প্রথম ঐ কানীকে দেখে।

ওমা, তাই নাকি! এই সামনের বাড়ী? তা মা, আমি ত এখানে কাউকে জানিও না, কাউকে চিনিও না। তা তুমি মা একটা কাজ করে দাও না। ঐ শিব বাবুর বউটিকে একবার ডেকে দিও না মা। আহা সতীলক্ষ্মী মা আমার, তাদের চিঠি লিখে আগে থেকে সবটা জানিয়ে দিয়েছিল, না হলে ত আমার আতঙ্কে সমস্তই খেয়ে আসতো ঐ কানী। তুমি মা আজ দুপুরে ওকে বলে পাঠিও যে সমীরের পিসিমা এখানে এসেছে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। আর তুমিও মা সেই সঙ্গে আর একবার এসো, কেমন মনে থাকবে ত?

ওমা তা আর মনে থাকবে না? আপনার জন্য এই টুকুও করতে পারবো না? খুব পারবো। তা পিসিমা, আজ দুপুরে কি খাবেন? ভাত ত সব গেল, আবার না হয় চারটি ভাত চড়িয়ে দিন।

আর পারি না, বুঝবো যে বিধি আমার ভাত আজ মাপান নি।

তাহলে?

ঐ দুধটুকু আছে, আর সমীর কিছু ফল এনে দিয়েছিল। ঐ খা হয় খেয়ে আজকের দিনটে কেটে যাবে। বলে তুমি যাও বল্লে, তোমার বরাৎ যায় সঙ্গে। বরাতে না থাকলে কি আর অন্ন জোটে না? আর তাও বলি, তাও ভালোই হোল। এ বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ না করাই ভালো। দেখি যদি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে পারি। একটু থেকে খুব চুপি চুপি বল্লে, আমার মা এ বাড়ীতে এক দিনও থাকতে ইচ্ছে হয় না। ঐ কানী বুকের ওপোর বসে বসে যত সব গিন্নীপনা করবে আর আমাকে তাই জুল্ জুল্ করে চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে? আর বল্‌বো কি মা, আমার ভাইপোর টাকাপয়সা জিনিষ পত্তর সমস্তই ঐ মাগীর মুঠোর ভেতর, আর কি নষ্টই যে করছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই। আজ আট আনার ঘুঁটে কিনলে, তা কোন দরদস্তুর করা নেই, গোনাগুনতি করা নেই ঘুঁটেউলি যা দিলে তাই নিয়ে ফুস্ করে পয়সা ফেলে দিলে। বলে, ফাটে না ফোটে, যায় যায়, তার যায়। তা এ সব কি আর আমি চোখ দিয়ে দেখতে পারি মা।

পাশের বাড়ীর গিন্নী সায় দিয়ে বল্লেন, তা বটেই ত পিসিমা তা বটেই ত। আপনার নিজের সংসার, নিজের জিনিষ। এরকম অপচয় স্বচক্ষে আর দেখবেন কি করে? তা পিসিমা, আমি এখন উঠি, দেখি আবার আমার বাড়ীতে কি কাণ্ড হচ্ছে। মা ষষ্ঠীর দয়ায় শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে অনেক গুলি বাচ্ছা-কাচ্ছার সংসার ত, এক মিনিট বেরুলেই একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড বেধে যায়।

তা হবেই ত মা, তা হবেই তো। তা এসো মা, এসো, পিসিমা স্মিতমুখে তাকে বিদায় দিয়ে বল্লেন, কিন্তু মা মনে করে ঐ বউটিকে নিয়ে দুপুরে একবার এসো, ভুলো না যেন।

গিন্নী-বল্লেন, আস্‌বো, নিশ্চয় আস্‌বো কিন্তু আপনার ভাইপো রোজ দুপুরে বাড়ী আসে কি না সেই জন্যে—

পিসিমা বল্লেন, হ্যাঁ আসে, আবার দুটো আড়াইটে নাগাদ বেরোয়, তা তুমি মা তিনটের সময় এসো, তাহলে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

গিন্নী বল্লেন, আচ্ছা তাই হবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করে যেতে উচ্চৈস্বরে বল্লেন, কেন আর বুড়োমানুষটাকে কষ্ট দাও বাছা, যে দুদিন আছে একটু ঘরই কর না। পরকাল বলে ত একটা কিছু আছে অত দম্ভ, অত তেজ ভালো নয়।

যেতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পিসিমা ঘর থেকে বল্লেন চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী মা, চোরাকে আর কি শোনাবে। গিন্নী একটা দুঃখসূচক মুখভঙ্গী করে এ বাড়ীর উঠান পার হয়ে ওদের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

[ক্রমশঃ]

"পেক্‌টিন"

ডাঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র সোপান কৃষি শিল্পের উন্নয়ন। সভ্য জগতের উন্নতিশীল বৈদেশিক জাতির ইতিহাস হইতে পরিচয় পাওয়া যায় যে তাঁহারা দেশের কৃষিশিল্পকে একমাত্র কেন্দ্র করিয়া আজ এত দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হইতে সক্ষম হইয়াছেন। দেশের অভ্যন্তরে খাদ্য দ্রব্যের অনটন ঘটিলে কোন প্রকার নূতন শিল্প পরিকল্পনার প্রচেষ্টা সুদূর পরাহত। ভারতবর্ষ এমনই একটি দেশ যেখানে বিবিধ প্রকার শস্য, ফল, মূল প্রভৃতির প্রাচুর্য্য। ইহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, রক্ষণ ও বিবিধ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

ফলের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার উপকারিতা মোটামুটি ভাবে অল্প বিস্তর সকলেরই জানা আছে। ফলের ভিতর একরকম আঠার মতন পদার্থ আছে যাহার সংযোগে জ্যাম, জেলি ইত্যাদি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য তৈয়ারী করা সম্ভব হয়। এই আঠা পদার্থটীর নাম "পেক্‌টিন"।

বৈদেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষ তাহার সকল প্রকার শিল্পের পরিচালনার জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিত এমন কি জ্যাম, জেলি প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও বিদেশীয় সাহায্য ব্যতীত পঙ্গু হইয়া পড়িত। জ্যাম, জেলি ইত্যাদি প্রস্তুতির মৌলক পদার্থ "পেক্‌টিন্"। পেকটিনের চাহিদা মিটাইতে পারে ভারতে এমন কোন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না, বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে পেকটিন আমদানী করা হইত। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ভারতবর্ষ তাহার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্রুত-গতিতে উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এই দেশের বৈজ্ঞানিকরা দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে বিশেষ যত্নবান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পেকটিন প্রস্তুতির নানাপ্রকার প্রয়োজনা উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠানের জন্য গবেষণায় নিমগ্ন।

বিভিন্ন ঋতুতে স্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণিত করিয়াছেন যে পেক-টিন সব ফল হইতে কম বেশী পাওয়া যাইতে পারে। সকল ফলের মধ্যে পেয়ারাতে বেশী পরিমাণে পেকটিন আছে। সমস্ত মত যদি ঠিক দৃষ্টি রাখিয়া পেকটিনতৈয়ারী করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে জ্যাম, জেলি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেশ কিছু মাত্রায় হ্রাস পাইবে। অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে পেঁপে, লেবু, আপেল, পেয়ারা, কাঁঠালের খোসা, বেল, আমলকী, টেপারী প্রভৃতি হইতে প্রচুর পরি-মাণে পেকটিন পাওয়া যায়। লেবুর বীচি (albe-do) এ্যাসিডের সহিত সংমিশ্রণ করিয়া গরম করিলে, প্রোটোপেকটিন সেলুলোজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, ও তখন পেকটিন জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে যথা বোম্বাই, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার ও আসামে লেবু ও লেবু জাতীয় ফল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন উপায়ে ফল, তাহার খোসা ও বীচি হইতে পেকটিন প্রস্তুতির নিত্য নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া অল্প দামে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইতেছেন। বিভিন্ন ফলে কিরূপ পরিমাণে পেকটিন আছে তাহার মান নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভিন্ন ফল	পেক্‌টিন (ফল প্রতি)
বিবিধ আনারস	৪·০২ হইতে ৫·১৪ (অনুমানিক)
„ কমলা লেবু	৮·১১ „ ১২·৬ „
„ পাতিলেবু	২·৮৫ „ ৯·২১ „
„ পাকাকলা	১·২৬ „ ১·৫৭ „
„ পেয়ারা	১৬·৮৩ „ ২০·০১ „
„ পেঁপে	৫·০২ „ ১০·৫১ „

ইত্যাদি

পেক্‌টিন, কার্ব্বন ও হাইড্রোজনের (carohydrate) একটি যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ। ইহা পলিগ্যালকটুরেনিক অম্লের (galacturonic acid) সহিত বিভিন্ন মানের এস্‌টারিফিকেসান (different degree of esterification) এবং জলের সহিত সংজ্ঞেই মিশ্রিত হয়। ইহা কোষের আভরণের মধ্যে অবস্থিত থাকে। শর্করা (চিনি), জল ও পেক্‌টিন জাতীয় অম্লের পরিমিত মিশ্রণে জ্যাম, জেলি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়।

পেক্‌টিন তৈয়ারীর করার প্রণালী এখানে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। সবুজ রংয়ের পেয়ারা (কাঁচা পেয়ারা) গাছ হইতে তুলিয়া পরীক্ষাগারে ধুইয়া এবং এবং ১% ইথালন সলুশন এ (Ethanol solution) রাখিয়া পরে পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছিয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ পেয়ারাগুলি ছোট ছোট টুকরা করিয়া ১০০°c উত্তাপে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড সহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টা গরম করা হয়। এখন সংমিশ্রণে পেয়ারাগুলিকে নিষ্কাশন যন্ত্রের দ্বারা নিষ্কাশন করিয়া পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়া ছাকিয়া লইতে হয়। ইহার পর নিষ্কাশন তরল পদার্থটী একটি আধারে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। শতকরা ৯৫ ভাগ এ্যালকোহল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিষ্কাশন তরল পদার্থের সংমিশ্রণ করিলে পেকটিন যথাযথভাবে পাওয়া যায়।

পেক্‌টিনের ব্যবহার সম্বন্ধে আগে বলা হইয়াছে যে ইহা জ্যাম, জেলি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতির একমাত্র সহায়ক। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির সহিতও ইহার ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইতেছে, যেমন লজেন্স, স্যালাড্ (salard dressing), চাট্‌নি (cordiment), আইসক্রিম প্রভৃতি। বিভিন্ন তেলের সহিত জলের সংমিশ্রণের জন্য পেকটিন অবদ্রবক (Emulsifier) হিসাবে ব্যবহার হয়। নানাপ্রকার আঠা ও এই জাতীয় জিনিষেতে বহুলাংশে পেকটিনের প্রয়োজন হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে পেকটিনের ব্যবহার কোথায় যে হইবে না তাহা কল্পনার বাহিরে। তাই পেকটিন যাহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

॥ রুবীর তাজমহল ॥

—আবু আতাহার

তাজমহল দেখার ইচ্ছে ছিল অনেকদিনের। রুবীর সে অনুরোধ কেউ শোনেনি। বাবা ব্যস্ত মানুষ। একদিন বলেছিলেন, ভালো করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটা দেখা হ'লোনা তো তাজমহল। কেরাণীর চাকরির আর এক নাম টাকা তৈরীর কর্মদাসী মেশিন। একটু গড়বড় হ'লে, সময়মতো তেল দিতে না পারলে ঘ্যাচাং!

বাবার কথা শুনে হাসি পেয়েছিল কিন্তু ইচ্ছেটা মরেনি। তাই বিয়ের পর ফিরোজ যেই জিগ্যেস করলো, হানিমুন করতে কোথায় যাবে বলো!

—আগ্রা তাজমহল দেখব।

উত্তর তৈরী ছিল, বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ফিরোজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। হয়তো বা হিসেব করছিল। বাজেট কষছিল তাই সেই মুহূর্তে হ্যাঁ কি না কিছু বললো না। এবং রুবীকে আদর করার ইচ্ছে জাগলেও হাত বাড়ালোনা। কারণ ওর মনে হ'লো রুবীর এই ইচ্ছেটা আগে পূরণ করা উচিত।

—কিছু বলছনা যে!

—ভাবছি।

—কি?

—ওখানে গিয়ে তুমি যদি বলো আমি মমতাজ হ'তেচাই। কারণ তাজমহল দেখলেই মেয়েরা নাকি মরতে চায় শুনেছি অমন একটা কবর পৌঁছের লোভে। আমি তো শাজাহান হ'তে পারবোনা।

—ভয় নেই। তোমাকে ছেড়ে আমি মমতাজ, ক্লিয়োপেট্রা কিছু হ'তে চাইনা, বুঝেছ।

—সত্যি!

—সত্যি গো সত্যি।

এবার ফিরোজ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, অল রাইট, রিকোয়েষ্ট এ্যাকসেপটেড।

ঠিক তো।

—ইয়েস

এবার দু হাতে রুবী ওরফে রাবেয়া বেগমকে জড়িয়ে ধরলো ফিরোজ। হাসতে হাসতে বললো, বিয়ের আগে আমার নানি [দিদিমা] বলেছিলেন,নতুন বৌয়ের কথা প্রথম প্রথম শুনতে হয়।

আগ্রায় এখন বেশ শীত পড়েছে। গায়ে লেপ দিতে হয়। সন্ধ্যের সময় ওরা পৌঁছলো! সকালে উঠেই তাজমহল যাবে। মোটামুটি প্রোগ্রাম ঠিক করে নিল।

রুবীর চোখে ঘুম আর আসতে চায়না। ছোটবেলায় মাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে তাজমহলের কথা শুনেছিল। আর তখনই কেমন যেন একটা দারুণ ইচ্ছে গেঁথে গেছিল মনে। তাজমহলের কোন গল্প, কোন কবিতা, ইতিহাস যা হাতের কাছে পেত তাই পড়তো রুবী। তাজমহল যেন সব সময় হাতছানি দিত ওকে! চোখ বুজলেই তাজমহলকে দেখতে পেত যেন। সাদা মার্বেল পাথরের চুড়ো। জ্যোৎস্না রাতে ধব ধব করছে। শাজাহানের সেই গভীর ভালোবাসার কথা মনে হতো। ভাগ্যবতী মমতাজের কথা মনে হ'তো। তাজমহলকে ভালবেসে ফেলেছিল রুবী।

ফিরোজ ঘুমুচ্ছে। হাসি পেল রুবীর।

একটা জলজ্যান্ত জোয়ান পুরুষ তার পাশে। এই কিছুদিন আগেও যাকে ও চিনতো না। জানতো না। এমন কি চেহারাও দেখেনি যার। সেই ছেলেটি কি নিশ্চিন্তে তার পাশে ঘুমুচ্ছে। ভাবতেও কেমন লাগছে যেন। একবার চোখের কাছে হাত নিয়ে গেল রুবী। দুষ্টুমি করে চোখ

বুঝে প'ড়ে নেই তো! তাহ'লে হাতের ছোঁয়ায় পিটপিট করবে চোখ!

না। ভালোই ঘুম এসেছে। আহা ঘুমোক। এই ছেলেটার জন্যেই তো আজ তার তাজমহল দেখা হ'লো। উঁহু দেখা হয়নি তো! হ'য়ে যাবে। কাল সকালেই। আর কতটাই বা বাকী! সেই ছোটবেলা থেকে যে সখ ছিল ফিরোজ তা পূরণ করেছে, কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে এল রুবীর। ঘুমন্ত ফিরোজের একটা হাত উঠিয়ে গালে রাখলো ও।

আচ্ছা এখান থেকে তাজমহলটা কতোদূর! দেখা যায়না! চাদর জড়িয়ে ব্যালকনিতে এল রুবী। সম্মুখে পথ। মহাল সাপের মতো ঘুমচ্ছে যেন। এখন অনেক রাত। চারিদিক নিঝুম, নীরব। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বেশ ভালো লাগছে। নতুন বিয়ের আবেশটাও মনের ভেতর। এখন যেন সারা দেহমন কোন এক মিষ্টি ফুলের সুগন্ধে সুরভিত।

উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। কাল। আগামীকাল। এই রাতটা শেষ হ'লেই ব্যস তাজমহল, তার স্বপ্নের তাজমহল তার সামনে। কতোদিন থেকে যার কথা ভাবছে ও। কতোজনকেই না তার ইচ্ছের কথা জানিয়েছে। সেই মনের ভেতর পুষে রাখা খাঁচার পাখির মতো সাধটা এবার যেন মুক্তির আনন্দে ডানা মেলছে। রুবী চোখ বন্ধ করে সেই খুশী খুশী সাধটা একবার অনুভব করে। আঃ, আমার তাজমহল!

সারা রাত এইভাবে কাটুক না ক্ষতি কি! ঘুম তো আসবেনা! ঘুমন্ত রাতকেই দেখা যাক। ফিরোজকে একবার ওঠানোর ইচ্ছে হ'লো ওর। আদর খেতে মন চাইলো কিন্তু কি ভেবে এগোলনা, দুচোখের দৃষ্টিটাকে আলো-আঁধারিতে যতোদূর যায় ততো দূরে মেলে ধরলো, আর ঠিক তখুনি কাঁধে একটা হাতের চাপ পড়ায় ভীষণ চমকে মুখ ফেরালে রুবী।

ফিরোজ নয়।

একটা তরুণ। পাজামা, পাঞ্জাবী, সাদা শাল গায়ে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, মুখে অদ্ভুত হাসি। এবং যার নাম শামিম।

সেই মুহূর্তে কিছু বলতে পারলোনা রুবী। কারণ কি বলা যায় ভেবে পেলনা। ওকে চুপ থেকে শামিম বললো, চিনতে পারছ তো। চশমাটা খুললো ও, এবার? চশমাটা ইদানিং নিয়েছি।

—তু-আপনি এখানে!

—উঁহু আপনি কেন? তুমি। তুমিই তো বলতে। সম্বন্ধ কেটে দেব বললেই তা কাটেনা।

শামিম সিগারেটা ধরলো একটা, সন্ধ্যে বেলায় তোমরা এলে দেখলাম তোমার বরটা ভালোই। মোটা মাইনের চাকরি করে তা দেখলেই বোঝা যায়। তোমার তো সেইরকমই ইচ্ছে ছিল। ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টট্যান্ট। তা মিষ্টার ফিরোজ আমেদ কি।

নাম জানলে কি করে। এবার কথা বললো রুবী!

—হোটেলের খাতায়। যাক্‌গে, কি করেন

—ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

—ডাক্তার, ইনজিনিয়ার জোটাতে পারোনি তাহলে। বিদ্রূপের সুরে বললো শামিম। ওদের বাজার দর তো অনেক। তোমার আব্বা (বাবা) তা দিতে পারবেন না জানি। তোমার রূপ, যৌবন, বিদ্যেটাই সম্বল।

রুবী কিছু বললো না। কারণ বলার মতো কিছু ছিলনা তার। এই দুর্বল মুহূর্তে এবং যার কাছে একদা অনেক দুর্বল হয়েছিল সেই শামিমের সামনে কিছু বলার সাহস পেলনা ও!

শামিম সিগারেট টানছিল একমনে এবং রুবীকে দেখছিল। আগ্রার একটা হোটেলে এতদিন পর এইভাবে ওর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতে পারেনি ও। আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ। ঘুরতে ঘুরতে সে-ও এই সময় আগ্রাতে! জীবনের অনেক কটা মাস, প্রায় ২। ৩ বছর রুবীর সঙ্গে একটা মিষ্টি সম্বন্ধ ছিল তার। কোলকাতার পথে পথে এখনো অনেক স্মৃতি। কিন্তু শামিম বুঝতে পেরেছিল তার মতো অল্প মাইনের সামান্য চাকরি করা একটা ছেলেকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়না রুবী। কথার ভাব ভঙ্গিতে তাও জানিয়ে দিয়েছিল এবং একদিন সরে গেছিল ওর জীবন থেকে। শামিমের কিছু করার ছিল না। কারণ সে তখন নিজের অর্থনৈতিক চিন্তায় ব্যস্ত। মনে হ'য়েছিল সত্যিই তো রুবীর আর কি দোষ! এমন লোকের সঙ্গে

এ যুগের কজন বুদ্ধিমতী মেয়েই বা ঘর বাঁধতে চায়।

—বিয়ে করেছ।

রুবী জিগ্যেস করলো।

—না! একটু হেসে জবাব দিল শামিম। মনে হচ্ছে কেমন যেন একটা দুষ্টু বুদ্ধি ওর মনে বাসা বাঁধছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। রুবীর ভীষণ ভয় করছিল। বুক কাঁপছিল। এখন যদি ফিরোজ ওঠে। তাকে এইভাবে এত রাতে এক জন ছেলের সঙ্গে ব্যালকনিতে গল্প করতে দেখে। অথচ কি করবে ভেবেও পাচ্ছিল না!

—যাক্‌গে শোন। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শামিম বললো, তাজমহল দেখতে এসেছ নিশ্চয়ই! তোমার তো অনেকদিনের সখ। মনে পড়ছে নিশ্চয়ই আমি বলছিলাম, বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে তাজমহল দেখতে যাবো, প্রথম তাজমহল দর্শন তুমি, আমি, অন্য কেউ নয়। মনে পড়ছে!

রুবী কিছু বললোনা।

—ভুলে যাওনি তা আমি জানি। বিয়ের পর পুরোণ প্রেমের কথা মেয়েরা ভুলে যেতে চেষ্টা করে। ধরা পড়লে বরকে বলে ওটা মোহ। ওর সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি। তবে আমি বিয়ে করলে বৌকে বলব, রুবীকে আমি ভালোবাসতাম, বুঝেছ!

—ছেলেরা যা পারে, মেয়েরা তা পারেনা।

—উল্টো কথা শুনছি মনে হচ্ছে! আজ কাল তো সব মেয়েরাই বলে ছেলেরা যা পারে মেয়েরাও তা পারে। এখন এমন কথা কেন সখি? যাক্‌গে স্টপ ইট্‌। খোদার ইচ্ছে পুরণ হ'য়েছে। আমাদের দুজনের দেখা হ'য়েছে অদ্ভুত ভাবে। তাজমহল আমরা একসঙ্গে দেখবো!

—এ্যাঁ!

—ঘাবড়িওনা। প্রতিজ্ঞা করেছ পুরণ করতে হবে। তোমার বরের সঙ্গে নয় আমার সঙ্গে সর্বপ্রথম তাজমহল দেখবে তুমি।

ভয়ে কেঁপে উঠলো রুবী। এ কি বলছে শামিম। এতদিন পর এভাবে ও দেখা দেবে ভাবতেও পারেনি। এড়িয়ে গেছিল নিজের ভালো ভেবে। কিন্তু হঠাৎ এইভাবে দেখা দিয়ে ওর দাবী জানাবে এ মনেও হয়নি কোনদিন। এখন কি করবে ভেবে পেলনা। ভীষণ কান্না পেল ওর। এবং ঐ সামান্য আলোয় ওর চোখের জলের দিকে চোখ পড়লো শামিমের।

—কাঁদছ মনে হচ্ছে। হুঁ! সেদিন আমিও কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিল আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ বলে তুমি আমার ভালোবাসাকে লাথি মেরে চলে গেছ। তাহ'লে ভালোবাসার আর এক নাম কি 'মানি'। আজ আমি ছাড়বো না! কখখনো না! আমার বাহুতে তোমার সেই ছবি যাতে লেখা আমার শমিমকে দিলাম। তোমার সেই নিজেকে উজাড় করে লেখা প্রেমপত্র—সব আছে। বুঝতেই পারছ তোমার অবস্থা। যাক তোমার সর্বনাশ করতে চাইনা। কিন্তু তাজমহলটা আমার সঙ্গে প্রথম দেখতে হবে তোমাকে!

কাল সকালে তো ফিরোজের সঙ্গে যাবে। খুব ভোরে। তার আগে আর সময় কই! রুবী ভেবে পেলনা কিছু। তার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল করছে। মনে হচ্ছে বাঘের সামনে পড়েছে সে। একদা যাকে দেখলে চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো, মনের ভেতর পুলক ছড়াতো, এখন তাকে দেখে ভয়ে বুক কাঁপছে!

—কি করে যাবো? কাল সকালেই তো ওর সঙ্গে—। ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বললো রুবী।

—হুঁ। কি যেন ভাবলো শামিম তারপর বললো, তাহ'লে এখুনি।

এ্যাঁ এই এত রাতে।

—এ ছাড়া প্রথম দর্শনের আর তো উপায় নেই। কাল ভোরেই তো তুমি দেখবে। আর তাহ'লেই সেটা পুরোন হয়ে গেল। আমি তা চাই না! অতএব—

—তোমার এ আবদার কি করে রাখা সম্ভব! আমাকে এমন বিপদে নাই বা ফেললে। কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

—এ কথা সেদিন যদি তুমি ভাবতে তাহ'লে তো ঝামেলাই চুকে যেত! অপেক্ষা করতে পারলে না। এই তো আমি আজ ভালো চাকরি করছি। তোমার বরের চেয়েও বেশী মাইনে পাই, বুঝেছ। অফিসের কাজেই এখানে আসা!

—আমাকে মাফ করো শামিম। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো রুবীর, আমার ঘর ভেঙ্গনা।

—ঘর ভাঙ্গলে ঘর হয় কিন্তু মন ভাঙ্গলে! আমার মন ভেঙ্গেছ তুমি?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো কবী! ও বোধ হয় বুঝতে পারছিল এর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার কোন উপায় নেই! রাত অনেক হ'য়েছে শীতটাও বাড়ছে! কবী বললো, কিন্তু হোটেল তো বন্ধ। পথেও গাড়ি নেই!

সব ব্যবস্থা করে ফেলছি!

—না হ'লে কি হয়না!

হাসলো শামিম, তুমি যেমন সেদিন নিষ্ঠুর হ'য়েছিলে আমাকেও আজ তা হ'তে হবে। তোমাদের মতো মেয়ে যারা ভালোবাসাকে স্পোর্টস্ মনে করে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত!···তাহ'লে যেতি। আমি ম্যানেজারকে বলছি গিয়ে!

শামিম! কবী দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো এবার। ও যদি জানতে পারে আমার সব শেষ হ'য়ে যাবে। এবার মাফ করো। দোষ করেছি অন্য শাস্তি দাও! কিন্তু এই রাতে—!

—হ্যাঁ এই রাতেই যেতে হবে।

ট্যাঁ! ভ্যাঁ! একটা বাচ্ছা ছেলের কান্না ভেসে এল শামিমের ঘর থেকে! কবী আর একবার অবাক হ'লো! শামিম হেসে উঠলো, ধ্যাৎ তেরি, এমন নাটকটাই নষ্ট করে দিল। তোমাকে একটু জ্বালাবো ভেবেছিলাম।

—কি হ'লো। কবীর চোখে মুখে প্রশ্ন তখন।

—বৌ। আর ছেলে।

—তোমার!

—আমার ঘরে অন্যের বৌ থাকবে নাকি! ইয়ে শোন এখুনি তো ঝি উঠে পড়বে। চলি। বেবলে কেলেঙ্কারি! কাল ভোরে বুঝলে—পা বাড়ালো শামিম—বৌকে পাঠাবো তোমার সঙ্গে ভাব করতে আর আমিও ফিরোজ সাহেবের সঙ্গে। মানে ইয়ে—পেছন ফিরে ঘর দেখলো শামিম—তোমার আমার সম্বন্ধে কেউ জানবে না অবশ্য। তারপর একসঙ্গে যাবো তাজমহল দেখতে। আমরা বিকেলে এসেছি। আমারো দেখা হয়নি তাজমহল। প্রতিজ্ঞাও পূরণ হবে-বুঝেছ···চলি।

ভ্যাঁ ভ্যাঁ! আবার শব্দটা শোনা গেল!

—ধ্যেৎ তেরি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলো শমিম। কবী অবাক! একটু পরেই ভীষণ হাসি পেল ওর। এতক্ষণ পর আবার তাজমহলটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ফিরোজের পাশে গিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করলো ও।

কিশোর জগৎ

ভক্তি ও ভগবান্

—শ্রীজ্ঞান

বাংলা দেশের পূজার মরশুম সুরু হয়ে গেছে। দেবী দুর্গার মহাপূজা সমাপ্ত হয়ে গেছে। মা লক্ষ্মীর পূজাও হয়ে গেছে। মহাকালীর পূজাও শেষ হল। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর পূজাও সমাগত। তারপর কিছুকাল বিরতির পর আসবে তোমাদের সবচেয়ে আদরের, সবচেয়ে আনন্দের অনুষ্ঠান মা সরস্বতীর পূজা।

এই সব পূজা অনুষ্ঠানে তোমাদের প্রায় সকলেই সক্রিয় অংশ নিয়ে থাক। চাঁদা আদায় করা, প্রতিমা সজ্জিত করা, আলোর রোশনাই করা, মাইকে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা, সেচ্ছাসেবকরূপে যানবাহন নিমন্ত্রণ করা, ইত্যাদি অনেক কাজই তোমরা সুসম্পন্ন করে থাক: এ-সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তোমরা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আজকালকার এই সব কর্ম্মঠ, প্রাণচঞ্চল কিশোর-কিশোরীদের কাজের প্রশংসা করেও একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হয় যে তোমরা পূজা বলতে বোধ হয় এই সব জাঁকজমক, আলোকসজ্জা এবং মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণের শিল্প কুশলতাকেই সব বলে মনে কর। তাই না? কিন্তু পূজা বলতে কি তাই বোঝায়? এ প্রশ্ন কি তোমাদের মনে উদয় হয়? মনে হয় কি যে পূজার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ভক্তি? ভক্তিবিহীন যে পূজা সে পূজা পূজাই নয়! কিন্তু সত্যকথা বলতে কি, আমার মনে হয়, আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই এই "পূজা" নামে একরূপ ভক্তিবিহীন পূজার অনুষ্ঠানই হয়ে থাকে। অবশ্য তোমরা বলবে যে কেন সকলেই তো ঠাকুরকে প্রণাম করে, পুষ্পাঞ্জলি দেয়। ঠিক কথা— প্রণাম অবশ্যই করা হয় এবং পুষ্পাঞ্জলিও দেওয়া

হয়। কিন্তু সত্যকার ভক্তি তাতে কতটা থাকে? প্রার্থনা অবশ্য থাকে—পাশ করিয়ে দাও, পরীক্ষায় যেন ভাল ফল করতে পারি, অমুকটা পাইয়ে দাও, অমুক বিষয়ে যেন সাফল্য লাভ করতে পারি, ইত্যাদি। কিন্তু প্রার্থনা তো ভক্তি নয়। ভক্তকে ভগবান সব কিছু দিয়ে থাকেন, কিন্তু ভক্তিহীন প্রার্থনা পূরণ করবেন কেন তোমরাই বল। তাই তোমাদের যত সব প্রার্থনা তা পূরণ করাতে হলে চাই আন্তরিক ভক্তি। ভক্তের ভক্তিই হচ্ছে ভগবানের সব চেয়ে বড় পূজা-উপচার। জাঁক-জমক-চৌলুষ এসব বাইরের ভড়ং। এতে ভগবান ভোলেন না। ভগবান শুধু ভোলেন ভক্তিতে। তোমরা সেই ভক্তি দিয়ে ভগবানের পূজা কর, দেখবে তোমাদের মনস্কামনা ভগবান পূর্ণ করবেন।

মেঘ-বাদলের খেলা

স্বপন বুড়ো

ঘোষক—দারুণ গ্রীষ্মের তাপে সারা দেশটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। নদী-নালা সরোবর আর পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলি রোদের তাপে ঝলসে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। গোটা দেশটার যেন পিপাসা পেয়েছে। তোমরা আবার কারা গো, নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে আসছ?

ছেলেমেয়েদের দল—আমরা দেশের ছেলে-মেয়ের দল—

(ছেলেমেয়েদের গান)

পিপাসাতে পরাণ যে যায় এক ফোঁটা জল চাই
নদী নালা সায়র পুকুর কোথাও যে জল নাই
হায় বিধাতা কি তাপ দিলে
গাছের পাতা শুকিয়ে নিলে
কোলের ছেলে কাঁদছে পাইয়ের বাঁটেতে
দুধ নাই
গলায় মোদের সুর জাগেনা কেমনে গান গাই?

ঘোষক—সারা দেশের ছেলেমেয়েরা পিপাসায় কাঁদছে। কোথাও পান করবার শীতল জল নেই। আকাশে বন্ধুর গমগম করে জ্বলছে। তোমরা আবার কারা গো? নানা রঙের ফুল না কী?

মেয়েরা—ঠিক বলেছ। গ্রীষ্মকালের ফুল।

(গ্রীষ্মকালের ফুলেদের গান)

মোরা গ্রীষ্মকালের ফুল
হালকা বায়ে সুবাস ছড়াই দুলি মোদুল দুল
এবার কি যে অনাসৃষ্টি
এক ফোঁটা নেই রে বৃষ্টি
তপ্ত তপন চোখে মুখে ফোঁটায় যেন হুল।
শাদন করার তরে মোরা স্বপ্ন দেখি রোজ
জল বিহনে মরছি, সবাই কেউ রাখেনা খোঁজ
আয়রে শ্যামল মেঘের ছায়া
দে বিছিয়ে মধুর মায়া
বর্ষারাণী এলেই মোদের ভাঙবে মনের ভুল।

ঘোষক—গ্রীষ্মকালের ফুলেরা ত' তাদের মনের কথা জানিয়ে চলে গেল। একি একি! আকাশে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে যে। সারাটা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল—মেঘদল যেন মাদল বাজাচ্ছে। (মেঘের গর্জন) সেই কালো মেঘের ভেতর দিয়ে সাদা মালার মত তোমরা কে ভেসে আসছ?

বলাকা—আমরা শ্বেত বলাকার দল। মেঘের ইসারা পেয়েছি তাই তো ঘরে ফিরে যাচ্ছি—

শ্বেতবলাকার গান

শ্বেতবলাকার মালা গাঁথি নিকষকালো মেঘে
ঝোড়ো হাওয়া আর না দেবে পক্ষীরাজের বেগে।
আমরা উড়ি দিক্‌বিদিকে
বৃষ্টি আসার গানটি লিখে
পাখায় মোদের বাদল ধারার ছন্দ আছে জেগে।

ঘোষক—শ্বেত বলাকার দল ঠিক সাদা মালার মতই উড়ে চলে গেল। ওরা বোধহয় বৃষ্টি আসার খবর পেয়েছে—তোমরা আবার কারা পেখম মেলে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছ?

ময়ূর দল—আমরা উত্তরবনের ময়ূর দল বর্ষারাণীর আসবার খবর পেয়েছি। তাই তো খবর পৌঁছে দিচ্ছি দোরে দোরে।

ময়ূরের গান

আমরা ময়ূর—মেঘের ডাকে পেখম ছড়াবো
ইন্দ্রধনুর রঙটি নিয়ে স্বপন গড়াবো
আসব মোরা কদম বনে
নাচবো মোরা সবার সনে
বর্ষারাণীকে আসার পথে মশাল ধরাবো।

ঘোষক—বা। বা। ময়ূরের নাচের কি অপরূপ দৃশ্য। আকাশে মেঘ জমেছে—তাই ময়ূরের দল পেখম তুলে নাচছে। গুরু গুরু মেঘের ডাক—বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আরো আরো মজার ব্যাপার—শিল পড়ছে. শিল—

শিল। হাঁা আমরা শিলের দল এগিয়ে এসেছি আকাশ থেকে।

(শিলদের গান)

শিল—শিল—শিল।
বরফের ডিম মোরা খোলা যে রে দিল!
তর্ তর্ করে নামি তীব্রগতি
বেলোয়াড়ি চুড়ি যেন—ঠুন্‌কো অতি।
আকাশের স্বপ্নের খুলে দিই খিল
শিল—শিল—শিল

ঘোষক—ছেলেমেয়ের দল ভিজে ভিজে শিল কুড়িয়ে নিচ্ছে—। কী মজা—কী মজা। আবার দেখছি ঝোড়ো হাওয়া উঠ্‌লো। তোমরা যে সবাই মাথা নাড়িয়ে দুলছ। কে তোমরা?

গাছের দল। আমরা বনের গাছের দল। ঝোড়ো হাওয়ায় আমাদের ডালপালা উড়ছে—

(গাছেদের গান)

আমাদের ডালপালা হাওয়ায় ওড়ে
শিকড় পারবে কি গো রাখতে ধরে
আসে ঝড় সন্ সন্
মাথা করে বন্ বন্
বাসুকীর ফণা যেন পাতাল ফোঁড়ে—
শিকড় পারবে কি গো রাখতে ধরে।
এলো মেলো হাওয়া বয় শাখা যে দোলে
বাসা বাঁধা পাখিগুলি রয়না কোলো।
ভাঙে শাখা দুদ্দাড়
সব ভেঙে চুড়মার
এ ঝড়ে পরাণ টাকে রাখে কে ধরে।

ঘোষক—ঝড়ের তাণ্ডবে বনের বড় বড় গাছ গুলি বৃষ্টি ভেজে গেল। (গাছ পড়ার শব্দ ঝড়ের শেষ—শো শব্দ—মেঘের গর্জন)

তোমরা আবার কারা নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছ?

বৃষ্টি ধারা—আমরা বৃষ্টিধারা। তপ্তধরণীকে আমরা শীতল করবো। তাইতো আমরা এগিয়ে এলাম ঝম্ ঝম্ শব্দে।

(বৃষ্টির ছড়া)

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
আর বৃষ্টি জোরে
পয়না দেব তোরে
আয় বৃষ্টি নেমে
উঠবি তবে থেমে।
আয় বৃষ্টি ধীরে
ভরবো বাটি ক্ষীরে।
আয় বৃষ্টি কাছে
তবেই পরান্ বাঁচে
আয় বৃষ্টি আয়
মেঘ যে ডেকে যায়।

(মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির শব্দ)

ঘোষক—এইবার বনে বনান্তরে পাহাড়ের বুকে নদী নালায় বৃষ্টির মাতামাতি সুরু হল। ভাসিয়ে নিয়ে গেল মানুষের ঘর বাড়ী খোকা খুকুর খেলাঘর গেল ভেসে। দুরন্ত বর্ষারাণী এবার জেগেছে। তোমরা দুটী কারা এই মাতামাতির ভেতর গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছ?

কদম-কেয়া। আমরা কদম আর কেয়া। বর্ষার মধুর পরশে মাটি মায়ের স্নেহে জেগে উঠেছে

কদম-কেয়ার গান

আমরা যে গো কদম-কেয়া বর্ষারাণীর ফুল
ঝরো ঝরো বরিষণেই, দুলে যে দোদুল দুল।
ভালোবাসী বাদল ধারা—
তাতেই পরাণ আপন হারা
বরষণের পরশমেই ভাঙবে মনের ভুল॥

ঘোষক। তোমরা আবার কারা এলে ভিজতে ভিজতে? তোমাদের এলোচুল বেয়ে জল ঝরছে।

মেয়ের দল—আমরা ধরার মেয়ে। বাদল ধারাকে বরণ করে নিতে এসেছি। যা কিছু

জঞ্জাল সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে—বৃষ্টি ধারা। মেদিনী আবার শ্যামল হবে। শুকনো মাটি আবার সোনার ফসল ফলাবে—মানুষ আবার নতুন করে বাঁচবে—

ঘোষক—তাহলে ধরার মেয়ের দল, শোনাও তোমাদের গান—। বৃষ্টিধারাও যোগ দাও সেই সঙ্গে

(বৃষ্টি ধারার গান)

(ধরার মেয়ের গান)

(সমবেত গান)

ঝমঝম ঝরঝম
হরদম বৃষ্টি
ভাসে মাঠ ভাসে ঘাট
ভেসে যায় সৃষ্টি
নদী নালা খাল বিল
পুকুর যে ডুবল
ভেজে খোকা, ভেজে খুকি
শুধু গায় ছুবলো !
ঝমঝম হরদম জল শুধু ঝরছে—
কেয়া বনে টুপটাপ জল ঝরা পড়ছে।
পুলকেতে ভেজে চাষী ভিজে মাটী পেয়েগো
ক্ষণে ক্ষণে আনমনে উঠছে সে গেয়ে গো
কলসীর দলগুলি চোখ মেলে জাগছে
ছেলেদের ঘরে ঘরে কোলাহল লাগছে।
কেবা আজ নৌকায় তুলে দেয় সাদা পাল
থাকিস নে বসে কেউ ফেলো দাঁড় ধরো হাল।

স্মৃতি পূজা

শ্রীকিরণচন্দ্র শুকুল

•সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপি সাধনা তোমার
•খর স্রোতা নদী সম চির অফুরান্—
•সলিত কলার চর্চা, সাহিত্য সেবায়
•তাহাই কিশোর লাগি নিবেদিত প্রাণ।
•রাখিবে তোমার সৃষ্টি তব পুণ্য নাম
•ওগো শিশু—মরমিয়া তোমারে প্রণাম।

•কবিতাটির প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষরগুলি পর পর সাজিয়ে নিলে যে নাম পাওয়া যাবে, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশেই কবিতাটি লিখিত হয়েছে।

মাছেদের ঘ্রাণ শক্তি

গৌর আদক

বছরের অন্যান্য সময় অপেক্ষা বর্ষার সময়েই সব চেয়ে বেশী লোককে হাতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যেতে দেখা যায়। সেদিন আমাদের পাড়ার অমলেন্দুদাকেও এমনিই হাতে ছিপ নিয়ে যেতে দেখলাম, যাবার সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, অমলেন্দুদা আজ কোথায় যাচ্ছেন? এই ভাই একটু চাম্পাহাটি যাবো; আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। এই কথা বলেই অমলেন্দুদা হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটতে লাগলেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনের দিকে।

মনে মনে ভাবলেম এই এক পাগল লোক। মাছ ধরার এমনই বাতিক যে, জল নেই বড় নেই হাতে ছিপ নিয়ে চলেছে মাছ ধরতে। আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশু ওখানে, এ যেন লেগেই আছে। এটা যেন তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

মাছ ধরাটা যেমন তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে, তেমনি মাছ ধরতেও তিনি খুব পটু। এমন সুন্দর ভাবে তিনি চার ও টোপ তৈরি করেন যে পুকুরের মাছ চারের গন্ধে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে আসে।

কিন্তু এখন তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শুনেছি জলের মধ্যে তো বাতাস নেই কিন্তু কেমন করে তারা এই গন্ধ অনুভব করে? এটা খুবই সত্য কথা যে জলের মধ্যে বাতাস নেই কিন্তু তবু তারা কি করে বিভিন্ন গন্ধ অনুভব করে। এটা শুধু তোমাদেরই প্রশ্ন নয়, যাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ হাতে নিয়ে পুকুর ধারে সাদা ফাতনার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, তাঁদেরও প্রশ্ন বলা চলে; কেননা আমার মনে হয় তাঁরাও বোধ হয় এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। তাঁরা শুধু মাছ শিকার করে তার সার নিবারণই করে থাকেন। মাছ শিকার করে তার সার নিবারণ করলেই মাছ সম্বন্ধে সব কিছু জানা যায় না। মাছ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার আছে তার মধ্যে মাছেদের গন্ধ অনুভব করার কারণটিও একটি।

পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও যত প্রকার জীব-জন্তু আছে তারা সকলেই নাকের সাহায্যে ঘ্রাণ শক্তি অনুভব করে

কিন্তু মাছের বেলায়, তাদের ঘ্রাণ শক্তি অনুভব করার জন্য ভগবান তাদের একটা আলাদা শক্তি দিয়েছেন। তাদের মাথার ঠিক উপরেই দুটি গন্ধ বহন শিরা আছে সেই শিরার দ্বারাই মাছেরা ঘ্রাণ শক্তি অনুভব করে। এখন তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে তবে কি মাছেদের নাক নেই? মাছেদের নাক আছে ঠিকই তবে তারা নাকদিয়ে ঘ্রাণ শক্তি অনুভব করে না। মাথার উপরকার শিরার দ্বারাই তারা গন্ধ অনুভব করে। মাছেদের ঘ্রাণ শক্তি অন্যান্য জীব-জন্তু অপেক্ষা ভীষণ প্রবল; বহুদূর থেকেই এরা যে কোন গন্ধ অনুভব করতে পারে। বিশেষ করে নদীর ছোট ছোট মাছেরা ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা দূরের বিপদ আপদ ও খাদ্য সম্পর্কে অনুমান করতে পারে, আবার তেমনি নিজের দলের কে কোথায় আছে বা কাছা কাছি কোন শত্রু আছে কিনা তাও অনুমান করতে পারে। এছাড়া মাছেদের মধ্যে যদি কোন মাছ কোন রকম ভাবে আহত হয় সেই আহত স্থান থেকে তারা এমন এক প্রকার গন্ধ নির্গত করতে থাকে যে সেই গন্ধ অনুভব করেই মাছেরা কাছা কাছি কোন বিপদের আশঙ্কা অনুমান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা সাবধান হয়ে যায়।

পৃথিবীতে যত রকমের মাছ আছে সব মাছের কিন্তু ঘ্রাণ শক্তি এক রকম নয়, বিভিন্ন মাছের বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারো কম কারো বেশী তবে, যে সমস্ত মাছ সবচেয়ে কম ঘ্রাণশক্তি অনুভব করে, তাদের ঘ্রাণশক্তি কিন্তু পৃথিবীর যে কোন জীব-জন্তু অপেক্ষা অনেক বেশী।

মাছেদের ঘ্রাণ শক্তি সম্বন্ধে প্রমাণ করতে গিয়ে জার্মান প্রাণী-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফনফ্রিস অনুমান করেন যে, মাছেরা নাক দিয়েই ঘ্রাণ অনুভব করে, তবে তাঁর এই প্রমাণটি কিন্তু অনুমানই বলা চলে।

অচিন পথের যাত্রী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

গটেনবার্গ বন্দর থেকে স্পিজবার্জেন দ্বীপ অনেক দূরের পথ। এত্রি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে "ভির্গো" জাহাজের ডেকে বসে সেই জলপথ অতিক্রম করছিলেন তাঁরা বেলুন যাত্রাকালীন সমস্যা আলোচনা করে। কখনো ডেকের উপর বসে তাঁরা অন্তহীন জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকেন; আবার কখনও আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকে সাদা কালো মেঘের অপরূপ দৃশ্যের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন। রুপালি ঢেউয়ের উপর সূর্য্যের সোনালী রোদ জলের উপর নেচে নেচে খেলে; দেখে দেখে তাঁদের চোখ যেন ভরে যায়।

প্রথম কয়েকদিন নির্ব্বিঘ্নেই কেটে গেল। তারপর একদিন ভোর থেকেই আকাশের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলো। সমুদ্রের সুদূর দক্ষিণাংশে বিপুল জ্যোতিচ্ছটা দেখা যেতে লাগলো। জাহাজের নায়েক অনেকক্ষণ ধরে চারিদিক লক্ষ্য করে এত্রিকে বললেন—"আশঙ্কা হচ্ছে প্রবল ঝড় আসছে।"

এত্রি বললেন—"ক্ষতি কি! ঝড়ে আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকেই নিয়ে যাবে। আমাদের সময় বাঁচবে।"

একথা শোনার পর নায়েকের মুখে আর কথা বেরুল না।

ঝড় এলো। যেমন ভীষণ ঝড়—তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি, বৃষ্টির জল যেন বরফের মত শক্ত। জাহাজের ডেকে পড়ে সেই বরফ ছিটকে এসে যাত্রী আর নাবিকদের চোখে মুখে লাগতে লাগলো। এমন দুর্য্যোগ বুঝি কেউ কখনো দেখেনি। বাতাসের এমন হাহাকার বুঝি আর কেউ শোনেনি। আর কী ভীষণ সমুদ্রের ঢেউ! পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ বারে বারে এসে "ভির্গো" জাহাজকে গ্রাস করার চেষ্টা করতে লাগলো; আবার এক একবার ঢেউ এর স্পর্শত্যাগ করে জাহাজ শূন্যে উঠতে লাগলো। কিন্তু "ভর্গো"জাহাজ ডুবলো না, তুফানে বক্ষ বেগে অগ্রসর হতে লাগলো।

রাত্রিবেলা যখন ঝড়ের বেগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলো, তখন সাহেব অন্যান্য নাবিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এণ্ড্রিকে বললেন—"আমার মনে হয় কাছের কোন বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো ভালো। নতুন বিপদ ঘটতে পারে।"

এণ্ড্রি বললেন—"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন বন্দরে যাবো?"

এণ্ড্রি বললেন "আমি তো শুধু একটা বন্দরের নাম-ই জানি। সেটা স্পিজবার্জেন।"

উত্তর শুনে সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—"তাই হবে। আমরা স্পিজবার্জেন বন্দরেই যাবো।"

"ভির্গো" জাহাজ যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলল। দুইবার ডুবতে ডুবতে বেঁচেও গেল। কিন্তু জাহাজের ছাদের একদিকটা উড়ে গেল! প্রভাতে বাতাসের বেগ ক'মে এল—আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হল। এণ্ড্রি বললেন—"আমরা সময় মতই পৌঁছে যাব মনে হচ্ছে।"

এণ্ড্রির অনুমান মিথ্যা হলো না। ক্রমে একদিন "ভির্গো" জাহাজ নির্বিঘ্নে এসে স্পিজবার্জেন বন্দরে নোঙর ফেলল।

এণ্ড্রির ধারণা হলো, তাঁর অভিযান ব্যর্থ হবে না। মেরুর বুকে প্রথম পড়বে একজন সুইডেনবাসীর পায়ের চিহ্ন, উড়বে সুইডেনের জাতীয় পতাকা মেরুর আকাশে বাতাসে। মনের আনন্দে তিনি তাঁর মাকে লিখলেন—

"যে রকম নির্বিঘ্নে সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হচ্ছে, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাগবানের দয়ায় আমরা জয় গৌরব নিয়ে ফিরবো—সেদিন খুব দূর নয়…।"

এণ্ড্রির অনুমান মিথ্যা হয় নি। তিনি শুধু জানতেন না প্রথম প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; আর তিনি যখন সগৌরবে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন রাজোচিত মর্যাদায় তখন তাঁর স্নেহে জীবন থাকবে না।

স্পিজবার্জেন বন্দরে পৌঁছেই জাহাজ থেকে জিনিষ পত্র নামানো আরম্ভ হলো। নামানো হলো জামা কাপড়, বিছানাপত্র, যন্ত্রপাতি খাদ্যদ্রব্য আর গুলিবারুদ ও বন্দুক। সবশেষে নামানো হলো অতিকায় বেলুন ঈগলকে।

ধীরে ধীরে "ঈগলের" কাঁপা জায়গায় গ্যাস পূর্ণ করা হ'লো—ফুলে ফেঁপে বেলুন আকাশের গায়ে দুলতে লাগলো—নিবিড়ে ঘোতলা গণ্ডোলা বেলুনে বেঁধে তাতে যাত্রীদের জিনিষপত্র তোলা হ'লো—যথারীতি সাজানোও হ'য়ে গেল সে সব। আকাশের বাতাসকে যাতে নিজের সুবিধা মত কাজে লাগাতে পারেন—যাতে বেলুনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের পথে নিতে পারেন—সেজন্য এণ্ড্রি বেলুনের গায়ে তিন দিকে তিনখানা পাল বেঁধে দিলেন। সুইডেনের জাতীয় পতাকাও বাঁধা হল একখানা বেলুনের গায়ে।

আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো, "ঈগল" বেলুন আকাশের গায়ে দুলে দুলে উড়তে লাগলো—বাঁধন খুলে দিলেই বেলুন উড়ে যাবে ভাল ভাবে আকাশে উঠে সুমেরুর দিকে রওনা হ'তে পারে, তার সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত ভাবে করা হলো।

কিন্তু যাত্রা করা আর হলো না।

ক্রমে বাতাস একেবারেই থেমে গেল। যে বাতাস তীব্র বেগে আগের কয়েকদিন বয়েছিল, যার বেগে ভির্গো জাহাজের ছাদও উড়ে নিয়েছিল, সমুদ্রে এত ঢেউ উঠেছিল, তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। যাত্রী দল তখন প্রার্থনা করছিলেন বাতাস—বাতাস আর একটু বাতাস!

কিন্তু তাঁদের আশা পূর্ণ হ'লো না! সামান্য বাতাস যা-ও বা দেখা দিল, তা তাঁদের উদ্দেশ্যের সহায়ক নয়; যে দিকে থেকে জোড় হাওয়া বইলে সুমেরুর দিকে যাওয়া যেতো, তা পাওয়া গেল না।

স্ট্রীণবার্গ আর ফ্রেণকেল ক্ষোভে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলেন, তাঁরা এণ্ড্রির দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাইলেন। এণ্ড্রিও তাঁদের দিকে একবার তাকালেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি ধীর, স্থির, ক্ষোভ কলঙ্ক শূন্য—সে দৃষ্টির মধ্যে উদ্বেগের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

এইভাবে কয়েকদিন কাটলো। আকাঙ্ক্ষিত বাতাসের দেখা পাওয়া গেল না। ক্রমে যাত্রার সময় বয়ে গেল; যে সময়ে রওনা দিলে শীতঋতুর পূর্ব্বেই সুমেরু পৌঁছে ফিরে আসার চেষ্টা করা যেত, সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে

গেল। ধীর নিষ্কম্প স্বরে এণ্ড্রি বল্‌লেন—"এবার ফিরতে হবে ; সুইডেনে।

ষ্টীণবার্গ আর ক্লেণকেন দুইহাতে আপন আপন মাথা চেপে ধরলেন, সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁদের সম্মুখে ঘুরতে লাগলো। তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তাঁরা এণ্ড্রির দিকে তাকাতে পর্য্যন্ত পারলেন না। শুধু ভাব্‌লেন—"কী শোচনীয় পরাজয়! এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

কিন্তু যিনি যেখানে বিরূপ, মানুষ সেখানে কি করতে পারে?

নিরুপায় এণ্ড্রি বেলুন থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে তারে তাতে আবার তা' জাহাজে তুল্‌তে লাগলেন,—হুড়ির থৈ, মশাল, কুড়াল, খন্তা, গুলিগোলা, খাদ্যদ্রব্য সবই বেলুন থেকে নামিয়ে জাহাজে তোলা হলো। সবশেষে বেলুনের মুখ কেটে গ্যাস বের করে দেওয়া হলো, তাঁজ করে বেলুনটাকেও জাহাজে তোলা হ'ল। সব জিনিষ তোলা হ'লে এণ্ড্রি বল্‌লেন—"ছাড়ো জাহাজ! দেশে ফিরে চলো।

প্রথমপ্রচেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে নিতান্ত শুষ্ক মনে মুখ নীচু ক'রে এণ্ড্রি দেশে এলেন। জয়ধ্বনি হ'ল না। কেউ জয়মাল্যও দিল না। এণ্ড্রির বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা বল্‌তে লাগ্‌লো—"দেখ্‌লে তো! এমন যে হবে তা'ত আমরা আগেই জানি!"

প্রথম সুযোগ ব্যর্থ হ'য়ে গেলেও এণ্ড্রি হতাশ হলেন না। দিনের পর দিন নিখুঁত হিসেব করে সমস্ত পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় ভুলত্রুটীর সংশোধন ক'রে নূতন ক'রে যাত্রার আয়োজন করলেন তিনি। ষ্টীণবার্গ আর ক্লেণকেনও তাঁর সঙ্গে ছাড়লেন না। তাঁরা ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক, যাঁরা কথা বলেন কম—কাজ করেন বেশী।

ইউরোপের নানা দেশ এণ্ড্রির প্রচেষ্টাকে, প্রথম ব্যর্থতাকে নিন্দা কুৎসার গ্লানিতে ভরিয়ে তুললো। তারা প্রচার করলো একবারে আশা মত টাকা পাওয়া যায় নি, তাই আর একবার ধোঁকা দিয়ে টাকা আদায় করতে আছেন এণ্ড্রি!

কিন্তু অন্যে যে যাই বলুক—সুইডেন তার বীরপুত্র এণ্ড্রিকে খুব ভাল ক'রেই চিন্‌তো। তাই দ্বিতীয়বার যাত্রা করবার সময় আবার যতটাকার দরকার হ'লো, তা' অতি অল্পদিনের মধ্যেই উঠে গেল।

গটেনবার্গ বন্দরে এসে এণ্ড্রি শেষবারের মতো শুধু শুধু ক'রে সমস্ত আয়োজন মিলিয়ে দেখে নিলেন,... সব ঠিক আছে, এবার সোজা গন্তব্যের দিকে।

এক বছর পরে জাহাজ ছাড়বার মুখে এণ্ড্রি একখানা চিঠি লিখ্‌লেন তাঁর মাকে—"আমার জন্য চিন্তা ক'রো না। তোমার স্নেহময় মমতাভরা চোখ তো সারা সময়ই আমার দিকে চেয়ে আছে। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তুমি ভেবো না মা। তোমার আশীর্ব্বাদে সফল আমি হবোই। আর সুমেরুটী জয় ক'রে সেই গৌরবের মুকুট তোমার পায়ে এনে দেবো!"

জাহাজ আবার যথাসময়ে এসে স্পিৎসবার্জেন বন্দরে নোঙর ফেলল। আবার জিনিষপত্র সবই জাহাজ থেকে নামানো হ'লো। অতিকায় বেলুন "ঈগলকে" মাটীতে নামানো হ'লো। তার নীচে গণ্ডোলা বাঁধা হ'লো—গ্যাসে পরিপূর্ণ হ'য়ে বেলুন আকাশে উড়তে লাগলো, জিনিষ পত্র সব গণ্ডোলায় তুলে যাত্রীদল রওনা হ'বার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

আকাশ পথে বেলুনে ভ্রমণ নিশ্চিন্ত যাত্রা। নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক যাত্রীরা দূরবীন তুলে দেখ্‌লেন। মেরু-মন্ত্রী রাত্রির আলোয় ঐ দূরে ঝিক ঝিক করছে তুষার মহাদেশের প্রান্তরেখা। আশায় উদ্বেল হলো তাঁদের মন।

তবুও তাঁদের যাত্রা পথে বাধা পড়লো—এলো প্রকৃতির এক নূতন বাধা! ঝড়ের বেগে বাতাস এলো উত্তর-পূর্ব্ব কোণ থেকে—অর্থাৎ সুমেরুর বিপরীত দিক থেকে।

যাত্রীরা প্রমাদ গণলেন। (ক্রমশঃ)

সুলতার মন

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

আগে কিছুই বোঝা যায়নি।

বিয়ের আগে দু'বার দেখেছিল সুকান্ত। প্রথম বার একা আর দ্বিতীয় বার বৌদি আর বাচ্চাদিকে সঙ্গে নিয়ে সুলতাকে দেখতে এসে ছিল। সুন্দর চেহারা। চেহারার মধ্যে কোথাও একবিন্দুও অশুভ চিহ্ন তারা কেউ খুঁজে পায়নি। খুঁজে পায়নি সুকান্ত ফুলসজ্জার মধুর রাতে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম রাত হাসি গল্পর ভেতর দিয়ে সকালের রোদের বুড়ি তাদের ছুঁইয়ে দিয়েছিল। কথা বলার ক্লান্তির ঢল যখন তাদের ঠোঁট জোড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, তখন একটি ঠোঁট হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর ঠোঁটের বুকের ওপরে। প্রথম পাওয়ার আনন্দে বুঁজে ছিল চোখের পাতা। এমনি লঘুছোঁয়া দিয়েই চারটে রাতকে দিন করেছিল সুকান্ত আর সুলতা। বিয়ের পরে এমনি সহজ ছবি ঘটতে পারে ভাবেনি দিদি বৌদিরা। আসল ছবি দেখে তাই তাদের মনের সলতে নিবে এসেছিল। মন-মরা মন নিয়ে তাই সবাই আড়ি পাতার ডিউটি ছেড়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে খিল এঁটেছিল।

পঞ্চম রাতে সুলতার পাশে শুয়ে সুকান্ত বুঝেছিল আজ দরজার ঠিক ওপাশে খুট খাট শব্দ আর কিলকিলে হাসি জেগে নেই। তবুও সঠিক জানার তাগিদে নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে আচমকা ভাবে দরজাটা একটানে খুলে হাট করেছিল। বেরোতে না পারা নেংটি ইঁদুরটা থালি এক ছুঁটে মিলিয়ে গিয়েছিল ফাঁকা দালানের মধ্যে।

মুচকি হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করেছিল সুকান্ত। ফিরে এসেছিল, খাটে শুয়ে পড়েছিল সুলতার কোল ঘেঁসে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা সুলতার দেহটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল নিজের দেহের ওপরে। সুলতার বুকের কাছে হাত জোড়াটা এসে আঁকুপাঁকু করে উঠেছিল। শাড়ীর বেশ কিছুটা অংশ খসে পড়েছিল, নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল ব্লাউজের একটা টিপকল। 'তুমি ভারী অসভ্য,' বলে সুলতা নিজেকে ছাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু তার কৃত্রিম চেষ্টা চাপা পড়েছিল স্বামীর আকর্ষণ দমনে। তালগোল পাকানো দেহটা তাই কেমন যেন সুকান্তর দেহের নীচে চাপা পড়তে বসেছিল। আলো আঁধারে ডোবা কড়িকাঠগুলো আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করেছিল সুলতার মনের মধ্যে। মাথা ঘোরার ভাবেই গুলিয়ে উঠেছিল গাটা। বমি বমি ভাবটা চাপা দেবারজন্যই স্বামীর বুকে মুখটা চেপে ধরেছিল সে। এতে বমিভাবটা কেটে ছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই শুরু হয়েছিল কাশি। ছোট এক টুকরো কাশি নয়। বড় বড় টানা টানা কাশি একটানে কেশেই চলেছিল সুলতা।

স্বামীর দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বাথরুমে গিয়েছিল সুলতা। বেসিনটা আঁকড়ে ধরে কয়েকমুহূর্ত কাসার পরই ফল পেয়েছিল, খানিকটা তাজা রক্ত ঝলকে ঝলকে ছিটিয়ে পড়ে ছিল সাদা বেসিনটার ওপরে। এক চিলতে রক্ত কল থেকে গড়িয়ে এসে থেমেছিল থুতনির নীচে। কাশির কষ্টে নেমে আসা চোখের জলটা নেমেছিল আরও নীচে।

চোখের সামনে তাজা রক্ত দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিল সুলতা। তাড়াতাড়ি বেসিনের ওপর

থেকে চোখটা তুলে নিয়েছিল। চোখের সামনে বড় আয়নাটার ওপরে নিজের প্রতিচ্ছবির কণ্ঠে রক্ত দেখে প্রচণ্ড ভয়ে সে আরও বেশী কুঁকড়ে যেতে বসেছিল।

দালানে পায়ের শব্দ পেয়ে সুলতা তাড়াতাড়ি বেসিনের কলটা খুলে মুখটা ধুয়ে নিয়েছিল। রক্তটা চালান করে দিয়েছিল নর্দমার মধ্যে। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সুকান্তর সাথে ফিরে গিয়েছিল ঘরে। স্বামীকে ও কিছু নয়, কাশির জন্য সামান্য বমি হয়ে গেল। বাসি মাছ খাওয়াতে বোধ হয় অম্বল হয়েছে,' বললেও নিজের মনকে কোন সান্ত্বনার কথা বলতে পারলো না সুলতা। মুখ থেকে তাজা রক্ত ঝরেছে, সেতো সাংঘাতিক কাণ্ড! তার এতো সুন্দর দেহের ভেতর ও রকম কুৎসিৎ কোন রোগ থাকতে পারে সেটা বিশ্বাসই করা যায় না। অবিশ্বাসী মন তাই বিশ্বাসীমনকে বুঝিয়ে রায় দিল 'ও কিছু নয়, কাসতে কাসতে গলা চিরে গিয়ে রক্ত ঝরেছে। এতে এতো ভয় পাবার কি আছে? সুলতা খানিকটা আশ্বস্ত হতেই তার ক্লান্ত দেহটা মনের অজান্তেই এলিয়ে পড়ে ছিল ঘুমের কোলে।

শুধু একটি রাতের একবারের ঘটনা নয়। পরবর্ত্তী দিনে ঘটল আবার সেই একই ঘটনা। বিকালে বড়জার কাছে বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল কাশির তাণ্ডব নৃত্য। কালকের ঘটনা ঘটবে ভেবেই সুলতা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চেপে ধরল মুখটা। মুখ চাপলেও রক্ত থামল না। কালকের মতনই খানিকটা তাজা রক্ত গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিল সুলতার শাড়ীর আঁচলের খুঁট। ঐ অবস্থায় শাড়ীটা জড়োসড়ো করে উঠে পালাতে চাইল সে কিন্তু পালাতে সে পারল না: পুলিশ চোর ধরার মতই সে বন্দী হয়ে ধরা পড়ে গেল বড়'জার হাতে।

কথাটা কানে যেতেই হাতে পা ছুঁড়ে মড়া কান্না শুরু করে দিয়েছিলেন বাসন্তী দেবী। টানা ঘণ্টা কয়েক জুড়ে কান্নার রোল ওঠা নামা করেছিল। রাত্রে সুকান্ত বাড়ী ফিরলে তার কাছে সমস্ত ব্যাখ্যা করে তবে তাঁর কান্না থেমেছিল। মায়ের মুখ থেকে এতো কথা শুনে একটা কথারও উত্তর দেয়নি সুকান্ত। শুধু তার মুখটা ক্রমশঃ বাসি মাছের রঙে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারী পা জোড়াকে কোন ক্রমে হেঁচড়ে টেনে নিয়েগিয়েছিল নিজের ঘরের দিকে।

বিছানার ওপরে উপুর হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল সুলতা। পেছনে সুকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে বুঝেও সে মুখ তুলে তাকায়নি। স্থির ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সুকান্ত। পরে আস্তে করে এগিয়ে গিয়ে হাতটা রেখেছিল স্ত্রীর পিঠের ওপরে।

কূল ভাঙ্গা বন্যার মতন স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুলতা। বন্যার প্লাবনে প্লাবিত উচ্ছল জলধারার মতন তার অশ্রুর ধারা ফুলে-ফুলে কেঁপে কেঁপে কেঁকিয়ে উঠছিল। নিজের বুকের ওপর থেকে স্ত্রীর মাথাটা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরেছিল সুকান্ত। মুখের সামনে মুখটা এনে সান্ত্বনার সুরে বলেছিল, 'এতে ভয় পাবার কি আছে? কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আনবো'।

পরপর দু'জন ডাক্তারই পরীক্ষা করে একই রায় দিলেন। আর তাদের রায় অনুযায়ী কদিনই হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়ে গেল সুলতা। মাত্র পাঁচ পাঁচটা দিন শ্বশুর বাড়ীর ঘর করার পর পুরো পাঁচ মাসের জন্য হাসপাতালের ঘরে বন্দিনী হয়ে বসল সে। সামান্য একটা স্পট নয়, এক্সরে যন্ত্রে যা ধরা পড়েছে তা মারাত্মক ব্যাপার। দু'লাঙ্গেই বেশ খানিকটা করে ঘা দগদগ করছে। এ রোগ সহজে সারবার নয়। একে সারাতে হলে প্রয়োজন প্রচুর ওষুধ আর অনেক পথ্যের।

অর্থের ব্যাপারে কোন কার্পণ্যকেই মনে স্থান দিল না সুকান্ত। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্তই সে ব্যয় করে বসল হাসি মুখে। সাত কাজের মধ্যেও প্রতিদিন ট্রাম বাসে যুদ্ধ করতে করতে ছুটে আসে হাসপাতালে। ছোট্ট টুসটাকে যতদূর সম্ভব বিছানার কাছে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বসে সুলতার কোল ঘেঁসে। বহুদিনের দাম্পত্য জীবনের মতনই লঘু হাসি ঠাট্টায় ভরিয়ে তোলে সুলতার সহজ মনের ফুলের ডালিকে। তার এই এক ঘণ্টার সান্নিধ্য তাই সুলতার মনে বেশ কয়েক ঘণ্টার মধুর রেশ তানপুরার সুর বাজায়। ডাক্তারী অভিধানে যে সুর শোনার একান্ত প্রয়োজন যক্ষ্মা রোগীদের। এ রোগ যে শুধু দেহের নয়, মনেরও

বটে। মনকে তাই সহজ করে রাখলেই সহজ ভাবে এ রোগ সারতে শুরু করবে।

মাসখানেক যেতে না যেতেই ধীরে ধীরে সারতে শুরু করেছে সুলতা। এখন তাই হাসপাতালের অনুমতি নিয়ে ছুটির দিন সে খানিকটা বেড়াতে যায় সুকান্তর সঙ্গে।

আজ রবিবার। কাল যাবার সময় সুকান্ত বলে গেছে আজ পরেশনাথ মন্দিরে বেড়াতে যাবে তারা। স্বামীর কথামত ঠিক সময়ে সুলতা সাড়ী বদলে, মুখে প্রসাধনের প্রলেপ এঁকে তৈরী হয়ে নিল। তখনও চারটে বাজতে কিছু বাকি আছে, সুকান্ত আসার সময়ও তখন হয়নি; কিন্তু সে না এলেও বিনা নোটিশে বৃষ্টি এসে গেল আকাশ কালো করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সুলতা বুঝলো আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না। বেড়ানো তো চুলোয় যাক্ এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সুকান্ত কেমন করে আসবে সেই কথাই ভাবতে বসে সুলতার মুখটা বাইরের আকাশের মতন কালো হয়ে উঠলো। চোখের কোণে চিকি-মিকি বেদনা জাগলো। 'কি এখনও তুমি তৈরী হওনি'? কাক-ভেজা হয়ে সুলতার পেছন থেকে ডাক দিয়ে তার আনমনা মনটাকে চমকে দিল সুকান্ত।

'একি তুমি কখন এলে? বৃষ্টিতে কি সাংঘাতিক ভিজেছো তুমি।' সুলতার মেঘকালো মনের ওপরে আনন্দের বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো।

'বৃষ্টি কই'? কপট অবাকে ভেঙ্গে পড়ল সুকান্ত।

'ওগুলো তাহলে বুঝি রোদ করছে,' জানালার গরাদের মাঝে চোখ ঘোরালো সুলতা। নতুন কিছু দেখার লোভেই যেন স্ত্রীর চোখের সাথে নিজের চোখ জোড়াকেও বাইরের দিকে চালান করতে চাইল সুকান্ত। আচমকা ভাবে যেন একমুঠো অবাক বিস্ময় ঝলকে ঝলকে গড়িয়ে পড়ল সুকান্তর মন থেকে। মনটা তার জানলা অবধি যায়নি। ঠিক জানলার আগেই এসে থেমে গেছে। থেমে গেছে বাইশ নম্বর বেডের পেসেণ্টের ওপরে এসে। এতোদিন বাদে জয়ন্তীকে এমন কঙ্কালসার রূপে এই হাসপাতালে দেখবে তা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেনি সুকান্ত। তাই বেশ কয়েক বছর বাদে সে আবার জয়ন্তীকে নিয়ে ভাবতে বসল। বাইরের বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা-গুলো যেন এক একটা প্রশ্ন হয়ে সুকান্তর মনের মধ্যে ঝরতে লাগল। ঝরা প্রশ্নগুলো অবশেষে জমে গিয়ে মনের নর্দমা বন্ধ করে তার বুদ্ধি চিন্তার ভাণ্ডারে জল ঢুকিয়ে ছাড়ল।

সুলতা স্বামীকে লক্ষ্য করল। তার মনের আনমনা ছবিটা পড়ে নিয়ে তার চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে তাকালো জয়ন্তীর দিকে। জয়ন্তীর কিন্তু কোন দিকে হুঁস নেই। আধবোজা চোখ জোড়াটা কড়িকাঠের ওপরে ছেড়ে দিয়ে কি যেন বিড় বিড় করে সে বকে চলেছে আপন মনে।

যে কথার সুর দিয়ে সুকান্ত কথা বলতে-বলতে ঢুকেছিল সে সুরটা যেন ধীরে ধীরে বেসুরো ভাবে সুলতার কানে বাজতে লাগল। মুখে অসংলগ্ন কথা বললেও তার স্বামীর চোখটা যে ঐ বাইশ নম্বর বেডের ওপর নিবদ্ধ সেটা বেশ সহজ ভাবেই লক্ষ্য করল সে।

মুখে কিছু না বললেও সুলতা তার কৌতূহলী মন নিয়ে পরপর তিন দিনই লক্ষ্য করে দেখল যে সুকান্ত এসে আগের মতনই তার কোল ঘেঁষে বসলেও তার মনটা কিন্তু চলে যায় দূরে, বাইশ নম্বর বেডের ওপরে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে না থাকলেও মিনিট মিনিট অন্তর সে আড়চোখে একবার দেখে নেয় বাইশ নম্বর বেডের রোগিণীকে; পর মুহূর্তেই আবার চোরা চাহনি মেলে দেখে সুলতা তার এই চোর চোর খেলাটা ধরতে পেরেছে কিনা।

স্বামীর এই ভাবান্তর দেখে, এক পাগলী যক্ষ্মা রোগিণীর প্রতি লক্ষ্য ভাব দেখে সুলতার কৌতূহলী মনটা বিস্ময়ের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়।

বিয়ের পরও বহু পুরুষ সুন্দরী মেয়ে দেখলে নগ্নভাবে তাকায়, এবং এই তাকানোটা স্বাভাবিকই। সব সুন্দরীই পুরুষের মনের পূজারী। মনে মনে রাগ করলেও মুখ ফুটে কোন স্ত্রী এতে বাধা দেয়না সুলতাও দিত না যদি সুকান্ত সুন্দরী যুবতীর দিকে মাঝে মধ্যে নগ্ন চোখে তাকাতো। কিন্তু একটা পাগলী যক্ষ্মা রুগীনির দিকে স্বামীকে এমন ভাবে প্রতিদিন তাকাতে দেখে তার মনের বাক্সে রহস্যের পরশ পাথর ঠোকাল। ভাবলো এই রহস্যের সত্যতা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। এ বিষয়ে সুকান্ত

তাকে কিছুই বলবে না। বলবার হলে অন্ততঃ তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এমন ভাবে ওকে দেখতো না। সুতরাং এ রহস্যের কিনারা করতে হলে অপর পক্ষের সাহায্যের প্রয়োজন।

মেট্রনের মানা আছে বাইশ নম্বরের সাথে কেউ যেন প্রয়োজনের বাইরে কোন কথা না বলে, আর কোন পেসেন্টের পুরুষ ভিজিটার যেন ভুলেও তার বেডের কাছে না যায়। পুরুষ দেখলেই বাইশ নম্বরের মুখের চেহারাটা কেমন পাল্টে যায়। মনের বিকৃত রূপটা যেন বেশী করে তখন চাড়া দিয়ে ওঠে। ছোট টেবিলের ওপরে রাখা কুজো আর কাঁচের গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে যায় মাটিতে আছাড় খেয়ে। সেই অবস্থায় তাকে সামলানো দায় হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা জোর করে ঘুমের ইনজেকসন দিয়ে তাকে নিঝুম করে তবে ওয়ার্ডকে শান্ত করে। এই কারণেই ওয়ার্ডের কোন রোগিণী বাইশ নম্বরের সাথে কথা বলে না। শুধু কথা কেন, এই পুরো ওয়ার্ডের কোন রুগীই তার নাম জানে না। অবশ্য হাসপাতালে রুগীদের নাম জানার দরকার হয় না। বেড নম্বরটাই ডাক নাম হিসাবে তাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে, যতদিন তারা হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকে; তারপর রোগ সারিয়ে যখন তারা ফিরে বাড়ী তখন নিজেদের হাসপাতালের ডাক নামটা দান করে যায় আগামী অতিথিকে।

আজ কদিন ধরে সুলতা লক্ষ্য করে দেখেছে বাইশ নম্বর খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নেয়। সে যখন বাথরুমে ঢোকে তখন সারা ওয়ার্ড ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং বাইশ নম্বরের সাথে কথা বলার উপযুক্ত সময় ভোরে। ভোরের হাওয়ায় সারা ওয়ার্ডের রুগীনিরা ঘুমের কোলে লুটিয়ে থাকে কঠিন যক্ষ্মা রোগের কাশিকে বশ মানিয়ে।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে চোখের পাতা সামান্য খুলে সুলতা দেখলো বাইশ নম্বরের রুগী বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। মিনিট কয়েক পরে সুলতা গুটিপায়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াল বাথরুমের সামনে। দরজায় আলতো করে গোটা দুয়েক টোকা দিয়ে বলল: বাথরুমে কে?

প্রথম ডাকে সাড়া মিলল: আমি?

'আমি কে'? সহজ গলায় আবার প্রশ্ন করলো সুলতা। প্রশ্নের উত্তর কয়েক মিনিট নিরুত্তর রইল, পরে শান্ত গলায় উত্তর এলো, 'আমি, মানে—মানে মিস জয়ন্তী বসু'। বাইশ নম্বরের নামটা জানতে পেরে আনন্দে কিলবিলিয়ে উঠল সুলতার জিজ্ঞাসু মনটা।

'ও ঠিক আছে,' বলে সুলতা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। ভাবলো বাথরুম থেকে জয়ন্তী বের হলেই তার সঙ্গে অন্য কথায় আলাপজমাবে। কিন্তু দেখা গেলকার্যক্ষেত্রে তা হ'ল না। অনেকক্ষণ বাদে জয়ন্তী বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোল বটে, কিন্তু সুলতারআলাপী হাসিকে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিতার ভ্রুকুটি হেনে পুরোপুরি উপেক্ষা করেই নিজের বেডে ফিরে গেল।

বেশ কয়েকদিন সকালে উঠে নানান ভাবে চেষ্টা করেও যখন জয়ন্তীর সঙ্গেসুলতা আলাপটা জমাতে পারলো না, তখন তার জিজ্ঞাসু মনের সলতেটা ধীরে ধীরে নিভতে বসলো।

অনেকদিন হল সুলতা এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এই অনেক দিনের মধ্যে এক দিনও জয়ন্তীর কোন ভিজিটারকে আসতে দেখেনি। আজ হঠাৎ তার বেডের কাছে গোটা চারেক ভিজিটারকে ঘিরে থাকতে দেখে সুলতা অবাক হ'ল? পাশের বেডের রমা'দির কাছে খোঁজ নিয়ে জানলো কাল রাতে বাইশ নম্বরের মুখ দিয়ে প্রচুর ব্লাড পড়েছে। কথাটা জানিয়ে ওর বাড়ীতে খবর পাঠানো হয়েছিল; তাই বাড়ী থেকে আজ ওকে দেখতে এসেছে।

দেখতে আসা ভিজিটারদের মধ্যে একটি বছর বাইশের মেয়ে চোখ ঘুরিয়ে এদিকে—ওদিকের পেসেন্ট দেখছিল। তার দেখার ভাব দেখে মনে হ'ল হাসপাতাল বোধ হয় সে এই প্রথম দেখছে। চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে সুলতার চোখের ওপরে তার চোখ পড়তেই সুলতা চোখ কুঁচকে হাসলো, হাসির মধ্য দিয়ে মেয়েটিকে আমন্ত্রণ জানালো তার কাছে আসতে।

প্রথম দিন শুধুমাত্র হাসির আমন্ত্রণ হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দিলেও পরের দিন মেয়েটি সুলতার বেডের কাছে এসে হাসিমুখে প্রশ্ন করলো; 'আপনি কেমন আছেন'; 'আমি ভাল আছি। আপনার

উনি কেমন আছেন,' বাইশ নম্বরের দিকে ইশারা করে জানতে চাইলো সুলতা।

'উনি আমার দিদি। একই রকম আছেন,' বিষণ্ণতায় মুখ কালো করলো মেয়েটি।

ও তাই বুঝি, বোন পরিচয় পেয়ে মনেমনে খুশী হল সুলতা। ভাবলো এই ছোট বোনের সঙ্গে আলাপ জমিয়েই জেনে নেবে বড় বোনের জীবন রহস্যটি। যে রহস্যর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে সুকান্ত।

প্রথম দু'চারদিন অবশ্য সুলতা তেমন কিছু প্রশ্ন করেনি। মামুলি আলাপ দিয়েই বন্ধুত্বটা মজবুত করে নেয় শুধু। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে প্রশ্নটা করে বসে, 'আচ্ছা ভাই তোমার দিদির একসঙ্গে দুটো রোগ হ'ল কেমন করে'?

'একসঙ্গে দুটো রোগ হয়নি। একটা রোগ সারাতে গিয়েই আর একটা রোগ হয়ে বসেছে। প্রথমদিকে সামান্য মাথা খারাপের লক্ষণ দেখে বাবা ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইলেট্রিক চার্জটা ভুল ভাবে দেওয়াতে ব্রেনের ধারা গিয়ে লাগে একেবারে বুকে। প্রচণ্ড ভাবে লাংসে আঘাত লাগাতেই বুকে জল জমতে শুরু করে। তারপরই ধীরে ধীরে দেখা দেয় এই রোগ। ওদিকে মাথা খারাপের লক্ষণটাও বেশ চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। প্রথমদিকে অবশ্য ওকে বাড়ীতে রেখেই চিকিৎসা হচ্ছিল কিন্তু ইদানিং ও এতো বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে বাড়ীতে রাখা দায় হয়ে উঠেছিল। অপরিচিত কোন পুরুষকে দেখলেই ও আক্রমণ করে বসতো। শেষে নিরুপায় হয়েই ওকে এই হাসপাতালে রেখে যেতে হয়েছে। হয়তো ওর বাকী জীবনটা এখানেই শুয়ে কাটাতে হবে,' হুবেরুমাল দিয়ে মেয়েটা চোখ মুছতেই সুলতা বুঝতে পারলো দিদির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই মেয়েটার চোখে জল এসে গেছে। অন্যকথা দিয়ে তাকে শান্ত করে সবে সুলতা সেই কথাটা পারতে যাবে যে কেন মেয়েটির মাথা খারাপ হ'ল, ঠিক সেইমুহূর্তেই তার বেডের সামনে এসে হাজির হোল সুকান্ত। সুকান্তকে দেখেই মেয়েটা তাড়াতাড়ি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে 'আজ চলি' বলে চলতে লাগল বাইশ নম্বর বেডের দিকে।

'উনি কে,' সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করলো সুকান্ত।

'বাইশ নম্বর বেডের ভিজিটার' সহজ গলায় উত্তর দিল সুলতা।

'তোমার এখানে কেন,' স্বরে কৈফিয়ত তলব করলো সুকান্ত।

'বারে, আসতে নেই বুঝি,' অভিমানের আবদারে ঝরে পড়লো সুলতা।

'না মানে···,' মানেটা আর লজিক দিয়ে বোঝাতে পারলোনা সুকান্ত। তবে এর একটা মানে সুলতা করে ফেলেছে। স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে বাইশ নম্বর পেসেন্টের সঙ্গে সুকান্তর একটা যোগ আছে। আর এই যোগ জলকে বিয়োগ করে কাল সে বুঝে নেবে জয়ন্তী বসুর ছোট বোনের কাছ থেকে।

'সেই লোকটাকে আমরা কখনও দেখিনি, তবে লোকমুখে শুনেছিলাম ও নাকি দিদির সাথে এম, এ, ক্লাসে পড়তো। এই পড়ার মাধ্যমেই দিদির সাথে ওর পরিচয়। পরিচয়টা পরে বন্ধুত্বের বুড়ি ছুঁয়ে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। দিদিকে ও বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। আর সেই মিথ্যা কথাতেই ভুলে দিদি তার জীবনের চরম ভুলটা করে বসেছিল। অনেকদিন অবধি আমরা এ সব কথা ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি। হয়তো কোনদিনও জানতে পারতামনা যদি সেদিন দিদি অমন ভাবে বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান না হয়ে যেতো। ডাক্তার সেন সেদিন দিদিকে দেখতে এসে নাড়ী দেখেই বলেছিলেন, ও কিছু নয়, প্রথম ইস্যু কিনা তাই সামান্য মাথা ঘুরে পড়েছেন'। সেদিন কথাটা শুনে আমাদের সারা বাড়ীর লোকেদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বাবা সারারাত গুম হয়ে বসেছিলেন তার লাইব্রেরী ঘরে। আমি বিছানায় পড়ে সারারাত কাঁদতে কাঁদতে শুনেছিলাম পাশের ঘরে মায়ের অনুরোধ, উপরোধ, 'অন্ত' যা হয়েছে সেতো হয়েছেই, এখন বল কে তোর এই সর্বনাশ করলো'?

দিদি একটা কথাও সেদিন বলেনি। আজ অবধি সেই নামটি করেনি, কে নামধারী শয়তানটা তার এতোবড় সর্বনাশ করেছে। তবে এর কদিন পর থেকেই দেখলাম দিদি কেমনউল্টো-পাল্টা বকছে কথার মধ্যে কেমন বিকৃত অংশ জেগে রয়েছে,' ওরা বামুন রায় বাহাদুরের ছেলে, কায়স্থর মেয়েকে

বিয়ে করবে কেন? প্রেম করতে পারে ওরাই, প্রেমের ফলে যদি সন্তান আসে পেটে তাকে নষ্ট করার জন্য টাকা দিতে পারে, কিন্তু বিয়ে, সন্তানের বাপের পরিচয় দেওয়া—হাঃ হাঃ হাঃ' এরপরই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো দিদি।'

নিজের মনের প্রচণ্ড কান্নাটাকে অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে খানিকটা ধরা গলায় সুলতা জানতে চাইলো, 'আচ্ছা ঐ লোকটা কে তোমারা জানতে পারোনি।' 'দিদিতো কোনদিন নাম বলেনি। তবে আমরা খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। 'এবর্সন' করার জন্য যখন দিদিকে নার্সিং হোমে ভর্তিকরা হয়েছিল, তখন আমি দিদির আলমারী ঘেঁটে একটা সকৃয়িতা পেয়েছিলাম সকৃয়িতার প্রথম পাতায় লেখা ছিল, 'আমার জয়ন্তীর জন্ম-দিনে, সুকান্ত মুখার্জী, বালীগঞ্জ।'

শেষের কথাগুলো আর সুলতার কানে যায়নি। স্বামীর নামটা কাঠগড়ায় আসামীর গড়ায় উঠে যাওয়ার পরেই কে যেন গরম সিসে দিয়ে তার কান দুটো কালা করে দিয়েছে। ভোঁতা করে নিয়েছে তার ভাগ্যকে। ভাগ্যকে আগে যানতো-না সুলতা। প্রথম জানলো যখন বিয়ের কয়েকদিন বাদেই তার মুখদিয়ে রক্ত বার হোল। সেই পুরানো ভাগ্যকে আজ আবার নতুন করে সে মানলো যখন বুঝলো তার স্বামীর ভালোবাসায় সোঁয়া পোকা লেগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। প্রচণ্ড কান্নায় ফুলে ফুলে সুলতা ভাবলো তার দেহের এরোগ হয়তো একদিন সেরে যাবে, কিন্তু তার স্বামীর ভালোবাসার মধ্যে যে গরল আগে থেকে মিশে গেছে তাকে কোন্ পবিত্রতার ছাকনি দিয়ে সে ছেঁকে তুলবে। কে ভালো করে আনতে তার স্বামীর সখের খেলায় হেরে যাওয়া সঙ্গিনী জয়ন্তী বসুকে। জগতে একজনই পারে তাকে আবার সহজ সরল মানুষ করে আমাদের সমাজে ফিরিয়ে আনতে। এই ফিরিয়ে আনার পেছনে প্রয়োজন ঐ একজনের প্রচণ্ড ভালোবাসা আর আপনকরে ফিরে নেওয়ার সাহসটুকু। সুলতা বেশ ভালো ভাবেই জানে ঐ একজনের নাম সুকান্ত মুখার্জী। তবে এ সংসারে তার কি প্রয়োজন? মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠলো সুলতা। প্যাডের কাগজে কি যেন খসখস করে লিখে সেটা খামের মধ্যে পুরে মুখ বন্ধ করে রেখে দিল বালিশের নীচে। বিছানা থেকে নেমে ছোট আলমারী থেকে দুটো বড়ি বার করলো। প্রতিবেতের আলমারী ঘেঁটে চুরি করে আনলো এমনতরো আরও দশটা বড়ি। এরপর উঠে এলো বিছানায়।

ফোনে খবরটা শুনে বিশ্বাস করেনি সুকান্ত। 'এবসার্ট' বলে ফোনটা রেখে দিয়েই ছুটে এসেছে হাসপাতালে। কিন্তু না 'এবসার্ট' নয়, সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করেছে সুলতা। মৃত্যুর পূর্বে বালিশের তলায় রেখে গেছে স্বামীকে লেখা প্রথম চিঠি। নার্সের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলো সুকান্ত। গোটা গোটা হরফে লেখা, আমি চললাম। যাবার আগে একটা ভিক্ষা চাইছি। বাইশ নম্বরকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়ে আবার সুস্থ করে সংসার কোর?

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বর

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষড়জ স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে ঋষভ স্বর সম্বন্ধে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঋষভ

"প্রপ্রোতি হৃদয়ং নাভ্রমস্তস্মাদৃতঃ স্মৃতঃ।
স্ত্রীগবীষু যথা স্নিগ্ধস্তিষ্ঠতি ঋষভো মহান্।
স্বরগ্রামে সমুৎপন্নঃ স্বরযোনিঋষভস্তথা।
এক বক্ত্রঃ চতুর্হস্তঃ পার্শ্বিভ্যাং কমলে বৃতঃ।
বীণাং বিভ্রৎকরাভ্যাং চ ঋষভো নীলবর্ণভৃৎ।
অগ্নিস্তদৈবতংগাতা তু পন্নগঃ।
রস হাস্যোহস্য বাসঃ গৌরীতি মৃগাহারকে।
নাভে নমুদিতো বায়ু স্তালু জিহ্বাগ্র সংহতঃ।
ঋষভস্বরতে যস্মাদৃষভ উচ্যতে।"

শীঘ্র অন্য স্বরের সহিত হৃদয়ে উপস্থিতি হেতু ইহাকে ঋষভ বলা হয়। স্ত্রী গবীর পার্শ্বে বৃষ যেরূপ শোভাপায় সেইরূপ ইহারও স্থিতি। স্বরগ্রামে উৎপন্ন হেতু ইহাকে স্বরযোনি আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা একমুখ বিশিষ্ট চতুর্হস্ত যুক্ত। ইহার দুই হস্ত কমল শোভিত এবং দুই হস্তে বীণা ধৃত। ইহার বর্ণ নীল। ইহার গায়ক ব্রহ্মা এবং অগ্নিদৈবত। ইহার রস হাস্য এবং মৃগয়ার রসেও প্রেম। ইহার বাহন বৃষ। নাভি হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া তালু ও জিহ্বাগ্রে সংহত হইয়া উচ্চারিত হয়। বৃষের ন্যায় শব্দ বলিয়া ঋষভ নামে অভিহিত করা হয়।

এই ঋষভস্বর রতিকা নাম্নী সপ্তম শ্রুতি অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। সপ্তম নক্ষত্র হইল অদিতি যাহা হইতে আদিত্য উৎপন্ন। আদিত্যই অগ্নিস্বরূপ। রবির দেবতা শিব ও অগ্নি। বেদে রুদ্রই অগ্নি। অতএব ঋষভ হইল অগ্নিদৈবত।

গান্ধার

"বাচং গানাত্মিকাং ধত্ত ইতি গান্ধার সংজ্ঞকঃ।
গন্ধর্ব সুখহেতুত্বাদ্গান্ধারো ব্যক্তিমীয়তে।
গান্ধার স্বেক বদনো গৌরবর্ণঃ চতুর্ভুজঃ।
বীণাকলাক্ষবষ্টাভৃদ্ভুজকরঃ স্যাদ্গ্নেয়বাহনঃ।
শঙ্করোদৈবতং যুক্তর্গন্ধর্বাঃ কুলম্।
বিষ্ণুর্গাতা রসোবীরো জ্ঞেয়োঽথ মধ্যমঃ।"

বাক্য গীতরূপ ধারণ হেতু গান্ধার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গন্ধর্বদিগের সুখকারক হেতু গান্ধার নামে অভিহিত করা হয়। গান্ধার স্বরের একবদন, গৌরবর্ণ ও চারিহস্ত। হস্ত সমূহ বীণা, কমল, পদ্ম ও ঘণ্টা দ্বারা শোভিত। মেষ ইহার বাহন। দেবকুলোদ্ভব হইয়া শঙ্কর দৈবতে অবস্থিত। ইহার মুখ্য রস বীর এবং ইহার গায়ক বিষ্ণু। ইহা হইতে মধ্যমকে জানা যায়।

গান্ধার ক্রোধানাম্নী নবম শ্রুতি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। নবম নক্ষত্র হইল অশ্লেষা। উহা শক্তি নির্দেশ করা হেতু কেতুর জন্ম নক্ষত্র এবং মনরূপ চন্দ্রের গ্রহে অবস্থিত। চন্দ্রকেতু হইল পন্নগের নাম। সুতরাং গান্ধার হইল পন্নগদৈবত। এবং ক্রোধ হইল বীররসের পরিচায়ক।

মধ্যম

"স্বরাণাং মধ্যমত্বাচ্চ মধ্যম স্বর উচ্যতে।
যথা মধ্যস্থিতো যোগ ইতি মধ্যম শব্দতঃ।
যথা মধ্যস্থিতাধারো বক্ষচিত্তে সমাশ্রিতাং।
মধ্যস্থান মবস্তাচ্চাস্মাদ্ধ্যমং পরিকীর্তিতঃ।
মধ্যমস্যেক বক্ত্রঃ স্যাদ্বেদ বর্ণ চতুঃভুজঃ।
সবীণা কলসৌবহ্নৌ সপদ্ম বরদৌ তথা।
ভারতী দৈবতং বংশঃ সুপর্ণজঃ।
গাতা চন্দ্রো রসঃ শান্তঃ ক্রৌঞ্চযানমতন্তু।"

স্বরসমূহের মধ্যস্থানে অবস্থান হেতু এইস্বরকে মধ্যম বলা হয়। বীণা যেমন স্বীয় যোগকে বিকাশ করে সেইরূপ শব্দও মধ্যম স্বরকে প্রকাশ করে। অথবা বায়ু যখন উত্থিত হইয়া বক্ষচিত্তে অবস্থিত হয় এবং মধ্যস্থানে

স্বরসমূহের মধ্যতা করা হেতু মধ্যম আখ্যা প্রদান করা হয়। মধ্যম একমুখ বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ ও চারি হস্তযুক্ত। হস্তসমূহ বীণা, কমল ও পদ্ম শোভিত এবং বর মুদ্রাযুক্ত। ইনি দেবমূলস্থান এবং আবতী বৈবতে অবস্থিত। ইহার গায়ক চন্দ্র এবং ইহার রস শান্ত। ক্রৌঞ্চ ইহার বাহন।

"আর্য্যসঙ্গীতে শ্রুতি" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে মধ্যমস্বরকে "অর্দ্ধ" স্বর বলা হয়। কারণ ইহা সপ্তকটীকে দুইটী সমান অর্দ্ধেক অংশে বিভাগ করে এবং ইহা রার্জ্জনী নামক এয়োদশ শ্রুতিতে অবস্থান করিয়া স্বর সপ্তককে ধারণ করিয়া অবস্থিত।

এয়োদশ নক্ষত্র হইল কন্যা রাশির ধারণকর্ত্রী নক্ষত্র যাহার দেবতা সবিতৃ। উহাই আর্য্যদিগের একাধারে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী। সুতরাং মধ্যম হইল আবতী বৈবত।

পঞ্চম

"স্বরাণাংপঞ্চমঃ বিস্তারং যোমিমীতে স পঞ্চমঃ।
পাঠক্রমেণ গণনে সংখ্যায়াং পঞ্চমোঽথবা।
নাভিহৃৎকণ্ঠোমূর্দ্ধাস্তৌষ্ঠাস্যাতন্নিস্বনঃ।
পঞ্চস্থানসমুদ্ভূতঃ কথ্যতে পঞ্চমস্তদা।
পঞ্চমোলোকবরনো ভিন্নবর্ণশ্চাষ্ট করঃ।
বীণাকরদ্বয়ে শঙ্খবাপিচ বরাভয়ৌ।
স্বয়ম্ভূবৈবতং পিতৃ বংশজঃ।
কোকিলবাহনং গাতা নারদঃ প্রথমো রসঃ।

স্বরসমূহের যে বিস্তার করে তাহাকে পঞ্চম বলে। অথবা সংখ্যাপাঠে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত বলিয়া পঞ্চম নামে অভিহিত হয়। পঞ্চাঙ্গ যথা নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধি ও ওষ্ঠ চালনা হেতু ইহা উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চম বলা হয়। ইহার এক বদন এবং বর্ণ ভিন্ন অর্থাৎ শ্যাম ও ছয় হস্ত বিশিষ্ট। দুই হস্তে বীণা ও দুই হস্তে শঙ্খ শোভিত এবং দুই হস্ত বর ও অভয় মুদ্রা যুক্ত। ইহা পিতৃগণ হইতে উদ্ভূত ও স্বয়ম্ভূবৈবতে অবস্থিত। কোকিল ইহার বাহন নারদ ইহার গায়ক এবং রস আদি অর্থাৎ প্রথম।

ইহা আলাপিনী নামক সপ্তদশ শ্রুতি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। বৃশ্চিক রাশির সপ্তদশ নক্ষত্র হইল অনুরাধা যাহার দেবতা মিত্র—যাহা মেরুকে ক্ষেপণ করে। ইহা রবির জন্য নক্ষত্র এবং কিরণ ক্ষেপণ হেতু সূর্য্যের একটা নাম মিত্র। ইহা সকলেরই জানা আছে যে রবি এইখানে আসিলে মিত্র পূজা (ইতু) আরম্ভ হয়। যে স্বরে আত্মার বিশেষ ক্ষেপণ হইয়া উদ্ভূত হয় তাহাই স্বয়ম্ভূবৈবত অর্থাৎ স্বতঃ উদ্ভূত। সেই জন্য পঞ্চম হইল স্বয়ম্ভূবৈবত এবং আদিরসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

—বৈবত—

ধী অর্থে বোধ ও চিত্ত অর্থাৎ বোধ ও চিত্ত জন্য ও জনকের মত সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া বৈবত বলা হয়। এবং যেহেতু পৃষ্ঠস্থানে ধৃত সেই হেতু বৈবত বলা হয়। ইহার বর্ণ গৌর। ইহা এক মুখ বিশিষ্ট ও চারি হস্ত যুক্ত। বীণা, কমল,মুদ্গর ও ফল সমূহের দ্বারা হস্ত সকল শোভিত। ইনি ঋষি কুলোদ্ভব ও শম্ভুবৈবতে অবস্থিত। ইহার রস ভয়ানক এবং ইহার গায়ক তুম্বরু। ইহার বাহন হয় অর্থাৎ অশ্ব। বিংশ নক্ষত্র হইল নিশ্বতি।

রম্যা নামক বিংশ শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বৈবত অবস্থিত। ধনু রাশির বিংশ নক্ষত্রের দেবতা আপ্ যাহা আপ্যায়িত করে। ইহাই মঙ্গলের জন্য নক্ষত্র। শম্ অর্থে মঙ্গল এবং ভূ অর্থে হওয়া। সেই কারণ বৈবত স্বর শম্ভুবৈবত। যাহা জ্ঞান দেবতা রূপে ধীশক্তির সম্বন্ধ করে তাহাই শম্ভুবৈবত।

নিষাদ

নিষীদন্তি স্বরাঃ সর্ব্বে নিষাদস্তেন কথ্যতে।
নিষাদোগৌর বক্ত্রঃ স্যাৎ চিত্র বর্ণশ্চতু র্ভুজঃ।
ত্রিশূল পদ্ম পরশু বীজ পূরকরস্তরঃ।
রণেশো দৈবতঃ বংশঃ সুপর্ব্বজঃ।
গাতা তু তুম্বুরুঃ শাস্ত্ররসঃ স্যাদ্বাহনং গজঃ।
নিষীদন্তি স্বরাঃ সর্ব্বে নিষাদস্তেন কথ্যতে।

নিষাদ অর্থে ব্যাধ। ব্যাধ কথাটী ব্যধ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ব্যধ অর্থে হনন বা অন্তকরা। যে প্রাণীগণের

স্বরের অন্ত করিয়া বিরামে অবস্থিত হয় সেই নিষাদ। স্বর সপ্তকের এই অন্তস্বরটী স্বর সমূহের অন্তিমে অবস্থান করিয়া স্বর সমূহকে অন্ত দেয় বলিয়া ইহাকে নিষাদ আখ্যা দেওয়া হয়। নিষাদের মুখ গজের ন্যায় এবং ইহার বর্ণ চিত্রিত ও ইনি চতুর্ভুজ। হস্ত সমূহে ত্রিশূল, পদ্ম, পরশু ও বীজ শোভিত। ইনি দেব বংশ সম্ভূত ও গণেশ দৈবতে অবস্থিত। তুম্বরু ইহার গায়ক। ইনি শান্তরস ব্যাপক ও গজ ইহার বাহন।

নিষাদ দ্বাবিংশ শ্রুতি ক্ষোভিণীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। শ্রুতি সমূহ গণনায় দ্বাবিংশ সংখ্যা, যাহা গণন বা গণ বিভাগ করে তাহাই গণ দেবতা গণেশ। সুতরাং নিষাদ স্বর গণেশ দৈবত।

মকর রাশির দ্বাবিংশ নক্ষত্র হইল শ্রবণা। ইহার দেবতা বিষ্ণু যাহার ত্রিপাদ হেতু গতি বুঝায়। দ্বাবিংশ শ্রুতি হইল ক্ষোভিণী। ক্ষোভিত অর্থে চালিত, আন্দোলিত, ঘর্ষিত ইত্যাদি। শক্তিতেই ভাবের আন্দোলন ও আলোড়ন হইয়া থাকে।

এই স্বর সমূহ বিকৃত। ইহারা কেহ বিকৃত নহে। ইহা হইতে যাহা বিকৃত তাহাই হইল বিকৃত স্বর। এই স্বর সমূহ কোন্ কোন্ শ্রুতিতে অবস্থিত হইবে তাহা যথা—

আদি শ্রুতৌ চতুর্থ্যাংতু স্বরঃ ষড়জোবিরাজিত।
সপ্তম্যাং ঋষভস্তদ্বৎ গান্ধারস্তু দ্বিতিঃ পুনঃ।
নবম্যাংতু একোনত্রিংশ্যাং মধ্যমঃ পঞ্চমস্ততঃ।
সপ্তদশ্যাং দৈবতস্তু বিংশ্যামথ নিষাদকঃ।
দ্বাবিংশামিতি মন্দ্রস্থাং স্বরা সপ্ত প্রকীর্তিতাঃ।
ইন্দুজের দ্বিতি মধ্যে তাবে চৈবেদৃশী স্থিতিঃ।

—সঙ্গীত বিলাস—

অর্থাৎ আদি শ্রুতি হইতে চতুর্থ শ্রুতিতে ষড়জ, সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ, নবম শ্রুতিতে গান্ধার, ত্রয়োদশ শ্রুতিতে মধ্যম, সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম, বিংশ শ্রুতিতে দৈবত এবং দ্বাবিংশ শ্রুতিতে নিষাদ এইভাবে স্বর সমূহকে শ্রুতি-সকলে বসাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার সনে স্বর সপ্তক বসিবে।

এই যে স্বর স্থাপনা দেখান হইল ইহার সহিত আধুনিক স্বর স্থাপনার কোন সামঞ্জস্য নাই। আধুনিক স্বর স্থাপনার পাশ্চাত্য tempered scale এর গুণে হওয়া হেতু প্রাচীনদের সহিত এত পার্থক্য এবং সেই কারণ বশতই সঙ্গীতের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা হইতে বিচ্যুত। এই সমস্ত কারণ হেতু আর্য্য সঙ্গীতের এত অবনতি ও রসাভাব পরিলক্ষিত হয়।

আনন্দ

শুচিস্মিতা দাশগুপ্তা

ফুলের বনে ফুটলো অলি
মধুর লোভে,
গাছে গাছে ফুটলো কলি
কেমন শোভে!
জ্যোৎস্নাধারা লুটিয়ে পড়ে
নদীর কূলে,
জলের মাঝে ঝিকিমিকি
উঠছে দুলে।
হাওয়ায় হাওয়ায় ফুলের সুবাস
আসছে ভেসে,
তারাগুলো দেখছে খালি
মুচকে হেসে।
ফুলের সাথে চাঁদের কত
চলছে খেলা,
মাঝে মাঝে মেঘ দেখে যে
ভাসিয়ে ভেলা।
পূব আকাশে চড়লো রবি
সোনার রথে
উষা দিল আলোর ছটা
বিছিয়ে পথে।

দরবারী সঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়

ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন চিরকালই রাজা মহারাজা, আর আমীর ওমরাহরা। সুলতান-বাদশাহের দরবারে যে সঙ্গীত ধারার উদ্ভব আজ তারই প্রচলিত রূপ দরবারী সঙ্গীত।

প্রাচীন মার্গসঙ্গীত নামে হিন্দু সঙ্গীতের যে রূপের চলন ছিল তার রূপরেখা আজ আমাদের কাছে অপরিচিত বললেই হয়। রাগ রাগিণীর নামগুলি কিন্তু সেই হিন্দুযুগ থেকেই চলে আসছে, গাইবার ভঙ্গী ও ভাবের রূপের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়।

হিন্দুযুগের সঙ্গীতের রূপরঙ্গের অনেক পরিবর্তনই শুধু ঘটে নি, বলরূপেরও রূপান্তর ঘটছে—আর তো সেই যুগের সেই বিশুদ্ধ হিন্দুসঙ্গীতকে কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু আজ যে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তার অঙ্গে অঙ্গে বিরাজ করছে সেই বিস্মৃত সময়ের অপরিচিত সুরধারা।

যে সব রাজা মহারাজা আর আমীর ওমরাহদের সময় প্রসাদে আজকের দরবারী সঙ্গীত ধারার উদ্ভব হয়েছে তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সব উৎসাহী নরপতিদের অনেকেই নিজেরাও কৃতী গুণী সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ গোয়ালিয়রের করদ রাজা রাজামান। ১৪৮৬ থেকে ১৫১৬ তাঁর জীবৎকাল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিচিত্র শিল্পীরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম। সংকীর্ণ শ্রেণীর রাগবৈচিত্র্যে তাঁর কৃতিত্ব আজও স্বীকৃত। গুর্জরী, মালগুর্জরী, বাহার গুর্জরী এবং মঙ্গল গুর্জরী এই চারটি রাগিণী তাঁর সৃষ্ট বলে কথিত।

মালবের রাজা বাজবাহাদুর আর একজন কৃতী সুরস্রষ্টা। ১৬০০ সালে মালবের সিংহাসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গলা ছেড়ে চড়াগলায়গাইবার প্রথা তাঁরই প্রবর্তন। তাঁরই নাম অনুসারে এই পদ্ধতির নাম হয়েছে বাজখাই গলার গান।

জৌনপুরের সুলতান হোসেন শির্কীকে খেয়াল গানের স্রষ্টা বলে উইলার্ড সাহেব জানিয়ে গিয়েছেন। খেয়ালের সাধারণের দুটি কুক আস্থায়ী ও অন্তরা প্রচলিত। খেয়ালের দুটি কুকের অতিরিক্ত ধ্রুপদের মতো চার কুকে (আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ) ঘিরে বিশিষ্ট খেয়াল 'ওলাক' তাঁর সৃষ্ট।

মুসলমান সুলতান বাদশাহরা অনেকেই বেশ সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন। তাঁরা গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের দরবারে সসম্মানে আশ্রয় দিতেন। মুসলমান ধর্মের অনুশাসনে সঙ্গীতের চর্চা নিষিদ্ধ হলেও চিরকালই ওস্তাদরা সঙ্গীতের ধ্যানে নিরত ছিলেন। পারস্য দেশের রাগরাগিণী এদেশের রাগরাগিণীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে নবপ্রেরণা এনে দিয়েছিল।

ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই নবপ্রেরণার নব প্রবাহ এনে দিয়েছিলেন আমীর খসরু। বস্তুত দরবারী সঙ্গীতের তিনিই স্রষ্টা। পারস্য দেশের অধিবাসী খসরু বলবনের রাজত্বকালে এদেশে এসে দিল্লীদরবারের সভা গায়করূপেই বাকীজীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। মুসলমানী রাগ-রাগিণী তাঁর কণ্ঠেই এদেশী রূপ পায়। এইভাবে পার্সী মোকামগুলি হিন্দুরাগরাগিণীর অঙ্গে সংযুক্ত হয়।

ভারতীয় ১৬ রাগিণী ও ৬ রাগের সঙ্গে পার্সী ১২টি মোকাম ২৪টি ওস্তা ও ৪৮টি গোছাকে আমীর খসরুই তাঁর খেয়াল অঙ্গের গানে প্রথম সম্মিলিত করেছিলেন।

আচার্য ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বড় চমৎকার মন্তব্য করেছেন—"পরন্তু মুসলমানদিগের রাজত্বকালে আমাদের সঙ্গীত অনেক পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহারা আমাদিগের সঙ্গীতই নিজমতের অনুগত করিয়া লয়। তাহাদিগের নিজের সঙ্গীত ছিল না, কারণ তাহা-

হিন্দের ধর্মশাস্ত্র কোরাণেই তৎপরিশীলনের বিশেষ নিষেধ আছে। সুতরাং ভারত-সঙ্গীতই ত হাদিগের সঙ্গীতের আদর্শ এরূপ নিষেধ থাকিলেও সঙ্গীতে মনোহারিতা ও মনোরঞ্জকতা বর্দ্ধন করিয়া মুসলমান সম্রাটদিগের উৎসাহে আমাদের সঙ্গীতের অনুকরণ করিয়া তাহারা সঙ্গীতানুশীলন করিত।"

আর এই ভাবে মুসলমান দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের অবিরাম চর্চা শুরু হল। দরবারের গানে তানসেন বিশ্ব-স্রষ্টা। তিনি আকবরের দরবারের সভাগায়ক। নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তিনি পুরানো রাগিণীগুলিকে নতুন করে পরিবেশন করেন।

তানসেন পূর্বে রেওয়ার মহারাজা রামচন্দ্রের সভা-গায়ক ছিলেন। আকবর তাঁকে নিজের দরবারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। তানসেন এবং সুরদাস উভয়ই ছিলেন সমসাময়িক। তাঁরা প্রাচীন রাগিণীগুলিকে নবীন রূপদান করেন। ফলতঃ তাঁদের দুজনের হাতে দুটি নতুন রূপ পেয়েছিল ঝিঁঝোটি মল্লার, সুরদাসীমল্লার।

ধ্রুপদ গানের তাঁরা দুজনই নব স্রষ্টা। হিন্দু ধ্রুপদী সুরদাসের ধ্রুপদের নাম 'বিষ্ণুপদ'। ধ্রুপদের একটি প্রাচীন রূপ চিরকালই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। জয়দেবের প্রবন্ধ সঙ্গীত গুলিও ধ্রুপদ নামে পরিচিত হয়ে আছে। অনেকে অনুমান করেন গোয়ালিয়র অঞ্চলের সাধারণ নাগরীরা ধ্রুপদ ধরনের লোক সঙ্গীত গাইত। তানসেন, সুরদাস প্রভৃতি গুণিজনের উদ্যমে সেই গান সুবাসিত হয়ে দরবারে স্থান পেয়েছে।

ধ্রুপদ গানের চারটি বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়-গবহার বাণী, খাণ্ডার বাণী, ডাগর বাণী এবং নওহর বাণী। দরবারেই এগুলি সৃষ্ট। গবহর বাণী রীতির গানই মুসলিম ধ্রুপদ রীতি। গৌড়বাণী সম্ভবতঃ গবহারবাণীরই অপভ্রংশ। এই বাণীর গতি মন্থর এবং মূল ভাব শান্ত রসের।

খাণ্ডার বাণী রীতির গান সেনী ঘরোয়ানারই নবাৎ খাঁর প্রবর্তন। অত্যন্ত প্রখর এবং দ্রুত এর গতি; কালোয়াতী ওস্তাদের রীতিতম বিক্রম বীর্য প্রকাশ পায় খাণ্ডার বাণী ধ্রুপদে।

সেনী পরিবারের সংস্কার আলি খাঁ ও উজীর খাঁর আধুনিক প্রচলিত ধ্রুপদের প্রবর্তক ব'লে পরিচিত। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সুর স্রষ্টা রূপে পরিচিত হয়ে আছেন বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, মীরা, হরিদাস স্বামী, বাবা রামদাস প্রভৃতি।

মহম্মদ শাহের রাজত্বের সময়ে সদারঙ্গ ও তাঁর পুত্র অদা-রঙ্গ দরবারী সঙ্গীতে নতুন রূপের প্রবর্তন করেন। সেনী ঘরোয়ানার সদারঙ্গের আসল নাম নিয়ামৎ খাঁ। আধুনিক প্রচলিত খেয়ালের স্রষ্টারূপে তাঁরা সুপ্রসিদ্ধ।

দরবারের আসরের পূর্বেও তো ভারতীয় হিন্দুসঙ্গীতের একটি রূপ ছিল, তার পরিচয় আজ আর আমাদের জানবার উপায় নেই। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এ বিষয়ে বলেছেন "সঙ্গীতের আকার কিরূপ ছিল তা-ও আমরা সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। যদিও মুসলমান যুগের পূর্বেও রচনা বা ভাষার পার্থক্য ছিল, তথাপি রাগরাগিণী ও আলাপাদি যে শুদ্ধ মূর্তিতে প্রচলিত ছিল, তাতে আর সন্দেহ কি।"

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রিন্সেপ স্ট্রীট এডিনবরার প্রধান রাস্তা। চারপাশের দোকানগুলোর ঝলমলে সোকেস, চটকদারি বিজ্ঞাপন, নিয়নের বৈচিত্র্যময় আলোর রোশনাই, বড় বড় অফিস, সব মিলিয়ে একটা গমগমে আভিজাত্যের নিশানা।

রাস্তাটার ইষ্ট এণ্ডে 'নর্থ ব্রিটিশ হোটেল' এডিন-বরার সব চেয়ে বড় হোটেল। হোটেল বিল্ডিংয়ের ওপরের টাওয়ার ক্লকটা অনেকদূর থেকে দেখা যায়। হোটেলের নীচে এডিনবরা ওয়েভারলি ষ্টেশন।

ওয়েষ্ট এণ্ডে আবার ক্যালেডোনিয়ান হোটেল আর ষ্টেশন।

রয়েল টেরাস কিন্তু ইষ্ট-এণ্ডের খুব কাছেই।

পাঁচটা বাজার পনেরো মিনিট আগে থেকেই শঙ্কর নর্থ ব্রিটিশ হোটেলের নীচে অপেক্ষা করছিল শালির জন্যে। হোটেলটার বিপরীত দিকের উল-ওয়ার্থের দোকান থেকে কাঁচের দরজা বার বার খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল একনাগাড়ে। ক্রেতার আনা গোনায়।

শঙ্কর দেখছিল লাল জেলেডেটের জামা পরে ঘণ্টাখানেক বয়সের একটা ছেলে তার ঠাকুমার হাত ধরে যাচ্ছে। দুজন পূর্ণযৌবনা যুবক যুবতী আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হয়ে বিপরীত দিক থেকে আসছিল। খট্ খট্ করে হাই-হিলের আওয়াজ তুলে পনেরো ষোল বছরের কিশোরীরা হাত ধরাধরি করে প্রিন্সেপ স্ট্রীট ধরে চলেছে। কিন্তু শঙ্কর লক্ষ্য করল হাত ধরাধরি করে দুজন কি তিনজন ছেলে একসঙ্গে একবার যাচ্ছে না।

যদিও মাঝে মাঝে টেডি বয়েদের দেখা যাচ্ছে দঙ্গল বেঁধে চলেছে। কিন্তু ছাড়াছাড়া ভাবে।

—শঙ্কর তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ ?

চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে শঙ্কর দেখে ওয়েভারলি ষ্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শালি জিজ্ঞেস করছে।

এই মিনিট পনেরো হলো দাঁড়িয়ে আছি। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় তখন পাঁচটা।

শঙ্কর, এস আমার সঙ্গে। তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। যেটা তুমি বোধহয় দেখ অবশ্য যার কিছুই দেখনি।

সে আবার কোথায় ?

রয়েল টেরাসের খুব কাছেই। কার্লটন হিলে। তুমি গেছ কখনও ওখানে ?

না।

তাহলে এস।

তারা কিন্তু রয়েল টেরাস ধরে কার্লটন হিলে উঠলনা। রিজেন্ট স্ট্রীট ধরে কার্লটন হিলে ওঠার বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে উঠতে লাগল।

আশ্চর্য। সপ্রতিভ মেয়ে শালি। সে কিন্তু দু'মিনিটেই সহজ হয়ে গেছে। যেন কত দিনের চেনা। শঙ্করের ভীরু হাতটাকে নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে চলতে অভ্যস্ত করল।

শঙ্করের সারা শরীরে, সর্বক্ষণে কিন্তু একটা জড়তা আর ভীরুতা রয়ে গেল। কে কখন তাকে এ ভাবে দেখে ফেলে সেই ভয়ের সঙ্কোচনে। যদিও তার সমস্ত দেহমন জুড়ে একটা অনাস্বাদিত পূর্ব অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় শঙ্কর দেখল বিপরীত দিক থেকে বিনয় ব্যানার্জী আসছে। সে কিন্তু তাদের দেখল না। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে উৎরাইয়ের ওপরের হলিরুড প্যালেস লক্ষ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কার্টুন ছিলেবে শঙ্কর ভেবেছিল অসম্ভাকীর্ণ। কিন্তু দেখল আসলে তা একেবারেই নয়। পাহাড়ের ওপর সুন্দর সবুজ সমতল ভূমি। চার পাশে ফাঁকা ফাঁকা দাঁড়ানো পাইন পপলার আর সিলভার-বার্চ গাছের সারি।

পাহাড়ের ওপরের সমতল ভূমি কিন্তু একেবারে অন্ধকার নয়। তার কারণ চারপাশ ঘিরে পাহাড়ে ওঠার সর্পিল রাস্তায় মোড়ে মোড়ে উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের লাইট রয়েছে। পাহাড়ের ওপর কিন্তু কিছু নেই। খালি আলো আঁধারের খেলা।

শঙ্কর লক্ষ্য করল পাহাড়ের ওপর খালি তাবা নয় জোড়ায় জোড়ায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক যুবক যুবতীর দল, বিভিন্ন ভঙ্গিমায়।

শালি শঙ্করের হাত আকর্ষণ করে এখানে বস শঙ্কর। তারা একটা পাথরের খাঁজের ওপর বসল। চার পাশে হৈ হৈ করা জোড়ো হাওয়া, কিন্তু আশ্চর্য্য, ঠাণ্ডা লাগছে না। আরও আশ্চর্য্য এত নর নারী এখানে বসে আছে কিন্তু এমন ভাবে জায়গাটা তৈরী যে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

কি ভাবছ শঙ্কর?

ভাবছি ইংরাজেরা বড় রসিক জাত। বাইরে থেকে তাদের গোমড়া মুখ দেখে খুব সিরিয়াস আর গুরু মনে হয় কিন্তু তোমরাও যে জীবনটাকে ভোগ করতে জান সেটা এইরকম ব্যবস্থা দেখলে মনে হয়।

শঙ্কর, প্রথম মই বলি আমরা ইংরেজ নই স্যর, যদিও তোমরা এই তফাৎটা ধরতে পার না। কিন্তু ইংরেজ বললে অনেক স্যর মনে মনে বিরক্ত হয় যদিও আমি তাদের দলে নই।

আর দ্বিতীয় কথার উত্তরে আমি বলব ব্রিটিশ জাতকে যদি তুমি বল খালি কাজের ধান্দা ভূত থাকে তাহলে খুব ভুল হবে। ব্রিটিশরা যখন কাজে থাকে তখন পুরোদস্তুর কাজ করে আর যখন ছুটি পায় তখন গভীর ভাবে ছুটি উপভোগ করে।

আসলে আমরা হচ্ছি সাদা চিউইং গামের মত। ওপর থেকে বর্ণহীন, গন্ধ, কিন্তু যত চিবোবে তত রস পাবে। আবার বেশী চিবোলে দাঁতে আটকে যাবে। আমরা খুব আরাম প্রিয় জাত। যখন উপভোগ করি গভীর ভাবে উপভোগ করি। কিন্তু তুমি এসব কথা বলছ কেন শঙ্কর?

—এই জায়গাটা দেখে। যিনি তৈরী করেছেন তিনি খুব রসিক লোক। চার পাশে এত ছেলেমেয়ে, কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আমরাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না; নীচে, পাশে, পেছনে এত আলো কিন্তু এখানে আমাদের পীড়াদায়ক, অস্বস্তিকর আলোর আভাসও নেই।

ওহো···হো শঙ্কর, তোমাকে আমি যতটা নাইভ ভেবেছিলাম ততটা তুমি নও তাহলে।

—জান এ জায়গাটার নাম হচ্ছে Lovers, bough, এটা এজন্যেই তৈরী। বুড়োদের এখানে দেখতে পাবেনা।

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে শালি বলে, আচ্ছা শঙ্কর পাশ করেই তুমি কি দেশে ফিরে যাবে?

হ্যাঁ, আমরা দেশের ভাগ ছাত্ররাই তাই।

শঙ্কর, তোমার আমাদের দেশটাকে খুব খারাপ লাগে; তাই না?

না ঠিক তা নয়, কিন্তু পদে পদে এই কালচার আর ম্যানার্সের বেড়া ডিঙোতে ডিঙোতে অস্থির হয়ে যাই মাঝে মাঝে। অথচ এই ইংলিশ কালচার শেখবার জন্যে সাত সমুদ্র পেরিয়ে আমি ইংল্যাণ্ডে স্কটল্যাণ্ডে আসিনি। আমি এখানে সায়েন্স শিখতে এসেছি।

—জান শঙ্কর, আমি তোমাকে প্রথম দিনই লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম তুমি আমাদের দেশের ম্যানার্স জান না। সে জন্য আরও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম, যাতে তুমি ভবিষ্যতে ঠোকর না খাও।

কেন? কেন?

শঙ্কর, এক বছর আগে নটিংহাম থেকে যে ইংলিশ দম্পতি আণ্ডেন হোটেলে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে তোমাকে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছিলেন মিসেস কার্ন রোডস্কি, তখন তুমি কি ভাবে তাদের সঙ্গে আলাপ সুরু করেছিলেন;—তোমার মনে আছে?

কেন,—হাউ ডু ইউ ডু বলে করমর্দ্দন করেছিলাম আমি।

সেটা উচিত হয় নি। তাদের সঙ্গে তোমাকে যখন ইনট্রোডিউস করে দেওয়া হচ্ছে তখন তারাই সে কথা বলবেন আগে। প্রত্যুত্তরে তুমিও বলবে। তারা না বললে নয়।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝতে পারে কেন সেদিন মটিংহোল থেকে আদা ইংরেজ দম্পতী দুপ কাল করে ডাইনিং হল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর কেনই বা রিসেপ্ শন-রোস্তরি তারপর থেকে শঙ্করের সঙ্গে আর কথা বলেন না। ওই অজ্ঞানতার জন্যে কতজনে যে তার ওপর রুষ্ট হয়েছে কে জানে?

শঙ্কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব যতখানি পারি। বলে শালি শঙ্করকে আরও ঘন ভাবে জড়িয়ে ধরে। মনে রেখ তুমি ইংলিশ কায়দার গ্লাসটা না ছুঁয়ে, সায়েন্সের জল খেতে পারবে না।

কেন তুমি আমার জন্যে এত করবে?

কুমার মঙ্গলমের জন্যে। তুমি তার দেশের লোক।

কুমার মঙ্গলম্ কে?

…আট বছর আগে যখন আমি যার বছরের কিশোরী তখন গ্যালাসিলের পলিটেকনিকাল স্কুলে কুমার পড়তে আসে। পেয়িং গেষ্ট হয়ে আমাদের বাড়ীতে থাকত।

কুমার খুব হাসিখুশী, মিশুকে ছিল। সে আমাদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেত। গ্যালাসিলের প্রান্তে একটা পুকুর ছিল। সেখানে আমরা স্কুলের ছেলেমেয়েরা মধ্যে মাঝে এসে মাছ ধরতাম।

একদিন এভাবে মাছ ধরছি। গরমের বিকেল বেলায়। এমন সময় পা পিছলে পুকুরে গভীর জলে পড়ে যাই।

কুমার পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে জলে লাফিয়ে পড়ে আমাকে তুলে বাঁচায়। সেই থেকেই আমি ইণ্ডিয়ানদের দেখলেই সাহায্য করি।

…কাল'টন হিল হোস্টের হাওয়ায় কাঁপছে! মাথার উপর কাচের চাঁদের অস্পষ্ট আলো। নীচের শহরের কোলাহল, গির্জার ঘণ্টা সমুদ্রের গর্জনের মত কানে এসে লাগছে। চারপাশে এক মন্ত্রির পরিবেশ।

ঈশ্বর…ঈশ্বর কে যেন কাঁদছে।

শালি বুঝতে পেরে বলে নাইটিঙ্গেল পাখী ডাকছে। বাচ্চা ছেলের কান্নার মত শোনায়।

শঙ্কর তুমি বড় ছেলেমানুষ। নাইভ…এখনও চুপ করে বসে আছ!

শঙ্কর বুঝতে পারে, শালির হাতটা তার কোমর বেষ্টন করেছে।

আরও ঘন হয়ে ওঠে তাদের আশ্লেষ। শালির পীনোন্নত বক্ষ পিষ্ট হয়ে যায় শঙ্করের দেহের পেষণে। অধরে অধর এসে হয় মিলিত। নাইটিঙ্গেল পাখীটা ডেকেই চলে। আর নীচে শহরের কোলাহল দূর শ্রুত সমুদ্রের গর্জনের মত বার বার কাল'টন হিলের উপত্যকায় আছড়ে পড়তে থাকে।

যখন টেরাসে এসে তারা পৌঁছাল তখনও সাপারের টাইম হয়নি।

দরজাটা ভেজিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে সোফার ওপরে এলিয়ে বসে শঙ্কর।

একরাশ চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকাতে থাকে। এয়ারোগ্রামটা খুলে পড়ে। সন্ধ্যের ডাকে দেশ থেকে এসেছে।

মা লিখছেন—"যত তাড়াতাড়ি পার পাশ করিয়াই দেশে ফিরিয়া আসিবে। তোমার ওপর ভরসা করিয়া আমি ইটচুনায় আজও পড়িয়া আছি। তোমার বোন শ্রীমতির বিবাহের চেষ্টা করিতেছি। আমার বিশ্বাস তুমি বিপথে যাইবে না। খারাপ কিছু করিবে না। অসৎ সঙ্গে মিশিবে না। ভগবান তোমার সহায় হোন।"

টক্ টক্ টক্। দরজায় কে নক করছে। শঙ্কর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

হাসিমুখে হেমন্তর ঘরে ঢোকে। তারপর কি হল নাকি চ্যাপ। সব খুলে বল। গলার স্বরে তার একরাশ কৌতূহল ঝরে পড়ে।

বলছি জলটা খাই আগে।

সে রাতেও তাদের সাপার খাওয়া হল না। দুবন্ধুতে বসে বসে গল্পনা শুরু হয়। সব শুনে হেম বলে শঙ্কর তুমি প্রথম চেষ্টেই সেকুণ্ডী করলে।

তারপর আগ্রহের সঙ্গে বলে শালিকে ধরে আমার জন্যে একজন গার্লফ্রেণ্ড জোগাড় করে দাও।

• • • •

ব্রিটিশ কাউন্সিলে সে রাত্রিরে সোশাল ডান্স। নরকম ইনভাসনের প্রভাবে পড়ে শঙ্করও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মেম্বার হয়েছে।

শঙ্করের সঙ্গে এসেছে হেম দত্ত। নাচ সুরু হল। কুইক ষ্টেপ ডান্স।

বেশীর ভাগই ইণ্ডিয়ান আর আফ্রিকান্ ছাত্র। তারাই গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে এসেছে নাচের আসরে। কাউন্সিল খালি নাচের ফ্লোর ছেড়ে দিয়েছে তাদের জন্যে।

শঙ্কর দেখল তাইই মত বেশীর ভাগ। নাচতে ভাল জানে না। নিছক কানের জন্যে নাচতে, হলে এসেছে।

এমন সময় শালি আর একজন উনিশ কুড়ি বছর বয়েসের যুবতীকে নিয়ে হলে ঢুকল। তারপর বলল গুড-ইভনিং শঙ্কর এণ্ড হেম। যে আই ইনট্রোডিউস নর্মা রাইট উইথ ইউ প্লিজ। বলে তাদের দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

পরিচয় বিনিময়ের পালা শেষ হতে শালি শঙ্করকে বলল, এস আমরা নাচ সুরু করি। ওদের দুজনকে একটু অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দেওয়া যাক।

—কিন্তু আমি যে নাচতে জানি না শালি।

তাথ শঙ্কর, তোমরা ইনডিয়ানরা যে কেউ নাচতে জান না আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু চেয়ে দেখ, নাচের ফ্লোর ভরে গেছে। হল ভর্ত্তি ডান্সিং ফ্লোরে কেউই নাচতে পারে না। সব কাল লুটতে এসেছে। কাজেই লজ্জার খোলস ছেড়ে উঠে এস।

তাদের ওপর রেকর্ড প্লেয়ারে একখানা রেকর্ড চাপান ছিল। একটার পর একটা বেজে যাবে। বাড়া তিন ঘণ্টা যে পায় পার্টনার নিয়ে এরই ফাঁকে ফাঁকে নেচে যাও। তিন ঘণ্টা বাদে ঘড়িতে বারোটা বাজবে তখন সব শেষ হয়ে যাবে।

একটা গণ্ড সং হচ্ছিল। "অলি…ঘাই লাভ… লেট আস ওয়াক…থ্রি মিভো…ও…ও"

তাতে কেউ টুইষ্ট করছে, কেউ কুইক নাচ নাচছে, কেউ বা স্লো ডান্স করছে। অত ভীড়ে কেউ কিন্তু নাচতে পারছে না।

শালি আর শঙ্কর একটা কোণ ঘরে নাচতে লাগল। স্লো ওয়ালজ।

শঙ্কর নাচতে পারছিল না। শালি তার কোমর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁকাতে লাগল আর নাচের ষ্টেপ শেখাতে লাগল।

আশে পাশে কেউই কিন্তু তাদের লক্ষ্য করছে না। সকলেরই নমনীয় অবস্থা।

জান শালি, আমি সামনের সপ্তাহ থেকে ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটালে ট্রেনিং নিতে যাব।

সে ত অনেক দূরে। পোর্টোবেলার কাছে। সমুদ্রের তীরে। পোর্টোবেলায় তুমি কখনও গেছ কি?

না। সে কোথায়?

এডিনবরার ইষ্ট এণ্ডে। পোর্টোবেলার এডিনবরার বন্দর। চমৎকার জায়গা। ইষ্টার্ণ-জেনারেল হসপিটালটা তারই কাছে। তোমার কিন্তু রয়াল টেরাস থেকে একটু দূর হবে। জায়গাটা শহরের কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে।

নাচটা শেষ হতেই কিছুক্ষণের বিরতি দেওয়া হল। যে যার নিজের নিজের চেয়ারে বসল গিয়ে।

আরে একি! হেম আর নর্মা কোথায় গেল? শঙ্কর বলে।

শালি মুখ টিপে হেসে বলে তোমরা না নাচবার জন্যে আজ-কর সোশালে এসেছিলে। যাকগে ভেবনা ওরা হারাবেনা। ঠিকই হাজির হবে।

বারোটা বাজতেই নাচের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। যে যার ওভারকোট পরে বাইরে বেরোতে লাগল। এমন সময় চন্তদন্ত হয়ে নর্মা আর হেম এসে পৌঁছাল।

তারপর গায়ে নিজেদের ওভারকোটগুলো চড়াল।

কি ব্যাপার! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি ভেবে মরি। শঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

আর ভাবনার কি আছে। ভেতরকার গরমে মাথা ধরাতে আমরা একটু বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়েছিলাম।

নর্মা ব্লাশ কর না। আমি জানি তোমরা কোথায় গিয়েছিলেন। শালি হাসতে হাসতে বলে।

জানলার বাইরে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ বাউ গাছটার নীচে তোমরা এতক্ষণ ছিলে। নর্মার চুলে কাউয়ের পাতা দেখেই আমি ধরেছি। আর হেমের ওভারকোটের হাতায় লিপষ্টিকের ছাপ। রুমালেও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

কাজেই বুঝই ব্যাপারটা। বলে রুমালে মুখ চাপা দিয়ে খুক খুক করে হাসতে থাকে শালি। আর নর্মা ব্লাশ করেই চলে। [ক্রমশঃ

হাতের কথা

সুরাচার্য

এবারেও এক অদ্ভুত জীবনের হাতের আলোচনা করছি। ভদ্রলোকের দুটি হাতের রেখাগুলি দেখুন বিভিন্ন রকমের। কাজেই তাঁর জীবনের যে অনেক পট পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং অনেক নূতন ভাবের সমাগম হয়েছে এ কথা সহজেই বোঝা যায়। বাঁ হাত থেকে আমরা পাই জন্মগত ব্যবস্থা জন্মগত প্রকৃতি, স্বভাব, সুযোগ ইত্যাদি। ডান হাত দেখায় মানুষ নিজের চেষ্টায় কী অবস্থায় দাঁড়ালো কারণ বাঁ হাতকে বলা হয় বংশগত হাত। ডান হাতকে ধরা হয় ক্রিয়াশীল, পরিবর্ত্তন সূচক হাত।

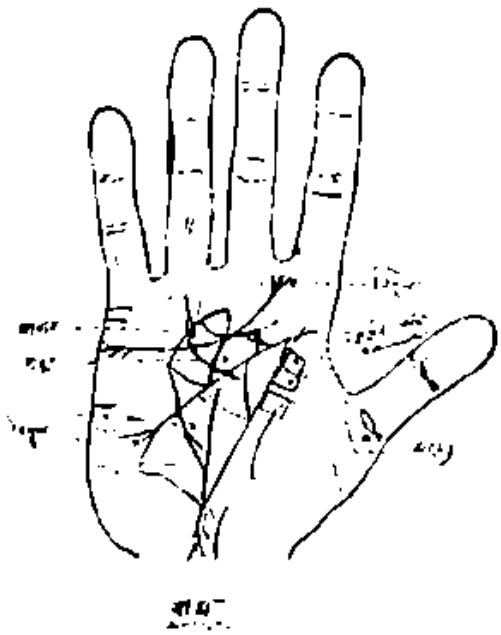

প্রথমেই দেখুন বাঁ হাতটি পুষ্ট চৌরস আঙুল গুলি সরল ও সোজা। চৌকো হাতের লক্ষণ সর্ব্ব বিষয়ে সমদৃষ্টি, সামাজিকতা, মানান সই বুদ্ধি বিবেচনা, রক্ষণশীলতা, পারিবারিক সুব্যবস্থা, বিনা প্রমাণে কোন জিনিসকে গ্রহণ না করা, কিন্তু এই হাতে মস্তিষ্ক রেখা অনেকটা ঝুঁকে পড়ায় বাস্তববাদিতা পূর্ণমাত্রায় থাকতে পারে না। বরং কাল্পনিক প্রভাব এসে পড়ে, এবং নূতনের আস্বাদন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জাগিয়ে তোলে। কাজেই ভদ্রলোক বাহ্যতঃ বাস্তববাদী হলেও কল্পনার অনুসরণ করবেন। এবং এইসব বিষয়ের চর্চা করতে যা তাঁর বংশে কোনদিন ছিল না। বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। (আঙুলের নীচে পর্ব্বতগুলি উঁচু)। প্রায় ২৭ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পিতৃদেবের পর্ব্বত আড়ালে ছিলেন এবং নিজের খেয়ালে চলবার বেশ সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাস, দাবা, কেরম বিলক্ষণ খেলতেন। ঘরের বাহিরে ফুটবল, ক্রীকেট, ব্যাডমিণ্টন, সাইকেল নিয়ে লম্বা পাড়ি এই সব sports recreationএ তাঁর সক্রিয়উৎসাহ দেখা যেত। বাঁ হাতের মস্তিষ্ক রেখার শেষে তিনটি শাখা থাকায় সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা ও উৎসাহ ছিল, ছোটবেলা থেকেই নানা খেলাধূলায় উৎসাহ ছিল। কতকটা পারদর্শিতাও ছিল। অবশ্য উৎকর্ষ অধিকদূর অগ্রসর হয়নি। পড়া লেখাতেও ছাত্র খারাপ ছিলেন না। বিদ্যালয়ে প্রথম কয়েক জনের মধ্যেই থাকতেন। অবশ্য কলেজের লেখা পড়ায়—উচ্চাঙ্গের কিছু হয়নি, সাধারণ ভাবে বি, এ পাশ করেন।

graduate হয়ে তিনি ভাবলেন—যাক্ বাঁচা গেল! আর পরীক্ষায় বসতে হবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে আসল পড়াশোনা, ঠিক ছাত্রের মত, সুরু হোল তখন থেকে। ডান হাতের মস্তিষ্ক রেখা ২১ বৎসর বয়স হতেই তেজের সহিত নূতন ধারায় প্রবাহিত।

উভয় হাতে ভাগ্য রেখা ভগ্ন। কাজেই ভাগ্য ভঙ্গ হোল। মজাসে সবেকি চাল যা চলছিল তাতে পূর্ণচ্ছেদ এসে পড়ল। বড় বাড়ী ছেড়ে ছোট বাড়ীতে বাস সুরু হোল। Jonit family ভেঙ্গে Small unit হোল। ডান হাতে ভগ্ন পিতৃরেখা (Life lines ইংরেজি মতে) তার প্রমাণ দিচ্ছে। এই ভগ্ন পিতৃরেখা পুনরায় পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষয়, ক্ষতি, অপচয় ইত্যাদি জানাচ্ছে।

বাঁ হাতের হৃদয় রেখা বিশেষ প্রবল ও বলবান। কাজেই স্নেহমায়া ভালবাসা দিয়ে তাঁর জীবন গড়া। পিসি মাসী খুড়ী জেঠী অনেকেই খুব স্নেহ করতেন, এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও স্নেহ দিয়ে আগলে রাখতেন। ডান হাতে ভগ্ন হৃদয় রেখা স্নেহপুষ্ট জীবনের উপর প্রচণ্ড কোপ হানলে। স্বাস্থ্যহানি করলো এবং মানসিক বল ও সাহস খর্ব্ব করলো। ডান হাতের আকৃতি দেখুন, বাঁ হাতের মত চৌরস নয়। আঙুলের নীচে পর্ব্বতগুলি অপেক্ষ কৃত কমস্থান অধিকার করার জন্য ছোট দেখাচ্ছে। কিন্তু হাতের মধ্যস্থানে দুইটি মঙ্গলের ক্ষেত্র সমেত জায়গাটি ফেটে পড়েছে। কাজেই মঙ্গলের লড়াই ভদ্রলোকের জীবনে এসে গেল। মস্তিষ্ক রেখাও গভীর ও বলবান হওয়ায় নিজের চিন্তাধারার বলিষ্ঠ রূপ ও চেষ্টা দেখা যায়।

তাঁর বাঁ হাতের মস্তিষ্ক রেখায় বুদ্ধির দীপ্তি আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তুদুর্বল আত্মবিশ্বাস তার সঙ্গে জড়িত। কাজেই শান্ত পরমুখাপেক্ষী ভাব নিয়ে কাটল বাল্যকাল। শনির স্থান উচ্চ থাকায় তিনি ছিলেন ধীর, স্থির গম্ভীর প্রকৃতির। আপন ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। সব কিছুরই গভীরতার দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর বেশী। কি পড়া কি খেলা সবেতেই ছিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। দায়িত্ববোধ ছিল যথেষ্ট, অথচ দায়িত্ব পালন করার উপযুক্ত ব্যবহারিক জ্ঞান বিশেষ ছিলনা। এই অবস্থায় শুধু পৈতৃক সুযোগ নষ্ট হলো না, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হোল নানান গৃহ বিশৃঙ্খলায়। মনে ছিল উচ্চাশা, অনেকটা কাল্পনিক বলা যেতে পারে। সাইহোক্ দেহ হার স্বীকার করলেও মন চাইলো ঠেলে উঠতে নূতন পথ ধরে। এই সময় তাঁর নজরে পড়ে যায় Cheiro'র অমরবাণী—"To belive is to perceive either by the senses or the soul"

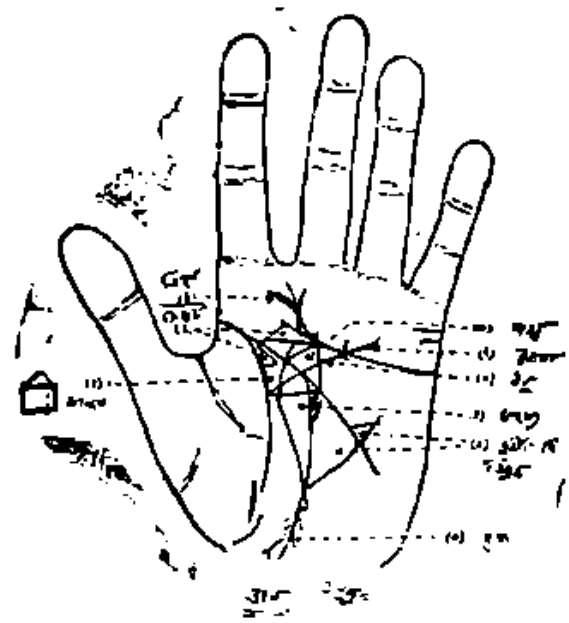

কথা কটি এক নূতন উদ্দীপনা ও জাগরণ সৃষ্টি করলো তাঁর অন্তরাত্মায়। তিনি আরো পড়লেন

The greatest trnth may lie in smallest things

The greatest good in what we most despise

The greatest light may from grosn the daykest skie

The greatst chord from e'en the weakst strings

জীবনটা যে ব্যর্থ নয়, তার একটা বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজন আছে, এই বোধ জেগে উঠলো এই কবিতাটি পড়ে। সত্যই Cheiro এনে দিলেন এক নূতন আলোকের সন্ধান। তাই ভাঙ্গা হাটে আলোর মালা দেখা গেল।

বা হাতে শুধু ক্রশ, মস্তিষ্ক রেখা ও হৃদয় রেখার মাঝে। কাজেই তিনি শুধু বিদ্যায় ব্রতী হলেন।

হস্তরেখা, জ্যোতিষ, সংখ্য-বিজ্ঞান (numero-

logy) হস্তলেখা বিচার (graphology), যোগ ব্যায়াম, ধর্ম্মসাধনা এই সব নিয়ে পড়লেন। বা হাতের মস্তিষ্করেখা উচ্চ চন্দ্র ক্ষেত্রের দিকে ধাবমান বুধের ক্ষেত্র উচ্চ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী দীর্ঘাকার, শনির স্থানও উচ্চ। কাজেই বিরাট গুহ্য ক্রশ নানান বিষয়ের গুহ্যবিদ্যায় অনুরাগী করলো। ডানহাতেও গুহ্য ক্রশ থাকায় ভিতরের প্রেরণা কার্য্যে পরিণত হোল। বিশেষ করে হৃদয়রেখা ভঙ্গ হয়ে যে চন্দ্ররেখা উৎপন্ন করেছে এটি কেহ কেহ হস্তরেখা বিদ্ বলেন—"Singular aptitude of occult learning"

ডান হাতের তর্জ্জনী একাকী আলাদা ও আপন জোরে দণ্ডায়মান থাকায় ভদ্রলোকের মতবাদ নিজস্ব ও স্পষ্ট। তাঁর কাজও উপদেষ্টার। অনামিকার অগ্রভাগ চওড়া হয়ে যাওয়ায়, হাস্যরসিক ও ব্যঙ্গভাব বর্ত্তমান। কোন কিছুকে ভাল করে সাজিয়ে বলতে বা দেখাতে পারেন যাতে telling effect হয়। ডান হাতের আঙুলগুলি পাকিয়ে গোলাকার হয়ে গেছে, কাজেই নিজের অনেক fads এসে পড়েছে। সকলের সঙ্গে মিশেও তিনি যেন আলাদা। ডান হাতে ভাগ্যরেখা বৃক্ষাকারে শাখা প্রশাখা নিয়ে উঠেছে। কাজেই তাঁর কর্ম্মধারাও নানান্ দিকে ব্যাপৃত হয়ে যাচ্ছে। রবি রেখা ডান হাতে হৃদয়রেখা থেকে ভালই উঠেছে, অবশ্য ছাপে তেমন ভাল দেখা যাচ্ছে না। পর্ব্বতের মধ্যে শুক্র, বুধ, শনি, চন্দ্র, মঙ্গল (Negative) বলবান্। বৃহস্পতি উচ্চতায় মাঝারি পরিসর ভাল, বাঁ হাতের রবিস্থান দাবা, কাজেই সাহায্যকারী পারিপার্শ্বিক পান নি।

এবার কতকগুলি চিহ্ন দেখুন।

বাঁ হাতে মধ্যমার নীচে ত্রিশূল হৃদয় রেখা ও মস্তিষ্ক রেখা এমন কি জীবনী রেখা ত্রিশূলাকারে সমাপ্ত. মস্তিষ্ক রেখা ও হৃদয় রেখার মাঝে মধ্যমার নীচে শঙ্খ তার গায়েই হেলান বড় মন্দির চিহ্ন যার শীর্ষ ভাগ শনি রবি পর্ব্বতের মধ্যস্থানে। পুনরায় মস্তিষ্ক রেখার ঠিক নীচে মস্তিষ্ক রেখা ও জীবনীরেখা নিয়ে বড় মন্দির চিহ্ন হইয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতে মৎস্যচিহ্ন দেখুন। ডান হাতে ত্রিশূল, ত্রিভুজ, মন্দির, মৎস্য চিহ্ন লক্ষ্য করুন, বিশেষ করে ধনু ও নৌকা চিহ্ন। এখন দেখুন হাতে বাস্তবিকই শুভাশুভ চিহ্ন থাকে, এগুলি নিছক গাঁজাখুরী কথা নয়। চিহ্ন যখন আছে তখন কি তারা বিনা মানে নিয়ে বসে আছে বলতে পারেন? মানে প্রত্যেকেরই আছে এবং থাকে বিশিষ্টভাবে।

ত্রিভুজ চিহ্ন বুদ্ধির কুশলতা প্রদান করে। এবং লোক চালনার ক্ষমতা দেয়। চতুষ্কোণ নিরাপত্তা ও অধিকার সূচক বা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। মৎস্যরেখা সমৃদ্ধি ও অভাবহীনতা, শঙ্খ সুনাম, যোগ্যতা, পরামর্শ দাতৃত্ব, ধনু রেখা উচ্চাভিলাষ ও চেষ্টা, মন্দির চিহ্ন সদ্‌ভাব সৎকাজ। ক্রশ চিহ্ন বিপর্য্যয়, কিন্তু শুভভাবে থাকলে বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতায় লাভ। তারকা কতকটা চমৎকার বা বিস্ফোরণ কারক বা চিহ্নের শুভাশুভ প্রকারের উপর অর্থাৎ চিহ্নের দীপ্ত কি বিকৃত অবস্থা প্রমাণ করে। বৃক্ষ সমৃদ্ধি প্রসার ও পরোপকার প্রভৃতির নির্দ্দেশক, ত্রিশূল সততা ও ধর্ম্মসাধনার উন্নতি।

এই ভদ্রলোকের জীবনে যদি সংঘাত না আসতো, তাহলে ইনি সংসার যাত্রায় সুখে কাল কাটিয়ে সাধারণ আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতেন বড় জোর। কিন্তু দারিদ্র্যের ও বিপদের সংঘাত ও নিষ্পেষণে তার ভিতরের রস নিঙড়ে বার করে এনে স্বকীয় উপলব্ধির ও জন কল্যাণকর কতকগুলি যোগ্যতা ও বৃত্তির উদয় ঘটালো। এবং জীবনের বাস্তবিক তাৎপর্য্য কি এই অনুসন্ধান তাঁর ক্রমাগত চলেছে। কাজেই দারিদ্র্য বা পরিবর্ত্তন নিন্দনীয় বা ভয়াবহ নয়। সংরক্ষণশীলতা অনেকাংশে ভাল হলেও সবটা ভাল নয়। জীবনের ঘটনা পরম্পরার যে নূতন প্রবাহ এবং তার প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সংস্কার, মন, পরিবেশ ইচ্ছা অভিরুচি সবই বদলাচ্ছে। কাজেই এই গতির প্রবাহে অন্ধ স্থিতি সম্ভবপর নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। এবং গতির প্রবাহ আছে বলেই যে স্থিতির মূল্য বা প্রয়োজন নাই এটাও ভুল ধারণা। মিলিয়ে চলাই প্রয়োজন, তবে নিজের সত্তাকে ভুলে নয়, সত্তার অস্তিত্ব রেখে। কাজেই পুরুষকার দরকার, সবটা অদৃষ্টে ফেলে চলেনা আর সবটাও পুরুষকার লব্ধ নয়। কাজেই সামঞ্জস্য

একমাত্র বার্ত্তা। হাতের চিহ্নগুলি সেই বার্ত্তার দ্যোতক। কেহ অদৃষ্টবলে গ্রহণ করেছেন, কেহ পুরুষকার বলে গ্রহণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বা রুচি অনুযায়ী। মোট কথা যেমন ভাব, তেমন লাভ। এটা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, হাতের চিহ্নগুলি পড়া দরকার তাদের বার্ত্তা কি জেনে কাজে লাগাবার জন্যে। তা না হলে অন্ধকারের ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর্দ্ধেক জীবন কেটে যাবে, বোধ যখন আসবে তখন দেখা যাবে কবর খোঁড়ার সময় এসে গেছে। কাজেই এ শাস্ত্রের বার্ত্তা অবহেলা করে লাভ কি? হস্তরেখার আলোকরেখা আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে, এটুকু জোর করে বলতে পারি।

এই ভদ্রলোক জীবন আরম্ভ করেছিলেন High living, plain thinking'য়ের platformএ। তিনি এখন এগিয়ে চলেছেন তার একেবারে উল্টো রাস্তা দিয়ে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন। plain living high thinking'ই জীবনের আসল পথ। ত্রিশূল, শঙ্খ, মন্দির এই সব চিহ্নগুলি এই চেষ্টা ও সাধনায় যথেষ্ট সাহায্য করছে। গতানুগতিক ভোগ মার্গ হতে জ্ঞান মার্গে অভিযান এটা এই দুই হাতে স্পষ্ট রেখায় দেখিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দরকার চোখ কান খুলে রাখা, এবং প্রকৃতির ইঙ্গিত উপলব্ধি করার জন্য যথার্থ সচেষ্ট হওয়া।

অগ্রহায়ণ মাস কেমন যাবে?

কার্ত্তিক মাসের সাধারণ রাষ্ট্রগত ফলাফল যা লিখেছিলাম তা পড়ে থাকবেন। রাজনৈতিক আবহাওয়া কিরকম গেল এবং অন্যান্য দাঙ্গা হাঙ্গামা লুঠ তরাজ যা কার্ত্তিক মাসে ঘটেছে তা অনেকেই দেখে থাকবেন বা পড়ে থাকবেন। এ থেকেই বুঝতে পারছেন জ্যোতিষ দৃষ্টিতে আগামী ঘটনার ছায়াপাত বা রেখাপাত হয় কিনা। সমগ্র পৃথিবীতেই অত্যন্ত অশান্তিকর অবস্থা চলেছে। মত বিরোধ, দ্বন্দ্ব দিকপালদের মধ্যে ঘটে উলু-খাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে। বোধ হয় এই চিরাচরিত প্রথা বা ইতিহাস। যাইহোক এখন রাষ্ট্রগত অগ্রহায়ণ মাসের গ্রহ ফল কি দেখা যাক্।

গ্রহরাজ রবিগ্রহ ক্রুর বরুণগ্রহের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন এবং উভয় পার্শ্বে মঙ্গল ও প্রজাপতি গ্রহদ্বয় দ্বারা বৈর দৃষ্টিতে আক্রান্ত। কাজেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজসরকারের অবস্থা সহজ এবং সুখময় থাকা সম্ভব নয়। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের অবস্থাও সঙ্কট জনক চলবে। কার ঘাড়ে কী রকম কোপ কখন পড়ে, বলা শক্ত। ততক রাজশক্তি টলটলায়মান হবে। মঙ্গল ও প্রজাপতি গ্রহদ্বয় রক্তপাত, দুর্ঘটনা, হঠাৎ তুমুল আলোড়ন প্রভৃতির কারক, কাজেই একটা নূতন ধরণের অদ্ভুতপরিস্থিতি এসে ফেলতে পারে। তার মধ্যে থাকবে অনিশ্চয়তা উদ্বেগ রেষারেষি ও নানাবিধ উৎকট অশান্তি। গুপ্তচক্র, মন্ত্রণা, ambwsh ইত্যাদি প্রচুর বৃদ্ধি পাবে। এক কথায় বিশ্বাস বস্তুটি দুর্লভ হয়ে পড়বে, দেখা যাবে সে যায়গায় বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং নানাবিধ Torpedo-like action, কাজেই আজ যিনি বুক ফোলাচ্ছেন কালকেই তিনি অজ্ঞাত কারণে চিৎ বা কাত হয়ে পড়বেন। এই গ্রহফলে দেশের দশের ও বিশ্বের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে, ক্ষীণ আশা দেখা যায়। বিশেষ করে কলিকাতায় নানা দুর্বিপাক ঘটতে পারে। সিংহ লগ্ন বা সিংহ রাশির লোকেরও দিকদারি বিলক্ষণ হতে পারে।

বুধগ্রহ রবিগ্রহের ন্যায় আক্রান্ত হওয়ায় উগ্র বুদ্ধির প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আপোষ মিলন চিন্তা অপেক্ষা যুদ্ধং দেহি ভাবই সবমকে তরোয়াল ঘোরাবে। এর মধ্যে যদি সামান্য কিছুও ভাল হয় ত অনেক জানবেন।

এখন ব্যক্তিগত মাসফল সংক্ষেপে বলি।

বৈশাখে জন্ম যাঁদের—তাঁদের অগ্রহায়ণ মাস কর্ম্মময়। ঝামেলা অনেক থাকবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সব ঠেলে যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। নিজের কাজের প্রচার করার এই সময় মুখ বুঁজে বসে থাকবেন না, নিজের trumpetয়ে ঘন কাঠি বাজান কারণ সভ্যের ভিত্তিতেই এটা বাজান হবে। Speculation করলে লুকসান হিন্দি ভাষায় বলতে গেলে। উদর যাতে ভাল থাকে তার জন্য খাওয়া দাওয়ার নিয়ম মানা বাঞ্ছনীয়। সন্তান সম্বন্ধীয় ফল সুখকর নয়। জ্ঞাতি আত্মীয় প্রভৃতি-

বেশী নিয়েও সুখ দেখিনা। চিঠি পত্র বুঝে সুঝে সংযত ভাষায় লিখবেন এবং কোথায় কি সই করেছেন, দেখে নেবেন। পরের কথায় ধপাধপ সই দেবেন না। যদি অবিবাহিত হন, বিবাহের ব্যাপারে এগিয়ে আসুন। যদি ব্যবসায়ী হন, public relation বাড়াবার চেষ্টা করুন।

আপনাদের এবার আয় বাড়ার পথে, চিন্তার কারণ নাই।

জ্যৈষ্ঠে জন্ম যাঁদের—আপনাদের অপব্যয় কমে যাবে, চেষ্টা করলে হয়ত কিছু জমাতেও পারেন। দুশ্চিন্তা ঝঞ্ঝাট যাই থাক, সব সামলে নিতে পারবেন। শত্রু দমনের চিন্তা ত্যাগ করুন, নিজের কিসে ভাল হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখলে ভিতরে ভিতরে solid base করতে পারবেন। অমায়িক ভাবে চলাই বাঞ্ছনীয়। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা, পারিবারিক অশান্তি, সম্পত্তিগত গোস-যোগ, বন্ধুদের সহিত মনোমালিন্য এই সব এসে পড়তে পারে। কর্ম্মে নজর রাখুন এবং সাহসে ভর করে এগিয়ে যান। বিবাহিতদের পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য মন ভাল থাকবে না। অবিবাহিতদের বিবাহ এই মাসে avoid করতে পারলেই ভাল। আমি অবশ্য স্থিরীকৃত বিবাহের বাক্‌ভঙ্গের পক্ষপাতী নই। যদি কথা দিয়েই থাকেন, ভগবৎ বিশ্বাসে এগিয়ে যান। মাতার স্বাস্থ্য ভাল না থাকার কথা। বিদ্যালাভে বিঘ্নবাধাও রয়েছে।

আষাঢ়—আপনাদের ভাগ্য বৃদ্ধির পথে। ভাগ্যস্থ রাহু লাভস্থ শনি আপনাদের প্রতিষ্ঠার ভাল ব্যবস্থা করছে। বৃহস্পতি শুক্র তুলায় এসে আপনাদের আরো উন্নতি করবে। তৃতীয় স্থান ভাল দেখিনা, ভাগ্যাধীশও বেশ বেকায়দায়, কাজেই জ্ঞাতি আত্মীয় প্রতিবেশী থেকে সুখ দেখিনা, তাঁদের নিয়ে অনেক সময় মাথা ব্যথা হতে পারে। পারত পক্ষে ছোটখাটো ভ্রমণ বাদ দেবেন, এবং কাগজে পত্রে বুঝে সুঝে সই দেবেন বা কোন মন্তব্য করবেন। সাংসারিক সুখও তেমন দেখছিনা আপনাদের। নানারূপ চুরি-চামারি দ্বারা আপনা-দের কিছু ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কাজেই নিজের জিনিসে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। বন্ধু বান্ধব কিছু অধিক Smart হয়ে আপনার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে পারে। কাজেই যদি দেখেন কাঁঠাল হাতে এগোচ্ছে, মাথা খানা হেলিয়ে দিয়ে বন্ধুদের অপচেষ্টাটি পণ্ড করে দেবেন। শুভবুদ্ধি আপনার মাথায় অনেক এসে হাজির হবে, অবশ্য কতকগুলির উপর সন্দিহান হয়ে পড়বেন বা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সেগুলিকে যথাযথ সমাদর করতে বা কার্য্যকারী করতে নাও পারেন। শত্রুর নিপাত হবে সত্যি, কিন্তু আপনার মাথায় আগুনের হলকা কি কম বইবে। দুঃসাহসের কাজ করে ফেলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবেন না. বিবাহ না করে থাকলে বিবাহে আর আপত্তি কেন? কর্ম্মে বদলী হলে আশ্চর্য্য হবেন না।

শ্রাবণ—আপনার যাতে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় সেই দিকে চেষ্টা চালিয়ে যান। কর্ম্মে যথেষ্ট দায়িত্ব থাকলে অনেক বোঝা হালকা করতে পারবেন। পড়াশোনায় যতটা পারেন মনোনিবেশ করুন। তবে লাভ যা হবে তাতে মন ভরবে না। জ্ঞাতি আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের সহিত ব্যবহার ভাল ভাবেই করবার চেষ্টা করুন। কর্ম্মযোগ্যতা দেখানোর কোন অসুবিধা দেখিনা। বিবাহ বা প্রণয় ব্যাপারে সুখী হতে পারবেন। তবে হঠ-কারিতা কোরবেন না। সবুর করুন, মেওয়া ফলতে পারে। সন্তান যাঁদের আছে তাঁরা সন্তান সম্বন্ধে সর্ববিষয়ে যত্ন নেবেন, অবহেলা করবেন না। বাড়ীতে শুভ অনুষ্ঠান লাগতে পারে।

ভাদ্র—আপনাদের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক থাকবে। টাকাকড়ি ধার দেবেন বুঝে সুঝে। বিশ্বাসের ভরসায় এগিয়ে গেলে দেখবেন বিশ্বাসের মুণ্ডচ্ছেদন হয়ে গেছে। বন্ধুদের ব্যবহার অতি অপ্রীতিকর বা তাদের কারণে অন্যবিধ ক্ষতি এসে যেতে পারে। সাংসারিক কারণে প্রচুর ব্যয় বেড়ে যাবে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা অশান্তিই বা কম কিসে? বাধা বিঘ্ন যাই থাক ভাগ্য বৃদ্ধি কিছুটা হবেই। অল্প গোলমালে ভড়কে যাবেন না, সাহসের লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে যান। আলো পথ দুই-ই পাবেন।

আশ্বিন—জগতে আত্মীয় প্রতিবেশী নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে আপনার বেশ বেকায়দা। অধিক তেজ দেখিয়ে শুভ সুযোগগুলি হারাবেন না। আবহাওয়া আপনার অশান্ত ও থমথমে। বুদ্ধির তৎপরতা দিয়ে অনেক কিছু manage করতে

হবে, পারবেনও। লাভ মোটামুটি খারাপ দেখি না। বেশী অশান্ত হয়ে পড়ে নিজের tension বাড়াবেন না। শত্রুতা কেউ বেশী করলে, দু এক ঘা বসিয়ে দিলেই অনেকটা কাজ হবে। বিদ্যার চেষ্টা বাড়ান। সন্তান সংক্রান্ত care নেবেন। তারা কেউ কেউ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বিপদ না ডেকে আনে!

কার্ত্তিক—আপনার পারিপার্শ্বিক দুশ্চিন্তা অনেকটা কাটবে; শনি রাহুর দৃষ্টিতে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য এতদিন মোটেই পাচ্ছিলেন না। বৃহস্পতি শুক্র আপনার রবি রাশিতে এসে আপনার অনেক অশান্তি দূরীভূত করবে। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাবে এবং স্বামী বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য, মন ভাল থাকবে। এবং যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহ যোগ ভালই এসে পড়ল। 'শুভস্য শীঘ্রং' বুঝে নিয়ে অথবা এই ব্যাপার postpone করবেন না। আয় সংক্রান্ত আপনার উদ্বেগ আছে, এটার বিশেষ লাঘব দেখি না। বরং হাতে পয়সা রাখাই সমস্যা। তবে হ্যাঁ, বে-কায়দার অবস্থা এসে পড়লে কোথা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ এসে গিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা দূর করে দেবে। গৃহবাটী পরিবর্ত্তনের পক্ষে সময় ভাল। যাঁদের পয়সা কিছু বেশী এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির দিকে নজর রাখেন তাঁরা এই বিষয়ে উৎসাহী হলে কাজ এগোবে।

অগ্রহায়ণ—আপনাদের মাথার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে যাবে। তবু স্থির থাকতে পারবেন আশা করি। সাহস ও তেজ হারাবেন না। এই দুটোই আপনাদের প্রধান সম্বল। উপস্থিত বুদ্ধিও আপনাদের অনেকটা সাহায্য করবে। বাড়ী ঘর বদল করার ইচ্ছা থাকলে সচেষ্ট হন। পিতার কারণে উদ্বেগ চলছে। তাঁর শারীরিক দুর্ভোগ অধিক দেখা যায়। কর্ম্ম জীবনে বা চাকুরীতে বিশেষ শান্তি নাই, এই মাসে আরো একটু খারাপ হতে পারে। সাংসারিক পারিবারিক ব্যাপারে কিছু উন্নতি সাধন করতে পারবেন। কর্ম্ম জীবনের প্রসারতায় বাধা দেখছি। ছোটখাটো ভ্রমণের সুযোগ পেলে নিয়ে নেবেন। তাতে অনেক দিক দিয়ে ভাল বোধ করবেন। জ্ঞাতি আত্মীয় প্রতিবেশী এঁদের ব্যাপারে উৎসাহী হলে মান আনন্দ দুই পাবেন। কোন সহোদর বা সহোদরার হঠাৎ অনর্থ ঘটতে পারে।

পৌষ—আপনাদের ভাল আয় আশা করি। তবে ব্যয়ের মাত্রাও কম নয়। আপনার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ভালই থাকবে। অনেকে হুকুম তামিল করতে দ্বিধা করবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল দেখি না; সে কারণে অনেক ব্যয়ও দেখা যায়। মামলা মকদ্দমা avoid করুন। বিদেশ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই সুবিধাজনক দেখি না। গৃহের দায়দায়িত্ব কিছু বাড়বে। কর্ম্ম সংক্রান্ত মাথা ব্যথা মধ্যে মধ্যে এসে পড়বে। ব্যস্ত হবেন না, স্থির হয়ে কাজ করলে অনেক বিষয়ে সুবিধা করতে পারবেন।

মাঘ—কর্ম্ম ব্যাপারে অনেক সুযোগ সুবিধা এসে পড়বে। কিছু মান সম্ভ্রমও বৃদ্ধি পাবে, অবশ্য দায়-দায়িত্ব যেটা আছে সেটা এড়ানো যাবে না। সাহস ও তৎপরতার সহিত এগিয়ে যান, অনেক বাধা দূর হয়ে যাবে। অর্থনাশ যা ঘটছিল তা এবার কিছুটা কমবে, আয়ও বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক গোছগাছ যা ভাল তা করবার জন্য সচেষ্ট হন। পাকা ভিত্তিতে গৃহাদি ব্যাপারের অনেক সুবিধা করে নিতে পারবেন। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা ফল বা উন্নতি করতে পারবেন। মধ্যে মধ্যে হজমের গোলমাল দেখা দিতে পারে। কতকটা নিয়মের মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। অবিবাহিত যাঁরা তাঁদের বিবাহ যোগ হঠাৎ এসে পড়তে পারে। যাঁরা বিবাহিত তাদের পতি বা পত্নীর মেজাজ একটু কড়া থাকবে মনে হয়।

ফাল্গুন—কর্ম্ম বিষয়ে আপনাদের খুব তৎপর থাকতে হবে এই অগ্রহায়ণ মাসে। অনেক ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এসে পড়তে পারে। গুপ্ত শত্রুতা করার চেষ্টা করবে কেউ কেউ। তবুও আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম বজায় থাকবে। অন্যবিধ ভাগ্যোন্নতি ঘটবে, আশাকরি। অর্থ সংক্রান্ত শুভফল হবে। ধর্ম্ম ব্যাপারে উন্নতি করতে পারবেন; তীর্থপর্য্যটনে অনুরাগী হলে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হবেন। গৃহাদি ব্যাপারে অভিলাষ চরিতার্থ হবে। সম্ভব স্থলে যানবাহন যোগও দেখা যায় সহোদরদের কিছু সুবিধা ঘটতে পারে। এবং তাঁদের সহিত প্রীতির বন্ধন বাড়তে পারে। পুনশ্চ সহোদরাদির

হঠাৎ ঝঞ্ঝাট ভোগ হতে পারে। অবশ্য মোটের উপর তাদের অবস্থার উন্নতি আশাকরা যায়। সন্তান সংক্রান্ত উদ্বেগ এসে পড়বে, তাদের tension কিছু থাকতে পারে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য, মন ভাল থাকবে না। অবিবাহিতদের এই মাসে বিবাহের পক্ষে অনুকূল নয়। ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁদের ব্যবসায় অনেক অন্তরায় এসে পড়তে পারে। public relations suffer করতে পারে।

চৈত্র—আপনাদের চতুর্দ্দিকে নরম হাওয়া। নিজেও কতকটা বেপরোয়া হয়ে যেতে পারেন। অর্থসংক্রান্ত লাভ উন্নতি আশাকরি। অপব্যয় কিছু কমলে পাকে-চক্রে আপনার শত্রুধ্বংস হবে. আপনার বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন হবেনা। আয় ভাল হবে। মাথাও খুলবে বেশী। সাহস ও তৎপরতার সহিত কাজও করতে পারবেন। ধর্ম্মব্যাপারে উন্নতির আশা কম। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট অনেক এসে পড়বে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। অবিবাহিতদের বিবাহে বিঘ্ন-বাধা এসে পড়তে পারে। মামলা মকদ্দমায় সুফল দেখিনা। ব্যবসায়ে মধ্যে মধ্যে অনর্থ এসে দেখা দেবে। ৪।১১।১৯

———

প্রশ্ন বিচার ও উত্তর

১। শ্রীসঞ্জীব ভট্টাচার্য্য—খাড়াই।

আপনার পত্র পাইয়াছি। জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইতেছি।

২। শ্রীমণিলাল নন্দী, শালকিয়া, হাওড়া।

আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার লেখা মনোযোগ সহকারে পড়েন জানিয়া সুখী হইলাম। প্রশ্নের উত্তর শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতেছি।

৩। শ্রীদীপঙ্কর চৌধুরী বর্দ্ধমান।

আপনার ৩০শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। শরীর যাহাতে ভাল থাকে সেদিকে সচেষ্ট হউন। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইতেছি।

৪। শ্রীবিমলকান্তি দত্ত,—বালেশ্বর।

আপনার ২৯শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। আপনার পড়ালেখায় উৎসাহ আছে জানিয়া সুখী হইলাম। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইতেছি।

৫। শ্রীকল্যাণকুমার ব্যানার্জী,

শালকিয়া, হাওড়া।

আপনার ২১শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। অর্থনীতিতে আপনি এম, এ পাস করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা যাইতেছে।

৬। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,—আলিপুর রোড কলিকাতা।

আপনার ২৪শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। আপনার প্রশ্নের উত্তর আলাদা পাঠাইয়া দিতেছি।

৭। কুমারী বিজয়া মুখার্জী,—শাহরাণপুর।

আপনার ২৬শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। আপনি হাতের ছাপটি বেশ সুন্দর লইয়াছেন। উচিত ছিল নীচে আপনার নাম লিখিয়া রাখা।

এর আগের সংখ্যাগুলিতে যাঁদের প্রশ্ন গণনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাঁহাদের নাম এই।

১। শ্রীমণিমোহন পাল।
২। শ্রীঅজয়কুমার বসুমল্লিক।
৩। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৪। কুমারী স্বাধীনা ভট্টাচার্য্য।
৫। শ্রীহৃষীকেশ নন্দী।
৬। শ্রীনরেশচন্দ্র বসু।
৭। শ্রীহড়িৎকুমার গোস্বামী
৮। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পাইক।

আশা করি এঁরা সকলেই যথা সময়ে পত্র পাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি ?

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দেবেন সুরাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাঁদের জন্মচক্র, গ্রহের ফুট, বিংশোত্তরীর দশা যা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri's Ephemenis বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ সুরাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটীর বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন। অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটী ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি 'কুপন'-এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

পত্র লেখার সময় ও তারিখ সঙ্গে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপও পাঠাতে পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্ঘাটনের সহায়ক হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না ; Stamp pad ink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink, Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভুষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে বৃথা খরচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও সুরাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় বা গুরুতর বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন বার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক ! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন।

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা ?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধতে পারবো কি ?" "দেনা শোধ করতে কত সময় লাগবে ?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এইসব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যই আকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনকভাবে মিলে গেলে সুরাচার্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

ভারতবর্ষ কার্ত্তিক—১৩৭৬ গ্রহ-জগৎ

গোঁফ ও রত্নাবাঈ

সমীর চট্টোপাধ্যায়

বউবাজার অঞ্চলে একটা কাঠের দোকানে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গিয়ে হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে জহরচাঁদলালজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। জিনিস পত্র নিয়ে দোকান থেকে বাইরে আসতেই একটা মিষ্টি সুরের ডাক শুনতে পেলাম,—কিতাব বাবু!

ডাক শুনে চমকে পিছন ফিরে তাকালাম। ঐ নামে শুধু একজনই আমাকে ডাকত, সে বারাণসীর বিখ্যাত জহরচাঁদলাল ঠাকুর।

তখনকার সকলে যাকে ডাকত ঠাকুরজী বলে। বারাণসীর গোধূলীয়ায় একটা অতিথি-নিবাসের মালিক। তাছাড়া প্রচুর জমি আর বাড়ী ছিল তার বাবার,—আর একমাত্র ছেলে হিসাবে ঠাকুরজীই সব সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হবার কথা,—অন্ততঃ আমি তাই জানতাম। শুধু জানাই নয়, এই আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু অতবড় জমিদারের একমাত্র তনয় যে আজ একটা দোকানে হেঁট মুণ্ডে বসে, নাকের ডগায় একটা চাঁদির চশমা লাগিয়ে নিবিষ্ট মনে ক্যাশমেমো কাটতে পারে, এমন কল্পনা আমি কখনও করিনি।

কিন্তু এসব কথা ভেবেও আমি তত বিস্মিত হইনি, যতটা হয়েছিলাম জহরচাঁদ লালের মুখের দিকে তাকিয়ে। তার সেই নির্লোম মুখটা দেখতে দেখতে বারাণসীতে দেখা আগের সেই জহরচাঁদ লালের কথা মনে পড়ল। ছ'ফিটের ওপর লম্বা একটা বলিষ্ঠ মানুষ। পাকা সোনার মতন গায়ের রঙ। মাথায় বাবরি চুল। খাঁড়ার মতন বাঁকা—নাকের নীচে ঝুলে থাকা দ্বিতীয়—বন্ধনী চিহ্নের মতন ঈষৎ লালচে একটি রিয়াল গোঁফ, যেটি জহরচাঁদ লালের সঘন লালিত। পংমঘণ্টে যেটিকেদে পরিচর্যকরতো। তার বিন্যাসকরতো। তাকে সাজাতো গোছাতো। তারপর বাড়ী থেকে যথারীতি বেশভূষা করে বার হবার সময় সেই গোঁফে সুগন্ধি চামেলী আতর মাখাতো। তার সারা দেহের মধ্যে বোধ হয় সব থেকে বেশী যত্ন ছিল ঐ বিরাট গোঁফটার প্রতি। ভালোও বাসতো সে সব থেকে বেশী ঐটাকেই। জগতে এত বেশী সে আর কাউকে ভালোবাসত না। আবার ঐ গোঁফই একদিন তার সামনে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জহরচাঁদ লালের জীবন নাট্যে তখন রত্না বাঈয়ের আবির্ভাব ঘটেছে।

কর্মোপলক্ষে বারাণসীতে আমাকে বেশ কিছুকাল থাকতে হয়েছিল। জহরচাঁদ লালের অতিথি নিবাসেই উঠেছিলাম। সেখানে থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থাই আছে। সব কথা বার্তা হবার পর জহরচাঁদ লাল তার বিরাট গোঁফে দুবার হাত বুলিয়ে, খুব চিন্তিত ভাবে ভাঙ্গা বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে বলেছিল,—লেকিন বাবু, ইঁহানে আপনার খানা—পিনার অসুবিধা হোবে নাতো? বলেছিলাম,—কেন?

জহরচাঁদ লাল বলেছিল,—আপনি কোলকাতার বাংগালী বাবু, মছলী না হোলে তো চোলবে না!

বলেছিলাম,—একেবারেই চলবে না এমন কথা বলতে পারি না ঠাকুরজী! আর আমি ওসবের বড় একটা ভক্ত নই।

—বোলেন কী!—তবেতো আপনি আমাদের দলে নাম লিখিয়েছেন—বলেই তার সেই বিরাট গোঁফ নাচিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিল সে।

পরে জেনেছিলাম, ঐ অতিথি নিবাসটা জহরচাঁদ লালের কিছুটা সখের কারবার। ওটা থেকে তার আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ভাগই বেশী। জেনেই তা টের পাচ্ছিলাম। খাবার দাবারের ব্যবস্থা অতি উচ্চ পর্যায়ের। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর আসবাব পত্র। অতিথি নিবাসটা সে করেছিল আরও একটা কারণে, সে কথায় ক্রমে আসব।

প্রচুর ঐশ্বর্যশালী জহরচাঁদলালের বাবা কিষেণচাঁদ ঠাকুর। বারাণসীর গোধূলীয়া আর গণেশ মহল্লায় তার কম করে অন্ততঃ খানদশেক বড় বড় বাড়ী।

সেই বাড়ীর প্রায় বেশীর ভাগই দখল করে বসে আছে বারাণসীর নামজাদা বাইজীরা। সারা ভারত জুড়ে তাদের নাম—ডাক। তাদের এক একটা মুজরোর মূল্য কম করে পাঁচশো টাকা। এক একজনার তিন চার খানা করে গাড়ী,—নানা রকমের।

তার মধ্যে মোটরও আছে, আবার সাবেকী ব্রহাম, আর ল্যাণ্ডোলেটও আছে।

ভাড়ার তাগাদা করতে সেই সব বাইজীদের কাছে জয়চাঁদ লালের যাতায়াত ছিল। কিষেণচাঁদ গোঁড়া লোক। তিনি ও সব বাইজীদের ধারে কাছে ঘেঁসতেন না। জয়চাঁদ লালের কিন্তু বাইজীদের সঙ্গে বেশ মহরম—মহরম চলত। গান বাজনা খুব ভালোবাসত জয়চাঁদ লাল। সে তার যাবার মতন মতুয়া—ধূর্ত্ত ও ধূর্ত্ত না। সে পায়জামা আর শিলে—হাতা চুড়িদার পাঞ্জাবী প'রে, গোঁফে - আতর দিয়ে যেত বাইজী পাড়ায়। মাঝে মাঝে বড় বড় জলসা হয়। নানা দেশ থেকে আরও অনেক বাইজীরা আসেন। তারা অনেকদিন ধরে থাকেন বারাণসীতে। সেই সব জলসায় গান শুনতে আসেন অনেক বড় বড় লোক। তারা এসে উঠতেন ঐ অতিথি নিবাসে। সে সময়ে বাইরের লোকের ওখানে আর জায়গা হ'ত না। এমনি একটা জলসায় যোগ দেবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। তখন দেখতাম অতিথি নিবাস জমজমাট। বড় বড় নামজাদা বাইজীরা সব এসে উঠতেন। সদা সর্বদা তানপুরার টুং টাং বাঁয়া তবলার ঠেরে কেটে ত্রিতালের বোলে অতিথি নিবাস সরগরম হয়ে থাকত। বাইরেরও অতিথিরাও এসেছেন। তাঁরা সব ঐ জলসার সমঝদার শ্রোতার দল। বাইজীদের জন্য সব পৃথক ঘর, পৃথক ব্যবস্থা। তারা থাকতেন অন্দরের দিকে। তাদের সঙ্গে থাকত সারেঙ্গী আর তবলচি। সে সময়ে আমাদের মতন নতুন কোন অতিথি এলে তাদের কাছে হাত জোড় করে নিজের অক্ষমতা জানাতেন জয়চাঁদ লালজী। সে সময় তার মন জুড়ে কেবল গান আর গান। বাজনা আর বাজনা। সে জন্য বেশ মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করত জয়চাঁদ লাল। সে সময়ে অনেক পুরানো অতিথিকে অতিথি নিবাস ছেড়ে থাকতে হত অন্যত্র। আমাকে কিন্তু তাদের দলে পড়তে হয়নি, কারণ আমি তখন জয়চাঁদ লালের মনে কিভাবে বাবু হয়ে গাঁট হয়ে ব'সে গেছি। আমি যে একজন সাহিত্যসেবী এ পরিচয় পাবার পর থেকে জয়চাঁদ লাল আমাকে ভিন্ন চোখে দেখতে সুরু করেছিল। সে আমাকে বলত, আপ্‌নি কিতাব লেখেন, আমাকে কুছু গান লিখে দিবেন বাবুজী? নানা রকমের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে সে অল্প ভাষাও বুঝতে পারত। আমার কথা বুঝতে তার মোটেই অসুবিধা হত না।

আমি বলতাম,—আমিত গান লিখিনা ঠাকুরজী, ওসব আমার আসেনা। আমি গল্প লেখক। ঠাকুরজী কিন্তু কিছুতেই সে কথা মানতে চাইত না। তার ধারণা, যিনি কলম ধরতে জানেন তিনি সব কিছুই লিখতে জানেন। অতএব আমিও চেষ্টা করলেই গান রচনা করতে পারি।

জলসার সময় অতিথি নিবাসে আমার ঠাঁই অটুট ছিল। কয়েক রাত ধরে আমিও জলসার শ্রোতা হয়েছিলাম। আর তেমনি এক জলসায় আমি দেখেছিলাম লক্ষ্ণৌর সবথেকে সেরা বাইজী রত্নাবাইকে। ঐ রত্নাবাইকে নিয়েই আমার আজকের এই গল্প। সেদিন যদি ঐ জলসায় আমি উপস্থিত না থাকতাম, তাহলে রত্নাবাইকে দেখার সৌভাগ্য আমার আর কোনদিনই হত না। আমার এই গল্প লেখাও সম্ভব হত না।

সারাদিন অতিথি নিবাস তানপুরা, সারেঙ্গী আর তবলার শব্দে মুখর। রাতেও এক একদিন আমার কানে আসত সেই সব বাজনার শব্দ। তারই মধ্যে কখনও শুনতে পেতাম মধুর সুরে কয়েক কলি গান। কিংবা কিছুটা সরগম, কিছুবা আলাপ।

জয়চাঁদ লালজীর দর্শনও তখন আমার কাছে প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। সব সময় সে জলসার আয়োজনেই ব্যস্ত থাকত। মধ্যে মধ্যে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সে আসত অতিথি নিবাসে সকলের অভাব অভিযোগের তদারক করতে। তারপর আবার একসময় চলে যেত।

জয়চাঁদলালের সঙ্গে জলসা শুনতে গিয়ে রত্নাবাইকে দেখেছিলাম। শুধু দেখা নয় তার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। ঠাকুরজীই তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তার পরেও আমি অনেকবার তার গান

ভনেছিলাম। জলসা শেষ হয়ে গেল। একে একে সকলে অতিথি নিবাস ছেড়ে চলে গেল। বাইজীরাও যে যার দেশে ফিরে গেল, গেলনা শুধু একজন। লক্ষ্ণৌরত্নাবাঈ এই বারাণসীতে এসে তখন জংচাঁদলাল ঠাকুরের প্রেমে পড়ে গেছে।

অনেকদিন হয়ে গেল ঠাকুরজী আর অতিথি নিবাসে আসেন না। নানা জনের কাছে নানা কথা শুনতে পাই। তারমধ্যে ভালো মন্দ অনেক রকমই থাকে। জংচাঁদ লাল নাকি রত্নাবাঈকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আবার কখনও শুনি জংচাঁদ লাল তাকে বিয়ে করে গোধূলীয়ার তার নিজস্ব বাড়ীতে নতুন সংসার রচনায় ব্যস্ত।

কথাটা ঠিকই। দুপক্ষেই বিয়ের প্রস্তুতি প্রায় পাকা হয়ে গেছল, কিন্তু হঠাৎ এক বিরাট বাধা এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পরস্পরের মন দেওয়া নেওয়ার মধ্যে। এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসেছে রত্নাবাঈ ঠাকুরজীর কাছে। প্রস্তাবটা অবশ্য এমন কিছু নয়, ভয়ানক নয়, আর কাজটাও কিছু কঠিন নয়,—স্ত্রীকে লাভ করার জন্য যুগ-যুগ ধরে তো কতো পরীক্ষাই না দিতে হয় পুরুষকে। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রকে হরধনু ভাঙতে হয়েছিল। দ্বাপরে অর্জুন বিঁধেছিলেন মাছের চোখ। তারপর এই কলিতেও অষ্টম এডওয়ার্ডের ভাইকে তো সিংহাসনই ছাড়তে হল। আর এত তুচ্ছ একটা জিনিস। সামান্য একটা গোঁফ। রত্না-বাঈ নাকি বলেছে ঠাকুরজীকে বিয়ে সে করবে কিন্তু তার আগে ঠাকুরজীকে তার ঐ বিরাট গোঁফটি সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলতে হবে। রত্নাবাঈ নাকি গোঁফ রাখা একেবারেই পছন্দ করেন না। বড় বড় গোঁফওয়ালা লোক তার চক্ষুঃশূল। ঠাকুরজী যদি সত্যিই তাকে ভাল-বাসে, তাহলে তার ঐ প্রস্তাবও তাকে মানতে হবে।

অন্যের রুচিবোধ নিয়ে বিশ্লেষণ করা চলেনা। রত্না-বাঈ গোঁফ রাখা পছন্দ করে না। গোঁফকে সে রীতিমত ঘৃণা করে। অতএব তার প্রেমাস্পদের মুখে যদি এমনই একটি ঘৃণ্য বস্তু বিরাজমান শোভা পায়, তাহলে তার সান্নিধ্য কেমন করে সে কামনা করতে পারে? সুতরাং ঠাকুরজী অতি শিগ্‌গির তার ঐ বিশ্রী গোঁফটি নির্মূল করুক।

ব্যাপারটা এক প্রস্তাব, অন্ততঃ জংচাঁদলাল ঠাকুরের মতন একজন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কাছে। কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল ঠাকুরজী। ক্রমে ঐ কথাটি বারাণসীর পথে-ঘাটে সর্বত্র সকলের মুখে মুখে আলোড়িত হতে লাগল অম্ল-মধুর হয়ে। সকলে বলতে লাগল, দেখাই যাক, এবার কি হয়,—কাকে রাখবেন এবার ঠাকুরজী,—গোঁফ না রত্নাবাঈ!

ঠাকুরজী কিন্তু গোঁফ ছাড়তে রাজি হয়নি, কোন মতেই। গোঁফকে সে ভীষণ ভালোবাসে। বোধহয় নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী। তাছাড়া আরও এক সমস্যা আছে। জংচাঁদ লালজীর বাবা কিবেনচাঁদ এখনও জীবিত। বাবা জীবিত থাকতে গোঁফ কামানো চলেনা। এটা ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধতা করা।

অতিথি নিবাসে আবার ঘন ঘন আসতে লাগলেন ঠাকুরজী। তার মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। আমার কাছে কোন কথাই গোপন রাখেন না। রত্নাবাঈয়ের সম্পর্কে সমস্ত কথাও আমার কাছে খুলে বললেন। রত্নাকে না পেলে তাঁর জীবন বরবাদ হয়ে যাবে এমন কথাও। বলতে বলতে তার দুচোখের পাতা ছলছলিয়ে এল। তার জন্য সমস্ত কিছুই করতে রাজি আছেন রত্নার কিন্তু ঐ এক অদ্ভুত প্রস্তাব; গোঁফ কামাতে হবে ঠাকুরজীকে। সে যদি রত্নাকে সত্যিই ভালোবাসে তাহলে অবশ্যই সে ঐ কাজ করতে দ্বিধা করবে না। লোকে প্রেমের জন্য কত কি ত্যাগ স্বীকার করে, আর এতো সামান্য একটা গোঁফ। ঠাকুরজী রত্নাকে নাকি একথাও বলেছে, যে ঐ কাজ করলে লোকে তার দুর্নাম হবে। রত্নাও তার প্রত্যুত্তর দিয়েছে, বেশ তাহলে ঠাকুরজী তার সমাজ নিয়েই থাকুন। সমাজই তাহলে তার কাছে বড় হল, রত্নার প্রেম সম্পূর্ণ গৌণ।

কিন্তু যেটাকে রত্নাবাঈ সামান্য কাজ বলে মনে করে-ছিল, ঠাকুরজীর কাছে সেটা যে এক বিরাট পর্বতের মতন বাধা, একথা কেমন করে জানবে রত্নাবাঈ?

ঠাকুরজীও বললে,—কভ্‌ভী নেহি! মোচ্ কাহাবো কি! সামান্য একটা মেয়েছেলের জন্য আমার সমা-জের বিরুদ্ধে যাবো আমি! তাছাড়া এটা তার প্রাণা-ধিক প্রিয় বস্তু! এতদিন ধরে একে সে সযত্নে রক্ষা করে

আসছে। একে সে কিছুতেই ফেলতে পারবে না! অনেক বোঝালে সে রত্না বাইজীকে। অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক মিনতি। বলল, তার কাছে ঠাকুরজীর ভালবাসা বড়, না সামান্য একটা তুচ্ছ গোঁফ বড়। একটা তুচ্ছ গোঁফ তাদের পারস্পরিক ভালবাসাকে মিথ্যা করে দেবে?

কিন্তু রত্না বাই এক ভয়ানক জেদী আর এক গুঁয়ে প্রকৃতির। আর হবেই বা না কেন? তার অভাব কিসের? ভগবান তাকে সমস্ত কিছু দিয়ে এ'জগতে পাঠিয়েছেন। তার যেমন অপূর্ব রূপ আছে, তেমনি গুণও আছে। বিখ্যাত গায়িকা সে। সারা ভারত—জুড়ে তার সঙ্গীতের খ্যাতি, তার নাম ডাক।

গান গেয়ে প্রচুর অর্থ সে উপার্জন করে। ঠাকুরজীর মতন দশটা লোককে অনুগ্রহ হেলনে চালনা করতে পারে। বড় বড় রাজা মহারাজারা পর্যন্ত তার গান শোনার জন্য, তার সান্নিধ্য পাবার জন্য সব সময় উন্মুখ হয়ে আছেন।

সেই রত্নাবাই ঠাকুরজীর মতন সামান্য এক জমিদার ছেলের পুত্রের তোয়াক্কা রাখবে কেন? ঠাকুরজীর কোন অনুনয়—বিনয়ই শুনল না রত্নাবাই। তার ঐ এক জেদ, যদি তুমি সত্যিই আমাকে পেয়ার করো, তাহলে আমার কথাও তুমি রাখবে। জগতে প্রেমের বিনিময়ে মানুষ কত কি করে আর এতো সামান্য একটা গোঁফ।

আরও কিছুদিন পরের কথা। আমার ইতি মধ্যে একটা নোটিশ এসে গেছে, যে কাজের জন্য আমার বারাণসীতে আসা তা প্রায় সম্পূর্ণ, অতএব আর মাত্র দিন কয়েক আমাকে এখানে থাকতে হবে। বারাণসীতে আমি এই প্রথম এসেছি। থাকলাম ও অনেক'দিন। আবার কবে আসবো, কিংবা আর আসাই হবে না, এই সব ভেবে সেদিন একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম। বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়, আর বিড়লা মন্দির ঘুরে গোধূলীয়ায় ফিরে আসতেই পথে ঠাকুরজীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে অতিথি নিবাসের দিকে যাচ্ছিলাম। ঠাকুরজীও আমার সঙ্গে এল। আমার ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকলে কিছুক্ষণ। অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত। মুখটা থমথমে, আষাঢ়ের আকাশের মত। যেন এখনই প্রবল বর্ষণ সুরু হবে। একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ঠাকুরজী বলল, রত্না লক্ষ্ণৌতে চলে যাচ্ছে কিতাব বাবু!

চমকে তার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম,—সে কি।

ঠাকুরজী বললে,—আপনি তো সবই জানেন কিতাব বাবু? রত্নার ঐ অদ্ভুত প্রস্তাব আমি রাখিনি! তাই সে রাগ করে লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছে। লেকিন বাবু, বলেই আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কয় কয় করে কেঁদে ফেলল। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন,—কিতাব বাবু, রত্না যে আমার প্রাণে এমন করে দাগা দিয়ে চলে যেতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! আপনি একবার তাকে বুঝিয়ে বলুন কিতাব বাবু। বললাম,—আমার মতন লোকের কথা সে শুনবে কেন ঠাকুরজী?

অল্পক্ষণ কি ভাবল ঠাকুরজী, বলল, সাচ্ বাত্! আপনি ঠিক বলেছেন, যা জেদী মেয়ে! মিছামিছি—আপনার কোথায় ঘেলাপ হোবে। তারপর অল্পক্ষণ নীরব থেকে বললে,—আমিও আজ বেশ কড়া কথা বলে এসেছি কিতাব বাবু। রত্নাকে বললাম,—আমার ঘরের বহু হলে তোমাকে জনমের মত বাইজীর কাম ছোড়তে হোবে রত্না, পারবে তুম?

বললাম,—শুনে কি বললে বাই?

ঠাকুরজী বললে,—কুছ বললো না।

রত্না বাইজীর জন্য ঠাকুরজী তার অতি প্রিয় সেই গোঁফটি সত্যিই নির্মূল করেছিলেন কিনা, কিংবা রত্না ঠাকুরজীর ঘরের বউ হয়েছিলেন কিনা, সে কথা আমি জানতে পারিনি কারণ তার আগেই আমাকে বারাণসী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ এমন আকস্মিক ভাবে কলকাতার এক কাঠের দোকানে অমিতাভ লালকে আবিষ্কার করে রীতিমত চমকে গেলাম। চোখে চাঁদির চশমা লাগিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিতাববাবু, নমস্তে।

আমি বললাম,—নমস্কার ঠাকুরজী। কথা বলতে বলতে আমি নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, এ জগতে অসম্ভব বলে কোন কিছুই সত্যই আছে কি না। এ' যেন গল্পের চেয়েও আরও বেশী চমকপ্রদ, আরও বেশী বিস্ময়কর ঘটনা।

অল্প হেসে ঠাকুরজী বলল,—আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন না কিতাব বাবু?—লেকিন আজ আপনি যা দেখছেন সেটাই সত্যি, আর যা কুছ্ তা বিলকুল ঝুই। সেদিন যে ঠাকুরজীকে আপনি দেখেছিলেন সে আজ আর নেই।

বললাম,—কিন্তু তুমি হঠাৎ এই কলকাতায় একটা কাঠের দোকানে কাজ করতে কেন এলে অরচাঁদ লালজী? তোমার অত ঐশ্বর্য—

আমার সে কথার উত্তর দিল না সে। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল,—আপনি দাঁড়ান,—এই বলে দোকানে গিয়ে ঢুকল সে, তারপর আবার আমার কাছে এসে বলল চলুন কিতাব বাবু, আপনাকে আমার মাকানে নিয়ে যাই। কতোদিন পরে আপনার দেখা পেলাম। বেশীদূর যেতে হলনা, কাছেই একটা নরু গলির মধ্যে কয়েকটা মাঝি মাঝি ঘর। তারই খানদুয়েক নিয়ে থাকে অরচাঁদ-লাল। বাইরের ঘরখানায় আমাকে বসালো। ভিতর দিকের দরজায় একটা পর্দা ঝুলছে। তার ওপাশে বোধ হয় অন্দরমহল। ভিতরে চলে গেল সে। পরক্ষণেই বাইরে এসে আমাকে বলল, আপনি বসেন কিতাববাবু, হামি জলদি আসছি,—এই কথা বলে দ্রুতপদে পথে নেমে পড়ল সে।

আমি বসে বসে ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাচ্ছি। পিছনের পর্দাটা দুলে উঠল। পর্দাটা সরিয়ে একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন ঘরে, মিষ্টি কণ্ঠে বললে,—কিতাব বাবু, নমস্তে! ভালো আছেন? হাত তুলে আমার নমস্কার জানালে সে। চিনতে পারলাম,—রত্নাবাঈ। আগের থেকে অনেক বদলে গেছে। পোষাকে-আষাকে তো বটেই, চেহারাতেও। সেদিনের সেই দালোয়ার, পাঞ্জাবী, আর ওড়নায় ঢেরা চটুল মেয়েটি আর নেই, পরিবর্তে তাঁর পরণে আজ চওড়া লাল পাড় তসরের শাড়ি আলগা করে বাঁধা খোঁপার ওপর ঘোমটা দেওয়া, তার ফাঁক দিয়ে সিঁথির জ্বলজ্বলে সিঁদুর আমার চোখে পড়ল।

বললাম,—তুমি কেমন আছ? রত্নাবাঈ বলল, ভালো, তারপর অল্প হেসে ভাঙ্গা বাংলায় বলল, আমাদের কিছু না বোলে আপনিও তো বেপারল ছোড়লেন।

বললাম,—সত্যি, অন্যায় করেছিলাম, সেজন্য আমাকে মাফ করো। কিন্তু সেদিন গোঁফ গোঁফ করে দুজনে যা লড়াই বাধিয়েছিলে আমারতো রীতিমত ভাই ধরে গেছলো।

আমার কথায় এবার খিল খিল করে হেসে উঠে বলল রত্নাবাঈ,—ওটাকে আপনি সত্যি সত্যি লড়াই বলে মনে করেছিলেন নাকি?

বললাম,—হবে?

রত্নাবাঈ মাটির দিকে মুখ নামিয়ে ধীরস্বরে বলল,—ঠাকুরজীর ভালোবাসা আসলি না নকলি তাই পরখ করেছিলাম! কিতাববাবু, হাজার হাজার রূপেয়া খরচ কোরে লোকে আমাদের গানা শোনে, হুল্লা তামাশাভি করে, কেউ কেউ প্রেম-ভালোবাসার কোথাও শোনায়! লেকিন আমি জানি, সেগুলির কোনটাই আসলি নয়, সবই ঝুটা—সবই মামুলি: ভেবেছিলাম ঠাকুরজীও বোধ-হয় আমার রূপে গানে বেহুঁস হয়ে আমার সাথে তেমনি খেলায় মেতে উঠেছেন। তাই আমি ঠাকুরজীর ভালো-বাসার পরীক্ষা নিলাম। আমি জানতাম, ঠাকুরজী তার ঐ মোচকে কতো ভালোবাসেন। বহুদিন সে কোথা তিনি আমার কাছে বোলেছিলেন। আমিও তাঁকে বোললাম যদি তিনি আমার কোথায় তাঁর ঐ অমূল্য সম্পদ ত্যাগ কোরেন তাহলে আমি বুঝবো যে তিনি সত্যিই আমাকে পেয়ার কোরেন। আমার কথায় রাজি হলেন, কিন্তু তিনিও বোললেন, তোমার কথায় আমি রাজি, তবে তোমাকেও আমার একটা কোথা রাখতে হোবে। আমি বোললাম কোন্ কোথা?

তিনি বোললেন,—তোমার কোথায় আমি আমার মোচ ফেলতে রাজি আছি। তোমাকেও বাঈজীবৃত্তি ছোড়তে হোবে বরাবরের জন্য। শাদির পর পাঁচজনার সামনে বোসে গানা গাওয়া আর হোসবে না, ওতে আমাদের বংশের মুখ পুড়বে!

কিন্তু বাবু, ঠাকুরজীর পরিবার আমাকে তাদের ঘরের বহু বোলে মেনে নেয়নি। এমনকি সম্পত্তি থেকেও ঠাকুরজী বঞ্চিত হোয়েছেন।

আমি মুজরো করা ছোড়ে দিলাম। ফলে আমার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেল। আমার যা রূপেয়া ছিল তাই নিয়ে দুজনে চোলে এলাম এই কলকাতায়। দু'কামরাওয়ালা এই ছোট বাড়িটা কিনলাম। ঠাকুরজী কাঠের দোকানে কাজ নিলেন। আমার জন্য ঠাকুরজীকে সব কুছ হারাতে হোল কিতাববাবু!

বললাম,—সব কিছুর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না তাই পেয়েছে ঠাকুরজী।

রত্নাবাঈ বলল,—কি?

বললাম, তোমার মত লক্ষ্মী স্ত্রী।

বিচিত্র বিশ্ব

শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য

জ্যোতিষীর অভ্রান্ত গণনা

অনেক কাণ্ড করে, নানান গলিপথ ঘুরে শেষে কালিঘাটের কালী বাড়ীতে এসে সেই বিখ্যাত জ্যোতিষীর মোটামুটি একটা হদিস পাওয়া গেল। বইলে কোথায় বেলেঘাটার শেষ প্রান্ত আর কোথায় কালিঘাটের অ বিদঙ্গার তীরবর্ত্তী বটবৃক্ষ। কন্যাদায়ের গ্রস্ত বৃদ্ধ তারিণী বাবু অনেক কষ্টে সেই বটবৃক্ষের গোড়া খুঁজে বার করলেন। দেখলেন খানিকটা জায়গা বেদীর মতন করে খান কয়েক ইট দিয়ে কোন রকমে বাঁধান। তারি উপরে একখানি কম্বলাসন বিছিয়ে সংসার বিরাগী এক বৃদ্ধ বসে আছেন। বয়স বোধ হয় ৮০।৮৫র উপর হবে। মাথার সব চুল একেবারে রেশমের মত সাদা। দাড়ি গোঁফ কামান। বেশ সুন্দর জ্যোতিময় চেহারা। মুখে মৃদু হাসি। শরীরের গঠন দীর্ঘ এবং সুগঠিত। গায়ের রং অত্যন্ত গৌর। দেখলেই মনে একটা ভক্তিভাব আসে।

ইনিই বিখ্যাত জ্যোতিষী, কালীচরণ বাবা, সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, অভ্রান্ত নাকি এঁর ভবিষ্যৎ বাণী। কেউ কেউ বলেন সাদা কাপড় পরে থাকলেও ইনি নাকি গোপনে তন্ত্রসাধনা করেন।

এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিক। সনটা এখন আর ঠিকমত স্মরণ নেই, বোধ হয় ১৩০০ হবে।

তারিণীবাবু অত্যন্ত সাত্ত্বিক এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ধরচাপানী করে সংসার যা কিছু আয় করেন, তাতে ঠিক মত সংসার চলে না। একটু বেশী বয়সে বিবাহ করেছিলেন, বর্ত্তমানে সন্তান চারটি, প্রথম তিনটি কন্যা এবং শেষেরটি পুত্রসন্তান। এ ছাড়া সংসারের আর একজন বিধবা ভগ্নী আছেন, অর্থাৎ মোট পোষ্য সাতটী, তাই সংসারের চাকা ঘোরাতে তারিণীবাবু একেবারে হিমসিম খেয়ে গেছেন। এর উপর কন্যাদায়ের চিন্তা। বড় মেয়ে সুহাসিনীর বয়সই তো প্রায় বিশ পেরিয়ে একুশে গিয়ে ঠেকলো, পরের দুটিকেও এই সঙ্গে পার করতে পারলে ভাল হয়।

'ও মশাই শুনছেন, বাবা যে আপনাকে ডাকছেন'—একজন ভক্ত তারিণীবাবুর ধ্যান ভঙ্গ করে ডাকলেন।

কথাটা শুনে রীতিমত লজ্জিত হলেন তারিণীবাবু। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে মাথা নত করে একপাশে বসলেন। অনেক আশা করে এসেছেন, কে জানে পূর্ণ হবে কিনা।

'ছক বা কুষ্ঠি এনেছো'—এবার প্রশ্ন করলেন খোদ কালীচরণ বাবা।

হ্যাঁ, এই যে—আমার বড় মেয়ের —কত বিয়ের সম্বন্ধ এল আর গেল, কিন্তু বিয়ের কথা কিছুতেই ফুটলো না। দেখুন তো বাবা বিবাহ আদৌ হবে কিনা, অবিশ্যি নিজের মুখে মেয়ে আমার সুশ্রী নয়, রং কালো,কেই বা দেখে—পছন্দ করবে।

ততক্ষণে কুষ্ঠিখানা মেলে ধরেছেন কালীচরণবাবা। দৃষ্টি তাঁর স্থির ভাবে বদ্ধ হয়ে আছে জাতিকায় জন্মকালীন গ্রহ সমাবেশের উপর।

তারিণীবাবু প্রশ্নের আবেগ রুদ্ধ করে কালীচরণ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন উত্তরের আশায়। সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারিণী বাবু খুঁটের কাপড়ে চোখের চশমা খুলে বার কয়েক মুছে নিলেন। ততক্ষণে

ভেতরে বেশ খানিকটা অস্বস্তিবোধ করছেন, কি জানি মেয়ের সম্বন্ধে কি না কি বলে ফেলেন।

ধীরে ধীরে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন কালীচরণ বাবা। একটু হেসে বললেন —ভয় নেই, হোক কালো, তবু তোমার এ মেয়ে রাজরাণী হবে। কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হবে। গাড়ী হবে বাড়ী হবে, বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার স্বামী হবে। যাও —বাড়ী গিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও, সময় হলে সব কিছু ঘটনা ম্যাজিকের মত একের পর এক ঘটে যাবে আগামী আট মাসের মধ্যে। শুধু তোমার কন্যাদায় মুক্ত হতে বছর পাঁচেক দেরী হবে।

এমন তাজ্জব এবং অবিশ্বাস্য কথা শুনে তারিণীবাবু হাসবেন কি কাঁদবেন, বুঝে উঠতে পারল না। শুধু অসহায় ভাবে কালীচরণ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কালীচরণ বাবার কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে কথাগুলো হীন-দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কর্ণকুহরে অবিশ্বাসের সুরেই ধ্বনিত হচ্ছে।

বার নাকি বেলেঘাটা থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত আসতে আটগণ্ডা পয়সা রাহা খরচ অনেক কসরৎ করে সংগ্রহ করতে হয়েছে, তার ঘরে নাকি রাজরাণী জন্মেছে, লাখ লাখ টাকা হবে, গাড়ী হবে,বাড়ী হবে আর কত কি হবে?

তারিণীবাবুর মানসিক প্রশ্নোত্তরের জবাবে কালী-চরণ বাবা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—'কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও, সত্যের খাতিরে বিচারে যা পেয়েছি, তাই বলেছি। যদি জন্মসময়, সন, তারিখ—এসব ঠিক থাকে, তবে যা বলেছি আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না।

বিস্মিত, হতভম্ব তারিণীবাবু গুরু তালুর চারপাশে জিবটাকে দু'একবার ঘুরিয়ে এনে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'সারাজীবন দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, গোটা একটা রূপার টাকা খুব কম দিনই রোজগার হিসেবে হাতে পেয়েছি। যজ-মানী করে পাই, আশী, দুআনা, বড়জোর সিকি, এর বেশী কেউ দেয় না। আমি চাইতেও পারি না।

কালীচরণবাবা উত্তর দিলেন—সে তোর কপাল দেখেই বুঝেছি, সময়ে অসময়ে ঘরে চোঙা বানিয়ে সংসার চালাতে হয়েছে। কত দিন ঠার উপোস করেছিস, আর ভগবানকে ডেকেছিস্। বলনা সত্যি কিনা? কথাটা শুনে তারিণীবাবুর চোখে জল এল। কালীচরণ-বাবা একেবারে সরস্বতীর সিদ্ধ বরপুত্র—সর্বজ্ঞ পুরুষ। তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি-পথেই সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন মনে হয়।

হ্যাঁ,বাবা আপনি ঠিক বলেছেন—সব নির্মম সত্য, দারিদ্র্য, অভাব, দুঃখ কষ্ট—এ সবই আমার অঙ্গ ভূষণ. ভগবানের কাছে তো দিনরাত কাঁদি। সৎপথেই তো থাকতে চেষ্টা করি, তবুও দুঃখ আমার ঘোচে না কেন?—কি আমার অপরাধ—জানি না!

কালীচরণ বাবা উত্তর করলেন কি করে জানবে— তোমার ঐ দেহ খোলটির মধ্যে সবই ছিল, একমাত্র পুরুষকার ছাড়া। তোমার ভেতর ঐটের বড় অভাব। ভাগ্যের সঙ্গে বিপুল বিক্রমে লড়তে পারছ না তাই হার মেনেছ। একবার সিংহের মত জেদ করে পুরুষকারকে কাজে লাগিয়ে দেখতো বাবা—যাও,বাড়ী যাও—আর আজ থেকে তত আশী, দুআনী আর সিকি পাবে—ঘরে ফেরার পথেই তা গরীব দুঃখীকে দান করে দেবে। খবরদার,কখনও টাঁ্যকে গুঁজে ঘরের চৌকাট ডিঙোবে না। এতে উপোস করতে হয়—করবে। ভয় পাবে না। আর প্রথম যেদিন রূপোর টাকা হাতে পাবে সেই টাকাটা বাড়ী ফিরে হাত-পা ধোয়ার আগে এই মেয়ের হাতে দিয়ে বলবে মা তোকে মিষ্টি খেতে দিলুম···তারপর সে মা ভাল বোঝে তাই করবে, যাও।

'আপনি যা বললেন তাই করব আজ থেকে। শুধু দু'বেলা দু'মুটো যেন খেতে পাই।'

'কের মেরেলি নাকে কান্না সুরু করলে! এই না পেখালুম ভাগ্যবিধাতাকে কেমন করে জব্দ করতে হয়।

'হ্যাঁ, বাবা ঠিক বলেছেন। আর না—আজ থেকে আমি অন্যমানুষ হব। আপনার কথা অন্যথা হলে চির-কাল আপনার কেনাদাস হয়ে থাকব।'

'উঠলি'—কালীচরণবাবা যেন তেড়ে উঠলেন। ছল ছল চোখে উঠে দাঁড়ালেন তারিণীবাবু, কি জানি কেন কোথা থেকে একটা আশার সঞ্চার হচ্ছে, মনে হচ্ছে আর এই ভিক্ষাবৃত্তি বেশীদিন করতে হবেনা।

কালীচরণবাবাই উত্তর দিলেন তারিণীবাবুর মনের কথাটার।

'বল্লমতো, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। মুখেরু ভাত খেয়েই যাবে—শুধু তোমার প্রথম নাতনীটির নাম তোমার তারিণী নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখবে নিস্তারিণী। তারপর ঐ খোলে গিয়েই তো তোমাকে আবার ঢুকতে হবে। যা যা পালা থাকা মেয়েছেলের মত আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি।

কালীচরণবাবার এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনে তারিণীবাবুর মনে অনেক গুলি একসঙ্গে ভীড় করে এল। কিন্তু তাড়িয়ে দেবার ভঙ্গী দেখে আর সাহস হল না। শুধু মুখে উত্তর দিলেন—শেষ পর্যন্ত যদি বাবা আপনার কথা ফলে, মেয়ে আমার রাজরাণী হয় আর ঐ বিপুল ধন-সম্পত্তি লাভ করে তাহলে আমার মেয়েকে মরার আগে নিশ্চয়ই বলে যাব তার প্রথম কন্যার নাম আমার তারিণী নামের সঙ্গে মিলিয়ে নিস্তারিণী রাখতে।

কালীচরণবাবা একটু হেসে বললেন—হবেরে তোর মেয়ে রাজরানীই হবে—গত জন্মে সে রাজরানীই ছিল। এজন্মে সে তার পূর্ব-জন্মের সঞ্চিত ধন-রত্ন ফিরে পাবে—যা সে গত জন্মে ভোগ করতে পারেনি। দেখবি—আমার কথাটার প্রমাণও পাবি—তোর মেয়ের ঠিক থুতনির নিচে মধ্যিখানে একটা বড় কালো জরুল আছে না—

হ্যাঁ,—যন্ত্রমুগ্ধের মত জবাব দিলেন তারিণীবাবু।

ঐ—ঐটেই হল ওর দুই জন্মের একমাত্র যোগসূত্র, যা চোখ কান খোলা রেখে চলবি—তাহলেই সব বুঝতে পারবি। যা বাড়ী গিয়ে অপদা পরিবারকে ঠাণ্ডা করগে যা।

তারিণীবাবু আর কোন উত্তর দিলেন না। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। কুটিখানা পকেটে পুরে ধীরে ধীরে গলিপথ বেয়ে এগিয়ে চললেন বড় রাস্তার দিকে।

বাড়ীতে ফিরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গোপনে সব কথা খুলে বললেন স্ত্রীকে। তিনি শুনেতো হেসেই খুন। বললে—ঐ জন্যেই বলি, সাধু-সন্ন্যেসী আর যাতালদের কাছে কখনও ভর সন্ধ্যে বেলায় যেতে নেই। নানারকম নেশাভাঙ করে থাকে, ওদের কি মাথার ঠিক থাকে, কি বলেছে তার ঠিক নেই। সেই শুনে তুমি একেবারে অজ্ঞানে আটখানা। মেয়ে তোমার রাজরানী হবে, তাহোক, তার তখন আমি না হয় পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে জোর গলায় বলবো—আমি রাজমাতা হয়েছি।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ালে টাঙান পুরনো আমলের ঘড়িটার আড়াল থেকে টিক-টিকিটা ডেকে উঠলো। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।

তারিণীবাবু যেন আদালতে নিজের সাক্ষী পেশ করলেন বললেন,—ঐ শোন—সত্যি সত্যি ফলবে কিনা?

এতে স্ত্রী সুধাময়ী দেবী আরও ক্ষেপে গেলেন। বললেন,—হ্যাঁ, তুমি ঐ টিক্‌টিকিটার ডাকের ভরসাতেই সারাজীবন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও—আর আমি সারাজীবন ঠোঙ্গা বানাই, ঘুটে দি, আর পাঁচবাড়ীর ফাই ফরমাশ খেটে তোমার সামনে ভাত বেড়ে দি।

অসহ্য জ্বালায় তারিণীবাবু মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কিন্তু এবার আর স্থির থাকতে পারলো না সুহাসিনী—তারিণী-বাবুর বড় মেয়ে। এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবার সব কথা সে মন দিয়ে শুনছিল। নাইবা বললো জ্যোতিষীর কথা। তবু বাবাকে এমন করে কটু কথা মায়ের না বললেও চলতো।

ঘরে ঢুকে সুহাসিনী বললে—মা সংসারে শুধু একা তুমি খাটনা—আমরাও সাহায্য করি। বাবাও বলে থাকেন না, যোগাড় করেন। অতএব দুঃখ করে লাভ নেই, ভাগ্যে যদি সুখ লেখা না থাকে—চীৎকার করে কি হবে মা?

বাপের হয়ে কথা বলাতে এবার মায়ের রাগ মেয়ের উপর গিয়ে পড়লো—তবে আমার বাপদোহাগী মেয়ে, রসের তো ঐ বাহার। যদি কোন্ রাজপুত্র জুটবে—তোর জন্যেই তো এত চিন্তা একেবারে গলায় কাঁটার মত বিঁধে আছিস্।

'আমায় এক গ্লাস জল দে মা—শুক তালু ভেজাতে মেয়ের কাছে জল চাইলেন তারিণীবাবু।

সুহাসিনী জল আনতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু যাবার আগে বলে গেল—'বেশ, বাবার কথার জের টেনেই বলছি, আটমাসের মধ্যে সত্যি যদি কোন পরিবর্তন না আসে, আমি নিশ্চিত তোমাদের মুক্তি দিয়ে যাব।

সুধাময়ী দেবী এরপর আর এগোতে সাহস করলেন না। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তারিণীবাবু স্যাটি-কেনের আলোটা একটু উজ্জ্বল করে দিয়ে দেওয়ালের টিকটিকিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

রাত্রি প্রভাত হতেই সুরু হল তারিণীবাবুর জীবনের ভাগ্য আর পুরুষকারের লড়াই। চাল-কলা, কলকলাদি যা পান সবই গামছায় বেঁধে নিয়ে আসেন। আনেন না শুধু নগদ কড়ি—অর্থাৎ আনী, দুয়ানী আর সিকিগুলো। রাস্তার গরীব-দুঃখী ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে আসেন। বাড়ী ফিরে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করেন স্ত্রী সুধাময়ীর মুখে বোমা ফাটার। কিন্তু আশ্চর্য্য একদিনও একটু টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত হলনা। যাক—অনেকটা স্বস্তিবোধ করলেন তারিণীবাবু। দিনগুলো একরকম করে কাটছিলও মন্দনা। কিন্তু মুস্কিলটা উদ্ঘাটিত হল ঠিক একুশ দিনের মাথায়। গামছায়, বাঁধা নৈবেদ্যর বোঝাটা বারান্দার উপর নামিয়ে রেখে পা ধুতে যাচ্ছিলেন কলতলার দিকে। এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে বড় মেয়ে সুহাসিনী হাতের ইসারায় বাবাকে কাছে ডাকলো। ঘনীভূত বিপদের আশঙ্কা করে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো তারিণীবাবুর। সুধাময়ী দেবী রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত ছিলেন টের পাননি। কাছে এসে দাঁড়াতেই সুহাসিনী মুখ টিপে হেসে বললো—বাবা, তুমি যেন মাকে বলে দিওনা যে দক্ষিণার পয়সাগুলো রাস্তার গরীব দুঃখী-দের রোজ বিলিয়ে দিয়ে আস—তাহলে আর মা তোমায় আস্ত রাখবেনা।

তারিণীবাবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—তাহলে এত-দিন গোটা আছি কি করে? দক্ষিণার পয়সা তো একদিনও হাতে পাননি।

কে বললে? আমার অমান পয়সা থেকে রোজ কিছু কিছু পয়সা নিয়ে আমি নৈবেদ্যর মধ্যে চুকিয়ে-দিতাম। কিন্তু বাবা আজ আর আমার হাতে কোন পয়সা নেই। প্রায় আট টাকা জমিয়ে ছিলাম, সব ফুরিয়ে গেছে। কাল সকালেই কিছু ধার পাব ব্যবস্থা করেছি। তুমি যাবে বলবে যে দক্ষিণের পয়সাটা একজনকে ধার দিয়েছো সে সকালেই ফেরত দেবে।

কথাটা শেষ করে সুহাসিনী বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

কিন্তু সুহাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারলেন না তারিণীবাবু, চোখে জল নেমে এল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ভগবান দিন দিলে, তোর কাছেই যেন সন্তান হয়ে ফিরে আসি মা। জ্যোতিষী বাবার কথাটি যেন ফলে।

সুহাসিনী লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তারিণী-বাবু সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন—না মা, আজ আর ছেলের জন্যে মাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। নে মা,—আজ আবার অনেকদিন পরে একটা গোটা রূপোর টাকা পেয়েছি দক্ষিণা হিসেবে। তুই রাখ, মিষ্টি খাস। বাপ হয়ে কোনদিনতো তোদের হাতে একটি কানাকড়িও দিতে পারিনি।

বিস্মিত হয়ে সুহাসিনী বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো গোটা একটা টাকা পেয়েছ বাবা? দাও এর থেকে চার আনা খরচ করে একটা সটারীর টিকিট কিনবো, তুমি কিন্তু বকতে পারবেনা। আজই সকালে বরানগরের ভূপেনকাকা এসে জোর করে একখানা টিকিট গছিয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই, এটা তোর টাকা মা, যা ভাল বুঝবি করবি। আমায় একটু তামাক সেজে দে মা, হাত পা ধুয়ে আসি। কথাটা শেষ করে তারিণীবাবু কলতলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুহাসিনীর হাতের তালুতে তখনও রূপার টাকাটা ঝিকি চক চক করছে।

এরপর মাস দুই পরের ঘটনা, তাকে একখানা চিঠি-এল বড় মেয়ে সুহাসিনীর নামে। হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সুহাসিনী কিন্তু পড়া ছাড়েনি। দশম শ্রেণীতে পড়ে, একটা পাশ করে যাতে বাবাকে কিছুটা অন্ততঃ সাহায্য করতে পারে, সেই সাধনাতেই সুহাসিনী মেতে ছিল। মাকে মাঝে সবাইকে আড়াল দিয়ে দু'একখানা বইখাতাও করত এদিকে ওদিকে, কি জানি যদি বেড়ালের ভাগ্যে দিকে ছেঁড়ে কখন।

চিঠিখানা খুলে বার বার পড়তে লাগলো সুহাসিনী,

বিশ্বাসই যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। গায়ে জ্বর নিয়ে ঘরের ভেতর শুয়েছিলেন তারিণীবাবু। দু'একবার অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন কে চিঠি দিয়েছেরে খুকী—তোর হাবাগঙ্গা?—নাকি বর্দ্ধমান থেকে তোর কৈলাসখুড়ো? পুরী থেকে তোর পেঁকোপিসী লিখেছে বুঝি? কিরে, উত্তর দিচ্ছিসনা কেন—কোন খারাপ খবর নাকি?

ঘরের ভেতর ছুটে এল মেয়ে বাপের কাছে। চিঠিখানা মুখের সামনে তুলে ধরে বললো—না বাবা, ওসব কিছু না, চার আনার লটারীর টিকিটে আমি দশহাজার টাকা পেয়েছি বাবা, দ্বিতীয় পুরস্কার, ভাল করে পড়তো বাবা, ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিনা। কোন ভুল ভ্রান্তি হয়নি তো?

এঁ্যা—বলে দশ দিনের জ্বরে ভোগা, পথ্যহীন দুর্বল শরীরটাকে মুহূর্তের মধ্যে সোজা করে বিছানার উপর একলাফে উঠে বসলেন তারিণীবাবু। চিঠিখানার প্রতিটি শব্দ দু'বার করে উচ্চারণ করে পড়তে লাগলেন।

হ্যাঁ, সত্যিইতো, সুহাসিনীর নামে দশহাজার টাকা উঠেছে। টিকিটটা যথাশীঘ্র জমা দিতে বলেছে। জয় বাবা জ্যোতিষীবাবার জয়। তোর মাকে এখানে ডাক, ওর নামে আমি বামা মধে দেব—বলে কিনা জ্যোতিষীর বাক্য ফলবেনা।

চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারিণীবাবুর। উত্তেজনায় দুর্বলতায় সর্বাঙ্গ তার কাঁপতে লাগলো।

'একটু জল দে মা—মাথাটা কেমন ঘুরছে, সুহাসিনী ব্যস্ত হয়ে পড়লো—তুমি শুয়ে পড় বাবা, আমি এখুনি জল আনছি। আর আমাদের দুঃখ করতে হবে না। সবাই খেয়ে পড়ে বাঁচবো। কারও বাড়ীতে আর হাত পাততে হবে না। তুমি সুস্থ হলে চল বাবা কালীঘাটের সেই বিখ্যাত জ্যোতিষীকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসি।

তারিণীবাবু চোখ বুজে বললেন—তাতে যাবই মা, তাঁর কথা ধীরে ধীরে ফলতে আরম্ভ করেছে। বাকিগুলোও নিশ্চয়ই ফলবে। তাঁকে প্রণাম করে আসবো। মেয়ে আমার লাখপতি না হোক হাজারপতি তো হয়েছে। রাজপুত্র নাহোক সুপুত্র দেখেও তো বিয়ে দিতে পারবো আজ।

তারিণীবাবু যেন চোখজোড়া বন্ধ রেখেও সেই আদি গঙ্গার তীরবর্তী বটগাছের নীচে বসে থাকা কালীচরণবাবাকে দেখতে পাচ্ছেন—একেবারে স্পষ্ট মুখ, তাতে স্বর্গীয় হাসি ছড়ানো।

এরপর আরও মাসখানেক কেটে গেল পুরস্কারের টাকাটা হাতে এসে পৌঁছুতে। অর্থাৎ প্রায় মাস চারেকের মধ্যে সুহাসিনীদের সংসারের কিছুটা দুঃখ ঘুচলো। জানিনা এর পরে ঘটনার স্রোত কোনদিকে বইচে। তবে তারিণীবাবু এঁচে রেখেছেন। এই টাকার মোটা অংশটি দিয়ে ছোটখাট একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করবেন। আর বাকিটা দিয়ে ব্যবসা। যাই হোক কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ—সবই কালীচরণ বাবার ইচ্ছায় হবে।

টাকাটা হাতে পাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই পাঁচশো টাকা হাতে নিয়ে বাপ আর মেয়ে একদিন সন্ধ্যায় সেই আদিগঙ্গার তীরে বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কালীচরণবাবা বসে ছিলেন চোখ বুজে। সেদিন ভক্তের সংখ্যা একটু কম ছিল। নোট পাঁচখানা পায়ের কাছে রেখে মাথা নত করে দু'জন হয়ে প্রণাম করলো সুহাসিনী বাবার নির্দ্দেশ মত।

চোখ খুলে দুজনকে দেখে মৃদু হাসলেন বাবা। সুহাসিনীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ, ঠিক সময়, সন, তারিখ—সবই ঠিক আছে। তবহু মিলছে। সবই কেমন পাবি মা, কিছুই নষ্ট হয়নি।

পরে টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমাকে দিয়ে কি হবে মা—তার চেয়ে আর একদিন সকালে আসিস, এই গঙ্গাতীরে নিজে হাতে খিচুড়ী রেঁধে সামনের ঐ বস্তিটার সবাইকে পেট ভরে খাওয়াবি। খবরদার এঁটো পাতা কাউকে ফেলতে দিবিনা। নিজে হাতে ফেলবি। তাহলে গতজন্মের পাপের যেটুকু প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে, তাড়াতাড়ি শেষ হবে। নে টাকা তুলে রাখ মা। যা বাড়ী যা। সুখী হবি।

প্রস্তাবটা শুনে সুহাসিনী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো—তাহলে বাবা কবে আসবো, আপনি আদেশ করুন।

মা হয়ে ছেলেদের খাওয়াবি, এতে আর দেরী কি—কাল সকালেই আয়।

তাই হবে—কালই সকালে আসবো। শুভ কাজে দেরী করতে নেই।

আনন্দিত চিত্তে বাপ আর মেয়ে জ্যোতিষী বাবাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে পা বাড়াল গলি পথ ধরে বড় রাস্তার দিকে।

এরপর নির্দ্দিষ্ট দিনে দরিদ্র নারায়ণ সেবা ভাল ভাবেই মিটে গেল। লোকও হোল প্রচুর। কালীচরণ-বাবা ও তার ভক্ত শিষ্যরা সবাই প্রসাদ পেলেন সমাদরে।

আরও মাসখানেক পরে তারিণীবাবুর বিধবা ভগ্নী প্রতিবেশীদের সঙ্গে কাশীবাসে বেড়াতে গিয়ে এক সুখবর নিয়ে এলেন যে সেখানে নাকি বাঙ্গালীটোলায় খুব সস্তায় একখানা পুরনো ছোটখাটো বাড়ী বিক্রী আছে। দাম মাত্র ৬০০০৲ টাকা। বাড়ী দেখে পছন্দ হলে কলকাতার বসেই কেনাকাটা চলতে পারবে।

বাপ আর মেয়ে আবার ছুটলেন কালীঘাট—কালী-চরণ বাবার পদপ্রান্তে। গিয়ে শুনলেন বাবাও নাকি ৺বিশ্বনাথ দর্শনের অভিপ্রায়ে দিনকয়েক আগে সশিষ্য কাশী রওনা হয়ে গেছেন।

ভারী আশ্চর্য্য লাগলো তারিণীবাবুর। ইঙ্গিতটা যেন একেবারে ফেলার মত নয়।

বাড়ী ফিরেই পরামর্শ করে কাশী রওনা হলেন দুজনে। বাড়ী দেখে পছন্দ করে ফিরে এলেন, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাশীতে কালীচরণবাবার কোন হদিশ করতে পারলেন না। মোটামুটি একটি শুভদিন দেখে বাড়ী কেনাও হয়ে গেল ক্রমে কথাটা কানে গেল প্রতিবেশীদের। তারাও নানান কথা বলে উত্যক্ত করতে লাগলেন তারিণীবাবুকে।

শেষে সত্যি সত্যিই একদিন কলকাতার বাস করার বাসনা ত্যাগ করে কাশীবাসী হওয়ার মনস্থ করে ফেললেন তারিণীবাবু। বেলেঘাটার বাসা ছেড়ে দিয়ে সপরিবারে চলে গেলেন কাশী।

কালীচরণবাবার কথামত আটমাসের মধ্যে দু'মাস কেটে গেল তারিণীবাবুর সপরিবারে কাশীবাসী হতে—অবিশ্যি সত্যি কথা বলতে গেলে এখন পর্য্যন্ত সব কিছু ম্যাজিকের মতই ঘটে গেছে বলতে হয়।

কিন্তু সব চাইতে বড় ম্যাজিক বোধহয় অপেক্ষা করছিল এরপর, যেটা সুহাসিনীর জীবনের সব চাইতে রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

কালীচরণবাবার কথামত সুহাসিনীর লাখপতি হওয়ার যোগের আটমাসের মধ্যে যখন আর মাত্র দিন ৫।৭ বাকি, ঠিক সেই সময়ে, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন সকালে সুহাসিনী বাজার থেকে এক লক্ষ্মী প্রতিমা কিনে এনে হাজির।

বাবাকে ডেকে বললো—জান বাবা, সেই তোমার দেওয়া একটা রূপার টাকার মধ্যে এক সিকি খরচ করে একটা লটারীর টিকিট কিনেছিলুম। আর যে বাকি বারো আনা আমার কাছে ছিল, তাই দিয়ে আজ এই লক্ষ্মী প্রতিমাটি কিনে এনেছি। ভাল করে পূজা করবে বাবা।

তারিণীবাবুও অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন, স্ত্রীকে ডেকে সব আয়োজন করতে বললেন। বিধি মুতাবিক কাজ পূজা হয়ে গেল। কিন্তু তার পরদিন বিসর্জ্জনের পর প্রতি-মাটিকে স্থায়ী ভাবে রাখার জায়গা নিয়ে সমস্যা বাধলো। শয়নের ঘর মাত্র দু'খানি। তাও জীর্ণদশাপ্রাপ্ত, যেখান-সেখান থেকে যখন-তখন চুনবালি খসে পড়ে। চৌকো চৌকো পাথরের চাঙ্গী আলগা হয়ে যায়।

তারিণীবাবু এখন এক-এক সময় ভাবেন, না কিনলেই ভাল হত। এত পুরনো যে আগাগোড়াই ভীতিমত সংস্কার করা দরকার। তাছাড়া স্থানীয়লোকের কাছে দু'চারদিন হল জানতে পেরেছেন—এটা নাকি বহুবছর আগে আসলে এক বিখ্যাত বাইজীর বাড়ী ছিল। কোন এক রাজা দানস্বরূপ বাড়ীটি সেই বাইজীকে দেয়। কথাটা শোনার পর থেকে তারিণীবাবু কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করছেন।

মেয়েকে ডেকে বললেন—ঠিক আছে, অন্য কোন জায়গা তোর পছন্দ না হলে তোর ঘরের কুলুঙ্গীটা পরিষ্কার করে সেখানে মাকে সাজিয়ে রাখ।

সুহাসিনী দ্বিগুণ উৎসাহে কুলুঙ্গী পরিষ্কার করতে লেগে গেল। আশ্চর্য্য যতবার ভেতরটা ভাল করে ঝেড়ে

পরিষ্কার করে তক্তপোষের আবার ভেতরে চুনকালি করে পড়ে। শেষে রেগে গিয়ে নিজেই দু'হাত দিয়ে চুনকালির আলগা আস্তরটাকে ভেঙে ফেলতে লাগলো। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো।

ভেতর দিকের একখানা পাথরের টালী পাশে কাত হয়ে পড়তেই চোখে পড়লো একটি লোহার সিন্দুকের শক্ত হাতল। সুহাসিনী সভয়ে দু'হাত পিছিয়ে এল।

দিনের বেলায় কেমন যেন গা ছমছম করে ভয় করতে লাগলো। চীৎকার করে পাশের ঘর থেকে বাবাকে ডেকে এনে দেখাল। তারিণীবাবুও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন হাতল দেখে। ভগবান জানেন ওর ভেতর কি আছে। তিনি শুনেছেন কতকগুলি অপদেবতা নাকি ভর করে থাকেন নানান অবাঞ্ছিত টাকা পয়সা গুপ্ত কালীচরণবাবার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিনের বেলায় ঘরের ভেতর আলো জ্বালিয়ে সেই হাতল ধরে বাপ আর মেয়ে—দুজনে মিলে প্রাণপণ শক্তিতে টান দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে জীর্ণ সিন্দুকের তালা খুলে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো পুরনো আমলের সহস্র সহস্র সোনার মোহর আর নানান মূল্যবান মণিমুক্তা বসান গয়না—কত ভরি হবে কে জানে?

বিস্ময়ে, আনন্দে, উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে গেলেন দুজনে। কালীচরণবাবার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। এতসোনা, গয়না, টাকা, ধনরত্ন—সিন্দুকের ভেতর থেকে সব একে একে বাইরে বার করে আনলেন তারিণীবাবু আর সুহাসিনী। সব শেষে বের হল সর্বশেষ বিস্ময়ের বস্তু—অতি জীর্ণ একখানি ফটো। সুহাসিনী অবাক বিস্ময়ে ফটোখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো, ফটোটী একজন সুন্দরী বাইজীর তবে রং চটে কিছু কিছু জায়গা অস্পষ্ট এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই বাইজীরও মুখে, ঠিক থুতনির নিচে মধ্যিখানে একটা বড় কালো জরুল রয়েছে।

ফটোখানা হাতে নিয়ে সুহাসিনী কাঁপতে লাগলো থর থর করে। কেবলি তার মনে হতে লাগলো এই বাইজীর মুখখানা তার অনেক কালের চেনা—হয়তো বা চিরকালের হবে। তাহলে কি কালীচরণবাবার কথাই ঠিক, আগের জন্মে সে এই বাইজী ছিল? আর কিছু ভাবতে পারলোনা সুহাসিনী। মাথা ঘুড়ে বাবার বুকের মধ্যে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে রইল।

আমার এই সত্য কাহিনীটির যবনিকাপাত এখানেই ঘটলো। শুধু শেষ কথাটা জানিয়ে রাখি একটি গরীব মেধাবী যুবককে নিজেদের টাকায় বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়ে এনে সুহাসিনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তারিণীবাবু।

অভিজিৎ এর জন্য বাস্তবিকই পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিবাহের কিছুদিন পরেই তারিণীবাবু সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন।

যথাসময়ে সুহাসিনী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে।

পিতার আদেশ মত সুহাসিনী তার নাম রাখে নিস্তারিণী।

তবে শেষ পর্যন্ত তারিণীই নিস্তারিণীর চরিত্রে ধরা-ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিনা বলতে পারবো না।

কেরলের নূতন মন্ত্রী—

গত কয়েক বৎসর কেরলে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের মুখ্যমন্ত্রীত্বে বাম কমিউনিষ্ট মন্ত্রীসভা চলিতেছিল। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হওয়ায় কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন ও মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া যায়। সম্প্রতি ডান-কমিউনিষ্ট দল কংগ্রেস দলের সহিত এক যোগে কেরলে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। শ্রীঅচ্যুত মেনন নূতন মুখ্যমন্ত্রী হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের রাজধানী লইয়া বিবাদ—

পুরাতন পাঞ্জাব প্রদেশের একটা অংশ পাকিস্থানে পড়িয়াছে। বাকী অংশটি ভাগ হইয়া দুইটি রাজ্য হইয়াছে। একটির নাম পাঞ্জাব দ্বিতীয়টি হরিয়ানা। চণ্ডীগড়ে যে নূতন রাজধানী কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে তাহা কে পাইবে তাহা লইয়া পাঞ্জাবের শিখেরা অনশন করিতেছে। চণ্ডীগড় হরিয়ানা এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে। ঐ সমস্যা সমাধানের ভার প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

গুজরাটে দাঙ্গা-হাঙ্গামা—

গুজরাট রাজ্যে সমুদ্রতীরের স্থানগুলিতে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া প্রায় একলক্ষ লোক মারা গিয়াছে। তাহা থামাইবার জন্য ভূতপূর্ব উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই রাজকোট যাইয়া কয়েকদিন অনশন করেন। গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমণ নারায়ণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া অল্পদিনের মধ্যে দাঙ্গা থামাইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহীতেন্দ্র দেশাইও রাজ্যপালকে একার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণে সীমান্তগান্ধী খান্ আবদুল গফুর খাঁন গুজরাটে যাইয়া কয়েকদিন গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে উত্তেজিত মুসলমান-সম্প্রদায় কতকটা শান্ত রহিয়াছে।

বিহারের মন্ত্রী সভা গঠনে সংকট—

বিহাররাজ্যে কংগ্রেসী নেতা শ্রীহরিহর প্রসাদ সিং-এর নেতৃত্বে যে মন্ত্রীসভা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তথায় রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতেছে। রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো বিহারে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীহরিহর প্রসাদ আবার কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সফল হন নাই। বিহারে কংগ্রেসীদের অধিকাংশ শ্রীমতী ইন্দিরা-গান্ধীর অনুরক্ত। কাজেই মনে হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার বিপদ কাটিয়া গেলেই বিহারেও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে।

অন্ধ্ররাজ্যে অসন্তোষ—

দক্ষিণভারতের কয়েকটি স্থান লইয়া বর্তমানের যে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে সেখানেও একদল অধিবাসী ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যকে দুইভাগে ভাগ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। গত অক্টোবরমাসে কয়েকদিন বর্তমানব্যবস্থার বিরোধীরা রাজ্যের বহু স্থানে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অশান্তি কমিয়া গেলেও একেবারে দূর হয় নাই। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কড়া শাসনে দেশের শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

অন্ধ্রে ভীষণ অনাবৃষ্টি—

অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতীরস্থ কয়েকটি জেলায় গত ৭ই নভেম্বর ভীষণ বড় বৃষ্টির ফলে বহু লোক মারা গিয়াছে, অনেকগুলি গ্রাম জলে ডুবিয়া

গিয়াছে ও কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা সত্বর স্থির করা যাইবেনা। শস্যক্ষেত্র নষ্ট হওয়ায় দশকোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া রেল, ঘরবাড়ী, পথ, বিজলীর তার ও পোষ্ট প্রভৃতি নষ্ট হওয়ায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

কলিকাতায় জলাভাব—

হঠাৎ টালার পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা অচল হইয়া যাওয়ায় ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর সারা কোলকাতা শহরকে দারুণ জলকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। গঙ্গানদী হইতে যাহারা দু-এক মাইল দূরত্বের মধ্যে বাস করে তাহারা প্রায় সকলেই বাধ্য হইয়া গঙ্গা স্নান করিয়াছে। শহরে এখন বহু সরকারী ও বেসরকারী নলকূপ হওয়ায় প্রত্যেক অধিবাসী নলকূপ হইতে জল সরবরাহ করিয়া পানীয় জল ও রন্ধনের জলের ব্যবস্থা করিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষগণ অবশ্য বিপন্ন অধিবাসীদের জল-সরবরাহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক তৃতীয় দিনে জলসরবরাহ ব্যবস্থা আবার ঠিক হওয়ায় লোক নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

দুর্গাপূজা ও কালীপূজা

১৩৭৬ সালে কলিকাতা শহর ও শহরতলীতে দুর্গাপূজার সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছিল। কালীপূজার সংখ্যা আবার তাহা অপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে। এত সংখ্যক অধিক কালীপূজা পূর্বে শহরবাসীরা আর কখন দেখে নাই। দুর্গাপূজার সময় ইলেকট্রিক কোম্পানী খুব বেশী আলোর ব্যবস্থা করিয়া সারা সহরটিকে রাত্রি কালে দিনের মত উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কালীপূজায় আলোকসজ্জা আরও অধিক এবং নূতন ধরণের হইয়াছিল। সর্বত্র কালী-পূজার মণ্ডপগুলি ভারতের নানাস্থানের দেবমন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হইয়া মানুষের ভীড় আকর্ষণ করিয়াছে। দুঃখের কথা এত কালীপূজা, কিন্তু কোথাওই প্রায় প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা দেখা যায় নাই।

সাগরপারের রূপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

জার্মানী
১৯২৭

"ইটের পর ইট তার মাঝে মানুষ কীট"—কবির এই দুঃখ, বেদনা মানুষের মনে সাড়া জাগায় না, "অটল হয়ে বসে আছে, ইটের আসন পাতা"। এবং "শীত বসন্ত সমানভাবে করে ঋতুযাপন"। চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত শ্যামল প্রান্তর শূন্যে মিলিয়ে যায়, আর তার জায়গায় গড়ে উঠে বড় বড় কল-কারখানা, বড় বড় প্রাসাদ। মানুষ হয়ে পড়ে কলের হাতে পুতুল, হারিয়ে ফেলে তার আপন সত্ত্বা।

শিল্পে ব্যবসা বাণিজ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তনে জার্মানী পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু অগ্রসর। আজও জার্মানীর "The Bavarian film city of Geiselgast-iz forms are of the largest blocks oi studios in Europe. ধর্মক্ষেত্রে মার্টিন লুথার, সমাজতত্ত্ববিদ কার্লমার্কস্, এঞ্জেলস্, দর্শনে হেগেল প্রভৃতি মনীষিগণ পৃথিবীর সংস্কৃতিক্ষেত্রে আপন আপন প্রতিভায় দীপ্যমান। একটি নূতন বলিষ্ঠ সমাজ গঠনে তার ভূমিকা, যাহা ভাল কি মন্দ তর্কের বিষয় হ'লেও দূরদৃষ্টিতার যে পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ও শিল্প-গত বিচারের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রেরও যে একটি নিজস্ব আসন আছে, তাহা অস্বীকার করা যায়না। জার্মানীর চিত্র প্রযোজকদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার যে প্রবণতা তা মানুষের চিন্তা-ধারাকে যান্ত্রিক করে তোলবার পক্ষপাতী। ক্যামেরা, যা দিয়ে চলচ্চিত্র তোলা হয়, তার অগ্র-গতির ক্ষেত্রেও জার্মানীর দান অনস্বীকার্য্য। মারনৌ (Murnau) যিনি "ডলি সট"কে পরি-পূর্ণতা দিয়েছিলেন, তিনি ক্যামেরাও যে মানুষের মত গতিশীল তার নিদর্শন দিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ Karel Capek মানুষের মত কাজ করতে পারে এমন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার দেখালেন। যাদু-বিদ্যার দ্বারা মৃতকে বাঁচানো বা ফ্রাঙ্কেষ্টাইনের মত কবরের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার অথবা প্রস্তরবৎ মূর্ত্তিকে প্রাণবন্ত করার মত কিছু না থাকলেও, মানুষের ন্যায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এঁর দান অপরিসীম। "Matropolis"এ রক্ত মাংসে গড়া কারখানার শ্রমিক যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছে এবং ডাঃ ক্যালীগরীর মত যেন কারুর দ্বারা চালিত হচ্ছে।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুতগতিতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছিল। Fritz Larz এর "Metopolis" মহা-যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তীকালীন ঘটনার উপকথা, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দাবস্থা দূরীভূত হয়ে আলাদিনের প্রদীপের ন্যায় আশ্চর্যভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার পথপ্রদর্শক। সূত্রটি মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মিলনের এক নূতন ঐকতান। Tycoon (জাপানের ভূতপূর্ব সেনাপতিকে বলা হলেও এখানে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে) জানতেন জাল মারিয়া (Maria) কে তৈরী করেছে। একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিতে (ধনতন্ত্রের প্রতীক) আসল মারিয়াকে (শ্রমিকের প্রতীক) কাজে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। আসল মারিয়া দরিদ্র, শোষিত, জনগণের বন্ধু। বর্ত্তমান জগতের কাজ, দারিদ্র্য, বিলাসিতা, খেলা, বিশ্রাম সবই এখানে রূপকারে পরিবেশিত। বহিরাবরণে মেট্রোপলিস্এর সঙ্গে Brughels-এর Tower of Babel-এর সাদৃশ্য আছে। বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদগুলি আজকের সহরে দিনের পর দিন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রাসাদ যেমন

সত্য, সবুজের বিলুপ্তিও তেমনিই সত্য এবং শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা এখানে গোপন করা হয়েছে কারণ 'যে বস্তু আসবে, তার কোন নির্দেশ এখানে নেই, উপরন্তু অর্থনৈতিক অবাবস্থা জার্মানীর উপরিভাগেও দানা পাকিয়ে উঠছিল।

হিটলার ও তাঁর প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস্ ".মেট্রোপলিস" দেখেছিলেন এবং অন্তরাসীন হয়েই হিটলারের নির্দেশে গোয়েবলস্ Larzএর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন এবং সরকারের তথ্য চিত্র তোলবার জন্য তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর কারণ এই নয় যে যন্ত্রপুরীর শাসন ব্যবস্থা তিনি নিখুঁতভাবে দেখাতে পেরেছিলেন. উপরন্তু এই ব্যবস্থা মানুষের অধিকারে কিভাবে রূপান্তর ঘটাতে পারে তার নিদর্শনও দিয়েছিলেন।

Freder মেট্রোপলিসের ঐশী শক্তি সম্পন্ন নায়ক যিনি শিল্পপতির পুত্র, তিনি দরিদ্রের বন্ধু-মারিয়াকে ভাল বেসেছিলেন এবং পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে শ্রমিকদের পক্ষে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। শিল্পপতি মারিয়ার এক গোপন বৈঠক উপস্থিত থেকে নকল স্বয়ংক্রিয় মারিয়াকে নিয়োগ করে শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। মারিয়া ও ফ্রেডারের মধ্যে ভালবাসা Tycoonকে সন্মতিদানে বাধ্য করেছিল এবং কারখানার কোরম্যানের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে তিনি বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন।

হিটলারের সরকার ল্যাংএর ছবিগুলিকে প্রচার কার্যের নূতনতম দিগ নির্দেশক বলে গণ্য করেন। কিন্তু কি সেই দিগনির্দেশক? এই চিত্রের নাটকীয় প্রসাদগুণ আজ আর নেই।

কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে জনগণের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল না বলেই একে অবজ্ঞা করা যায় কি?

পরবর্তী যুগের ইতিহাসে এই চিত্রের পদধ্বনি কি শুনতে পাওয়া যায়নি? উদয় শঙ্করের 'কল্পনা'য় যন্ত্র ও শ্রমিকের যে সংঘাত, তাঁর যন্ত্রের উপর বিখ্যাত নৃত্যগুলি কি এর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল? ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মালিক ও শ্রমিকের বিরোধের সর্বপ্রথম চিত্র হিসাবে Fritz Larzএর 'metropolis' চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আপন প্রতিভায় চির ভাস্বর থাকবে।

• • •

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

আবুল হায়াৎ—মুর্শিদাবাদ

বেদের বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য কোন্ কোন্ চিত্রশিল্পী সাহায্য করেছেন?

০ এদেশে চিত্রশিল্পী বলতে ক্যামেরাম্যানদেরই বোঝায়। বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীর বর্তমান যা অবস্থা তাতে চিত্র শিল্পীদেরই বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে একটা charitible fund খোলা উচিত।

• • •

সত্যেন গুহ—হালিসহর

ওয়েষ্ট ইণ্ডিস এর অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স আংটি বিনিময়ের পরও অজু বহেরাকে বিয়ে করলেন না কেন?

০ আংটি এবং প্রেম দুটোই গিন্টি করা ছিল বলে বোধ হয়।

• • •

অসীম গুপ্ত—রাজভবন—কলিকাতা

(১) দুঃস্থা মহিলা শিল্পীদের জন্যে মহিলা শিল্পীমহল যে বাসস্থান নির্মাণ করলেন তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। শুনেছি আমাদের দেশে অনেক দুঃস্থ পুরুষ শিল্পীও আছেন। অভিনেতৃ সংঘ কিংবা শিল্পী সংঘ তাদের জন্যে কিছু করেছেন কি?

০ বর্তমানের পুরুষ শিল্পীরা যাতে ভবিষ্যতে দুঃস্থ না হন সেজন্যেই অভিনেতৃ সংঘ এবং শিল্পী সংঘ গড়া হয়েছে। বর্তমানে যে সব দুঃস্থ শিল্পী আছেন তাদের জন্যে খরচা করবার মত সময় এদের কারোরই নেই।

(২) কালী বিশ্বনাথ মঞ্চের "নটী বিনোদিনী" আমার খুব ভাল লেগেছে। অথচ 'ঘরের' মত একটি নাটক যেখানে দিনের পর দিন চলেছে সেখানে "নটি বিনোদিনী" বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি?

০ মানিক পক্ষের অন্তঃকলহই "নটী বিনোদিনী" বন্ধ হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ।

(৩) আমার প্রিয় চরিত্রাভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবর কি?

০ শোনা যাচ্ছে উনি বর্তমানে যাত্রার আসরে যোগদান করেছেন।

• • •

অরুণ রায়—ফার্ণ রোড—কলিকাতা

"আবার সূর্য, তীরভূমি, চেনা অচেনা, বন জ্যোৎস্না" প্রভৃতি ৪।৫ খানি ছবি মাস কয়েকের মধ্যে রূপ করেছে। জুলাই আগষ্টকে বাংলা ছবির রূপ মাস বলা যায় না?

০ বললেও অত্যুক্তি হয় না। জুলাই আগষ্ট হচ্ছে বর্ষার মাস। নেহাৎ দায়ে না পড়লে কোন প্রযোজকই বর্ষাকালে ছবি রিলিজ করতে রাজী হন না। কারণ বর্ষাকালে কোন শো বিজনেসেরই ব্যবসা ভাল চলে না।

• • •

অরুণী হাজরা—বেণী নন্দন ষ্ট্রীট কলিকাতা

নাগিনা মাহাতোর বহুদিন কোন খবর নেই। ছবিটি কি শেষ হয়ে গেছে?

০ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর নাগিনা মাহাতোর শুটিং ইদানীং আবার শুরু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

• • •

মনীষা লাহিড়ী—আরামবাগ—হুগলী

চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্য উপস্থাপনা কি খুব আশ্লীলকর হবে? এমনিতেই আমাদের দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে তার ওপর এই সব দৃশ্য দেখলে কি হবে ভাবতেও ভয় করছে।

০ রুচি সম্মত এবং শিল্প সম্মত ভাবে উপস্থাপন করলে ভয় পাবার কিছুই নেই। সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ভাল হবারই সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য যারা মিনিক অথবা বয় হজমের রোগী তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

• • •

লিলি ব্যানার্জী—নাকতলা রোড—কলিকাতা

অজয় কর-এর পরবর্তী ছবির খবর কি? নায়ক নায়িকা কে?

০ পরবর্তী ছবি রবীন্দ্রনাথের "মাল্যদান" অজয় বাবু নভেম্বর মাস থেকে শুরু করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। নায়ক যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নন্দিনী মালিয়া।

• • •

সন্ধ্যা ঘোষ—কালিঘাট রোড—কলিকাতা

আপনারা অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনী ছাপেন না কেন?

০ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনী ছাপবার জন্যে বাজারে অনেক পত্রিকাই তো আছে। খামোখা আমাদের আবার ও দলে টানা কেন?

• • •

অমন্ত সেন—রামাপুরা—বেনারস

'অরণ্যের দিনরাত্রি' কবে মুক্তি পাবে?

০ সময় হলেই।

সোমা লাহিড়ী—বেলতলা রোড—কলিকাতা

তনুজার পরবর্তী ছবি কি?

০ উত্তম কুমারের বিপরীতে "যমুনা কে তীর" (বাংলা) ছবিতে ও অভিনয় করছে।

• • •

জ্যোতি ভট্টাচার্য—তিলজলা রোড—কলিকাতা

চলচ্চিত্রে চুম্বন সম্বন্ধে উত্তম কুমারের মতামত দেখবার পর জানতে ইচ্ছে করছে নায়িকারাও যদি উত্তম কুমারের সম্বন্ধে ডাক্তারের রিপোর্ট চায় তবে কি হবে?

০ নায়িকারা কোনদিনই নায়কের সম্বন্ধে কারুরই রিপোর্ট চায়ও না ও গ্রাহ্যও করে না।

• • •

বাণী ব্যানার্জী—নেতাজী সুভাষ রোড—কলিকাতা—৪৭

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল তা নিয়ে খুব ভালো একটা নাটক ও চিত্রকাহিনী লেখা যায়, তাই না? তবে রাষ্ট্রপতির পার্ট কে করবেন?

০ কোন এক রাজনৈতিক (অভি) নেতা হয়ত।

• • •

প্রদীপ সরকার—রাসবিহারী এভিনিউ—কলিকাতা

"চুপী পায়া হীরে"র নায়ক লেখক সুখেন দাস বেশ কবিংকমা বলে মনে হচ্ছে। নতুবা এই দুর্দিনে কাহিনীকার ও নায়ক হওয়া সোজা নয়। আপনি কি বলেন?

০ সুখেনবাবু কতখানি কবিংকর্মা তা আমি জানি না। "চুপী পায়া হীরে" মোটামুটি ভাল ছবিই হয়েছে এবং সুখেনবাবুর অভিনয়ও ভাল হয়েছে শুনেছি।

• • •

বরুণ হালদার—গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা

আম কাঁচা অবস্থায় টক কিন্তু পাকলে মিষ্টি। কাঁচামিঠে আমের কথা অবশ্য আলাদা, প্রেমের বেলায় তার উল্টো, কারণ কি?

০ প্রেমের ব্যাপারে সবটাই কাঁচামিঠে। তার সব কিছুই নির্ভর করে মনের ও বয়সের ওপর। প্রেমের স্বাদ আমের মতন কি না এর উত্তর একমাত্র এ ব্যাপারে যারা বিশেষ অভিজ্ঞ তারাই দিতে পারবেন।

• • •

প্রকাশ ঘর—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রোড—কলিকাতা

হাঁা, না, হচ্ছে, হবে না, এই রকম হাল সারা উত্তর দেন কেন ?

○ উত্তরটা নির্ভর করে প্রশ্নের উপর বলেই।

• • •

গায়ত্রী সেনগুপ্ত—হাওড়ার রোড—বলতে কোন্ কোন্ সাহিত্যিক সিনেমায় নেমেছেন ?

○ কাজী নজরুল—প্রবং, নৃপেনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—কবি কালিদাস, শৈলজানন্দ—কথা কও, মন্মথ রায়—রাজনর্ত্তকী, সুরীন্দ্রন মুখার্জী—উপহার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার, [illegible] নাথ ঘোষ—উল্টোরথ, শৈলেশ দে—শ্রীশ্রী [illegible] প্রভু, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—শুনী সাইন, বাঘা বাইন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়—নাম্বিকা সংবাদ,—এর বেশী বর্ত্তমানে আর জানা নেই।

• • •

সুজিৎ সরকার—বীরেন রায় রোড, ওয়েষ্ট—কলিঃ অসীমা ভট্টাচার্য্যের মেয় সাহেবের খবর কি ?

○ এখনও অবধি কোন খবর নেই।

• • •

কল্যাণ রায়—সরৎ বোষ গার্ডেন রোড—কলিকাতা

চলচ্চিত্র বর্ত্তমান যুব সমাজকে যে ভাবে প্রভাবিত করেছে, তাতে আমাদের উচিৎ সমাজের দিকে তাকিয়ে সংগঠন মূলক ছবি তৈরী করা। আপনার এই বিষয়ে কি ধারণা ?

○ এ বিষয়ে আমারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে ? ওই ধরনের ছবি করলে প্রযোজকের পেট ভরবে কি ? বিপ্লবের পর রাশিয়াতে সংগঠন মূলক অনেক ছবি করা সম্ভব হয়েছিল কারণ সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করতে সক্ষম হয়েছিল ওরা।

○ ○ ○

প্রতাপ অধিকারী—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড—কলিকাতা

"পরিণীতা" চিত্রের হাতের দৃশ্যগুলি জেল থেকে নেওয়া না পাশের বাড়ীর ছাত থেকে গৃহীত ?

○ ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে গৃহীত।

○ ○

কমলা ঘোষ—মহেন্দ্র গোস্বামী লেন—কলিকাতা

ঘোষনা কমিটির রিপোর্টের আগেই "ভানবোস মোতি" [illegible] চলেছিল না পরে ?

○ সেন্সর বোর্ডের কর্ত্তারাই এর জবাব দিতে পারেন।

○ ○ ○

বাজির হোসেন ও অন্যান্যরা—লোয়ার রোড—পাকসার্কাস—কলিকাতা

কার্য্যে) ইসরায়েলে আল আক্সা মসজিদ পোড়ানো [illegible] অন্যায় নারকীয় কাণ্ড। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ [illegible] এই ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যথিত হবেন ও প্রতিবাদ [illegible] তাই নয় কি ?

○ নিশ্চয়ই। আপনাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও নর-নারী প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ধর্মস্থান, তা সে যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, অপবিত্র করাটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। রাষ্ট্রবিপ্লব বা যুদ্ধের সময়কার কথা স্বতন্ত্র। তখন মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিটা লোপ পায়, প্রতিহিংসা নেবার স্পৃহাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। এ ধরণের ঘটনা এদেশে বহুবার ঘটে। গুজরাটের মানুষ কর্ত্তৃক গুজরাটের সোমনাথ মন্দির সহ অপবিত্র করণ, বহু মন্দির মসজিদে রূপান্তরিত করা এবং খুব বেশীদিনের কথা নয় ১৯৬৬ সালের মাঝার পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু মন্দির ধ্বংস করা ও অপবিত্র করা হয়েছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই এই ধরনের ঘটনায় ব্যথিত হয়েছেন কোন সন্দেহ নেই, প্রতিবাদে কেউ কর্ণপাতও করেন নি, কেননা পাশব শক্তির প্রাধান্যটা যেখানে প্রবল সেখানে প্রতিবাদে নীরবে মাথানুটে মরা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

(২) বাংলা চলচ্চিত্রে বহুদিন ভাদু ব্যানার্জিকে দেখা যায় না কেন ?

○ [illegible] তাঁর উপযুক্ত কোন চরিত্র নেই বলেই।

○ ○

কাজু [illegible] -ক্রীক রো—কলিকাতা

পিয়ালী [illegible] প্রিয়া সিনেমার মালিকদের নাকি ?

○ পাইয়োনিয়ার ব্যাঙ্ক (অধুনালুপ্ত), পাইয়োনিয়ার পিকচার্স (চন্দ্রশেখর), পুর্ণিমা পিকচার্স, প্রিয়া সিনেমা, পিয়ালী ফিল্মস, এ সব কিছুরই একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন ত্রিলোচন দত্ত ও অসীম দত্ত।

○ ○ ○

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার [illegible] ায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

াশিত হইয়াছে

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

ের অবসানে হুগলী জেলার দূর অভ্যন্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায়
। তার জীবনের একটিমাত্রই মন্ত্র ছিল, 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।'
, বিশেষ করে কলকাতা জুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ,
লাবাজারি—এদের ফলশ্রুতি হিসেবে ভিক্ষুক আর গণিকা। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির
ভোগবাদের প্রমত্ত উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আঘাতের পর আঘাতে
মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা শ্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে দাঙ্গা
—কলকাতার 'গ্রেট কিলিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে

স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে

থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ত
ার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু ক
যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্য বা তার হ'ল না।
ন্ধকার আর নৈরাজ্য তবু এরই অ কোথায় যেন আলোর ক্ষী
ছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে ক দেখল উনিশ শতকের রামে
অবধি অসংখ্য মানুষ সেই ধারাটিকে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য ভ
তার ওপরে এসে পড়েছে।
খোঁজে যে যুবক এসেছিল, কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধ
এই বিশাল ক্রমদী উপন্যাস সাম্প্রতিক কালের একটি অনন্য সংযোজ

দাম—দশ টাকা

রকটি উপন্যাস : নোনা জল মিঠে মাটি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

REG. NO. C. 679—BHARATVARSHA, Phone :—34-1744 Gram :—Publica
Price——Single Copy—Rs. 1/25, Subscription—Annual—Rs. 15/-, Half-yearly—Rs.

— প্রকাশিত হইল —

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কলে র নূতন উপন্যাস

বাস[illegible] জীর্ণানি

একদিকে কালজীর্ণ পুরাতন জমিদারী-৬[illegible]ন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নূতন উত্থান। প্রা[illegible]ণ্যক পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তর! হারানোর বেদনা আর প্র[illegible] কম্পমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোদুল্যমান একদ[illegible] তারকরত্ন আর অতুল কামার, অশোক আর প্রীতি, ভুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর কারিগর আর মিষ্টি, অবিনাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর বাঈ এমোকালী, সনাতন আর গঙ্গামণি—এ রকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর লেখকের এক

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন।

চেনা-জানা পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্য
বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা

অন্যান্য উপন্যাস—

[illegible]ড়জনবধূ ৫-৫০

[illegible]ল গাঁয়ের [illegible]হিনী (২য় সং) ৫,

[illegible]বেগম (৩য় সং) ৬-

[illegible]বী মন (২য় সং—ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৩-৫০

[illegible]হিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-[illegible]

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

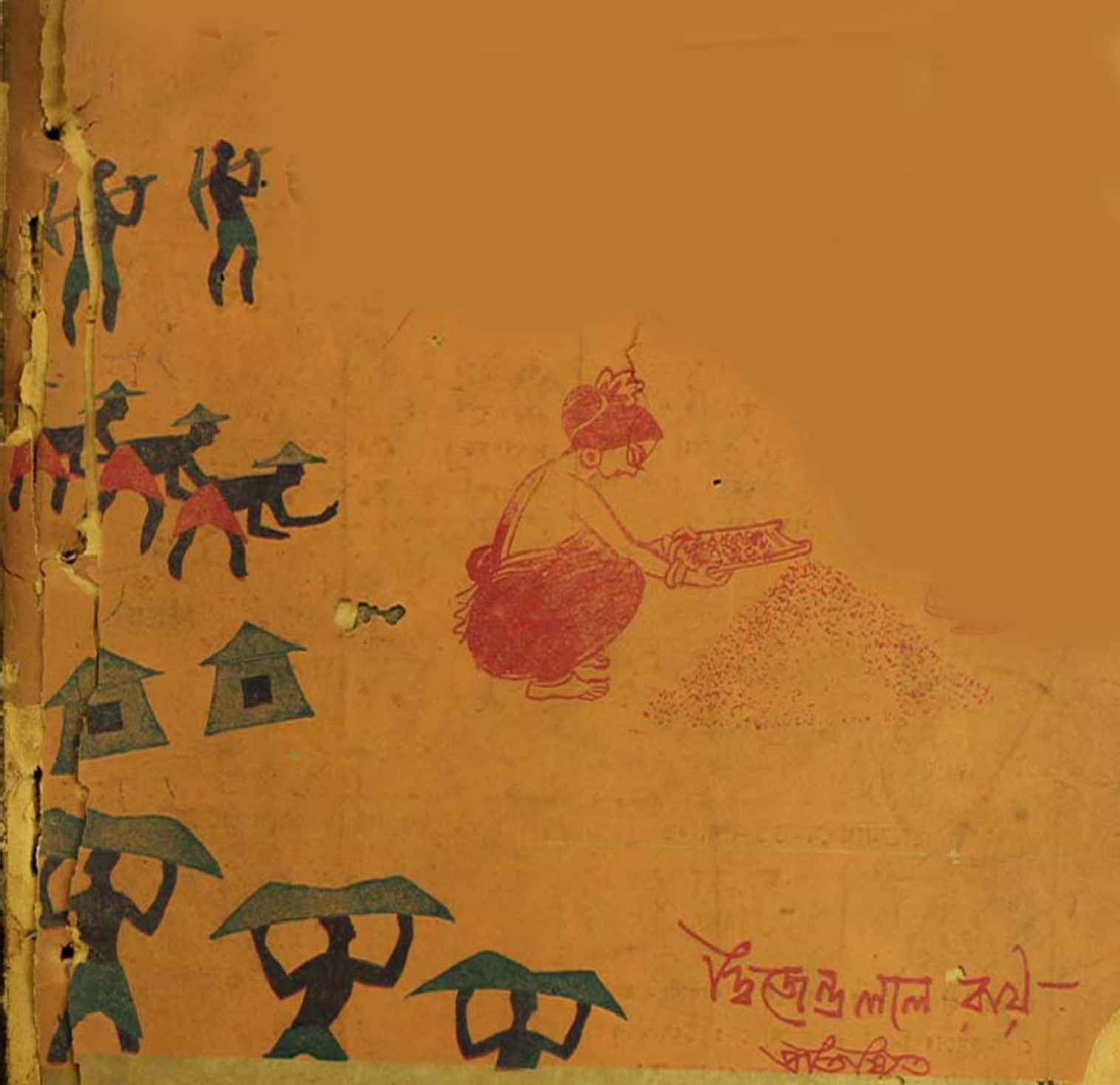

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-
স্মৃতিরক্ষা

৫৭-তম বর্ষ
প্রথম খণ্ড
ষষ্ঠ সংখ্যা

সকলের সেরা
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
লিঃ
COSE
KOLAY

...ই-

ওমর খৈয়াম

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির তিন শতাধিক রোবাই বহু যত্নে তাঁহাদের মূলগত তাৎপর্যানুসারে এবং ভাবানুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাট কলেবরে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত।

বহু ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে অনবদ্য।

দাম—সাত টাকা

...কল্পনা নিয়ে
...কাব্য "মেঘদূত"-এর
...নব স্বর্গলোক সৃষ্টি ক'রে
..."মেঘদূত" কাব্যের সুচালিত
...। নয়নমুগ্ধকর চিত্রাবলীতে
...—সাত টাকা

॥ উৎকৃষ্ট মুদ্রণ—চিত্রের প্রাচুর্য প্রত্যেক বইখানির বৈশিষ্ট্য ॥

উপহার দিয়া অথবা উপহার পাইয়া

আপনাকে খুশি হইতেই হইবে

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-সম্পাদিত

কুমার-সম্ভব

হাজার হাজার বছর পরেও যে মহাকাব্যখানি রসলিপ্সু প্রেমিকগণের নিকট অসীম আনন্দের উৎস-স্বরূপ হইয়া আছে—ইহা তাহারই বাংলা কাব্যানুবাদ।

বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত। দাম—পাঁচ টাকা

ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

ঋতু-সম্ভার

পৃথিবীর নিত্য-নূতন রূপ-পরিবর্তনের মাঝে আবেগপ্রবণ প্রেমিকচিত্ত যাহা অন্বেষণ করিয়া ফিরে—এই মহাকাব্যে আছে তাহারই অপূর্ব আস্বাদ। দাম—পাঁচ টাকা

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২৲

অনুপম কাব্যগ্রন্থ।

সুরেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী

বালিকাগণ কিরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজগুণে সকলকে সুখী করিতে পারিবে—তাহাই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝান হইয়াছে। দাম—দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার রেশম-কোমল ও কাল চুলের কোনোরূপ ক্ষতি হবে না। ইহা চুলের গোড়া মজবুত করিবে ও চুল পড়া বন্ধ করিতে সাহায্য করিবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

তারা তারা উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০

তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০

নীলকণ্ঠী ৫৲

সরোবর ২·৭৫

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্নিমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২·৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲

রাজগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲

হারানো খাতা ৩৲

পুষ্পলতা দেবী

মৌলিমার অঙ্ক ৩·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

আসাংসি ক্ষৌর্ণানি ১৮৲

জীবন-কাহিনী ৪·৫০

কুমারী মন ৩·৫০

গৌড়জনবধূ ৫·৫০

মণিবেগম ৬-২৫

কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

তারক

কল অফ দি ওয়াইল্ড ২·৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর খাল ২·৫০

নরীশাধব চৌধুরী

দেবানন্দ ৬৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲

নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲

সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩·৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲

একটি নির্মম হত্যা ২·৫০

অন্তরীণ পৃথিবী ৫৲

একটি আত্মা-হত্যা ৩৲

অন্ধকারের দেশে ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২·৫০

মুক্তির আস্বাদ ২·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মনেপদীর আদ্য ৪৲

সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

বনফুল

অগ্নি-সিক্তা ৩৲

ফুলের আগুন ১·৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্রে মানব ৫·৫০

কার্টুন ২·৫০

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

গল্প ১ম—২·৫০, ২য়—২·৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভুলের ফসল ২৲

খেয়ালের খেসারৎ ২৲

বংশধর ২৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ৩২·৫

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲

কল্কিপের বিষ ২য় ৮৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরাজ-বৌ ৩·০০ রামের সুমতি ১·২৫ বিন্দুর ছেলে ১·২৫

পথনির্দেশ ১·২৫

দমরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭·৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২·৭৫

নিতাইনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান শো ৪·৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২·৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪·০০ বিজয়লক্ষ্মী ২·৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩·৫০ পঞ্চভূত ২·৫০ বিষের বন্ধী ৫৲ শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲

চুয়াচন্দন ৩·২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২·৫০ কলরব ২৲

প্রিয়বান্ধবী ৪৲

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গন্ধরাজ ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

অরক্ষণ শাড়ীখানি ২৲

বনফুল

শিকতামহ ৬৲

নবদিগন্ত ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭ হাওড়া।

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

বহুল প্রশংসিত ও পরীক্ষিত

যক্ষ পীড়ায় সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ

অমিয় স্নেহ

মূল্য দুই সপ্তাহের জন্য ৭৲ টাকা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র অন্তত লিখা আবশ্যক। মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

এখানে সর্ব্বাবধ জ্যোতিষের ফাঁকি ও ভুলত্রুটিপূর্ণ অভ্রান্তি ও ছায়ারোগ্য ব্যাধির যাদুমন্ত্র ও সেবনীয় ঔষধ সমস্তে দেওয়া হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীসুকিনপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিষিনোদ ভ্রমাচার্য্য—ব্রহ্মশক্তি কার্য্যালয়

রাধাবাজার, নবদ্বীপ পোঃ (নদিয়া)

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

উপন্যাস : অঘটন আছে ঘটে ৫৷০, অভাবনীয় ১০৲, অঘটনের ঘটা ৬৲, অঘটনের শোভাযাত্রা ও অঘটনের সূত্রপাত ১০৲, অঘটনের পূর্বরাগ ৯৲, ছায়ার আলো ৭৲, দোলা ৮৲, ঘোটানা ৩৲, বিচারিণী ২৸০,

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী ৫৲

নাটক : তিথারিণী রাজকন্যা ২৷০, শ্রীচৈতন্য ৩৲, মীরা বৃন্দাবনে ৪৲।

ভ্রমণ : দেশে দেশে চলি উড়ে ৬৷০, ভ্রাম্যমাণ ৭৷০।

কবিতা : অনামী ৩৷০, (রাজ সং ১০৲) কৃষ্ণ-কথাকাহিনী ৬৲।

স্বরলিপি : সুরবিহার (১ম খণ্ড) ৪৲, ঐ (২য় খণ্ড) ৪৲, দ্বিজেন্দ্রগীতি ৮৲, হাসির গান-এর স্বরলিপি ৩৲

সদ্যোপ্রকাশিত উপন্যাস

অঘটনী গল্পমালা

মধুমুরলী

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কবিতা গান ও নানা অনুবাদ। শেষে ইন্দিরা দেবীর ভাষাতত্ত্বের অনুবাদ। শ্রীঅরবিন্দের পত্রাদি সহ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ভূমিকাসহ। মূল্য ১০৲

হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুরী-১৮ ও কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ের পাওয়া যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

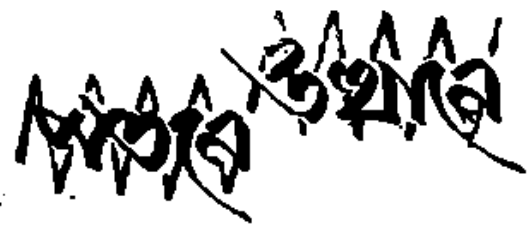

সতীনন্দর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন জাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীনন্দর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি?

দাম—পাঁচ টাকা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের দাইজ। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩৲

উদ্যান-নগরী জামসেদপুর

নগর পরিকল্পনার আধুনিকতায় যা সে যুগ থেকে ৬০ বছর এগিয়ে ছিল

ইস্পাতনগরী জামসেদপুর—এক কথায় যুগ্ম জামসেদপুর আজ ভারতের এক সবচেয়ে সুন্দর শহর। আজকের জামসেদপুর ৬০ বছর আগেকার এক পরিকল্পনার বাস্তব রূপ। সে যুগে আমাদের নগর পরিকল্পনার বেলাতেও তাই ঘটেছে।

সোনারী—বেএলাকা আজ আর অরণ্য নয়। এর চেহারা এখন পরিচ্ছন্ন ও ঝলমলে। কারখানা অঞ্চলের উচ্ছল আর প্রচুর ফুলের বৃক্ষশোভা। এখানে ৮০টা অরণ্যের এলাকাকে পরিকল্পনামাফিক রাখে রাখে ফুলের ঘরে ঘরে তোলার আগে টাটা ইস্পাত কারিগরদের হাতিয়ার ধরেছে।

টাটাদের হাসপাতাল—১৯০৮ থেকে এই আধুনিক হাসপাতাল চালাচ্ছে টাটা ইস্পাত বিভাগের স্পেশাল ওয়ার্ক বিল্ডিং ১৯৫৮তে ই. বি. হাসপাতাল তৈরী হবেছে।

ছুবিলী পার্ক—কারখানা অঞ্চলের ধূলি ধূসর, ধোঁয়াচ্ছন্ন ও গরম থেকে চোখ এখন কিছু পাবে যার ফলে মানুষের চোখ ও তার মনের বিশ্রামের জন্য সেখানে বা ইস্পাতের চেয়ে অনেক বেশী।...এই পার্ক তৈরীর পরিকল্পনা তার ধরে।"

ডঃএরনার বেবেক

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতে নয়, মানুষেও।

টাটা স্টীল

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৭৬

লেখসূচী

১। যোগের শাক্ত ও তন্ত্র কথা (প্রবন্ধ)
শ্রীশিপ্রা বসু ৩৩২
২। পতিতা ও পতিত পাবন (রম্যরচনা)
শ্রীদিলীপ কুমার রায় ৩৩১
৩। বাংলার গীতা 'সদ্ভাবসপ্তক'
শ্রীঅমিয়কুমার সেন ৩৩৮
৪। 'ইয়েস্ স্যার' (গল্প)
উমাদাস মৈত্র ... ৩৪১

লেখসূচী

৫। অসংসারী (উপন্যাস)
শ্রীঅমীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। আর্যা সপ্তশতী শ্রুতি ও স্বর
শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ
৭। সাপুড়ে (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত
৮। দৈনন্দিন
শ্রীঅমিতা ঘোষাল ... ৩৫৪

লেখ-সূচী

৯। নীতের ভোরে (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৩৫৬
১০। বিশ্ববেহাগ (ভ্রমণকাহিনী)
স্বামী আনন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩৫৭
১১। ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ
পুষ্পদেবী, সরস্বতী, প্রতিভাময়ী ৩৬২
১২। বন্দরের বন্ধন
অরুণকুমার দত্ত ৩৬৩
১৩। চিরন্তন (কবিতা)
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৬৭

লেখ-সূচী

১৪। হিমালয় দুহিতা (আলোচনা)
শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য্য ৩৬৮
১৫। মহীরুহ (কবিতা)
শ্রীবীরেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায়
১৬। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী
লীলা বিশ্বাস
১৭। স্বপ্নের ধূপকাঠি— (কবিতা)
জগদীশচন্দ্র দাস
১৮। দেবীদর্শন (গল্প)
মানসী মুখোপাধ্যায় ৩৭৫

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা ৩,

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪৲ জনা ৪৲

দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ সাজাহান ৪৲

মেবার-পতন ৪৲

সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

সরোবর

সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল।

অভাবগ্রস্ত একটি ছোটসংসার—তার তরুণ দম্পতীর জীবনে পড়েছে বৈরাগ্যের ছায়া। দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ তাদের দুটি মনের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া ক'রেছে—তাদের পারস্পরিক আকৃতিকে যেন সফল হ'তে দিচ্ছে না। জীবনের মূল্যায়নে তাহ'লে কি ঐশ্বর্যের স্থানই সব চেয়ে উচ্চ? 'সরোবর'-এ পাওয়া যাবে তারই উত্তর।

দাম—২·৭৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

লেখ-সূচী

১৯। রাগিণী (কবিতা)
উমা দেবীল ৩৭৮
২০। সংকলন ৩৭৯
২১। অব্যক্ত (গল্প)
শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ৩৮০
২২। মহাপীঠের প্রাচীনত্ব : অন্বেষণ
শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী ৩৮২

লেখ-সূচী

২৩। সংস্কৃতি নায়ক দিলীপকুমার
অধ্যাপক অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩৯২
২৪। গ্রহ-জগৎ—সুরাচার্য ৩৯৫
২৫। মহাকবি মধুসূদন
শ্রীভবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
২৬। পট ও পীঠ

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্ব্বার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

অখিল ভারত ধর্ম্মিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং ভারত ধারাসভী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। এই বিষয়বেষ্টারী মহাপুরুষের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী, হস্তরেখা ও কোষ্ঠীবিচার এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চিকিৎসিকেরা মুগ্ধ হইয়া প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন। ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ বৃটিশ সরকারের জয়লাভ, ১৯৪৯ সালে পণ্ডিত জহরলালের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা লাভ, ভবিষ্যত পাক-ভারত সম্পর্ক এবং ১৯৬২ সালের এই ফেব্রুয়ারীর অষ্ট্রেলিয়ান সম্মেলনে 'মানবজাতির অস্তিত্ব আতঙ্ক', পণ্ডিতজীর এই সকল অত্যাশ্চর্য ও অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সাড়ম্বরে তাঁহার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত করিয়াছে। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের—

আটগড়ের মাননীয় মহারাজা, মাননীয়া মহারাণী, ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীবি, এন, সিন্হা, বার-এ্যাট-ল, উড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীবি, কে, রায়, গুজরাটের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅতুল্যকুমার ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় সভাপতি শ্রীবি, কে, মাজাজী, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীসত্যরঞ্জন বাগচী, আমেরিকার মিঃ এডি টেম্পি, ওয়েষ্ট আফ্রিকার মিঃ এম্, এ, ফেসো, লণ্ডনের ফিসেস এম্, এ, মেইল, চীন মহাদেশের লাংচাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসত্যরঞ্জন মিত্র।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অল্প পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে দরিদ্রতা দূরীভূত হইয়া ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—১১'৩৩, শক্তিশালী মূল্য—৩৩'৩৩, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১৬৫'১১, (সর্ব্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর ধারণ করা কর্তব্য)। সরস্বতী কবচ—বিদ্যোন্নতি ও পরীক্ষায় সুফল। সাধারণ—১২'৫৪, মূল্য—১৭'৮৪। মোহিনী কবচ—ধারণে চিরসঙ্গিনী মিত্র হয়। সাধারণ—১৭'২৫, মূল্য—৪১'১৮, মহাশক্তিশালী—৮৮'৮৪। বগলামুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত কার্য্যোন্নতি, মামলায় সুফল এবং শত্রুনাশ। সাধারণ—১৩'৬৮, মূল্য শক্তিশালী—৫১'১৮, মহাশক্তিশালী—২৩০'৩১ (ধারণে তাৎক্ষণিক সন্তানী জয়ী হইবেন)।

জ্যোতিষ-সম্রাট মহোদয়ের বহু অলৌকিক ঘটনাবলী ও অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত সচিত্র জীবনী (ইংরাজী), "Jyotish Samrat" His Life and Achievements পড়ুন। মূল্য—৭'০০ ; ডাক মাশুল রেজঃ—১'০০ ; ভালুয়ার বচন—২'৫০ ; জ্যোতিষ-শিক্ষা—৩'০০ ; নারী জাতক—৩'০০ ; বিশ্বের রহস্য—৩ Queeons Answers—৪, 225। মূল্যাদি মণিঅর্ডার যোগে দেয়।

(বাকিটাকু ১৯০৭ পৃঃ) অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)
হেড অফিস ৮৮-২, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দক্ষিণ মোড় ও ধর্মতলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল) জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" কলিকাতা-১৩। ফোন—২৪-৫০৪৪। সাক্ষাতের সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস—৪৪,অরবিন্দ সরণি (পূর্বের ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট),' "বসন্ত নিবাস" কলিকাতা-৬। ফোন—৪৪-৩৯৮৪। সময়—প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা

বিরাট পরিবর্তন

UBF 2a8·69

ইউবিআই এর ঋণদানের মাপকাঠিতে

ছোট ছোট শিল্পযোগী, চাষী, খুচরা দোকানদার, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তাদের যে গুণটি প্রধান বলে গণ্য হয় তা হল ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা, যার অর্থই হল

- কারিগরি বিদ্যা
- পরিচালন পারদর্শিতা
- উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবার বিপণন-ব্যবস্থা
- ব্যক্তিগত সততা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস : ৬, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা-১

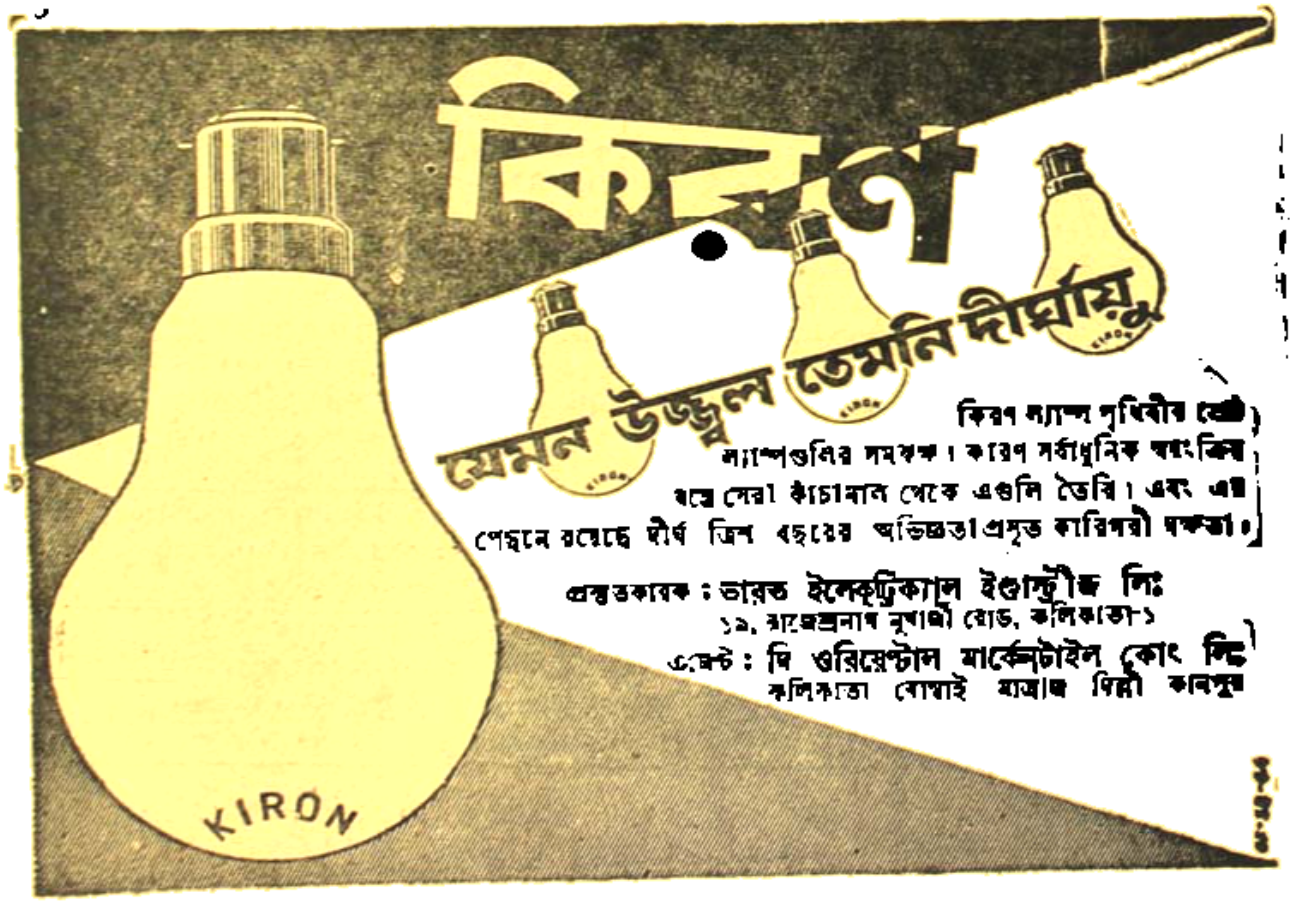

কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর যে কোন ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ। কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা প্রসূত কারিগরী দক্ষতা।

প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

এজেন্ট : দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর

প্রথম খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা,

সপ্তপঞ্চাশত্তম বর্ষ

CALCU
CENTR
UNIVER

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৭৬

যোগের শক্তি ও তত্ত্ব কথা

শ্রীশিপ্রা দত্ত।

ভারতের সমাজ জীবনে তথা ধর্ম জীবনে আজ পাপ প্রবেশ করেছে, আজ সর্বত্র সমাজ বন্ধন ভেঙ্গে পড়েছে। ধর্ম ও বাণিজ্য বিক্রয় বা উপহারের বস্তু। অর্থ লিপ্সার ঘূর্ণাবর্তে ন্যায় ও সততার আগল ভেঙ্গে চৌচির। দেশের ও দশের হিতের কথা লোক ভুলে যাচ্ছে। জড়তার মোহমুগ্ধ মানুষ ন্যায় অন্যায় বিচার করবার শক্তি হারিয়েছে। মন প্রাণ সব কিছুই বিক্ষিপ্ত। প্রলয়ের একটা বিপর্যয়ের দিকে ভারতের সমাজ ঝুঁকে চলেছে।

ভারতের চারদিকে দৃক্‌পাত করলে—এমন কোন ব্যক্তি বা কোন দল বা গোষ্ঠি দৃষ্টিগোচর হয় না—যারা দেশকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে টেনে তুলতে পারবে। সিদ্ধি লাভ করেছে অনেকজন তথাকথিত ভারত-ভাগ্য-বিধাতা শুধু বাক্যাবতে। শুধু কথার ওপর কথা বোঝা, প্যাচের উপর প্যাচ, নানা রকমের শব্দের বিন্যাস দ্বারা সরল জনসাধারণকে ধোকা দেবার চাতুরীতে। নিজের

উন্নতি সাধন ব্যতিরেকে দেশের জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা তাদের মধ্যে নেই।

ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যুব সমাজ আজ পরানুকরণ-প্রিয়। তাদের আদর্শ আজ সিনেমার তারকারা—এদের অনুকরণ করেই এরা কৃতার্থম্মন্য হচ্ছে। কেবল চিত্র তারকাদের অনুকরণে কাঁকই যুব সম্প্রদায় তৃপ্ত নয়। আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের হাওয়া এদেশের আকাশে বাতাসে যেন মিশে গেছে। তাই আমেরিকান পোষাক, হিটলার বাহিনীর অনুকরণে চুল ছাঁটা সবই চলেছে,—সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য দোষগুলিও তারা আয়ত্ত করেছে। অনুদিকে রাজনীতির নামে যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তারা আজ জাতীয়তা বোধ, স্বাধীনতা বিস্মৃত হয়ে একদল ষ্টালিনের পথগামী রাশিয়ার ধুয়ায় সুর মিলাচ্ছে। অপর দল মাও—সে—তুং এর স্বপ্নে সুর মিলিয়ে বিপ্লবের ধ্বনি করছে। কিন্তু কোথায় আজ ভারতের গৌরবময় স্বাতন্ত্র্যবোধ? নিজের দেশের ঐতিহ্য এরা ভুলেছে। ভুলেছে নিজের দেশের কীর্ত্তিমান পুরুষদের। তারা শোনা নয়পৎ, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, নেতাজী প্রভৃতিকে। তাই এদের মুখে আজ বিদেশের আদর্শ এবং বিদেশের রাজনীতির প্রতিধ্বনি।

যুব সমাজের সামনে বর্ত্তমানে কোন আদর্শ নেই। নেতৃবৃন্দ আপন সিদ্ধির জন্য যুব সমাজকে বিপথে চালিত করছে, অন্যায় কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করছে, প্রলুব্ধ করেছে অধর্ম্মের পথে এগিয়ে যেতে। কতিপয় সাহিত্যিক অশ্লীল সাহিত্য—যা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আজ ভারতের যুব সমাজকে বিদ্রান্ত ও হীনমন্য করবার উদ্দেশ্যে উপহার দিচ্ছেন। তাই আজ চলনে, বলনে, পোষাকে যুব সমাজের বাহ্যিকতা দৃষ্টির পরিচায়ক।

আজ এই অতীব দুর্দ্দিনে দেশকে তার অতীত গৌরবের শিখরে টেনে তুলবার একমাত্র ভরসা যুব সমাজের দৃষ্টিকে, যুবশক্তিকে সঠিকপথী করা। যুব সমাজের চরিত্র সংগঠনই আজ প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। এই যুব সমাজকে উন্নত করতে হ'লে প্রথমেই প্রয়োজন তাদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতি। শারীরিক উন্নতির জন্য কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, প্রাণায়াম প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা তাদের শরীর মন উন্নত করা সম্ভব ও দীর্ঘ নীরোগ জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব।

এই প্রাণায়াম ও যোগবলে মানুষ অনেক শক্তিই আয়ত্ত করতে পারে। অধমা এক প্রবীন যোগীর সান্নিধ্যে এসে এ সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানতে পেরেছি, স্বামীজীর অনুমতি না পাওয়ায় তাঁর যোগ সাধনার দীর্ঘ সূচী দেওয়া সম্ভব হ'ল না। কিন্তু তাঁর সেই দীর্ঘ যোগ-সাধনার ও দীর্ঘকাল সমগ্র ভারত পর্য্যটন ও বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান সাধনার যে তালিকা পাওয়া যায়—তা হতেই তাঁর প্রবীণত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমানে তিনি কলকাতায় অবস্থান করেছেন। কিছু কিছুকালের মধ্যেই তিনি রাঁচীতে প্রত্যাগমন করবেন। তিনি স্বামী সংস্থানন্দ সরস্বতীর শিষ্য স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী। গুরুর আশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবী হয়ে তিনি যোগ সাধনার দ্বারা অনেক শক্তির অধিকারী হয়েছেন। তন্মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি নীরোগ করা অন্যতম। এই যোগ সাধনার সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় যা জানতে পেরেছি—তা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করলাম। হয়ত স্বামীজীর এই যোগ সাধনার প্রবন্ধ পাঠ করে—অন্ততঃ কেউ কেউ যোগের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

স্বামিজী গোরক্ষনাথ যোগপন্থা অনুগামী। তিনি তাঁর গুরুদেবের নিকট হ'তে "পরম্পরা যোগ" অভ্যাস শিখেন। এবং তাঁর গুরুর আশীর্ব্বাদে তিনি যোগ প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে চেষ্টা করেন। লৌকিক উন্নতির জন্য বা মানবিক উন্নতির জন্য যৌগিক প্রক্রিয়া সম্ভব কিনা এই জন্য স্বামিজী অনুশীলন (experiment) সুরু করেন।

সাধারণতঃ যোগীরা আত্মোন্নতির জন্যই যোগ সাধনা করে থাকেন। এবং হঠযোগের "প্রদীপিকায়" উল্লেখও আছে—যোগের দ্বারা যোগী নিজেকে নীরোগ করতে পারেন, ইচ্ছামৃত্যু ঘটাতে পারেন এবং সূক্ষ্ম দেহ হ'য়ে পাখীর মত আকাশে বিহার করতে পারেন বা দেশান্তরে গমনাগমন করতে পারেন। কিন্তু স্বামিজী তাঁর যোগের দ্বারা কেবলমাত্র নিজেকেই নীরোগ করতে চান্ না।

তিনি অন্যান্যদেরও তাঁর যোগ দ্বারা যোগমুক্ত করতে চান।

যোগের Ultimate goal হ'ল—মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করা এবং আপন বশীভূত করা ও অফুরন্ত আনন্দ ও শান্তি লাভ করা। সুখ দুঃখ মনের ধর্ম। যখন মন থাকে না, তখন যে আনন্দ উপভোগ করা হয়, সেটা পার্থিব আনন্দ নয়। যেমন কোন ব্যক্তির পায়ে যদি কাঁটা বিঁধে, তখন তার মনে এক রকমের অবস্থা। আবার যখন তাঁর পায়ে কাঁটা লাগল, তখন সে সুখের অভাব অনুভব করল। ঐ কাঁটা যখন বের করা হয়, তখন দুঃখের অভাব বা সুখ অনুভব করা যায়। মন যখন স্থির হয়ে আসে বা আপন আত্মার মধ্যে আসে, তখন এক প্রকার আনন্দ। মন যখন চঞ্চল হয়,—তখন সুখ দুঃখ অনুভব করে। যেমন বিদেশ হ'তে কোন প্রিয়জনের আগমন বার্তায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন মনের যে অস্থিরতা তা দুঃখের অনুভবের তুল্য। যখন সেই প্রিয়জন এসে যায়, তখন মনের চঞ্চলতা থেমে যেয়ে মন প্রসন্ন হয়। না আসার উদ্বেগ দূর হয়ে, মনে সুখ আসে। এটা বিষয় সম্পর্কিত সুখ। যখন মন একেবারে বিষয়বস্তু হ'তে নিলিপ্ত হয়ে যায়—তখনই সেটা absolute bliss বা শান্তি বা সমাধি।

যোগের অনুকূল স্থান বা পরিবেশ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, সেই প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেছেন—সুরাজ্য ধার্মিক দেশ, সুভিক্ষ, (অর্থাৎ ভরণপোষণের চিন্তা করতে হবে না) নিরুপদ্রব—এটাই যোগীর পরিবেশ। এই পরিবেশ না হলে গৃহত্যাগী যোগীর পক্ষে যোগ সম্ভব নয়। গৃহী যোগীর পক্ষে শান্ত বা নির্জন পরিবেশ যোগের স্থান ও ধ্যানের অনুকূল।

যোগীর কিছু গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন বা কিছু গুণাবলী অভ্যাস করা প্রয়োজন। যেমন যোগের প্রথম স্তরে যোগী সার্বভৌম মহাব্রত, অহিংসা (সত্য ভাষণ, সৎকাজ করা), চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য পালন, সঞ্চয়শীল হবে না (অপরিগ্রহ)।

যোগের দ্বিতীয় স্তরে নিয়ম, সন্তোষ, শৌচ (অর্থাৎ শরীর, মন, ব্যবহার, আহার, কর্ম সব কিছু হই শুদ্ধতা পালন), তপ, (সহনশীলতার নাম তপ) যত দ্বন্দ্ব আছে তাকে জয় করা (সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান, অপমান, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতিই দ্বন্দ্ব), স্বাধ্যায় অনুশীলন (অর্থাৎ উত্তম গ্রন্থ পাঠ। ধর্মপুস্তক পাঠ দ্বারা মন শান্ত করা, জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ করা প্রভৃতি), ঈশ্বর প্রণিধান (ঈশ্বরে মন লাগানো, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজীবে, ঈশ্বর, সমস্ত জীবকে সেবা করা, কাউকে ঘৃণা না করা)। এই সব গুণাবলীর দ্বারা যোগী যোগ সাধনের উপযুক্ত হবে। গৃহী বা সন্ন্যাসী যে কেহই উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হলে যোগ করা সম্ভব।

শরীরকে যোগের উপযোগী করাকে বলে আসন। মনকে জয় করাই হল যোগ। প্রাণকে জয় করলেই মনকে জয় করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলি তখন মন জয় হয়। সাধারণতঃ লোকে প্রাণকেই জয় করতে চায়। ফলে তারা মনকে জয় করতে পারে না, প্রাণকেও জয় করতে পারেনা। প্রত্যেক প্রাণায়ামের সঙ্গে মনকে জয় করার একটা প্রয়াস রাখতে হবে। কোন জায়গায় (এককথা বস্তুর মধ্যে) মনকে লাগানোর নাম হচ্ছে ধারণা। সেটা যখন কিছুক্ষণ স্থির হল—তাকেই বলে ধ্যান। আর কিছুক্ষণ যখন সব কিছু ভুলে কেবলমাত্র ধ্যানে মগ্ন থাকা যায় তখন তাকে বলে সমাধি। তখন যোগীর নিজের দেহ বা সংসার সম্বন্ধে কোন চেতনাই বা জ্ঞান থাকে না।

আসন তিন প্রকার। যথা—স্বস্তিকা আসন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, অন্যান্য আসন শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখার জন্য।

প্রাণায়াম যত বেশী করা যায়, তত বেশী ফল পাওয়া যায়। প্রাণায়ামের সঙ্গে ধ্যান ধারণা করতেই হবে। যদি ধ্যান করা না হয়, তবে যোগের কোন ফল পাওয়া যায় না। মনকে স্থির না করতে পারলে প্রাণায়ামের কোন ফল হয় না। প্রাণায়াম দ্বারা মনকে স্থির করা হয়।

আধুনিক প্রাণায়াম পদ্ধতিকে স্বামীজী প্রাণায়াম নয় বলছেন। তাঁর মতে ইহা নিঃশ্বাসের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। প্রাণায়ামকারীদের প্রাণের উপর মনের কোন প্রভাব নেই। যোগের উদ্দেশ্য প্রাণকে অনায়াসে রুদ্ধ করা। প্রকৃত যোগী মনের ইঙ্গিতে অনায়াসে প্রাণকে রুদ্ধ করলেই মন রুদ্ধ হয়। মন নির্ভর করছে প্রাণ রুদ্ধ হওয়ার উপর। উন্নত যোগীর যেখানে মন যায়, সেখানে প্রাণ যায়। যেখানে প্রাণ যায়, সেখানে মনযায়। উভয়ই ওতো-

প্রোতভাবে চলিত। মন খুব উন্নত হলে প্রাণও রুদ্ধ হবে। এটাই যোগের পরবর্তী স্তর।

আধুনিক প্রাণায়ামকারীরা বেশী জোর দিয়ে থাকে প্রাণের উপরই। এতে তারা নিঃশ্বাসের প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণকে জয় করতে পারে না। প্রাণায়ামকারীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে মনকে সীমাবদ্ধ রাখে। তারা মনে করে এই ভ্রান্ত পদ্ধতিতেই তারা যোগ সাধনায় সিদ্ধ হবে। স্বামিজীর মতে এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এবং এটাই আধুনিক প্রাণায়ামের ত্রুটি। তাঁর মতে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে মনকে সীমাবদ্ধ করতে পারা যায় না, কারণ মনই একমাত্র প্রাণকে জয় করে।

মন একাই প্রাণায়াম আছে। যথা—সূর্যভেদন, উজ্জায়ী, শীতলী, শীৎকারী, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা, প্লাবনী, অনুলোম, বিলোম।

গরমের দিনে শীতলী ও শীৎকারী প্রক্রিয়ার দ্বারা মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে নাক দিয়ে ছাড়া হয়। সাধারণতঃ যোগীরা ভস্ত্রীকা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে থাকে। এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে অন্য নাক দিয়ে ছাড়ে। পুনরায় যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পূর্বে ছেড়েছিল, সেই নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে অপর নাক দিয়ে ছাড়ে, এই প্রাণায়াম দ্বারা মন ও প্রাণকে জয় করবে—এটাই প্রাণায়ামকারীদের ভ্রান্ত ধারণা। শ্বাস প্রশ্বাসকেই এরা বড় করছে। মনের প্রতি এরা কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

প্রাণায়ামের পদ্ধতি প্রসঙ্গে স্বামিজী বলছেন—শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে বিচ্ছেদ করে দেওয়ার নাম প্রাণায়াম। শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারই হচ্ছে প্রাণায়াম, প্রাণায়ামকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, পূরক, রেচক, ও কুম্ভক। শ্বাসকে গ্রহণ করার নাম পূরক। শ্বাসকে রুদ্ধ করার নাম কুম্ভক। শ্বাসকে বার করার নাম রেচক। সাধারণতঃ শ্বাসকে যখন পূরক করা হয় তখন ৪ মাত্রায়, কুম্ভক ১৬ মাত্রায়, ৮ মাত্রায় রেচক করা হয়।

১ : ৪ : ২ মাত্রায়।

এইভাবে প্রাণায়ামের সংখ্যা দিন দিন বাড়াতে হয়। যথা—প্রথমদিন ৪ মিনিট, পরের দিন ১০ মিনিট ইত্যাদি।

যখন শরীর ও প্রাণ দৃঢ় হবে, তখন সে বহুক্ষণ বায়ুকে ধারণ করতে সমর্থ হবে। অনায়াসে ইচ্ছামত বায়ু ধারণ করবার যখন সামর্থ্য হয়, তখনই প্রাণায়ামের সফলতা। ইচ্ছামত যখন শ্বাস-প্রশ্বাসকে ধারণ করতে পারা যায়, তখন মনপ্রাণও ইচ্ছামত রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন প্রাণ ও মন একই সঙ্গে রুদ্ধ হবে। They are inter connected। যখন এটা Developed হয়, তখন ইচ্ছামত মনপ্রাণকে রুদ্ধ করে। তখন আর এই পদ্ধতির প্রাণ ধারণের প্রয়োজন হয় না। তখন এটা মনের উচ্চ অবস্থা।

শ্বাস প্রশ্বাসকে প্রাণায়ামের মধ্যে রুদ্ধ করতে হবে। ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস যখন সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে, তখনই সে যোগে প্রবেশ করে। শ্বাস প্রশ্বাস ২১ হাজার নাড়ী ঘুরে এক মুহূর্তে বের হয়ে যায়। শ্বাস গ্রহণ করে মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত নাড়ী প্রবাহিত হয়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে বের হয়ে যায়। পূরক কল্প অর্থ Oxygen গ্রহণ করা। কিন্তু শরীরের মধ্যে এসে তা Carbon হয়ে বের হয়ে যায়। রেচকের সময় Carbon প্রশ্বাসের সঙ্গে বের হয়ে যায়। মৃত্যুর লক্ষণে দেখা যায়—শ্বাস গ্রহণ করা হয়। তখন শরীরে Carbon অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রশ্বাসের সঙ্গে তা বের হয় না। অর্থাৎ রোগীর তখন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেই জন্যই রোগীকে তখন অক্সিজেন দিতে হয়। মৃত্যুর লক্ষণই হল শরীরের কার্বন প্রশ্বাসে নির্গত হয় না। কিন্তু যোগী অনায়াসে কার্বন শরীর হতে বের করে থাকে। এইরূপে যোগী মৃত্যুকে জয় করতে পারে।

উপাসনা দুই রকম। একটা অহংগ্রহ ও অপরটি প্রতীক উপাসনা। অহংগ্রহ অর্থাৎ ভগবানকেই নেওয়া উপাসনা করা। প্রতীক উপাসনা হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে উপাসনা।

দেবদেবীর মাধ্যমে যে উপাসনা তা প্রতীক উপাসনা বা স্মার্ত উপাসনা। আত্মাতেই ভগবান বিদ্যমান এই ধ্যানে যারা ভগবানের আরাধনা করে—তারা হলেন অহংগ্রহ উপাসক। তাঁরা ধ্যান ধারণা দ্বারা ভগবানে মগ্ন হয়ে যান। কোন রকম প্রতীকের মাধ্যমে পূজা না করেও মনে মনে ভগবানের উপাসনা করে—তারাই অহংগ্রহ উপাসক।

পাঁচজন উপাস্য দেবদেবী আছেন যথা—গণেশরূপে সূর্য্যরূপে, বিষ্ণুরূপে, শিবরূপে ও দুর্গারূপে। সমস্ত দেবদেবীই এই পঞ্চদেবদেবীর অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান রূপে ভজনা করা হয়। শক্তিরূপে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হয় দেবীরূপে যেমন দুর্গা, কালী ইত্যাদি। ঈশ্বর যখন জ্ঞানরূপে প্রকাশ হন, তখন সূর্য্যরূপে উপাসনা করা হয়। বিষ্ণুরূপে তাঁকে ভজনা করা হলে তিনি বিভু বা সর্ব্বব্যাপী। ঈশ্বরকে শান্তিরূপে ভজনা করা হলো গণেশরূপে ভজনা করা। কল্যাণময় রূপে শিবকে ভজনা করা হয়।

১৮টি পুরাণ আছে। স্মার্ত্ত উপাসকরা এই ভাবে উপাসনা করেন। সৃষ্টাই বড়, সৃষ্টি ছোট। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন দেবদেবীকে ভজনা করার কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু মৌলিক কোন বিরোধ এদের মধ্যে নেই, কেবলমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও উপাসনা পদ্ধতির তফাৎ।

যোগ মনকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বস্তুতে নিয়ে যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সব চেয়ে প্রবল চক্ষু। চক্ষুর বিষয় হচ্ছে রূপ। রূপেই মন বেশী আকৃষ্ট হয়। যার চোখ নেই, তার কাছে সংসার শূন্য বোধ হয়। রূপের দ্বারা ঈশ্বরকে কল্পনা করে বহুমুখী মনকে একমুখী করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই মূর্ত্তি উপাসনার মাধ্যমে। মূর্ত্তি পূজাকে তাই প্রতীক উপাসনা বলা হয়। প্রতীক উপাসনা হচ্ছে মনবাণীর মধ্যে ঈশ্বরকে নিয়ে এসে মূর্ত্তির মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করা। সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিনিধিরূপে প্রতীককে চিন্তা করা হয়।

যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য মনকে জয় করা। আত্মা মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মন যখন স্থির হবে, তখন সে আত্মস্থ হবে। মন জয় করেছে কামনা বাসনাকে। কামনা বাসনার সমষ্টিই হচ্ছে মন। মন হতে কামনা বাসনা যখন চলে যায়, তখনই মন স্থির হয়। মন স্থির হলেই আত্মার reflection হবে। মন যেখানে থাকবে, সেখানেই reflection হবে। Reflection হল আভাস। আভাস যুক্ত আত্মা জীব বা মনযুক্ত আত্মাই জীব। সুখ দুঃখ ভোগ করছে জীব। আত্মা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। আভাসই সব করছে। আত্মা হল আধার। আভাসই হল বাসনা কামনার মূল। জন্ম মরণ আভাসেরই কাজ। আত্মা যায় আসে না, পাপপুণ্য আভাসেই থাকে। আভাস মুক্তি হতে হলে মন স্থির হয়। তখনই সে আত্মায় লীন হয়। যেমন—আয়নায় প্রতিবিম্ব আসে। আয়না মায়া আর মুখ তখন ঈশ্বর। প্রতিবিম্ব জীব। আয়না যখন থাকেনা, তখন মুখই কেবল থাকবে, তখন জীব বা ঈশ্বর থাকবে না। আয়না যখন নষ্ট হয়ে যায় ঈশ্বর বা জীব তখন থাকবে না। থাকবে কেবল মুখ। মুখরূপী ব্রহ্মই তখন বিরাজ করে।

মৃত্যু ভয়ের কারণ কি? মৃত্যুভয় সমস্ত জীবের মধ্যেই আছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্ম যার মৃত্যু তার কিন্তু যোগ শাস্ত্রে বলা হয়েছে মৃত্যুকেও জয় করা যায়। আত্মা অমর। জীবও অমর হতে চায়। এটা তার জন্মগত প্রেরণা। অনন্তকালের তুলনায় অমরত্ব ক্ষণস্থায়ী তা সত্ত্বেও মানুষ অমর হতে চায়। কারণ তা আত্মার প্রেরণা। আত্মার অভিধানই জীব।

কিন্তু যৌগিক দৃষ্টিতে যোগ সাধনার দ্বারা এই স্থূল শরীরকে সে অজর অমর করে রাখতে পারে। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত স্থূল শরীরকে অজর অমর রাখবে যোগী।

কায়সম্পাত হলে যোগী আপনার ইচ্ছামত শরীরকে বজ্রের মত দৃঢ়, সুন্দর, অণিমা, লঘিমা আদি অষ্ট মহাসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অণিমা অর্থ অণু, লঘিমা হাল্কা, মহিমা বড়, গরিমা ভারী, প্রাপ্তি অর্থাৎ ইচ্ছামত সমস্ত ভৌতিক পদার্থ প্রাপ্ত হয়। প্রাকাম্য হলে পঞ্চভূতে কোন বাধা থাকবে না। বশিত্ব অর্থাৎ পঞ্চভূত ও তার সমস্ত জীবকে বশীভূত করা। ঈশত্ব অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থের উপর শাসন করবার সামর্থ্য আসে। এই সমস্ত যোগ দ্বারা প্রাপ্ত হয়, স্থূলদেহ ত্যাগ করে যোগী সূক্ষ্ম দেহে নানা স্থানে বিচরণ করতে পারে। মনোবধত্ব অর্থাৎ মনের গতিতে চলা। বিকরণ ভাব অর্থাৎ শরীর বিনাশই বিষয়কে অনুভব করা।

শরীরের মধ্যে যখন মন থেকে অন্যান্য বিষয়ক চিন্তা করে ও অনুভব করে, তাকে কল্পিত বৃত্তি বলে। শরীরকে ত্যাগ করে মন যখন স্থির স্থিতি হয়ে যায়, তখন তাকে অকল্পিত বৃত্তি বলে। সাধারণ লোকের কল্পিত বৃত্তি। অকল্পিত বৃত্তিতে দেহত্যাগ করে মন চলে যাওয়ার যে শক্তি, সেটাই অকল্পিত বৃত্তি বা মহাবিদেহ। আসলে সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যেই থাকে, অকল্পিত বৃত্তিকেই মহাবিদেহ

বলা হয়। বাইরে মনের যে অর্কষ্ট্রেড বৃত্ত হল এটাকে বিশ্বের কারণ বলা হয়। বেঁচে থাকার যে ইচ্ছা বা অমর হওয়ার যে প্রেরণা—এটাই মৃত্যু ভয়ের কারণ।

মৃত্যুকে কি করে জয় করা যায়? যোগের মাধ্যমে প্রাণ ও মনকে জয় করা যায়। এই ভাবেই মৃত্যুকে জয় করা যায়। যোগীদের মতে স্থূল শরীর থেকেও মৃত্যুকে জয় করা যায়। বেদান্ত মতে মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু যোগীর মতে অমর হওয়া যায়।

আদিনাথ, শাবর, আনন্দভৈরব, চৌরঙ্গী, মীন, বিরূপাক্ষ, মহানন্দ, ভৈরব, সিদ্ধি, বুদ্ধ (বুদ্ধদেব নয়), কন্থরী, বিলেশয়, কোরন্টক, সুরানন্দ, সিদ্ধিপাদ, চর্পটি, কাণেরী, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কপালী, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, অল্লাভ, প্রভুদেব, প্রভু, চলী, টিন্টিনি, ভানু, নাগার্জুন, সত্যকাপালিক, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, প্রভৃতি মহাসিদ্ধ পুরুষরা আজও অমর হয়ে আছেন। যোগের প্রভাবে কালকে জয় করে এই মহাযোগীরা ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছেন। গোরক্ষনাথই সর্বশেষ অমর পুরুষ তাঁর গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ। গোরক্ষনাথের প্রসঙ্গ পরে আরও জানানো হচ্ছে।

যোগ সকলেই করতে পারে এবং ব্রহ্মজ্ঞান সকলেরই হতে পারে। যোগবাশিষ্ট রামায়ণের চারটি চরিত্র উদ্ধৃত করে স্বামিজী তা বিশ্লেষণ করেন। বলি ও প্রহ্লাদ দুইজন দৈত্য। লীলা ও চূড়ালা রাজমহিষী দুইজন নারী। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে নারীরাও যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারে।

প্রাণ একটা শক্তি। তাহাই প্রকাশ শ্বাস প্রশ্বাস। প্রাণ ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি মন, যে যোগীরা মনকে জয় করেন, তাদের প্রাণের সহায়তা লাগে না। তখন প্রাণ আপনা হতেই জয় হয় বা বশীভূত হয়। মনপ্রাণ যখন ব্যক্তি শরীরে আসে, তখন যোগাভ্যাস দ্বারা ব্যক্তিগত মনের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়। তখন মন সমষ্টিতে আসে। সমষ্টি মনই মায়া। চেতন ব্যক্তিমনে (individual mind) তা হয় জীব। চেতনের reflection মায়াতে পড়লে, তখন তা হবে ঈশ্বর। cosmic মন সমষ্টি এবং সমষ্টিই হল ঈশ্বর। চেতন কোন কাজই করে না। যখন সে reflected হয়, তখন অভিনব এক চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং তাকে জীব সাজা দেওয়া হয়।

যে মন প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সে হবে উন্নত মন। কিন্তু সাধারণতঃ প্রাণই মনকে সংযত বা control করে। কিন্তু যোগীর মনই প্রাণকে control করে। মন ও প্রাণকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাকে মন আহ্বান করবে। কামনা বাসনাযুক্ত মন হচ্ছে প্রতিবন্ধক। divine unity বা পরমাত্মাই হচ্ছে highe stotage of enlightement।

মনের কয়েকটি স্তর আছে। প্রথম স্তরকে বলা হয় Subconscious stage of mind। দ্বিতীয় স্তরকে ধ্যান দ্বারা conscious stage এ মন আসে। Gross element এ যখন—মূর্তিতে, যখন মন স্থির করা যায়, তখন তাকে conscious stage বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের দ্বারা (অর্থাৎ Sense organ দ্বারা) আমাদের বিক্ষিপ্ত মন যখন বিশেষ বস্তুর উপর নির্ভর করতে পারে, তখনই তাকে conscious stage বলে।

তৃতীয় স্তরে সূক্ষ্ম অবস্থায় যখন মন কাজ করছে, তখন তাকে Super Consciousness বলা হয়। মনের abstract অবস্থায় যারা যেতে পেরেছে যেমন দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি। এইসব মনের বৃত্তির উপর যাদের মন স্থির হয়েছে, তারা Super conscious stage, super consciousness এ হয়। একটা বৃত্তি। একজন দুঃখী অন্য দুঃখীকে দেখে ঠিক সেই পরিমাণ যে দুঃখ অনুভব করে এবং সেই দুঃখ নিবারণের জন্য মনে যে একটা বৃত্তি উদয় হয়—সেটাই দয়া।

সাধারণ মানুষ স্থূল বস্তুর উপর তাদের ধ্যান ধারণা সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু স্বামিজীর মতে মনের বৃত্তি Gross হ'তে abstract ভাবনা হল মনে উন্নীত হওয়া। নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা বা পশুরা হ'ল below subconscious stage, conscious stage কে Develop করলেই উন্নত স্তরে উঠান যায়। জীব অল্পশক্তিমান। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। উপরোক্ত ব্যাখ্যা সাইকোলজিক্যাল দৃষ্টি ভঙ্গি তে নয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে। মনের ব্যাখ্যা করে স্বামিজী বলেছেন—পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে আমাদের স্থূল জগৎ তৈরী হয়েছে। পঞ্চ মহাভূতের সত্ত্ব গুণ হতে

মনের উৎপত্তি, রজোগুণ হতে প্রাণের উৎপত্তি, পঞ্চ ভূতের তমোগুণ অংশ পঞ্চকরণ হলে তার সংমিশ্রণে এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। পঞ্চ ভূতের পাঁচটি গুণের সমষ্টিতে স্থূল জগতের উৎপত্তি হয়েছে।

মন সত্ত্বগুণ হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে পরমাত্মার বিকাশ মনের উপর অধিক প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই মনকে জ্ঞান শক্তি বলে। যেমন সমষ্টি জ্ঞান বা cosmic mind। রজোগুণ হতে যে প্রাণ তৈরী হয়েছে তা ক্রিয়া শক্তি। প্রাণে যে ক্রিয়া হয়, তাকে প্রাণক্রিয়া শক্তি বলে। যেমন—Energy, সমষ্টিগত যে ক্রিয়া তা ঈশ্বরের মায়া বা cosmic energy।

স্বপ্নের সৃষ্টি out of nothing। স্বপ্ন মনের বিলাস। যেমন মন স্বপ্ন সৃষ্টি করছে, তেমনি আমাদের বস্তু জগৎ বা ব্যবহারিক জগৎ ঈশ্বর মনের সৃষ্টি। জাগতিক মন ঈশ্বরের মন বা মায়া। স্বপ্ন যেমন আমরা অনেক কিছু ভাঙ্গি, গড়ি, তেমনি জাগতিক জগতে ঈশ্বর সমস্ত জিনিষ ভাঙ্গছেন গড়ছেন। স্বপ্ন জগতের নিয়ন্ত্রণ করছে মন। আত্মার আধারেই মন আছে। cosmic mind সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। বাসনাযুক্ত মন হচ্ছে ব্যক্তিমন বা individual mind, বেদান্তে মনকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যবহারিক সত্তা ঈশ্বরের সৃষ্টি। এটা মায়ার সৃষ্টি। যেমন মনের জগতে স্বপ্ন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি মায়াবলে পরমাত্মা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন। মায়া ঈশ্বরের শক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে স্বপ্নের মত এই ব্যবহারিক জগতকে ভ্রান্ত মনে হয়।

সত্তা তিন প্রকার। যেমন—ব্যবহারিক সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, পারমার্থিক সত্তা। ব্যবহারিক সত্তা ঈশ্বরের সৃষ্টি। প্রাতিভাসিক সত্তা জীবের সৃষ্টি বা মনের বিলাস। পারমার্থিক সত্তা হল পরমাত্মা।

জাগ্রত অবস্থায় যেমন স্বপ্নাদি নষ্ট হয়ে যায়,—তেমনি জ্ঞান প্রাপ্ত হলে ব্যবহারিক সত্তাও নষ্ট হয়ে যায়।

সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধে যে চেতনের সম্বন্ধ তাকেই আত্মা বলা হয়। স্থূল মৃত দেহে যে চেতন থাকে, যে ব্যাপক ব্রহ্মের চেতনতা, স্থূল শরীর হচ্ছে ভোগের শরীর। স্থূল ও সূক্ষ্মের সংমিশ্রণ হল জীব। সূক্ষ্ম শরীর একবারও আধার বিনা থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর ৮৪ লাখ কোন যোনীর শরীরে যেয়ে আশ্রয় নেয়। তখন তাকে জীব বলা হয়।

যখন ঈশ্বরের শক্তি সমভাবে থাকে, তখন তা মহাপ্রলয়। তখন সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনগুণের তারতম্য হয় না। এই তিনগুণের সমাবস্থার নাম প্রধান। যখন সৃষ্টি হবার সময় আসে, তখন এক গুণের তারতম্য হয়ে যায়। তার এক অংশ হয়ে যায় শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান। অন্য অংশ হয় মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান বা অবিদ্যা। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধা-ই মায়া। মায়া যুক্ত ব্রহ্মই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বিশ্বের স্রষ্টা—সর্বভূতের নিয়ন্তা ঈশ্বর। মলিন সত্ত্বগুণ অবিদ্যা। তার থেকে পঞ্চভূত তৈরী হয়ে এই জগতের সৃষ্টি হয়। স্থূল পদার্থ যেমন—মন, প্রাণ, স্থূল জগৎ, জীব—সব মলিন সত্ত্বগুণ হ'তে সৃষ্টি হয়। অবিদ্যাই আমাদের কারণ শরীর। কারণ শরীর মানেই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অবিদ্যার কোন জ্ঞান নেই। কারণ শরীর অনুভব হয় সুষুপ্তি অবস্থায়। অবিদ্যা বা অজ্ঞানে অভিভূত হওয়া। তার কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। কারণ সেই সময় সুষুপ্তি হতে জাগ্রত পুরুষ বলে কোন জ্ঞান ছিল না। মায়া সহ সত্ত্বগুণ প্রধান ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।

স্বপ্নে যা অনুভব করা যায় তা সূক্ষ্ম শরীর। সুষুপ্তি হচ্ছে কারণ শরীর। সুষুপ্তি সুখ অনুভব করে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও সে তা উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ সে অবিদ্যায় আবৃত ছিল। জাগরণে হল স্থূল শরীর। জাগরণে যে শরীর উপলব্ধি করা হচ্ছে তা স্থূল শরীর।

প্রত্যেক জীবই বাসনা নিয়ে মরে। বাসনা অনুযায়ী তার পরজন্ম হয়। যার বাসনা নেই মুক্ত পুরুষ। নিম্ন শ্রেণীর জীবদের কেবল ভোগের শরীর। কর্ম শরীর বা কর্মবাদ একমাত্র মনুষ্য শরীরেই প্রযোজ্য।

প্রত্যেক পদার্থের দু'টি কারণ আছে। একটা উপাদান কারণ, অন্যটা নিমিত্ত কারণ। যেমন—কোন গৃহ নির্মাণ করতে কারিকর বা মিস্ত্রী হচ্ছে নিমিত্ত কারণ। সিমেন্ট, ইট, কাঠ ইত্যাদি তার উপাদান কারণ। ঘটের নিমিত্ত কারণ হচ্ছে কুমার, উপাদান হচ্ছে মাটি, হাঁচ ইত্যাদি।

যোগের শক্তি সম্বন্ধে বলতে গেয়ে স্বামিজী গোরক্ষনাথের একটি কাহিনী উদ্ধৃত করেন। গোরক্ষনাথ ছিলেন মহাযোগী। তিনি শঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। গোরক্ষনাথ যখন তপস্যা করেন বা যোগ সাধনা করেন, তখন বিক্রমাদিত্যের বড় ভাই ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীতে নৃপতি ছিলেন। একদিন রাজা ভর্তৃহরি শিকারে গেয়ে একটি মৃগ শাবককে হত্যা করে এবং মৃগ শাবকটি গোরক্ষনাথের সামনে গেয়ে মৃত্যু বরণ করে। রাজা ভর্তৃহরি তখন গোরক্ষনাথের কাছে মৃত মৃগশাবকটি জীবী করেন। গোরক্ষ নাথ তখন তাঁকে ভৎর্সনা করে বলেন যে জীবন দান করবার শক্তি যখন তাঁর নেই, সেই জীবন নেওয়া তাঁর উচিত হয়নি। রাজা ভর্তৃহরি তখন জানান মৃগয়া রাজধর্ম। উভয়ের মধ্যে এ নিয়ে বচসা হয়। গোরক্ষনাথ যোগ দ্বারা ভর্তৃহরির শক্তি হরণ করেন। কিন্তু রাজার বাক্‌শক্তি তখনও ছিল। গোরক্ষনাথ বলেন "তুমি যদি শাবককে প্রাণ ফিরে না পাবো, তবে তোমারও এই মৃগের অনুরূপ গতি হইবে"। অবশেষে রাজা বলেন "আপনি যদি প্রাণ ফিরে পারেন, তবে আমি আমার এ প্রাণ দিব"। গোরক্ষনাথ তখন যোগবলে মৃত মৃগ শাবকের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। রাজা ভর্তৃহরি এই অলৌকিক কর্ম দেখে গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব বরণ করেন। তিনি আর রাজ্যে ফিরে যাননি। গোরক্ষনাথ প্রয়াণ করেছিলেন যোগের দ্বারা মৃত্যুরও প্রাণ সঞ্চার হতে পারে।

গোরক্ষনাথের কৃপায় নেপালের রাজা রাজত্ব করছেন। নেপালের রথযাত্রা মৎস্যনাথের। নেপালের প্রতিষ্ঠাতা পৃথ্বিনারায়ণও গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। তিনি গোরখা পাহাড়ে তপস্য করতেন। কথিত আছে তিনি রাণা পরিবারভুক্ত ছিলেন। গোরক্ষনাথের যোগ শক্তির দ্বারা পৃথ্বিনারায়ণ যোগশক্তি বলে একাই নেপাল জয় করেন। নেপালে নয়জন বড় বড় রাজা ছিলেন। তাঁরা পৃথ্বিনারায়ণের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। তাঁরা নেওয়ার জাতিভুক্ত।

পুরুষকার ও দৈব সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ আছে। স্বামিজীর মতে দৈব হচ্ছে পুরুষকারেরই ফল।

স্বামিজী বহু দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন—ক্যানসার, আলসার, গ্যাস্‌টিক, পক্ষাঘাত ও ঘুসিস প্রভৃতি বহু রোগ তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় করেছেন ও নিত্য করছেন। তাঁর যোগ ক্রিয়ার অভিনবত্ব এই যে—তিনি যখন রোগীদের জন্য যোগ করেন—তখন তাঁর কক্ষে কেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তাঁর পার্শ্বের কক্ষেই রোগীদের চিত্তে তাঁর যোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করতে হয়। এর দ্বারাই রোগী নিরাময় হয়ে ওঠে। অন্য কোন ঔষধ বা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

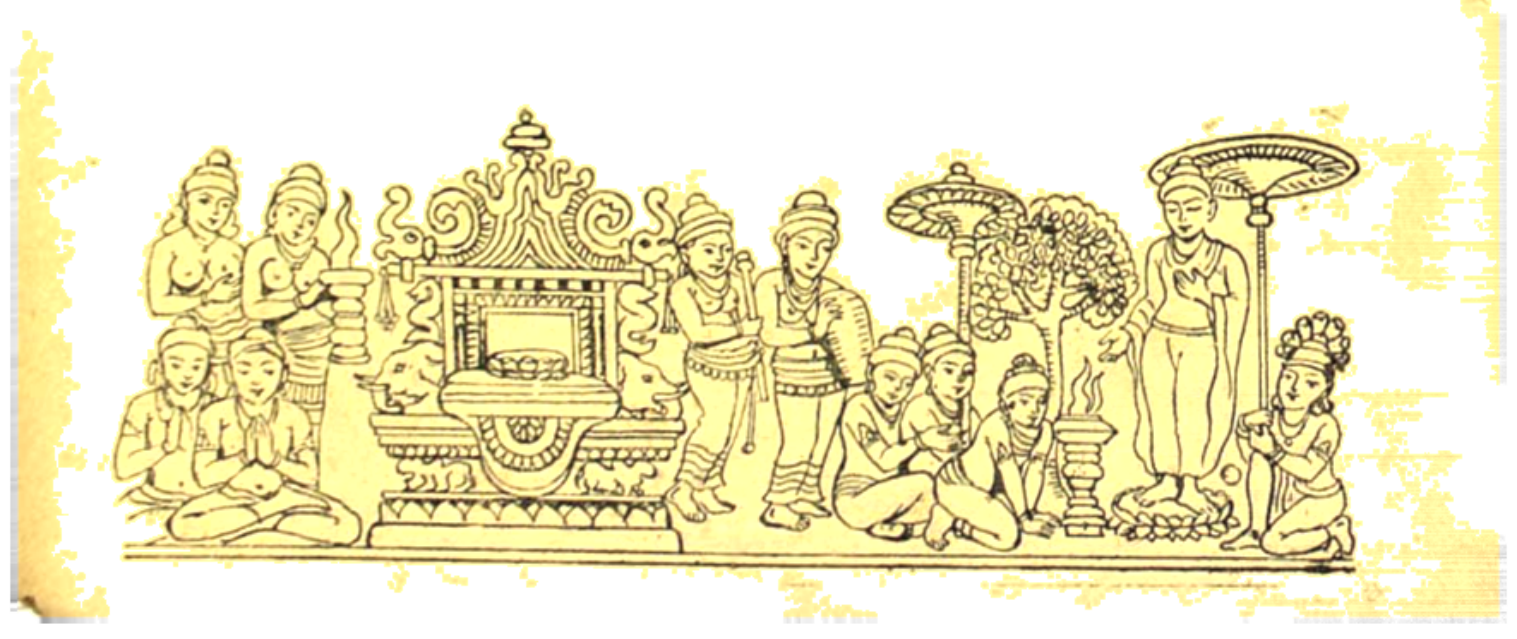

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"কুন্তী তার আর সব কথাই বিশ্বাস করেছিল—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে প্রসাদের কথার বাঁধুনি ছিল চমৎকার। কিন্তু গুরুদেবকেও একথা বলা চলবে না শুনে সে চমকে উঠল, কেন না তাঁকে ও সত্যিই ভালোবেসেছিল। শুধু ভালোবাসা নয়—তাঁরই দৈবী করুণায় যে তার প্রাণধন শাশ্বত কালোজলে আলোপথের মতন ফুটে উঠেছে একথা মনে করতেও ওর চোখে জল আসত। দিনের পর দিন ও তাঁকে দেব গুরুর আসনে বসিয়ে অন্তরের ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করত প্রতি প্রার্থনায়, ধ্যানে, গানে, এ-ভক্তিতে ওর কিছুটা হিমালি থাকলেও ওর হৃদয় ওকে নিরন্তরই বলত—দেব হিমারি ওকে পথ দেখাবেনই দেখাবেন, দুদিন বাদেই দীক্ষা দিয়ে আপন ক'রে নিয়ে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এ-স্বপ্ন ছিল ওর বড় আদরের।

"কিন্তু তবু হিমালের কারসাজিতে ওর ঠিকে ভুল হয়েছিল—তাই গুরুদেবকে গুরু মেনেও নিজেকে প্রসাদের শক্তি মনে করতে ওর বাধেনি। এসব কথা ও মাকে খুঁটিয়ে বলে পরে—আরো এক গাদা কথা—কী ভাবে প্রসাদ ওর কাছে আসত, কী ভাবে ওকে ঘোরাত মন ভুলানো কথায়, কী ভাবে ও সাড়া দিত একটু আধটু —যদিও বেশিদূর এগোয় নি। প্রথম প্রেমের পরে যা খেয়ে ও কতকটা সজাগ হয়ে ছিল তো— সম্পূর্ণ ধরা দেবার কল্পনায় ও তাই ভয় পেত বৈকি।

"কিন্তু প্রসাদ ছিল পাকা লোক, তাই রকমারি মিথ্যা আশ্বাসকে সত্যের ছোপে ছুপিয়ে এমন রঙিন ক'রে ধরত ওর সামনে যে কুন্তী উতলা হ'য়ে উঠত—আরো এই ভেবে যে, প্রসাদকে গুরুদেব পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি ক'রেই।

"কিন্তু সেই প্রসাদ বলল গুরুদেবের কাছেও কিছু না ভাঙতে, সেই যে যেন ওর মাথায় বাড়ি মারল। সঙ্গে সঙ্গে এল ভুক্তভোগীর আতঙ্ক—কোন্ বিশ্বে চলেছে কের কার হাতছানিতে? গুরুদেবের এত কৃপা পেয়েও তাঁকেই বঞ্চনা করা—ভাবতেও ও শিউরে উঠল আতঙ্কে। সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রাণের মন্দিরে জেগে উঠল ভক্তির জয়ধ্বনি যাকে ওর দেহের উদগ্র কামনা ঢাকিয়ে রেখেছিল এতদিন।

"রাতে খুব কেঁদে প্রার্থনা করল। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখল গুরুদেব ওর মাথায় হাত রেখে একটী মন্ত্র জপ করছেন। ঘুম ভেঙে সে কী আনন্দ! পরদিন গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলতে না বলতে তিনি ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন ঠিকই দেখেছ মা আমি তোমাকে সত্যিই আশীর্বাদ করেছিলাম যাতে তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও কেন প্রসাদ মিথ্যাচারী হয়েছিল। মা, মোহ আমাদের সাধনার পথে একটি বড় বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় প্রধানতঃ এইজন্য যে, সে আমাদের মিথ্যাবাদের পথে ঠেলে। নৈলে প্রসাদ তোমাকে বলত না কখনই যে, তুমি তার শক্তি।'

"গুরুদেব প্রায়ই বলেন একটা কথা যে, ভক্তি শুধু যে আমাদের নরম করে তাই নয় সেই সঙ্গে শক্তিও দেয় শক্ত হবার। তাইতো কুন্তী প্রসাদকে বলতে পেরেছিল পরদিনই যে, সে আর তার ছায়াও মাড়াবেনা, শুধু

গুরুদেবই তার গুরু পিশাচি সর্ব্বস্ব, আর কেউ নয় নয় নয়।

"একটা মিথ্যা দশটা মিথ্যা টেনে আনে: মিথ্যাবাদী প্রসাদ যা খেয়ে অজ্ঞানবদনে বজ্র গুরু বলে বেড়ানো সুরু করল যে, কুন্তী তাকে ওর ভাবভাবের ফাঁদে ফেলে যোগ ভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল···ওর ছায়া মাড়ালেও পাপ··· নির্লজ্জ নির্ভুল মিথ্যার সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ·····

"প্রসাদের এ-কথাই চতুর্বীর বিশ্বাস ক'রে বেঁটে পাকানো সুরু করল তাকে মেরে ফেলে বরণ ক'রে নেবে পাণ্ডার ঘরে। সিংহ বললে—এইসব নির্লজ্জ ভ্রষ্টার ভারতপুত্রকে মন্দিরে গ্রহণ করলে দলে রঘুনাথজী রুষ্ট হবেনই হবেন।

"একথায় পাণ্ডারা ভয় পেয়ে গুরুদেবের কাছে গিয়ে সব রিপোর্ট করল। চন্দন ও রঘুবীর সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা পরে আমাকে বলেছিল যে গুরুদেবকে তারা সেই প্রথম রুষ্ট হ'তে দেখে একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চরবীরকে তলব ক'রে পাণ্ডাদের সামনেই বললেন 'আমিকি তোমাদের সবাইকে বারবারই বলি নি যে, শান্তনু নিষ্পাপ শিশু, ওর সন্ন্যাসযোগ আছে? তোমরা বিদ্বেষে এত নেমে যেতে পারো আমি সত্যি ভাবতেও পারিনি। লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াতে তোমাদের লজ্জা করে না—তা আবার এক অনাথার বিরুদ্ধে যার একটি মাত্র সম্বল এই সুলক্ষণ ফুলের ম'ত শিশু? কত শত লোককে সে দিনের পর দিন কীর্ত্তন গেয়ে আনন্দ দিয়েছে—আজও দিচ্ছে—এতেও রঘুনাথজি রাগ করবেন এমন অকথা মিথ্যা তোমরা উচ্চারণ করতে পারলে কেমন ক'রে? কিন্তু এর পরে আর কোনো কথা নয়—শোনো যদি আমার কথায় তোমরা কান না দাও তবে যা বলবে করবে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমাদের—সাবধান। আশ্রমের আওতায় সুবিধে নিয়ে সাধক হ'য়ে দুর্বৃত্তের মতন আচরণ করলে আমি সইব না ব'লে রাখছি। তবু যদি অধঃপাতে যেতে চাও যাও, কেবল যেতে হবে নিজের দুষ্কর্মের পিছুটানে। কেবল মনে রেখো যে, হিংসুক আত্মঘাতের ফল শুধু মৃত্যুযন্ত্রণা নয়—নরকযন্ত্রণা। আর মনে রেখো, রঘুনাথ ধর্মের ধারক অধর্মের তিলস্পর্শও তিনি সহ্য করেন না, করলে তাঁর নাম 'পতিতপাবন' হত না। মহাভারতে ধর্মরাজও যক্ষকে বলেছিলেন এই কথাই তাঁর অতুলনীয় বাণীতে:

ধর্ম এব হতো হন্তি, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

অর্থাৎ

ধর্মকে যদি করিলে নিধন তবে তার হাতে তুমি যাও!

রক্ষা করিলে তাহারে করিবে রক্ষা সেও তোমায়।

তবে তিনি স্বভাবে ক্ষমাসুন্দর বলে অনেক দিন পর্যন্ত অন্তরে থেকে সত্যপথের দিশা দেন, বলেন—ঐ মহাভারতেরই ভাষায় যে, অধর্মের পথে কখনো কখনো প্রথমদিকে অভ্যুদয় হলেও অন্তিমে পতন অবশ্যম্ভাবী—"সমূলস্তু বিনশ্যতি। শেষ কথা, শোনো মন দিয়ে—যদি সমূলে বিনাশ না চাও আত্মঘাতের হলাহলে। ভগবানের দুটি রূপ বা ছন্দ যে এই প্রাণ লীলাকে ধারণ করে আছে শাস্ত্রের এ-বাণীটি মিথ্যা নয়: একটি হল তাঁর শিব, ত্রাতা বা ধাতা রূপ, অন্যটি হল রুদ্র হর্তা বা শাস্তারূপ। তিনি অনেকদিন পর্যন্ত শিবরূপে হৃদয়ে চোকা দেন মঙ্গলের দিশা দিতে, কিন্তু জোর করে মানুষকে ধার্মিক দাঁড় করান না, কারণ তিনি চান—মানুষ প্রেমের সহজ আনন্দের টানেই প্রেমিক হয়ে তার চরিত্রের পশুভাব কাটিয়ে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যখন দেখেন তার মনোবাসী শিশুপাল অসুর কিছুতেই বদলাতে চায় না, তখন তার বহু অপরাধ ক্ষমা করার পরে শেষে সুদর্শন চক্রে তার মুণ্ডপাত করেন।' এ-সম্পর্কে আরো অনেক কথা তিনি বলেছিলেন, রঘুবীর লিখে রেখেছেন তার ডায়রিতে তোকে দেখাব সে এলে—কারণ সেসব সত্যিই অতি চমৎকার কথা।"

অমিত বলল: "উত্তম প্রস্তাব। কেবল উপস্থিত আমি শুনতে চাই—এর পরে কী হল। প্রসাদ কি তার শেষে হাত মানল, না আরো রুখে উঠে গুরুদ্রোহিতার চালুপথে গড়িয়ে চলল?"

ভীষ বলল, গুরুদেবের মুখে শুনেছি—মানুষের 'আত্তর রূপান্তর হয় সচরাচর মন্থরাক্রান্তা ছন্দে—তিলে তিলে, বহু সাধনা, বহু ভোগান্তির পরে। তাই প্রসাদ জব্দ খেয়ে গুরুদেবের কাছে বাইরে ক্ষমা চাইলেও কুন্তী ও শান্তনুর বিরুদ্ধে হিংসাদ্বেষকে অন্তরে সাদরেই পুষে রাখল যার বিষফল ফলল পরে—যথাকালে সে কথা পরে বলছি উপস্থিত এইটুকু বললেই চলবে যে, প্রসাদ ও তার ধামাধরা চতুর্বীর বিষ্ণুদাস, ধনঞ্জীর, পিনাকী ও দিবাকর—কুন্তী বা

শান্তনুকে দেখবামাত্র সবে যেত গোমড়া মুখে। তবে বাইরে পাণ্ডাদের কাছে গুরুদ্রোহী প্রপাগণ্ডা বন্ধ হল—অন্ততঃ তখনকার মতন এইটুকুও যা বাঁচোয়া।

"কিন্তু এসব খুঁটিনাটি খতিয়ে অবান্তরই বলব—আসল কথা হল শান্তনুর আবির্ভাব দেবকুলাবেরই মতন। বলতে কি, ও এল যেন হঠাৎ আকাশ থেকে বজ্রপাতের পরে পুষ্পবৃষ্টিরই মতন। না, উপমাটা ঠিক হল না, কারণ ও এসেছিল সত্যিই যেন ভুবন মার তারক হয়ে—কৃষ্ণাই একদিন একথা বলেছিল আমাকে। সে আরো বলেছিল চোখের জলে যে, গুরুদেবের এত কৃপা পেয়েছিল ও শান্তনুর জন্যেই।"

অসিত শুধায়: "কিন্তু তাহলে কৃষ্ণাকে প্রথমদিকেই তিনি দীক্ষা দিয়ে দিয়া করলেন না কেন? তাহলে তো সব গোলই চুকে যেত।"

ভীষ্ম বলল "গুরুদেবকে একবার যা প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—কৃষ্ণার তোমের সাধ তখনো মেটেনি। অসময়ে দীক্ষা দিলে প্রায়ই উল্টো উৎপত্তি হয়। বলে একটু থেমে: "কথাটা যে সত্য মানতেই হবে। কারণ কৃষ্ণার স্বভাবে কিছুটা নটীপনা ছিল সেসময়ে। এ-ও সে জানত যে, সে পুরুষকে চানতে পারে তার চটকে, হাবভাবে, গানে—সবার উপরে, তার গড়নে আর চাহনিতে। তার অশ্রু জলে ভরা চোখদুটি দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' সে সচরাচর পুরুষদের সভায় চোখ নিচু করেই থাকত, কিন্তু থেকে-থেকে আচমকা বড় বড় কালো হরিণ চোখ তুলে এমন চাহে তাকাতো যে, অনেকের বুকেই ডমরু বেজে উঠত।"

অসিত হেসে টিপ্পনি করে: "কবি শেক্সপীয়রের কথা মনে পড়ে যায় হায়, 'If ladies are but young and fair, they have the gift to know it'*

ভীষ্ম একগাল হেসে বলে, "তোর সন্দেহ বাতিককে যতই কেন না অপছন্দ করি অসিত, তোর জেরা সত্ত্বেও ভেবে ভালো না লেগে থাকতে পারি না তোর এই রস-বোধের জন্যে।"

অসিত পিঠ পিঠ জবাব দেয়, "আর আমিও যাহা—to return the compliment—পাল্টা স্তুতি করি যে, তোমাকে ভালো না লেগে থাকতে পারি না—যোগী হওয়া সত্ত্বেও কালো হরিণ চোখের মর্মজ্ঞ হতে তাদের বাধেনি বলে।"

ভীষ্ম এবার হাসল না, সস্নেহে বলল, "বাবাকে কী ভুখে শুনি? মেয়েদের রূপ-টুপ কি কল্পনা না কি? তোর বৌদির কথা কি তুই মোটেই ভুলে যাস নি? না, বলতে চাস—সত্যিকার রূপলাবণ্যে পতি মাতৃগণ ভরে ওঠে এ-রটনা গাঁজাখুরি শুনব! না অসিত, আমি তুকে প্রায়ই বলি বড় গলা করেই যে ভগবান ও গুরুকে যে আজ একটুও স্বতঃ চালোবাসতে শিখেছি তার মূলে আছে সেই পুণ্যবতীর সুকৃতি তথা ভবতীর প্রেম জাগানো সৌন্দর্য। না, এ কথার কথা নয় ভাই। কারণ আমি জানি ও মানি যে তাকে সত্যি ভালোবেসেছিলেন বলেই আমার মনে তার কুঁড়ি ফুটে উঠেছিল; তাকে যদি ভালো না বাসতাম তবে সে-কুঁড়ি আ ফাটাই থেকে যেত। কিন্তু এসব অবান্তর কথা রেখে বাকিটুকু বলি সংক্ষেপে, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের—"

অসিত বাধা দিয়ে বলে, "নঃ সংক্ষেপঃ নৈব নৈব চ। তাছাড়া এত তাড়া কিসের? ব্রহ্মকুণ্ড তো আর 'সুইসাইড-পুল' নয় যে, অমুক সময়ের পরে গেট বন্ধ। মা গঙ্গার কোনো ঘাটেই নারীরা যখন ইচ্ছে নেমে হাত পা ছুড়ে খেলে খেলে স্নানাদি করতে পারেন। তাই তুমি বলে ফেলো যা প্রাণ চায়—কারণ এক্ষেত্রে prolixity-ই হচ্ছেন soul of wit, brevity-তে হয় বলভঙ্গ।

ফলিয়ে বলা এই তো চাও নিত্য বলবোধে,
শ্রোতব্যের অঙ্গহানি সত্য করে খোঁজে?"

ভীষ্ম বেজায় খুশী হয়ে অসিতের কাঁধে চাপড় মেরে বলে, "তোর অন্যান্য দোষ থাকলেও এই একটা কমপেনসেটিং গুণ—redeeming feature—আছে, মানতেই হবে যে তুই শুধু বক্তা পাইয়েই নোস, শ্রোতাও বটে। হিমালয় তোকে না চানলেও মানুষের খবর পেতে যে তুই সদাই উৎসুক—এ কম কথা নয়। কেবল মনে রাখিস হিমালয়ের হিমে মানুষের মন কিমিয়ে পড়ে না,

* তরুণী যদি মনোমোহিনী হয়,
জানেই জানে দৃঢ় প্রাণে—সামান্য সে নয়
অসিত পুরাণে আছে,

ভেতিরেই ওঠে। এই শান্তনু আর কুন্তীর কথাই নে না। এরা যদি ওদের পরিবেশ হত কলকাতা কি দিল্লি, তাহলেও ওদের নিয়ে হয়ত রীতিমত নাটক গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু ধর্ম যেখা মন্দির পাণ্ডা গুরু সাধকসাধিকা ভজন-কীর্তন এসবের তাকে যে-বিচিত্র মন্দাকিনীর সুমুর বেজে ওঠে সেটি সেভিত কি কোনো খোড়বড়িখাড়া খাড়াখড়ি-খোড়ের ঘরোয়া ঘর্ষরে? ওরে শ্রদ্ধাহীন ইয়ুরোপীয়েন্ট! কালিদাস মুখ্য কবি ছিলেন না—হিমালয়ের টুরিষ্টদের সরকারী গাইডও না—তবু তিনি কেন হিমালয়কে শুধু 'নাগাধিরাজ'-ই নয় 'দেবতাত্মা' উপাধি দিয়ে বসলেন? কেনই বা আবহমানকাল লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী দুরন্ত কষ্ট সত্ত্বেও উধাও হয় দুর্গমগিরি কান্তার মরুপারে উধাও হয়? গুরুদেব প্রায়ই একটা কথা বলেন জোর দিয়ে: যে, বিদেশীরা যখন ব্যঙ্গ ছলে বলে—ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলব কী জন্যে? কী আছে এখানে যা আর কোনো দেশের পাহাড়পর্বতে নেই? এ-জেরার উত্তর—বলেন গুরুদেব ভারতে আছে হাজার হাজার তীর্থ মন্দির মঠ সাধনার আশ্রম—সব ছাপিয়ে, পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও দেবতাত্মা হিমালয়। এ আমার কাঁপা উচ্ছ্বাস নয় অসিত ইতিহাসের পাতায় পাতায় মিলবে এ-কথার সাক্ষ্য যে গঙ্গা ও হিমালয়ের প্রেরণায় অগণন মহাজন বহুমুখী সাধনায় নিত্য নবপথের পথিকৃৎ হয়ে শুধু যে আমাদের ধর্মজীবনকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছেন তাই নয়, বহু মন্দিরে আশ্রমে মঠে তাঁদের অমর তপঃশক্তির অক্ষয়বীজ বুনে রেখে গেছেন। এ যে কথার কথা নয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—verification—পাই আমরা হিমালয়ের সান্নিধ্যে আসতে না আসতে। গুরুদেবের এ এযাহারের স্বপক্ষে নানা প্রমাণই আমি করতে পারি—কিন্তু সেসব উপস্থিত মুলতুবি রেখে শুধু বলি—যে-সেরা প্রমাণ পেয়েছিলাম আমি এই কিন্নরকুমার আর তার মার ইতিহাস থেকে। একে আমি সেরা নাম দিচ্ছি আরো এই জন্যে যে, এ-প্রমাণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে বা উচ্ছ্বাসের ফানুসে রূপ নেয় নি, নিয়েছে জীবনের অনুভূত সুখ দুঃখ ওঠাপড়া আশা-নিরাশার নাগরদোলায়। কী ভাবে—বলি শোন্।

"দেবপ্রয়াগে দীক্ষা নেবার পরেই আমার চোখে পড়ে একটি সুখবর সত্য: যে, কোনো পুণ্য আশ্রমের পরিবেশে এসে সাধনা করার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি আমাদের স্বভাবের নিচুটানের মহল হয় না। না, কোনো পরিবর্তনই হয় না বললে বাড়াবাড়ি হবে, কিন্তু ধর্মার্থীর মধ্যে যে উদারতা, মহত্ব, পবিত্রতা আমরা দেখতে পাই—আমাদের চরিত্রের ঘোঁয়াটে, দাম্ভিক ও বিষাক্ত গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করে পরম ভাগবতের সাধুতা ও অকপটতার যে দীপ্তি চাক্ষুষ করবার আশাকে মনে ঠাঁই দিই, পদে পদে যা খেয়ে সে-আশা মিইয়ে যায়—কিমিয়ে পড়ে। একথা যে শুধু পঞ্চপ্রয়াগের ক্ষেত্রে খাটে তা-ই না—দেবপ্রয়াগের আরো দুতিনটি আশ্রমের নানা সাধকদের মধ্যেই দেখতাম রকমারি কুশ্রী প্রবৃত্তি—বিশেষ ক'রে তাদের মেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি শঙ্করাচার্যকে নজির খাড়া ক'রে যে নরকস্থ যায় হ'ল নারী। বলব কি, কুন্তীকে ঠেস দিয়ে এমন কি অশ্লীল ভাষাসা করতেও তাদের বাধত না। গুরুদেব সবচেয়ে অপছন্দ করতেন এই পরচর্চা—gossip—বলতেন আমাদের উঠতে বসতে যে, মানুষ অপরের অশুচি নিয়ে আলোচনা করতে করতে অজান্তে নিজে অশুচি হয়ে পড়ে, তাই সাধকের সর্বদাই মনে রাখা চাই: এক, অপরের ত্রুটিবিচ্যুতির সম্বন্ধে সহিষ্ণু হ'তে হবে। দুই, নিজের দুর্বলতার সম্বন্ধে নিষ্ঠুর হ'তে হবে। তিন. বিচারের নামে মতলবী জজ সাহেব বা নীতিবাগীশ স্কুলমাষ্টার হ'য়ে দাঁড়ানো তার স্বধর্ম নয় নয় নয়। গুরুদেব আমাদের ক্রমাগতই বলতেন যে, অপরের বিচারক হ'তে বসার প্রবৃত্তি সাধকের পক্ষে সর্বনেশে, কারণ এ থেকে আসে অহঙ্কার—সেও এক সুপীরিয়রিটি। আমরা সবাই তাঁর এ ধরণের উপদেশ ভক্তিভরেই শুনতাম—এমন কি পঞ্চপ্রয়াগও শুনত মন দিয়েই, পণও নিত বার বার যে, পরচর্চায় বা অপরকে বিচার করার লোভকে প্রশ্রয় দেবে না কোনোছলেই। কিন্তু ভাইরে, সংসারে পণ নেওয়া সোজা হ'লেও রাখা যে কত কঠিন—শোন, একদিনের কথা বলি এ-কথার ভাষ্য হিসেবে।

"বলেছি, কুন্তী ও শান্তনুকে আমি প্রথম দেখি সেই অবিস্মরণীয় সকালে—ভাগীরথীর তীরে। কখনো কখনো ইচ্ছে হ'ত বৈকি তার গান শুনবার—বিশেষ ক'রে শান্তনুর সঙ্গে ডুয়েটে। কিন্তু প্রসাদের পদস্খলনের কথা মনে

হ'লেই ভয়ে পেছিয়ে যেতাম—বলতাম নিজেকে: 'ভোলা মন ভুলিস নে যে যে, সাবধানের মার নেই। তবু থেকে থেকে মনে হ'ত কুন্তীকে এড়িয়ে রঘুনাথজির মন্দিরে শুনি আমি শান্তনুর গান। কিন্তু আমল দিতাম না এ ইচ্ছাকে—পাছে এই সূত্রে কুন্তীর গান শোনার ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসে অজান্তে। তাছাড়া বস্তুর প্রসাদের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তার উগ্র আত্মসচেতনতা তাকে কী ভাবে পাকে ফেলেছিল চোখে আঙুল দিয়ে আমার এই একটা মস্ত শিক্ষা হয় যে, কোনো সূত্রেই আত্ম-প্রসাদ বা আত্মগৌরবকে আমল দিতে নেই। তাছাড়া যে-এর স্মৃতি যতই ম্লান হ'য়ে আসতে থাকে ততই মনকে বোঝানো সুরু করি—বাইরের চকাচকের যে হারিয়েছে তার চাই আরো সাবধান হওয়া—অর্থাৎ নিজের মনের চোরের 'পরে বেশি আস্থা না রাখা।

"কিন্তু পথ চলতে যতোই সাবধান হ'লেও শুধু যে পায়ে ধুলো লাগে তাই নয়, যেতে যেতে আশপাশের যানবাহনের উৎক্ষিপ্ত কাদায় ছিটে এড়িয়ে চলা যায় না সব সময়ে। এ-সান্ত্বনাকে আমরা তেমন গুরুতর মনে করি না—কেন না সেসব কালো দাগ ধুলেই সাফ হ'য়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো যে-দাগ ওঠাতে এত বেগ পেতে হয়—একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্যটা হয়ত প্রাঞ্জল হবে।

"আমার ঘরের পাশের চাতালে বসে সেদিন প্রসাদ জমিয়ে গল্প করছিল। সে সত্যি চমৎকার কথক ছিল, তাই আরো চতুর্থীর ওর এত ভক্ত হয়ে উঠেছিল, বলত: 'কী পার্সনালিটি রে!' যাক। কথায় কথায় যোগভ্রষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গ এসে গেল। প্রসাদ মুরুব্বি হাসি হেসে বলল; 'সবচেয়ে সঙ্গিন বিপদ টেনে আনে অপরা নয় রে ভাই, আনে শিষ্যা বা আশ্রিতা। আমি একগুহায় দেখেছিলাম এক সাধুকে যে দশ বছর কঠোর তপস্যা করার পরে ডুবেছিল বিয়ে ক'রে। আর কাকে বিয়ে করেছিল জানিস?' ব'লে দিবাকরকে চোখ মিট মিট ক'রে বাঁকা হেসে: 'একটি অনাথাকে যে তাকে সেবা করতে এসেছিল শুধু তার ঔরসে একটি ছেলে চেয়ে। তাকে কে বলেছিল সাধুর ঔরসেই যোগভ্রষ্ট শিশুর জন্ম হয়।' আমি বুঝলাম তার নিশানা কে। তাই জোর দিয়েই বললাম: 'খুঃ! বাজে কথা। কোনো মেয়েই এ ধরনের কথা সত্যি বিশ্বাস করতে পারে না।' প্রসাদ রুখে উঠে বলল: 'পারে না? জানো কি—তিব্বতে অনেক মেয়ে এই বিশ্বাসে কোনো যোগীকে অতিথি পেলে মহানন্দে তার সহবাস করে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ীর মত নিয়ে। 'আমার মন মুহূর্তে বিমুখ হ'য়ে উঠল, বললাম: 'যত সব আজগুবি কথা।' প্রসাদ আহত কণ্ঠে বলল: 'আজগুবি? মহাভারতে বিচিত্র-বীর্যের দু'দুটি মহিষীর গর্ভাধান করতে খোদ ব্যাসদেবকে ডাক দেওয়া হয় নি কি?' আমি রুখে উঠে বললাম: ওসব গালগল্প, ইতিহাস নয়।' প্রসাদ ক'াকানো সুরে বলল: 'কিন্তু তোমাদের আদরিণী মাতৃমূর্তি তো আর গালগল্প নয়।' বলতে বলতে রাগের মাথায় যেই হারিয়ে বলল: 'আর তাঁর কোল জুড়ে এলেন যে নবকুমার তাকেও তো উপাধি দিয়েছ তোমরা যোগ ভ্রষ্ট মহাভারত যিনি মন্দিরে মন্দিরে এই শুধরা প'রে প্যালাও হাতাচ্ছেন খাসা সকলের চোখের সামনেই। তার মুখে বেদগান শুনে তোমাদের সবাইকে আহ্লাদে আটখানা হতেও দেখেছি দিনের পর দিন।' আমি প্রতিবাদ করলাম: 'আমার নামে মিথ্যে কথা রটিয়ো না। আমি আজ পর্যন্ত শান্তনুর একটি গানও শুনি নি।' প্রসাদ ক'াকালো সুরে চালেঞ্জ ক'রে বলল: 'মিথ্যে? তোমার মা গত রবিবারেও কি এই ননী-গোপালটিকে কোলে বসিয়ে ননী খাইয়ে তার ভজন শুনে চোখের জলে নদী বইয়েছেন নি?" মা পাশের ঘরে ব'সে শান্তনুর জন্যে একটি জামা সেলাই করছিলেন, এবার আর থাকতে পারলেন না, বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন: 'সে সময়ে শুকদাস গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল, শান্তনুর গান শুনবে কেমন ক'রে?' প্রসাদ মার আচমকা আবির্ভাবে একটু হকচকিয়ে গেলেও টাল সামলে নিয়ে জবাব দিল: 'সেদিন না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু রঘুনাথজীর মন্দিরে কি কিশোরকুমারটির গান একদিনও শোনে নি বলতে চান?' মা উচ্চ কণ্ঠে বললেন: 'হ্যাঁ, তাই বলতে চাই কারণ কথাটা বোলো—আমরা সত্যি আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই যে, ছেলে আমার হিংসুকও নয়, মিথ্যুকও নয়।' প্রসাদ এবার আগুন হ'য়ে উঠল, বলল: 'কে মিথ্যুক আর কে হিংসুক জানি আমরা সবাই। আরো জানি—

চোখ দুটো আমাদের মুখ সামানো নয় ব'লে—কে ডুবে ডুবে জল খায়—নানা মিথ্যা গুরুদেবকে সত্যের ছোপে ছুপিয়ে আমার নামে গুরুদেবের কাছে চুকলি কাটে।' মা—ও বয়স্থাপী—জানিসই তো—তোকেই কতবার বকেছেন। প্রশান্তের এ-ইঙ্গিতে জ্ব'লে উঠে বললেন: 'ডুবে ডুবে জল কে খায় তাও জানি আমরা সবাই। ছেলে আমার সরল, চিরদিন সোজা পথেই চ'লে এসেছে—মনের মধ্যে তার জিলিপির প্যাঁচ নেই। তাই সে সুতীর সঙ্গে আজ পর্যন্ত আলাপ পর্যন্ত করে নি—তবে যারা অনাথার রক্ষক হ'তে যাওয়া করে ভক্ষক হ'তে চায় তারা একথা হয়ত বিশ্বাস করবে না।'

"হ'ব তো হ"—ঠিক এই সময়েই গঙ্গা স্নান সেরে গুরুদেবের প্রবেশ। সবাই চটস্থ। মা কেঁদে তাঁর পায়ে মাথা ঠুকে বললেন: 'আমাদের বিদায় দিন গুরুদেব—আমার ছেলেকে যে ভণ্ড বলে তার মুখও আমি দেখতে চাই না।'

"গুরুদেব মার শেষ কথাগুলি শুনেছিলেন ঘরে পা দেবার আগেই। বললেন: 'মা, অত রাগ করে না। মনে রেখো তুমিও প্রশান্তকে ভণ্ড বলতে কসুর করো নি—জেনেশুনে যে, সে অনেক অপরাধ করলেও আমার শাসনে কান দিয়েছিল ব'লেই টাল সামলাতে পেরেছিল।

সুতীর তখন কী অবস্থা হয়েছিল তোমরা তো জানো না। সে সময়ে প্রশান্ত প্রথম দিকে সত্যিই ওর ভালোর জন্যে করতে গিয়েছিল সদুদ্দেশ্যেই। তাই বলি মা, মানুষকে এভাবে বিচার করতে নেই শুধু তার দুর্বলতা দেখে। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটিও মনে রাখা ভালো যে, পথ যখন পিচ্ছল আর তীর্থ লক্ষ্য বহুদূর তখন সময়ে সময়ে হোঁচট খেতে হয় সবাইকেই। তাছাড়া মোহের বা রাগের মাথায় মানুষকে দিয়ে নানা ভুল রিপু এমন অনেক কিছুই বলিয়ে করিয়ে নেয় যা সে সত্যিই বলতে বা করতে চায় নি।

"ব'লে গুরুদেব গম্ভীর স্বরে প্রশান্তকে শুধালেন: 'তুমি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে যে, আমি তোমাদের সবাইকেই পই পই করে মানা করেছি পরচর্চা করতে?'

"প্রশান্ত মুখ নিচু ক'রে বলল: ভুলি নি গুরুদেব।"

"গুরুদেব আড়ুল তুলে বললেন: 'আর তুমি যে আমার কাছে তিন সত্যি করেছিলে যে ভবিষ্যতে আর কখনোই সুতীর বা শান্তনুর নিন্দা করবে না করবেনা করবেনা?'

"প্রশান্ত দুহাতে মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, গুরুদেবকে প্রণাম করে বলল; 'আমার অপরাধ হয়েছে, গুরুদেব।' বলেই মা-র দিকে চেয়ে করজোড়ে: 'আমাকে ক্ষমা করুন। আর কখনো যদি এমন অপরাধ করি তবে আপনাদের কাউকে চলে যেতে হবে না—আমিই বিদায় নেব।' বলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছল।

"ঘরের হাওয়া মুহূর্তে বদলে গেল। মা প্রশান্তের কাছে গিয়ে করজোড়ে বললেন: 'আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন জি। শুধু আমাকে নয়—গুরুদাসকেও। সে ছেলেমানুষ—তার ওপর স্বভাবে বোঁকালো—কী বলতে কী বলে ফেলে!' বলেই চোখে আঁচল।

"আমারও চোখে জল এল, বললাম: 'না, এবারো আমিই অপরাধী, পরলা নম্বর। কারণ আমিই সবপ্রথম রুখে উঠেছিলাম ভুলে গিয়ে যে, রোখেই রোখ জাগে—যেমন বিদ্যুতে বিদ্যুৎ।' বলে প্রশান্তের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললাম: 'দাদা, মা-র কথা মিথ্যে নয়। আমি স্বভাবে বিষম বোঁকালো। কত ভুগেছি যে এর জন্যে, কিন্তু তবু চৈতন্য হয় নি আজো। তবে অজ্ঞান করে বোকে বলুন। তাই আমার মিনতি—আপনি অবোধ ছোটভাইকে ক্ষমা করুন। আমিও কথা দিচ্ছি এমন বেদামাল হব না আর কোনোদিনই।"

অমিত হঠাৎ বলে: "একটা কথা বলব ভীষ্মদা? বেজায় লোভ হচ্ছে।'

"কী?"

"তোমাদের আশ্রমের যে—ঘরোয়া ছবিটি এঁকেছ তোমার নিপুণ তুলিতে, তার ছায়ায় মূল প্রেরণা যিনি শুনি তিনি কিন্তু একজন সংসারবিচ্ছিন্ন যোগী। গুরুবাদের আমি বিশেষ কিছুই জানি না ভাই, তবে আমার মনে হ'ত বরাবরই যে, গুরু প্রতি-আশ্রমের হাল ধ'রে থাকলেও দাঁড়ীদের কাছে কদাচ তাঁরেন না নৌকা ভিড়াবেন কোন্ পারে। কবি শেক্সপীয়র জগৎকে নাম দিয়েছেন মঞ্চ, মানুষকে—নট। আমার ধারণা ছিল—গুরু নিজে মঞ্চে অবতীর্ণ হন না, নট-নটীদেরকে নির্দেশ দিয়ে নির্লিপ্ত দার্শনিকের মতন দূর থেকে দেখেন—কে

কোথায় ঠিক পা ফেলল, কে পড়ল পিছলে। কিন্তু তোমাদের আশ্রম মঞ্চের পরিচালক দেখছি একাধারে নাট্যকার, নট, নিয়ন্তা—হয়ত আরো অনেক কিছু যার আমরা খবর রাখি না। তাই সাবাস ব'লে হাততালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

ভীম খুশী হ'য়ে বলে: "আর আমারও সাধু সাধু ব'লে হাততালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে—তুই খাঁটি বোকার মতন তাঁকে এক খাঁচড়ে চিনে নিয়েছিস ব'লে। কারণ গুরুদেবের একাধারে এই তিনটি রূপ আমরা বারবারই আশ্রমে ফুটে উঠতে দেখেছি বিশেষ ক'রে তাঁর জাদুকর রূপ, কোনো ক্ষোভ কি চেট উঠতে না উঠতে যাঁর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সব শান্ত হয়ে যায়। তাই আমি একবার গুরুদেবকে হেসে বলেছিলাম: 'গুরুদেব, আপনার আশ্রমনাম দয়াল মহারাজ হ'লেও আসল নাম—বৃটানিয়া।' গুরুদেবও হেসে পিঠ পিঠ জবাব দিয়েছিলেন: 'মানে, who rules the waves, এই তো? কিন্তু আমি কেন প্রাণলোকের চেউয়ের মাতামাতি পছন্দ করিনা শুনবে? আবাল্য গীতার একটি বাণী আমার জীবনের আদর্শ ছিল ব'লে:

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ,* ॥

অসিত খুশীহ'য়ে বলে: "চমৎকার!"

ভীম একগাল হেসে বলে: "চমৎকার,এর এখন হয়েছে কী রে অবোধ? মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় যাকে বলে 'চিত্তচমৎকার' তিনি এলেন ব'লে—অবাক্ হয়ে শোন্ কান খাড়া ক'রে—সাবাসী হাততালি পরে দিলেও চলবে।'

---

* করেন না যিনি বিচলিত কাহাকেও বিচলিত যাঁকে করিতে পারে না কেহ। (গীতা ১২।১৫) [ক্রমশঃ

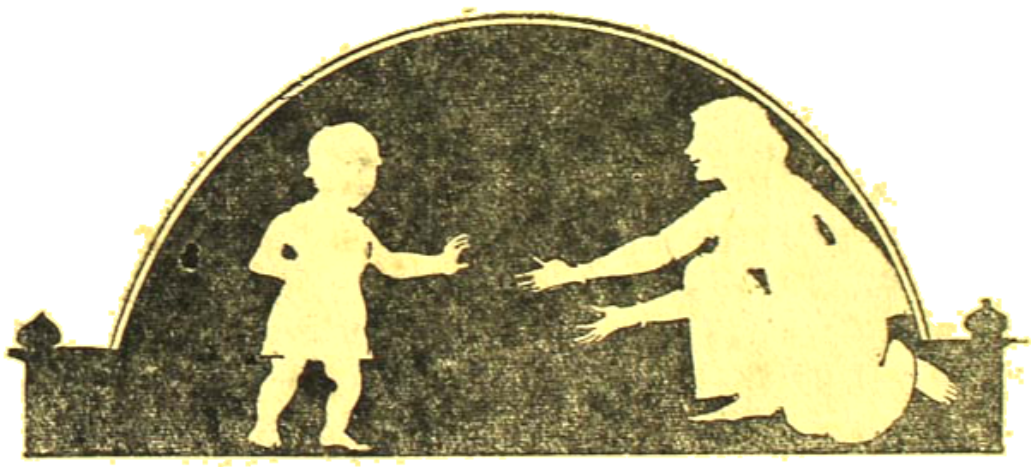

বাংলার গীতা 'সদ্ভাব শতক'

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

বাংলার স্বভাবকবি স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অমর কাব্যগ্রন্থ "সদ্ভাবশতক" বহুদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর সেনহাটি সম্মিলনী কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে এই অমূল্য গ্রন্থখানি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গীতার ন্যায় সমাদৃত হত। প্রসঙ্গত এখানে একটি প্রামাণ্য উদাহরণ তুলে ধরছি—যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও প্রণিধান যোগ্য। স্বনামধন্য প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী পুনর্মুদ্রিত সদ্ভাবশতক পুস্তকে সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তৎকালের প্রথিতযশা অধ্যাপক স্বর্গত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের একটি প্রশ্নকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। একদিন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার বাড়ী সেনহাটি, বাংলার গীতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক তোমাদের গ্রামেই লেখা হয়েছিল জানত'? 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন' প্রণিপাত সহকারে গুরুবাক্য মেনে নিয়েই অধ্যক্ষ চক্রবর্তী মহাশয় সদ্ভাবশতককে বাংলার গীতা বলেই গ্রহণ করলেন এবং বিদগ্ধ উত্তরসূরী অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মহাশয় সদ্ভাবশতককে গীতার মর্যাদায় ভূষিত করতে গিয়ে সদ্ভাবশতকের অন্যতম নীতিগর্ভ কবিতার প্রথম পংক্তি—'চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন' আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ আচার্যের চরণ প্রান্তে উপনীত ১২১৯ সালের তরুণ বিদ্যার্থী (একালের অধ্যক্ষ শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়) গুরুবচনে যন্ত্রচালিতবৎ আবৃত্তি করে গেলেন—

"চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

এইত গেল একটি মাত্র কবিতার কথা। এরূপ অসংখ্য নীতিগর্ভ কবিতা এক একটি হীরক খণ্ডের ন্যায়ই সদ্ভাবশতককে আলোকিত করে আছে। এই কবিতাগুলির কবিত্বের উৎস মূলে গীতার অন্তর্মুখিতা। প্রাণোন্মাদিনী আধ্যাত্মিক ভাব-ব্যঞ্জনা, উপদেশ ছলে পরমেশ প্রীতির প্রকাশ যখন আমাদের চোখে পড়ে তখন সত্যই আমরা বিমোহিত হই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি কবিতার কিছু কিছু অংশ তুলে ধরছি—

'যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি,
আন্ত গৃহে তার দেখিবেনা আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।

• • •

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

• • • •

'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

• • • •

'অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?

সদ্ভাবশতক পাঠে কবি কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য সাধনার কথা আলোচনা করলে মনে হয় কবির জীবন কাব্য চিন্তায় একটা অন্তর্মুখীন আধ্যাত্মিকতার ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনে চলার পথে ভগবানের শান্ত অশান্ত রূপ, সসীমে অসীমে পরিব্যাপ্তি। যুগে যুগে ভক্তবাৎসল্য ভাব উপলব্ধি করে সেই 'পরম পথে পৌঁছবার জন্য কবি একদিন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—এ ভব নদীতে শত শত বাধা বিঘ্ন, ঝড়বাদল ঘূর্ণিবাত্যার মাঝ দিয়ে কি করে ধীরে ধীরে তরণী বেয়ে ও পারে যাওয়া যায় সেই চিন্তায় অস্থিরতায়। কিন্তু একদিন তিনি অকস্মাৎ সাহস সঞ্চয় করলেন—তাঁর হৃদয় কন্দরে একদিন শক্তি সঞ্চারিত হল সেই পরমাত্মার চরণে মনে মনে

নিজেকে সমর্পণ করে তিনি শান্তি পেলেন এবং ভাবাবেশে বলে উঠলেন—

'প্রবল সংসার স্রোত, আমরা দুর্বল অতি,
কেমনে করিব নাথ। প্রতিকূল মুখে গতি?
যেদিকে বহিছে স্রোত, যেতেছি সেদিকে ভেসে,
নিকটে নরকাবর্ত্ত, কি হবে গতি।
দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ নাথ। দেহ বল,
সংসার জলাধি স্রোতে, নিস্তার সংসারগতি।'

প্রার্থনা চলতে চলতে পরমাত্মার দেবমূর্তির ছায়া এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র তিনি যেন পরিব্যাপ্ত দেখতে পেলেন—

'তুমি সর্ব্ব শরণ্য বরেণ্য গতি,
তুমি পূর্ণ পরাৎপর বিশ্বগুরু
গ্রহ-তারক-মণ্ডিত নীল নভঃ
ধন-ধান্য ভরা রমণীয় ধরা
সুগম্ভীর তরঙ্গিত নীর নিধি,
হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি
সকলে পুলকে সম তান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে।'

অনুভব করলেন তাঁর ক্ষুদ্র জীবনের মাঝে পরম পুরুষের বিমোহন মূর্তি—

'হে পুণ্য। তোমার কিবা মূর্তি বিমোহন,
তুলনা কোথায় পাব, কে আছে এমন।
তব এ বিশুদ্ধ বেশ হেরেছে যে জন,
পারে কি তোমায় সে ভুলিতে কখন?'

কবি বুঝলেন ভগবানের সাযুজ্যলাভ করাই জীবনের চরমতম সুখ। কিন্তু সে সুখ পেতে হলে যে পথে চলতে হবে সে পথ দুঃখ কষ্টের পথ—কঠোর সাধন ভজনার পথ। তাই কবি আমাদের শুনিয়েছেন—

'যদি কর শিরে আঘাত আসি,
পিছু না হটিব রহিব বসি।
তব হেতু যদি মরণ হয়,
বেঁচে ওঠা সেত মরণ নয়!
তব তরে আমি সহি যে দুখ,
দুখ নয়, এত বিমল সুখ।'

মহাত্মা কবীরের ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন সাধনায় এমনি একটা ভাবধারা আমরা দেখতে পাই—

সাধকা খেলতো বিকট বেস মতী।' (কবীর)

• • • •

পথের মাঝে এত কাঁটা? আগে নাহি জানি,
কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে গেছে পথখানি।
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী,
তব গীতে ওগো সিন্ধু দিবস যামিনী, (চিত্তরঞ্জন)

এই রঙ্গরস পূর্ণ পৃথিবীতে মানুষকে নানা ভাবে ভুলিয়ে রাখে। কেহ কেহ আপনাকে সারাজীবন ভোগের বাঁধনে বেঁধে মৃত্যুকালে এ বাঁধন ছাড়াতে পারে না। আবার কেহ কেহ ভোগের নেশায় একটু মত্ত হয়, কিন্তু তার দুদিনের ভোগের নেশা যখন টুটে যায় ভোগে আর সে তখন মত্ত হতে চায় না, প্রিয়তম 'পরম ধনের লাগি' ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জীবন সাধনা পথে চলতে চলতে শেষ বয়সে এব্যস্ততা কবিরও এসেছিল। তাই একেবারে 'সব' নিয়ে সেখানে গিয়ে 'অম্লান কুসুমের মধুপান তরে' ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কি করে যাওয়া যায়? মৃত্যুর পথ দিয়ে? কিন্তু যে কবি একদিন বলদৃপ্ত অন্তরে মৃত্যুকে স্মরণ করে বলেছিলেন—

'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
ও ভয়ে কম্পিত নয়, আমার হৃদয়।'

সেই কবি একদিন সত্য সত্যই বুঝলেন এই পৃথিবীতে দেহী যে মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। তাই শেষের সেদিন স্মরণ করে ক্ষীণাকুল কণ্ঠে কবি তাঁর জীবনের প্রার্থনা শেষ করলেন—

'বলহে বলহে বল শেষ-গতি!
কি হবে কি হবে মম শেষ-গতি।
করুণা করহে! করুণা করহে,
মম মোহ-তমো-নিচয় হরহে।'

• • •

'যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে।
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সহচর নিশ্চিত;
কোনরূপে তোমায় করিলে অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।'

কবির সদ্ভাবশতক প্রকাশের ক্ষুদ্র যে ইতিবৃত্তটুকু আমরা সংগ্রহ করেছি তাতে জানতে পারি ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে কবি 'মনোরঞ্জিকা 'কবিতা কুসুমাবলী,' 'প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী'

প্রকাশিত তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সংগ্রহ করে 'সদ্ভাবশতক' প্রকাশ করেন। সদ্ভাবশতক-কবির যশঃ সৌরভ দিক দিগন্তে প্রসারিত করে তাঁকে একসময় বাংলার কাব্য সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাটের আসনে বসিয়েছিল। 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃঃ ৩৬০) এই ভাবে লিখিত আছে—"এই সময় বাঙ্গালার কবি-কানন শূন্য। ইহঃ পূর্ব্বেই ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণে "সুধীরঞ্জন ঘারকানাথ" ও ফাল্গুন মাসে "সুকবি মদন মোহন" চলিয়া গিয়াছেন। পরবৎসর ১২৬৫ বঙ্গাব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করেন। সুতরাং বাঙ্গালার শূন্য কবিকুঞ্জ চাকার কৃষ্ণচন্দ্র তখন প্রতিদ্বন্দ্বী হীন কবি মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব' তখন সবে প্রেসে যাইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর কানে তাহা অস্বাভাবিক বাজিতেছিল। তাই বঙ্গবাসী কৃষ্ণচন্দ্রকেই তখন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান প্রদান করিতেছিল।"

তাই সুদীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য থাকার পর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের অমর কাব্যগ্রন্থ সদ্ভাবশতক সেনহাটি সম্মিলনী কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়ে সম্মিলনী সংস্করণের প্রকাশের ঘনটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্য এবং কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সম্মিলনীর পক্ষ থেকে কিছুকাল আগে কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি দেশবরেণ্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন যে এক সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে বাংলার স্বভাব কবি কৃষ্ণচন্দ্র শ্রদ্ধার মহান আসন পেয়েছিলেন এবং সদ্ভাবশতকের অনেক কবিতাই লোকে আগ্রহভরে পাঠ করে উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করত। প্রধান অতিথির ভাষণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন সভাকক্ষে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালেন, সেনহাটি সম্মিলনী সদ্ভাবশতকের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন ঠিকই কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই উচিত ছিল এতদিনের মধ্যে এই অমূল্য গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা। কবি এবং কবির কাব্যানুরাগী বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করেন। কবির স্বকথিত এবং তাঁর স্বগ্রামী সুসাহিত্যিক স্বর্গত অশ্বিনী কুমার সেনের সংগৃহীত কবির সংক্ষিপ্ত জীবন ধারা অবলম্বনে অধ্যক্ষ শ্রীসুকুমার মহাশয় পুনর্মুদ্রিত পুস্তকে যে সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ ভূমিকা লিখেছেন তাতে কবিরচিত সদ্ভাবশতকের অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাই পরিস্ফুট হয়েছে। ভারতের বিখ্যাত ভজনগায়িকা কুমারী যূথিকা রায় কবি রচিত 'প্রবল সংসার স্রোত, আমরা দুর্ব্বল অতি'—এই গানটি তাঁর সুললিত কণ্ঠে গেয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। কবির যে কীর্তিস্তম্ভ কালগর্ভে বিলীন হয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করে সেনহাটি সম্মিলনী বঙ্গভাষাভাষী বিদ্বৎসমাজের সভাই এক মহাউপকার সাধন করেছেন। অনুষ্ঠান শেষে এই কথাটি ভাবতে ভাবতেই মাল্য পরিশোভিত কবির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে প্রণাম জানিয়ে সভা কক্ষ ত্যাগ করলাম।

'ইয়েস স্যার !'

—উমাদাস মৈত্র

ব্রিটিশ সিংহের তেজ তখনও কমেনি। পাঁচটি মহাদেশে সিংহের হুংকার তীব্র ভাবে শোনা যাচ্ছে। ভারতের প্রত্যেকটি জেলায় সেই হুংকারে তখনও শিহরণ জাগছে। এমন সময় রাজসাহী জেলার মহকুমা শহর নওগাঁতে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।

কনেস্টবল বিশ্বনাথ বর বীরত্বপূর্ণ কাজের দ্বারা সমস্ত জেলাকে এবং প্রশাসনকে চমৎকৃত করেছে। সে নিজের জীবন বিপন্ন করে জমিদার মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কন্যা কমলাকে নদীতে নিমজ্জমানা অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে। শহরের সর্ব্বত্র এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আদালতে স্কুলে হাটে, বাজারে, সর্ব্বত্র একই আলোচনা। ধন্য বীর বিশ্বনাথ বর !

দেশ বিভাগ তখনও হয় নি। স্বদেশী আন্দোলনও জোর চলছে। সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা সর্ব্বত্র চলছে। এমতাবস্থায় এঁদের সৎকার্য্যকে তুলে ধরবার জন্য স্বয়ং ইনেসপেক্টর জেনারল অব পুলিশ নওগাঁতে এলেন। খাস বিলাতী সাহেব চার্লস উইকেল।

'পুট আপ' হ'ল বিশ্বনাথ আর তাকে যে সাহায্য করেছিল, কনেস্টবল আলি আসগর।

—টোমার নাম বিশ্বনাট্ ডর—আই, জি, পি, চার্লস উইকেল হুংকার ছাড়লেন।

—ইয়েস্ স্যর। বিশ্বনাথ কম্পিত কণ্ঠে 'এটেনসন' অবস্থায় জবাব দিল।

—টুমি মহান কাজ করিয়াছ। টুমি ভারটিয় নারীর জীবন 'সেভ' করিয়াছ। টুমি 'হোল কান্ট্রি'র সম্মান বাঁচাইয়াছ। টুমি গভর্ণমেন্টের সুনাম বৃদ্ধ করিয়াছ।

ইয়েস্ স্যর !

—টুমি গ্রেট ম্যান্, ব্যাভারিয়ান্স যে ভাবে কাজ করিয়াছে, টোমাদের নকল কুকুর যে ভাবে জীবন দিয়াছে, টুমিও সেইরূপ মহট্ কাজ করিয়াছ। জগটের দুর্ভাগ্য তাঁহারা মরিয়াছে কিন্তু টুমি অপরের জান বাঁচাইয়াছ এবং নিজেকেও বাঁচাইয়াছ। টুমি গ্রেট। ধন্য নিলেন আই, জি, পি.

ইয়েস স্যর। বিশ্বনাথ কম্পন কাটিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে লাগল।

টোমার বীরট্, সমস্ট পুলিশ ফোর্স, সমস্ট এডমিনিষ্ট্রেশন সর্ব্ব অনুভব করিটেছে। টোমার 'ক্রেডিটে' লাটসাহেব প্রীট হইয়াছেন।

ইয়েস স্যর।

টুমি আমার কাছে আই মীন, এডমিনি ষ্ট্রেশনের কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রট্যাশা কর ?

বিশ্বনাথ ম্যাট্রিক ফেল। একমাত্র ইতিহাস ছাড়া সব বিষয়েই ফেল করেছিল। কাজেই পুরু-আলেকজান্দার বা সেকেন্দার শুক্রগুপ্তর উপাখ্যান সে ভালভাবে জানে। বীরদর্পে সে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হল, ইয়েস স্যার।

ইয়েস, বল, কিরূপ ব্যবহার প্রট্যাশা কর।

ইয়েস স্যর রাজ যেরূপ রাজার কাছে ব্যবহার প্রত্যাশা করে, পুলিশ সেরূপ পুলিশের কাছে প্রত্যাশা করে।

চমৎকার। ব্রেভো। উচ্ছ্বসিত হয়ে আই, জি, পি, বিশ্বনাথের সাথে করমর্দ্দন করলেন এবং ঘোষণা করলেন, মহট্ কার্যের জন্য টোমাকে এক ডেভিসনের সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'ডিভিশনাল ক্রশ' দেওয়া হইবে। টুমি এ, এস, আই, পরীক্ষায় পাশ করিয়া ওংটিং লিষ্টে আছ। টোমার প্রমোশনের অগ্রাটিকার দেওয়া হইবে।

সাহায্যকারী কনেস্টবল আলি আসগরকেও

নগদ একশত টাকা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করলেন আই, জি, পি,।

হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। বিশ্বনাথকে আর দেখে কে। পুলিশব্যারাকে মহা আনন্দ।

নওগাঁ থানার বড়বাবু নূরমহম্মদ বিশ্বাস যেমন ডাকসাইটে অফিসর, তেমনি আমুদে। বিশ্বনাথ বড়-বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, ইয়েজ স্যর, সবই আপনার দয়া। আপনি না থাকলে পুরস্কার ত দূরের কথা আমার জেল হয়ে যেত। আপনি হুজুরেন, আপনিই স্যর, ভগবান। আনন্দে বিশ্ব-নাথের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

বড়বাবু বললেন, তোমার ভাল মন্দ আমার দেখা কর্ত্তব্য। আমার কোন কাজের ফলে যদি তোমার কোন উপকার হয়ে থাকে, তবে জানবে তা' খোদার ইচ্ছা আর তোমার বরাৎ।

ইয়েজ স্যর।

এতবড় বিপদ থেকে বাঁচবার পর কমলা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলায় মা কালী দর্শনে কালী-বাড়ীতে আসে। উনিশ কুড়ি বছরের নাদুসনুদুস জমিদার কন্যাকে দেখে বিশ্বনাথ রোজই উসখুস করে। চাংচাংবে চোখে চেয়ে থাকে। আলাপ করতে চায়। ভয় পায়, কি জানি জমিদারের মেয়ে যদি চটে যায়। যদি গিয়ে বাপের কানে তোলে, তবে ত গেছি। জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, ডি, ও, এস, পি, সব তাঁর হাতের লোক। তবুও বিশ্বনাথ সুযোগ পেলেই সন্ধ্যাবেলায় কালীবাড়ীতে চলে আসে। তাকিয়ে থাকে। সে দেখে তার সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে।

অবশেষে কমলা একদিন মুখ খুলল, কি! আপনিও বুঝি রোজ কালীবাড়ীতে আসেন?—

—ইয়েজ স্যর, আচমকা বিশ্বনাথের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাসিতে লুটিয়ে পড়ল কমলা।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে বিশ্বনাথ সোজা বলল, মা-কালীকে দেখতে আসি না, আসি আপনাকে দেখতে। বলবার পর বিশ্বনাথ নিজেকে বেশ সাহসী মনে করতে লাগল।

—আমাকে?

—ইয়েজ স্যর, আপনাকে।

—কেন? কমলার রাগতঃ স্বর।

—আপনাকে দেখা মানেই মা-কালীকে দেখা। কালীর আর এক নাম যে কমলা।

ননী মাখানো স্নেহল গালে টোল খেলিয়ে হেসে উঠল নধরদেহী কোমলাঙ্গী কমলা। বিশ্ব-নাথের হৃদয়-সাহারায় নব যৌবনের প্লাবন বয়ে গেল।

—সত্যি আপনি কি সুন্দর!

—কেন, আপনি বলেছেন মা-কালীর মত।

—আপনি মহাবিদ্যার পরম বিদ্যা কমলা। আপনি কালীর মত করাল কালো কেন হবেন। আপনি দার্জ্জিলিঙের তরাই অঞ্চলের কমলালেবু। আপনি মধুর।

—আপনার সাহস ত কম নয়।

—আপনি সাহস দিয়েছেন বলেই ত আমার স্পর্দ্ধা।

—পুলিশের এত কবিত্ব ত জানা ছিল না।

—দস্যুর দস্যু রত্নাকরের কবিত্ব থাকতে পারে, আর আমরা, যারা দস্যু দমন করি, তাদের থাকলেই দোষ।

—বাব্বা, আপনার সাথে কথায় পারা যাবে না।

—ইয়েজ স্যর।

আবার হাসিতে লুটিয়ে পড়ল কমলা। বিশ্বনাথও হেসে উঠল।

এইভাবে চলতে লাগল। ঝড়-বাদল তুচ্ছ করে প্রতি সন্ধ্যায় দু'জনে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে মিলিত হতে লাগল। যেখানে কালী সেখানে শিব। যেখানে কমলা সেখানে বিশ্বনাথ। প্রজাপতির রকেটে চেপে মহাশূন্যে দু'জনেই ঘুরে বেড়ায়। কত আলাপ, কত প্রলাপ। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, বেগুনি কত রঙের তারার স্বপ্নে তা'রা মশ্‌গুল। তাদের আলাপ যেন কত জন্ম জন্মান্তরের। নীরবে নিভৃতে দু'জনেই কালী-মন্দিরের সিঁড়িতে মাথা ঠোকে, মা, একবার মুখ তুলে চা, মা।

কেউ না জানলেও, পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব। পুলিশব্যারাকে এ নিয়ে অনেক মশ্‌করা সুরু হয়ে গেল।

থানার বড়বাবু নূরমহম্মদ বিশ্বাস ডেকে পাঠালেন বিশ্বনাথকে। শুনলেন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা। হৃদয়ের আবেগে বিশ্বনাথ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

—স্যর, আপনার কাছে মনের কথা বলব না ত কার কাছে বলব। আপনি আমার যা উপকার করেছেন, নিজের আত্মীয়ও তা' করে না।

—তুমি তাহলে বিবাহ করবেই।

—ইয়েস স্যার। আপনি একটু মদৎ দিলেই সব সমাধা হয়ে যায়। কো:-অপারেটিভ থেকে টাকা তুলে বসে আছি স্যার।

—বাবা। খাবার আগে আঁচাবার ধুম। আচ্ছা দেখা যাক্ কি করা যায়। জমিদার সাহেব কি রাজী হবেন। তবুও চেষ্টা করে দেখতে হবে। যদি তোমার তক্‌দিরে থাকে ত হবেই।

ইয়েস স্যার।

নূরমহম্মদ বিশ্বাস প্রস্তাব দিলেন জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরীকে। চৌধুরী মশাই আঁতকে উঠলেন, বলেন কি মশাই! আমার অত সাধের মেয়ের বিয়ে কি না দেব পুলিশের সাথে। চারিদিকে স্বদেশীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—কখন কে মরে আর কে বাঁচে তার ঠিক নেই। না, না, মশাই বিয়ে টিয়ে আমি দেব না।

—কথাটা একটু ভেবে দেখলে পারতেন, চৌধুরী মশাই। সময় মত না আটকালে পাত্র হয়ত হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। নূরমহম্মদ নতুন চাল দিলেন।

—আরে মশাই, আমি মোটেই উৎসাহী নই। অনেক ভাল ভাল পাত্র, ভাল ভাল বংশের ছেলের খোঁজ পেয়েছি। আমি পুলিশ পাত্রের সন্ধান চাই না।

—কি যে বলেন চৌধুরীমশাই, মাছের মধ্যে ইলিশ, আর মানুষের মধ্যে পুলিশ। কিন্তু শহরের খবর-টবর কিছু কি রাখেন? যে ভাবে আপনার মেয়ের ডোবার ব্যাপারটা বিকৃত হয়ে রটেছে, যে ভাবে তার উদ্ধারের ব্যাপারটা মুখরোচক হয়ে মুখে মুখে ঘুরছে, তা'তে আপনার মেয়ের বিয়ে না হবারই কথা। কারণ ভাল ভাল পাত্রের কান নিশ্চয়ই ঠসা নয়, এ সংবাদ তাদের কানেও যাবে। আপনি বরং পরামর্শ করুন বাড়ীর সকলের সঙ্গে। আমাকে সাতদিন বাদে জানাবেন কারণ বিশ্বনাথের অন্যত্র বিয়ের কথা চলছে। আর সামনের মাস থেকে ও' এ, এস, আই-তে প্রমোশন পেয়ে কাশীমপুর থানায় বদলি হয়ে যাবে। তখন যেন আমাকে দুষবেন না।

অনেক বিচার বিবেচনার পর যথা সময়ে কথা দিলেন, চৌধুরী মশাই। শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কাল হরণং। সংবাদটি চারিদিকে রটে গেল। বিশ্বনাথের জয় যেন তার সমস্ত বন্ধুদের জয়। উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমাণ সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকার জয়।

বিশ্বনাথ ভাবে, সত্যই কী সুন্দর এই জীবন। ঘটনা, দুর্ঘটনা সবই কত সুন্দর, কত মাধুর্যময়, কত ইঙ্গিতবহ। বিশ্বনাথের মনে পড়ে সেই কাল-রাত্রির কথা। কী ভীষণ বিপদে সে পড়েছিল। আলি আকবর না থাকলে সে যে কি করত, তা' ভাবতেই পারে না। উঃ, কী উত্তেজনা সেই রাত্রে!

ভাদ্র মাস। যেমন গুমট গরম, তেমনি মাঝে মাঝে বৃষ্টি। মহকুমা শহর নওগাঁর গা ঘেঁষে চলে গেছে আত্রাই নদী। তার কাণায় কাণায় জল।

এই নদীর ধার ঘেঁসে গড়ে উঠেছে, থানা, জেলখানা, আদালত এবং নওগাঁর প্রাণকেন্দ্র কো-অপারেটিভ সোসাইটি ফর দি কালটিভেশন অব গাঁজা এণ্ড হাশিশ। বিরাট সোসাইটি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম ঘর। সম্পূর্ণ সোসাইটিটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সব রকম সতর্কতার ব্যবস্থা আছে। সরকারের প্রচুর রাজস্ব আদায় হয় এই কারবারে। কাজেই সরকার এই সোসাইটি থেকে চুরি বা পিলফারেজ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। সোসাইটির ভিতরে বাহিরে কঠিন পাহারা। এমন কি নদীতেও নৌকা করে রাত্রে টহল দিতে হয়।

বিশ্বনাথ আর আলি আসগরের ডিউটি পড়ল রাত্রে। সারারাত্রি নদীতে টহল। কড়া নির্দেশ—চোর, ডাকাত, লুটেরা দেখলেই গুলি।

স্নেহ থলথল বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে বিশ্বনাথরা উঠল নৌকাতে। প্রথমটায় নৌকা হেলে পড়েছিল। ডোবে আর কী, বা লাস!

রাত্রি বাড়বার সাথে সাথে আলস্যও বাড়তে লাগল। ভ্যাবসা গরম কেটে গিয়ে ফুরফুরে হাওয়া বইতে লাগল। হাতের মা'স্কেট আর কোমরের গুলির পাউচ খুলে ফেলল বিশ্বনাথ।

বেল্‌টাকে আলগা করে দিয়ে নৌকার ছৈ-এর বাহিরে পাটাতনের উপর গুলির পাউচ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। নৌকা ভেসে চলেছে। ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। কো অপারেটিভ সোসাইটির প্রাচীরের দিকটা পরিষ্কার; কোন লোক নেই, কোন নৌকা নেই। জেলখানার ঘণ্টায় ঢং ঢং করে বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মধ্য দিয়ে শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বেশ একটা নিশ্চিন্ত পরিবেশ।

ওপাশ থেকে আলি আসগরের নাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুরেলা আওয়াজ। বিশ্বনাথের চোখে ঘুম নেমে এল। কন্ট্রাক্টারের ভাড়া করা নৌকার দাঁড়ি মাঝিরাও বন্দুকধারীকে অবসন্ন হয়েপড়ল।

ভোর রাত্রে ঝিম পড়তে লাগল। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিশ্বনাথ ঘুম থেকে উঠে বসল। পোষাক ঠিকঠাক করতে করতে হঠাৎ খোঁজ পড়ল গুলির পাউচের। ওটা ত মাথার নীচেই ছিল। গুলি ভর্ত্তি ছিল। খোঁজ খোঁজ। আলি আসগরও খুঁজতে লাগল। দাঁড়ি-মাঝিরাও। পাটাতনের নীচে, ছৈ-এর মধ্যে কোথাও পাওয়া গেল না।

ভয়ে, আতঙ্কে বিশ্বনাথ কেঁদেই ফেলল, আমার জেল হবে যে, না পাওয়া গেলে! সাহেবরা বলবে, স্বদেশীওয়ালাদের দিয়ে দিয়েছি। হাপুস নয়নে পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল। বিশালাকৃতি কৈলাস পাহাড় বেয়ে যেন বরফগলা জল মণি মহেশে এসে পড়ছে!

বুদ্ধিমান বলে আলি আসগরের খ্যাতি আছে পুলিশ ব্যারাকে। বিশ্বনাথ তার পা জড়িয়ে ধরল। বাঁচা আমাকে, বাঁচা।

—ঘাবড়াস নি। একটু ভাবতে দে।

অনেক ভেবে চিন্তে মতলব স্থির করল আলি আকবর। আশ্বাস দিয়ে বলল, তোর ভয় নেই। খোদার উপর ভরসা রাখ। যা বলি তাই কর।

ভোরের আলো ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জমিদার বাড়ীর ঘাটে কে যেন স্নান করতে নেমেছে। সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝ দরিয়ার দিকে আসছে। মনে হচ্ছে যেন হাফিয়ে পড়েছে।

জুতা জামা খুলেই তড়াক করে লাফ দিয়ে নদীতে কাপিয়ে পড়ল বিশ্বনাথ। সাঁতার কেটে কাছে গেলস্নানার্থীকে। ছিঃ ছিঃ এ যেযুবতীমহিলা।

—আহা আপনি ডুবে যাচ্ছেন। কোন ভয় নেই, আমাকে ধরুন। বিশ্বনাথ বলল।

—না, না, আমি ডুবছি না। আমি সাঁতার জানি চর্ব্বি কমাবার জন্য রোজ সাঁতার কাটি।

—আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ডুবে যাচ্ছেন। মুখ দিয়ে জল নিচ্ছেন।

—ওটা এমনি, মুখ দিয়ে পিচকারি কাটছি। সকলেই ওরকম মজা করে।

—আপনি ডুবে যাচ্ছেন। আপনি মজা-করছেন। আত্মহত্যা করবার চান্স নিচ্ছেন। বাড়ীতে নিশ্চয়ই ঝগড়া হয়েছে।

—বিশ্বনাথ চুলের মুঠি ধরল। ঝট্‌কা দিয়ে যুবতী সরে গেল। সত্যি সত্যি এ'বারে যুবতীর হাত ধরল।

—বাঁচতে চান ত আমাকে জোর করে ধরুন। বিশ্বনাথ বলল,

হাঁফাতে হাঁফাতে যুবতী বলল, আপনি চলে গেলেই, আমি বাঁচব!

আত্মহত্যার জন্য মরিয়া হয়ে গেলে সকলেই এরকম বলে। তাছাড়া সজ্ঞানে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে বাঁচানোও কঠিন। কারণ নিজের বিপদ তাতে হতে পারে। চকিতে সব কিছু ভেবে নিয়ে বিশ্বনাথ যুবতীকে আচমকা ঠাস্ করে চড় মারল। বেদম অবস্থায় যুবতী সত্যিই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

নৌকা নিয়ে ধীরে ধীরে আলি আকবর এসে পড়ল। জ্ঞান হীন বিশাল দেহটাকে নৌকার উপর তোলা হল।

নৌকার একজন দাঁড়ি নদীর পারে গিয়ে দুর্ঘ-টনার খবর রটনা করে থানার দিকে গেল। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। নদীর পারে লোক জমতে লাগল। ধীরে ধীরে যুবতীর দেহ নিয়ে নৌকা এসে লাগল জমিদার বাড়ীর ঘাটে।

পাঠাতনের উপর পড়ে আছে যুবতীর দেহ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভেজা অবস্থায় খালি গায়ে থল থলে ভুঁড়ি নিয়ে বিশ্বনাথ। এক কোণে চুপ করে ইউনিফর্ম পরে বসে আছে আলি আসগর।

জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরী চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, ওরে, আমার কমলারে।

জমিদার বাড়ীর ছেলে মেয়ে সকলেরই চোখে জল। বড় ছেলে গোবরা চৌধুরী বললেন, 'বডি'টা নামাও।

কনেষ্টবল আলি আসগর গর্জ্জে উঠল, খবরদার! আগে বড় বাবু আসুক।

খবর গেল। বড়বাবু এলেন। জমিদার বাড়ীর ব্যাপার, এস, ডি, ও, সাহেব এলেন। সরকারী ডাক্তার এলেন। 'বডি' নামানো হল।

ডাক্তার রেবতী বাড়ুজ্জে পরীক্ষা করে বললেন, বিপদের কিছু নেই। শক্।

বড়বাবু নূরমহম্মদ বিশ্বাস ঘটনার সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করে এস, ডি, ও, সাহেবকে জানালেন। এস, ডি, ও, বিজন বিশ্বাস বললেন, আপনার কনেষ্টবলেরা বিরাট কাজ করেছে। এতে হিস রয়েল ম্যাজেষ্টির প্রেষ্টিজ বেড়েছে। একটা মহান জীবন বিরাট দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছে। এত বড় মহৎ কাজ করতে গিয়ে গোটা কতক গুলি জলে পড়ে গিয়েছে, এ নেহাৎ তুচ্ছ ব্যাপার। স্টক রেজিষ্টার আনবেন, আমি রাইট অফ্ করে দেব।

একটু বাদে জ্ঞান ফিরল যুবতীর। চেয়ে দেখল চারিদিকে ভীড় কৌতূহলী জনতা। মা-বাবার চোখে জল!

—অ্যাঁ, আমি কোথায়? যুবতী প্রশ্ন করল।

—মা কমলা, তুমি আমাদের মধ্যেই আছ। কোন ভয় নেই।—মহেন্দ্র চৌধুরী বললেন।

—আমি এখানে কেন?

—তুমি ডুবে গিয়েছিলে। তোমায় এঁরা সব বাঁচিয়েছেন।—মহেন্দ্র চৌধুরী বিশ্বনাথ আর আলি আকবরকে দেখিয়ে দিলেন।

—উঃ—দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল যুবতী, আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

ডাক্তার বাবু বললেন, ডিসটার্ব করবেন না। বাড়ীতে নিয়ে যান। সম্পূর্ণ রেস্টে রাখুন।

যুবতী কমলাকে ষ্ট্রেচারে করে অন্দর মহলে নিয়ে যাওয়া হল। এস, ডি, ও, সাহেব বিশ্বনাথ আর আলি আসগরের সাথে করমর্দ্দন করে বললেন তোমাদের বিবরটা ব্রিটিশ সরকারকে নিশ্চয়ই জানাব। ইউ আর গ্রেট।

—ইয়েস স্যর!—বিশ্বনাথের মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। সে ভাবতেই পারছে না, কি থেকে কি হ'ল বা কি হতে যাচ্ছে।

থানায় এসে বড়বাবু ডাকলেন, বিশ্বনাথ।

—ইয়েস স্যর—বিশ্বনাথ জবাব দিল।

—ব্যাপারটা কি?

—সবই ত জানেন স্যর! আপনি করুণাময় স্যর!

—তাই না কি? তুমি বড্ড ঝামেলা কর!

—ইয়েস স্যর!

• • • •

মহা সমারোহে বিবাহ সমাধা হল। সরকারী বেসরকারী সকলেরই কৌতূহলের শেষ নেই। সকলের মহা আনন্দ। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ করেছে। যেন সার্ব্বজনীন বিবাহ উৎসব।

উত্তিল মিবরঞ্জন সেন তার বড় বাড়ীর একটা অংশ ছেড়ে দিলেন। সেখানেই হ'ল বৌ ভাত। ধুমধাম ও জাঁক জমকের সাথে উৎসব শেষ হলে বর—বউ এল ঘরে। ফুল শয্যা।

ফুল শয্যার রাত্রে কমলা জিজ্ঞাস করল, আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছে?

বিশ্বনাথ জবাব দিল, খু-উ-ব।

—আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, এটা কিন্তু সত্য নয়।

—আপনাকে না বাঁচালে, আমি বাঁচতাম না।

—আপনি ভারি দুষ্ট!

—আর 'আপনি' কেন, এবার থেকে, 'তুমি'।

—আচ্ছা, 'তুমি।'

ফুলের গন্ধে ঘর ভরপুর সর্ব্বত্র মিষ্টি মিষ্টি ভাব।

কমলা বললে, বাঁচাবার নাম করে তুমি আমাকে ও রকম চড় মেরেছিলে কেন?

'সোহাগ করে'—বিশ্বনাথ বলল,—'আহা তোমার বোধ হয় খুব লেগেছিল। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, কমলা। সেই চড় যেন হাজার চড় হয়ে আমার গালে লাগে।

—তুমি বড্ড ভাল, বড্ড সরল।

—ইয়েস স্যর!

দু'জনেই হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। বাইরে সমুদ্র যেন সাগরের জল গঙ্গার উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাশের বাড়ীর গিন্নীর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে সাহসে ভর করে বেণু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এবারে এসে পিসিমার ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখ্‌লে, পিসিমা বিছানায় একপাশ চুপ করে শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে ডাকলে, পিসিমা।

পিসিমা—

কোন উত্তর নেই। আবার ডাকলে,

খোঁকিয়ে উত্তর এলো কি ?

আমার ভোর হয়ে গেছে পিসিমা। আপনি পড়ে গিল্‌লেন, গরম ভাত, পাছে ভাপ লাগে তাই তাড়াতাড়ি তুল্‌তে গিয়েছিলুম, তা আপনি না হয় আর দুটি চাল চড়িয়ে দিন, আমি উনুন নিকিয়ে ঘরের ভেতরেই দিয়ে দিচ্ছি।

আর যত্ন করে দরকার নেই বাছা, আর যত্ন করে দরকার নেই। ঢের হয়েছে। এখন দয়া করে ঐগুলো পরিষ্কার করবে, না আমি আবার মরতে মরতে উঠ্‌বো ?

পরিষ্কার এক্ষুনি করে দিচ্ছি পিসিমা, বলেই বেণু তৎপর হয়ে কাজে লেগে গেল। ভাতগুলো কুড়ুতে কুড়ুতে যেন কত প্রফুল্ল হয়ে বল্লে একবার রান্নাঘরে সরু চাল পেয়েছিলুম পিসিমা, তাই যত্ন করে চারটি বাঁচিয়ে রেখেছিলুম তা এগুলো এমন ভাবে নষ্ট হয়ে গেল, কি করবেন বলুন পিসিমা এ আমারই বরাৎ।

পিসিমা বল্লেন, তোমার বরাৎ যে সবদিক দিয়েই ভালো, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। এখন সরু চালের ভাতগুলো তুলিই গেল গে।

বেণু এর কোন উত্তর না দিয়ে সেই হাড়ির মধ্যে মেঝের ভাতগুলো তুলে হাঁড়ি শুদ্ধ নিয়ে এসে কলঘরের সামনে রাখলে, তারপর ছাতা দিয়ে সমস্ত মুছে পরিষ্কার করে ফেল্লে।

পিসিমা শুয়ে শুয়ে বল্লেন, ওরে কালি, তুই যে সকড়ি পাড়লি, তা গোবর দিলি না ?

দিয়েছি পিসিমা।

কই ? আমি ত দেখতে পেলুম না। এই রকম করেই এ বাড়ীর সব কাজ হয় বুঝি ? দেখ ত ভোর, না দেখ্‌ত ঘোর।

না পিসিমা, ঘুটের কুচি দিয়েছি।

আ আমার পোড়া কপাল রে, ঘুটের কুচি দিয়ে বামুন বাড়ীর সকড়ি পাড়া হয়! না বাবা, এ বাড়ীতে আমি অন্ন গ্রহণ করতে পারবো না। শনীর আসুক তাকে আমি খোলাখুলি বলে দেব, এরকম মেলেচ্ছ আনা আমার পোষাবে না।

থতমত খেয়ে বেণু বল্লে আমরা ত তাই করি পিসিমা। নইলে গোবর এখানে পাবো কোথায় ?

কেন, এখানে গরু নেই। রাস্তা থেকে গোবর কুড়িয়ে আন্‌তে পারিস্‌ না।

ভয়ে ভয়ে বেণু বল্লে, আমাকে যে বাইরে যেতে দেয় না পিসিমা।

ওঃ, বলি গোবর কুড়ুনীর মেয়ে, পরের বাড়ী কি খাট্‌তে খাট্‌তে একেবারে রানী হয়ে বসেছে. তার আবার ভিয়কুটী কত, বাইরে বেরুই না।

বেণু একবার কোন জবাব না দিয়ে উনানটাকে বেশ করে নিকিয়ে পরিষ্কার করে ফেললে।

সমীর আজ সকাল সকাল বাড়ীতে এসে গেল। এসেই জামা প্যাণ্ট না ছেড়ে সোজা পিসিমার ঘরে এসে বললে, পিসিমা, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে?

পিসিমা শুয়ে শুয়েই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

বেশ তৃপ্তি হোল খেয়ে, বেশ রুচি হয়েছে ত?

খাওয়া আমার হয় নি, পিসিমা খাটের ওপোর উঠে বসে কথাগুলো বললেন।

কেন, কেন, সমীর অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে।

তোমার ঐ ঘরের লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা কর, কেন হয় নি।

সমীর চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে বল না পিসিমা আজ আবার রাগ হোল কেন?

পিসিমা কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লেন, এতেও রাগ হবে না ত কিসে হবে বল। নিজে জল তুলে ভাত চড়ালুম, তুমি বায়না করে জল তুলে দিয়ে গেলে, তাইতে তরকারী পুড়ে তরকারী করলুম, আর ভাত হয়ে যাওয়ার পর ভাত নিয়ে ঘরে আস্‌ছি, ঐ গিন্নী কিনা স্বহস্তে ছুঁয়ে দিলে।

কেন, কেন, কারণ কি? সমীর আগ্রহে প্রশ্ন করলে।

কারণ কি, তার আমি কি জানি? জিগ্যেস কর তোমার ঐ বাড়ীর গিন্নীকে, পিসিমা এক বিকৃত মুখভঙ্গী করে উত্তর দিলেন।

সমীর বেণুকে ডেকে বল্লে, কি হয়েছে রে বেণু।

বেণু দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে, ভাতের হাড়ী নিয়ে যেতে গিয়ে উনি পড়ে গিয়েছিলেন তাইতে —

বাধা দিয়ে পিসিমা বল্লেন, মিথ্যে কথা বলিস্‌নি, মুখ খসে যাবে। আমি পড়ে গিয়েছিলুম আর উনি এসে আমায় ধরে তুলেছেন! একবার বাজে কথা! না বাবা সমীর, হয়েছে কি বাবা, আমি ত দুর্ব্বল মানুষ, বাইরে রান্না করে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে ঘরে আসতে গিয়ে যাই মাথা ঘুরে হাড়িটা পাশে নামিয়ে বসে পড়েছি, আরকোথায় ছিল ঐ কানি, একেবারে দৌড়ে এসে আগুনখাকীর মত কাপিয়ে পড়ে আমার হাত ধরে টেনে তুলে, হাঁড়িটার পা লাগিয়ে ঝাং করে ফেলে ভাত ছড়িয়ে আমাকে ঘর দেখাতে এলেন। আমি যে বল্‌লুম, আমাকে ধরতে হবে না, আমাকে ছুঁস্ নি, তা সে কি বলবার সময় দিলে রাক্ষুসি হারামজাদী তোখাকার। তারপর সেই হাঁড়ি শুদ্ধ ভাত ঐ দেখ দরজার ধারে বসিয়ে দিয়েএসেছে। তাই বলছি যে আমি না হয় দুখটুকু খেয়ে থাকবো তুই সকালের ভাতগুলো নষ্ট করিস্ নি। নিজে খা, না হয় সমীরকে দে, তা কি শুনলে? আচ্ছা বাবা, তোমাকে কতদিন নিজে হাতে রান্না করে দিইনি, তা বলুম আমি না হয় নাই খেলুম তুমি খেও, তা ওর আলায় কি তা হবে, বলেই পিসিমা হাত ঝাড়া করে কেঁদে ফেল্লেন।

সমীর কলঘরের সামনে হাঁড়িটার দিকে চেয়ে দেখে বল্লে, তা সে থাক, এখন তুমি কি খাবে পিসিমা?

খাবো আমার মাথা আর মুণ্ডু।

একটু ভেবে নিয়ে সমীর বল্লে এক কাজ করি পিসিমা, আমি না হয় নিজের হাতে তোমার জন্য চারটি ভাত ফুটিয়ে দিই।

না বাবা সমীর, তুমি এই খেটে খুটে এলে, তোমাকে আর এত কষ্ট করতে হবে না। তুমি নওয়া খাওয়া কর গে, আমি বরফ দুধ আর ফল যা আছে তাই খেয়ে এবেলাটা চালিয়ে দিই।

না না, পিসিমা তা কি হয়। আমি চান করে তোমার জন্য ভাত ফুটিয়ে দি বলেই বেণুকে বল্লে, উনানে আগুন আছে?

বেণু বল্লে, না দাদা, এখুনি আগুন দিয়ে দিচ্ছি বলেই সে দ্রুতবেগে ভিতরে চলে গেল।

কেন আর হাঙ্গাম করছো সমীর, যে কালসাপ পুষে রেখেছে, ও আমায় এ বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করতে দেবে না, ও প্রতিজ্ঞা করেছে।

—না না ওসব বাজে রাগ রেখো না পিসিমা, ও লোকটা তেমন খারাপ নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বলেই সমীর পিসিমার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

স্নান করার পর সমীর যখন নতুন করে চুল আঁচড়াতে গেল, তখন পিসিমা কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, সমীর, বাবা সমীর।

কি পিসিমা।

তুমি খেতে বোসো, আমার চাল আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি।

না না পিসিমা আমি যিছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

সে হয় না সমীর, তোমরা বাইরে বাইরে ঘোরে, কত জায়গায় কত কি খেয়ে বেড়াচ্ছ, বুড়ো বয়সে ক্ষমতা থাকতে কেন তোমাদের হাতে ভাত খেয়ে মরি। বলে অমন পাপ মহাপাপ। একে ত কত পাপ করেছি, তাই অল্পকালে বেঁচে থেকে কত সব অঘটন না দেখতে হচ্ছে, আবার এ জন্ম—

তবে তাই করো পিসিমা, আমি না হয় হাঁড়িটা উনানে বসিয়ে দিই।

তা দাও বাবা, তাই দাও।

বেলা সাড়ে বারোটায় সমীর স্বহস্তে পিসিমার চাল উনানে চড়িয়ে দিয়ে ভিতরের বারান্দায় চুপ করে বসে রইলো।

পিসিমা বল্লেন, তুই খেয়ে নে না সমীর, তুই মিছামিছি দেরী করছিস্ কেন?

কত্তা বলতেন, নেয়ে উঠেই না খেলে পিত্তি পড়ে, তা তুই কেন মিছামিছি পিত্তি পড়াচ্ছিস্?

সমীর বল্লে, হোক্ না পিসিমা। এতদিন পরে তোমার সঙ্গে একসঙ্গেই খাওয়া যাবে।

না বাবা না, তুই এইখানে বসে খা, আমি দেখি।

সমীর বল্লে, আচ্ছা। ভেবুকে বল্লে, তাহলে আমাকে দিয়ে দে রে।

ভেবু নতমুখে সমীরের জায়গা করে ভাত দিয়ে গেল।

সমীর আচমন করে খেতে বস্‌তেই পিসিমা বল্লেন, কি যে তোদের প্রবৃত্তি হোল বাবা! যাকে দেখলে ঘেন্না হয়, যার ছায়া ছুঁলে নাইতে হয়, তার হাতের ভাতগুলো অম্লানবদনে দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছিস।

সমীর বল্লে, ওকথা থাক্ পিসিমা, ও কথা বাদ দাও। আমরা হলুম সব মহাত্মাজীর শিষ্য, তিনি বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেবের মত জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিলেন—

যা ভালো বোঝো তাই কর বাবা, পিসিমার সনাতন হিন্দুধর্ম।

সেকথা বল্লেও পারবে না পিসিমা। সমীর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, ঐ যে হিন্দুমহাসভা বাবা ভারতে পুরোপুরি হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করতে যায়, তারাও ত জাতিভেদ মানতে চায় না। আর চৈতন্যদেব কি এসব বুঝতেন না?

তাঁদের কথা ছেড়ে দাও বাবা, তাঁদের কথা ছেড়ে দাও। তাঁরা ছিলেন দেবতা, তাঁরা কি আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন, শুধু মানুষের দেহ নিয়ে লীলা করতে এসেছিলেন, বলে পিসিমা তাঁদের উদ্দেশে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

সমীর বল্লে সে যাই হোক পিসিমা তোমাদের হিসাবেও বেণু ত ছোট জাত নয়, সেও ত ব্রাহ্মণের মেয়ে।

ও কথা বোলো না বাবা, ও কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ কোরো না। জন্মটার আবার জাত! আর তাও বলি সমীর ও কক্ষনো ভালো বামুনের মেয়ে নয়, খোঁজ করে দেখ, ওর বাবা কি মা নিশ্চয়ই—বেণু দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে গেল। সমীর ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বল্লে, ছিছি পিসিমা, এ সব তুমি কি বলছ? ওর কেউ নেই বলে, বা ও গরীব বলে এরকম কটাক্ষ করা কি ভালো?

হতাশ স্বরে পিসিমা বল্লেন, জানি তোমার ভাল লাগবে না, কিন্তু কি করি বল, যা সত্যি, তাকে ত আর চাপা দিতে পারি না।

সমীর চুপ করে খেয়ে যেতে লাগ্‌লো। পিসিমা বল্লেন, বাবা সমীর, এই অত দিন কাশীবাস করে আর পাঠ কথকতা শুনে আমার এক দৃষ্টি খুলে গেছে। যাকে দেখ্‌লে প্রাণে একটা অশান্তি আসে, সে কখনও ভাল লোক হতে পারে না।

হাসিমুখে সমীর বল্লে, আচ্ছা পিসিমা, তোমার সেই গুরুভাই, সেই হাঁপানী কাশির বুড়োটা? পিসিমা ধমকে দিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ সে লোকটা—তা সে কি করবে বল, তার অভাবের সংসার, টানাটানিতে পড়ে তোমার টাকাগুলো মেরে দিয়েছে, কিন্তু লোক সে মন্দ কি! খুব ধার্মিক আর—

যে বুড়িকে নিয়ে সে সংসার করে, তাকে সে কবে বিয়ে করেছিল পিসিমা? সমীর হাস্‌তে হাস্‌তে প্রশ্ন করলে।

পিসিমা একটু রাগ দেখিয়ে বল্লেন, এ সব তোমাদের ভয়ানক অন্যায়। সে বুড়ো মানুষ, কবে কি হয়ে গেছে, সেই নিয়ে তোমরা—

আর যে গুরুদেবের সঙ্গে তোমরা একসঙ্গে কাশী থেকে বৃন্দাবনে এসেছিলে, সে তোমায় ফিরে না যাওয়ার জন্য

গাড়ী ভাড়ার টাকাটা ফেরৎ দিয়েছিল কি? সমীর পুনরায় প্রশ্ন করলে।

এ সব কথা পিসিমা বৃন্দাবন থেকে দিল্লী আসার পথে ষোটরে বসে বসে একে একে ভাইপোর কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে পিসিমা বল্লেন তা সে কি করবে? তার হাতে টাকা ছিল না। ফেরৎ দেবে কি করে?

ও, তা তুমি যদি কাশীতে ফিরে যেতে, তা'হলে সে তোমার টিকিট কিন্‌তো কি করে?

এসব তোমার দরকার কি বাবা? বাদুর-পণ্ডিত, সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব মানুষ, ওদের দোষ ত্রুটী ওরকম ধরতে নেই, ও-বিষয় চিন্তা করলেও পাপ।

সমীরের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এলো। আসন ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সে বল্লে পিসিমা, তোমার ভাত কতদূর হোল একবার দেখ, শেষে আবার তলা—টলা ধরে যাবে—পিসিমা বল্লেন, দেখি বাবা, দেখি। যে বরাৎ আমার, একবার ও এক হাঁড়ি ভাত পেছে, এবার যদি আবার ধরে পুড়ে যায়, বলতে বলতে মেঝে ঘরে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। সমীর নিজের ঘরে গিয়ে পান খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বিছানায় কাৎ হয়ে শুলো। বেচারীর সিগারেট খাওয়া আজ বন্ধ, পিসিমা পাশের ঘরেই জেগে আছেন। একবার ইচ্ছে হোল রেণুকে ডেকে বলে,আমাকে ছুটোর সময় ডেকে দিস্, কারণ আজ দাড়াইটের সময় অফিসে পৌঁছতেই হবে, আর মনে করিয়ে দিতেবে পঞ্চাশটে টাকাও আজ নিয়ে যেতে হবে অফিসে, একজনকে দিতে হবে, কথা দেওয়া আছে, কিন্তু পাছে পিসিমা কিছু মনে করেন, সেই ভয়ে আর রেণুকে ডাক্‌তে সাহস পেলে না। আর রেণুও আগে থেকেই এ ঘরের টেবিলে পাজা-পান রেখে গিয়েছিল। সমীর এ ঘরে আসার পর, সে আর এদিকেও মাড়ালো না। খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে সমীরের যথারীতি তন্দ্রা এসে গেল। এর পর সমীরের হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙলো তখন ঘড়িতে দেখে দুটো বেজে দুড়ি মিনিট। তাড়াহুড়া করে উঠে পিসিমার কোন খোঁজ—খবর না নিয়ে এক গেলাস জল পর্যন্ত না খেয়ে কোন মতে জামাপ্যাণ্ট গলিয়ে সাইকেলে উঠেই সমীর রওনা দিলে। দুটো তিরিশের বদলে অফিসে গিয়ে পৌঁছাল সে দুটো চল্লিশে। অফিসারের কামরায় গিয়ে কাজ সারতে সারতে হঠাৎ তার মনে পড়লো, সর্ব্বনাশ, টাকা ত আনা হয় নি। তাড়াহুড়া করে বেরুতে গিয়ে পঞ্চাশ টাকার কথা যে সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। অফিস থেকে আবার বেরিয়ে বাংলোয় গিয়ে টাকা নিয়ে আসা সেও ত সময় সাপেক্ষ অথচ আন্‌তে ভুলে গিয়েছি, এ কথা বলতেও সে মুখ ফুটে পারবে না। অফিসের দু-একজন অন্তরঙ্গ। সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, ঐ টাকা তাদের কাছ থেকে একদিনের জন্য ধার পাওয়া সম্ভব কি না।

তারা বল্লে, এখানে কোথা থেকে দেব, বাড়ী না গেলে ত হবে না। ক্যাশে কাজ করে যে বন্ধু, সে বল্লে, না ভাই, আজকাল বড় কড়াকড়ি,হঠাৎ যদি বিকেলে কেউ চেক্ করতে আসে, তাহলে চাকরী চলে যাবে। জানোই ত, বেটাদের এদিক নেই ওদিক আছে।

[ক্রমশঃ

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বর

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি নামক প্রবন্ধে শ্রুতি কি ও কাহাকে বলে ও তাহাদের বর্ণন কি ভাবে হইবে এবং আর্য্য শাস্ত্রের সহিত কালচক্রের কি সম্বন্ধ তাহা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতির সহিত স্বরের কি সম্বন্ধ ও স্বর কাহাকে বলে তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে স্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যদিও তাহা সঙ্গীতের উৎপত্তি নামক প্রবন্ধে সামান্য ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তথাপি এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সঙ্গীতের এই সপ্তস্বর প্রকৃতিতে অবস্থিত। মহাভারতে শান্তি পর্বে উল্লিখিত আছে যে মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে তৃণ কহিলেন—আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহারা আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দ জ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকূলতা বশতই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়।

এই শব্দই ব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।মহাভারতে শান্তি পর্বের উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে যে রাজা জনমেজয় কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন—ব্রহ্মা সৃষ্টি মানসে বিষ্ণুর নাভি পদ্মে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ সৃজন করিতেছিলেন। সেই পদ্মস্থিত দুই বিন্দু কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ—দৈত্যদ্বয় উদিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইল, এবং নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্তি ধারণ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া উদাত্তাদি স্বর সমূদয় অবলম্বন করিয়া সামগান আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অসুরদ্বয় সেই শব্দ শ্রবণমাত্র বেদ নিক্ষেপ পূর্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল। নারায়ণ সেই বেদ লইয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই শব্দ আবরণী ও বিক্ষেপণী অর্থাৎ সংকল্প ও বিকল্পময়ী মায়া প্রভাবে আবৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ শক্তি প্রভাবে যখন সেই মায়া অপসৃত হয় তখনই তাহার প্রকাশ হয় ধ্বনিতে। স্থূল ধ্বনিরূপ শব্দের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম শব্দও আছে এবং অবশেষে শব্দের এইরূপ আকার আছে যাহা প্রতীতিগম্য নহে। শব্দ যতই সূক্ষ্ম হয় ততই তাহার অনিত্যতা, অনেকরূপতা ও কার্য্যরূপতার খোলস পৃথক হইয়া যায় এবং পরিশেষে তাহা তাহার নিজস্ব একরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। শব্দের যাহা নিজ স্বরূপ তাহাই স্ফোট নামে অভিহিত হয়। যাহা হইতে প্রত্যেক শব্দ স্ফুটিত অর্থাৎ বিকসিত হয় তাহাই স্ফোট। প্রত্যেক দ্রব্যের প্রতি সূক্ষ্ম অবয়ব পরমাণু যেমন আধার রূপে দ্রব্যেই অবস্থিত আছে কিন্তু দৃষ্টি গোচর হয় না সেই রূপ শব্দের সূক্ষ্মরূপ স্ফোটও প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও প্রতীতির বিষয় হয় না। এই সূক্ষ্ম শব্দ বা স্ফোট সমস্ত দৃশ্য বা অদৃশ্য প্রপঞ্চের উপাদান। প্রত্যেক উপাদানেরই স্বভাব এই যে তাহা কার্য্যের সহিত অন্বিত থাকে। মৃত্তিকা বাদ দিলে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না। সেইরূপ সমস্ত প্রপঞ্চের উপাদান স্ফোটও সমস্ত বস্তুতে অন্বিত। এই স্ফোটই শব্দ ব্রহ্ম। এই স্ফোট অথবা শব্দ ব্রহ্মে নিখিল জগৎ বিবর্তিত হইয়াছে। ইহা সকলেরই জানা আছে যে এই তত্ত্ব অনুসরণে ব্রাহ্মী শক্তি সরস্বতীর পূজা শব্দকে স্ফুট করিবার নিমিত্ত স্ফুট কড়াই অর্পণের বিধি আছে। বিবর্ত অবস্থায় যে বস্তু যাহার বিবর্ত তাহারও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। রজ্জুতে সর্পের অবভাস কালেও রজ্জুর স্বরূপ অবস্থার কোনরূপ বিকার ঘটে না। পরিণামে স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শব্দ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ বিবর্তিত

হওয়া হেতু শব্দ ব্রহ্ম অথবা স্ফোট সমস্ত জগতের উপাদান। উপাদান অর্থে অধিষ্ঠান। জাগতিক বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই। কেবল অনাদিকাল হইতে যে সূক্ষ্ম বাসনা ব্রহ্মে লীয়মান থাকে সেই বাসনাই অবিদ্যা। সেই অবিদ্যা প্রভাবে স্ফোট বা শব্দ ব্রহ্মই নানারূপে ভাসমান হয়। আদি ও অন্তে এই ব্রহ্ম একই রূপে থাকে। কেবল মধ্যে অন্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম যখন নিস্পন্দ থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মে স্বাভাবিক অতিসূক্ষ্ম যে স্পন্দন উঠে সেই স্পন্দনই ওঁকার আকারে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের সংকল্প বিকল্পময়ী এই স্পন্দন শক্তিই মায়া। এই মায়া ব্রহ্মকে যত রূপে বিভক্তিত করে, তত প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ রাশি অনন্ত। পরব্যোমে ব্রহ্মের আদি ক্রীড়াই ওঁকার। এই ওঁকার হইল ব্রহ্ম সাগরে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ মাত্র। নিস্পন্দ অবস্থায় উহা অব্যক্ত। শক্তির অভিব্যক্তি কালে প্রথমে যে প্রকাশ কুণ্ডলাকারে স্পন্দনের গতি হয় শক্তির পরবর্ত্তী গতিও ঠিক সেই রূপ।

কুণ্ডলিনী একই ভাবে কার্য্য করে। অর্থাৎ পরব্রহ্মে যে ভাবে ক্রিয়া করে অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতেও সেই ভাবে ক্রিয়া করে। এই স্পন্দশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই মূলাধারে ব্রহ্মময়ী মহামায়াই সমস্ত জগৎ বিবর্ত্ত। আরক তিলকে আছে—

"আনন্দময়ীং দেবীং শব্দব্রহ্ম স্বরূপিণীং।
ইতে সকল সম্পত্তে, জগৎ কারণ মহিকাং॥"

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে, লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম অবস্থিত। এই স্থানে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুই সূক্ষ্ম নাড়ী সংযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত। মূলাধার অবস্থিত এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে কুম্ভকের দ্বারা সহস্রারে উপনীত করিতে হয়। ব্যক্ত স্পন্দনশক্তি বা কুণ্ডলিনী মা কালী। সহস্রারে উপনীত হইবার সময় তাহার যাহা গতি তাহাই মা কালীর নৃত্য। সাধক নীলকণ্ঠ ইহারই অনুভূতি করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"শ্যামা মা নয় সামান্য মেয়ে
সে যে মূলাধারে সহস্রারে উঠেছে যেয়ে যেয়ে।"

যেমন ব্যক্ত স্পন্দশক্তি মা কালীর রূপ সেইরূপ অব্যক্ত স্পন্দশক্তি দুর্গার রূপ। শক্তি যখন অব্যক্ত তখন তাহা অবধারণ করা কঠিন বলিয়াই তিনি—"দুঃখেন গম্যতে (প্রাপ্যতে) যস্যাংসা দুর্গা।"

অতএব দেখা যায় যে এই ওঁকারই স্ফোট শব্দব্রহ্ম বা স্পন্দবাহী কুণ্ডলিনী শক্তি। সমস্ত বিশ্বই এই শব্দ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত।

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

"আত্মা বিবক্ষয়াপেরং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং লোকং তস্মাদূর্দ্ধপথে চরন্।
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধস্যোষাবির্ভাবয়তি ধ্বনিম্।
নাদোহভিসূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মস্ত পুষ্টোঃ পুষ্টস্ত কৃত্রিমঃ।
ইতি পঞ্চবিধা যন্তে পঞ্চ স্থানস্থিতঃ ক্রমাৎ।

আত্মা নিজেকে ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে প্রকাশ করিবার মানসে চিত্তকে প্রেরণ করে। চিত্ত দেহস্থ বহ্নিকে জাগ্রত করিবার জন্য বায়ুকে প্রেরণ করে। ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত সেই বায়ু ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধি ও শীর্ষস্থানে ধ্বনি আবির্ভূত হয়। সেই অতি সূক্ষ্ম ধ্বনি ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া কণ্ঠ দিয়া নাদরূপে প্রকাশ পায়। এই পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকার ক্রিয়া দ্বারা স্বর নির্গত হয়।

ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেহস্থ অনল দেহস্থ অনিলকে বিক্ষোভিত করা হেতু তাহা ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। অর্থাৎ দেহস্থ অগ্নি মূলাধারস্থ অপান বায়ুকে বিক্ষোভিত করা হেতু ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি, যাহাতে সমস্তর অবস্থিত, তাহা জাগরিত হইয়া ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধপথে আরোহণ করে। প্রশ্ন হইতে পারে ব্রহ্মগ্রন্থি কোথায় অবস্থিত?

সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

আধারাৎ বায়ুনাদূর্দ্ধং মেঢ্রনাভ্ত অঙ্গুলাদধঃ।
একাঙ্গুলং দেহ মধ্যে তপ্তজাম্বুনদ প্রভম্।
তত্রাস্তে অগ্নিশিখা তন্বী চক্রাৎ তস্মাৎ নবাঙ্গুলাৎ।
দেহস্থকন্দাৎ তৎ শোধ্যমাত্যাং চতুরঙ্গুলং॥
ব্রহ্মগ্রন্থিরিতি প্রোক্তা তস্ত নাম পুরাতনৈঃ।

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে এবং একাঙ্গুল দেহমধ্যে তপ্তজাম্বুর ন্যায় বর্ণ।

যেখানে নব অঙ্গুলি প্রমাণ চক্র অবস্থিত এবং সেই চক্রে অগ্নিশিখার ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ী অবস্থিত। দেহমূলে উচ্চতায় চতুরঙ্গুলি প্রমাণ ব্রহ্মগ্রন্থি অবস্থিত।

এই ব্রহ্মগ্রন্থিতে অবস্থিত নাদরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি উত্তপ্ত অপান বায়ুকর্তৃক বিক্ষোভিত হইয়া চক্র হইতে চক্রে উঠিতে থাকে এবং অবশেষে কণ্ঠ দিয়া স্বররূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকাশেরও একটা ক্রমিক রীতি আছে।

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

ব্যবহারে তথা ত্রেধা শ্রুতি র্মন্দ্রোত্তিষীয়তে।
কণ্ঠমধ্যে মূর্দ্ধ্নিভাব বিশুদ্ধ স্ত্রোত্তরোত্তর।"

ব্যবহারে তিন প্রকার—মন্দ্র স্থানে মন্দ্র, কণ্ঠে মধ্য ও মূর্দ্ধ্নি ভাব এবং তাহারা পরস্পরের বিশুদ্ধ মন্দ্র ও মধ্যের বিশুদ্ধ ভাব। আবার প্রত্যেক স্থানে সেই দ্বাবিংশ শ্রুতিও বর্ত্তমান। শাস্ত্র যথা—

প্রত্যেকং তত্ত্বঃ পুনঃ স্থানং দ্বাবিংশতি বিধং ভবেৎ।
তথা দ্বাবিংশতির্ভেদা শ্রবণাৎ শ্রুতয়ো মতাঃ।"

অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই তাহারা দ্বাবিংশ এবং তাহাদের দ্বাবিংশ ধ্বনি পার্থক্য উপলব্ধি শ্রবণযোগ্য বলিয়া তাহারা দ্বাবিংশ শ্রুতি। সকল স্বরের ঊর্দ্ধে দ্বাবিংশ নাড়ী সকলে অবস্থিত। শাস্ত্র যথা—

"স্বয়ূর্দ্ধনাড়ী সংলগ্না নাড়ন্যো দ্বাবিংশতির্মতাঃ।"

এই শ্রুতিসকলের বিভাগ পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বরসমূহ শ্রুতিতে কখন কিরূপ ভাবে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে স্বর কাহাকে বলে ও তাহাদের কি কি লক্ষণ সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

সঙ্গীত রত্নাকর বলেন—

"শ্রুত্যন্তরসমুৎপন্নস্নিগ্ধো অনুরণাত্মকঃ।
স্বয়মেব স্বতঃ শ্রাব্যঃ শ্রোতৃচিত্তানিমিত্তি তোষয়ন্ঃ।"

অর্থাৎ শ্রুতি সকলের অন্তে স্নিগ্ধ অনুরণনযুক্ত মধুর ধ্বনি যাহা শ্রোতৃমণ্ডলকে আপনা হইতেই মোহিত করে তাহাই স্বর।

শৃঙ্গাধর বলেন—

"স্বরং যো রাগতে রাগঃ স স্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মোহয়ি সন্ত ষড়জাদি ভেদতঃ।"

অর্থাৎ যাহা নিজে ধ্বনিকে রঞ্জিত করে তাহাই স্বর। তাহারা ষড়জাদি ভেদে সপ্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে শ্রুত্যন্তর যে স্নিগ্ধ অনুরণনযুক্ত ধ্বনি তাহাই স্বর। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে এই মাত্র বলা যায় যে pure tone with all its hermonics is স্বর। এবং এই শ্রুত্যন্তর যে প্রথম অনুরণনাত্মক ধ্বনি কণ্ঠ দিয়া নির্গত হয় তাহাই সঙ্গীতের প্রথম স্বর ষড়জ। এই ষড়জাদি স্বর সমূহের লক্ষণ যথা—

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

—ষড়জ—

যস্মাৎ অন্যাংশ্চ জনকঃ ষড়ভির্বাজ্যতে স্বরৈঃ।
যস্মিন্ ষড়্জাদয়ো জাতাস্তস্মাৎ ষড়জ ইতী স্মৃতঃ।
কণ্ঠোরস্তালুরসনা নাসিকা নাভিদেশকে চ।
ষট্সু স্থানেষু জাতত্বাৎ ষড়জঃ স্যাৎ প্রথমঃ স্বরঃ।

ছয়টী স্বরের জনক ও ছয়টী স্বর ইহা হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ অন্য জনক সমস্ত বিশিষ্ট হওয়া হেতু ইহাকে ষড়জ বলা হয়। ষড়জাদিস্বর সমূহ ইহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে ষড়জ বলা হয়। পুনরায় ষড়জ চালনা হেতু এই এই স্বর উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে ষড়জ বলা হয়। ষড়জ যথা—কণ্ঠ, উরস, তালু, রসনা নাসিকা ও নাভক।

ইহার রূপ যথা—

"ধরণ্যুঃ স্যাৎ চতুর্ভুজঃ পাণিভ্যামুপ্তলে ধৃতঃ।
বীণা শোভিত করযুগঃ কৃষ্ণবর্ণো রস প্রভঃ।
কুন্দং সুপর্ণমক্ষং জম্বুদ্বীপং ব্রহ্মা চ দৈবতং।
শৃঙ্গারস্তে রসে সেয়ো যুদ্ধগাত্রো ত্রু পাবকঃ।
ময়ূরো বাহনং তস্য স্বরান্নুকরণাৎ পুনঃ।"

ইনি ছয় মুখ বিশিষ্ট চতুর্হস্তযুক্ত। দুই হস্তে পৃথ্বী ধারণ করিয়া অবস্থিত এবং দুই হস্তে বীণা শোভিত। ইহার বরণ হইতে তামসিক রস নির্গত হইতেছে। জম্বুদ্বীপ অর্থে যেমনত্ব সুপর্ণমক্ষ অর্থে সুপ্রসিদ্ধি এবং ত্রু অর্থে পৃথিবী ও সা অর্থে গ্রহণ। অর্থাৎ ষড়জ স্বর মূলাধারে বিরাজিত কুণ্ডলিনী শক্তিতে শব্দ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত। ইহার দেবতা ব্রহ্মা। ইহা শৃঙ্গার রসে গেয় এবং পাবক ইহার গায়ক। ময়ূর বাহন হইয়া ইহার স্বর অনুকরণ করে।

শ্রুতি বিচারে দেখান হইয়াছে যে এই ষড়জ স্বর চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হইয়া ছন্দোবতী নামক চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত হেতু চতুর্থ নক্ষত্র রোহিণীর সহিত সমস্ত বস্তু রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা প্রজাপতি কমলজ। সুতরাং ষড়জ হইল ব্রহ্মদৈবত।

[ক্রমশঃ

সাপুড়ে

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

সাপেরই সঙ্গে ঘর করি সুখে
সাপেরে খেলাই রঙ্গে ;
মুগ্ধ নয়নে নৃত্য করি গো
সর্প জড়ায়ে অঙ্গে ;
হুঁসিত সর্প দর্প দেখায়
ফণা তুলে নানা ভঙ্গে।

(২)

ঝাঁপিতে ঝাঁপিতে কত না সর্প—
আমারই নিত্য সঙ্গী !
কুণ্ডলায়িত লীলায়িত তারা—
কত যে চঙের চঙী !
সবে পায় ভয় ; ভালো লাগে মোর
তা'দেরই কুটিল ভঙ্গি।

(৩)

ছোবল মারিতে ওস্তাদ তা'রা,
তোলে ফোঁস ফোঁস শব্দ।
সর্প-বশের বিদ্যা আমার
জানি না কিভাবে লব্ধ ;—
হাঘরের ঘরে তা'রা নাকি হয়
ভয়ে প্রেমে তাই জব্দ !

(৪)

দিন ভরানো চলে কোনো মতে
সাপ-খেলানোর পেশায় ;
মাথার উপরে অথই আকাশ,—
রঙে রঙ.কে যে মেশায় !
নানা জনপদে পথে কাটাই
না জানি কিসের নেশায় !

(৫)

বিদ্যুতান্বিত মেঘ-সম্ভারে
ভয়াতুর হ'লে সৃষ্টি,
ঝাঁপিয়া আসিলে ঝম্-ঝম্-করা
জলে থই-থই বৃষ্টি
কম্প তখনো হয় না কখনো
এ মোর সহজ দৃষ্টি।

(৬)

আমি জানি এই জলে পিছিল
পঙ্কিল যত পথে
সর্প সোহাগ করিবে আবার
রক্ত-রক্তের সঙ্গে।
ঝাঁপি সম্বল, তা-ই মোর বল ;
ভয় কী ছিন্ন অঙ্গে !

(৭)

সাপে পায় ভয় ভুবনে সবাই,
সাপুড়ের তা-ই বিত্ত ;
সর্প সঙ্গ মোরে যে করিছে
শুদ্ধ নিত্য নিত্য।
সকল সাপেরে ঝাঁপিতে ভরিতে
উৎসুকই থাকে চিত্ত ;—
সাপ-ধরা আর সাপ-খেলানো যে
সাপুড়েরই চির-কৃত্য।
ভবর ভবর সাপ ধরিলে কি
থামে সাপুড়ের নৃত্য ?
জীবন ভরিয়া চলেছি করিয়া
ভয়েরে পায়েরই ভৃত্য।

॥ চৈতালি ॥

শ্রীঅমিতা ঘোষাল

অনেকক্ষণ ধরে কথা হচ্ছিল—এপার ওপারের সমুদ্র পেরিয়ে যাবে বারদুই ক্রস্ কানেক্‌শন হলেও হৃদয়ের প্রাণ-খোলা আলাপনে ঘটলোনা কোন ব্যাঘাত। তার পর শেষ করবার আগে বড় করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে একজন আর এক জনকে—

আর মাত্র কটা দিন, তারপর আবার সেই জ্বালা ভরা গরমের যন্ত্রণা মনে হলে এখনি আমার মাথায় খুন চাপে যায়ে। • মনিবেরাতো বেশ থাকেন এয়ার কণ্ডিশনের পরেও আবার ইয়ারলি বার করেক লণ্ডন লিভ, গরমে হলিডে অন্ আটস অর্থাৎ হাজিরিং, লিমলা, মুসৌরী। এপার থেকে যাবা পড়লো, কিন্তু যা যাই হোক তবু আমার মনে হয় এই জ্বালাভরা শুষ্ক বরফের আশা যাওয়ার পালায় আছে এমন অনেক মাধুর্যঘন-সন্ধ্যা সকাল।. অনেকদিনের অনেক অনুভূতি জড়ানো স্মৃতি। যা গেছে হারিয়ে কিম্বা যা পারে হারিয়ে যেতে, দুইএর মধ্যেই সমান ব্যথা। কাজেই শীত গ্রীষ্মের প্রলয় আপাততঃ থাক, ঘুম পাচ্ছে, দুরাত জলসায় জেগেছি। তবু ওরা—

ওপার থেকে বললে—ওরা ঠকালো তোমাকে, পয়সা দিলেনা তাইতো? আগেই বলেছিলুম যেওনা, ওদের আমি চিনি হাড়ে হাড়ে, তুমি বোকা। শুনেছি তোমার বাজনা ভাল হয়েছিল বেশ।

তা হতে পারে—কিন্তু থাক, আর রাত করবোনা কাল তবে আর আফিসে পারবোনা হাজির হতে ঠকতে হবে সেখানে—কটা বা টাকা তা থেকেও বললে কী উপায় হবে বলো—।

এসব বেশ কিছুদিন আগের কথা. তারপর সত্যিই দেখতে দেখতে এসে গেছে কখন সেই জ্বালাভরা দিন। গলদঘর্ম হয়ে ছোটাছুটি, কি বিরক্তিকরই না দিনযাত্রা। নীলাভ ধূসর ভোরের আকাশ জলে জলে যখন তাম্রতপ্ত, ঠিক এমনি সময় সরকারী বেসরকারী সব অফিসের লাক-মাসে এক পরম মুহূর্ত নেমে আসে তার সাথে সাথে আসে নেমে ছোট্ট ছুটির মিছিল। অবশ্যই তারা কেরাণী টাইপিষ্ট ষ্টেনোগ্রাফার ইত্যাদি। পঞ্চাশ থেকে একশো পনেরোর মর্যাদা বোধ নিয়ে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ যারা। তারি মধ্যে চুলচেরা হিসেব করে তারা বিরাট এক মডার্ণ আর্টের ক্যানভাস তুলেছে ভরে রঙবেরঙের আশা, কামনা বাসনা—সংসার, সমাজ, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইত্যাদি আছে সবই। যতটুকু তারা দেখেছে বুঝেছে তেমনিই রঙের ছবি এঁকে চলেছে।

আজ আঙন চালা পথে পিচ গলে নরম হয়ে আছে। একের পর এক ঢেউএর মত এগিয়ে পিছিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ছুটির মিছিল অফিস পাড়ার পথে।

এ ধার ও ধারে গলির মুখে কার্নিশের গরম ছায়ার ছায়ার।

রঙবেরঙের নরম নধর পাকা ফলের ডিজাইন যেন বাঁধানো ফ্রেমে চাকা কাচের বাক্সের খোলা প্রদর্শনী, পথে পথে হাজার তৃষাতুর দর্শকের প্রাণের সাধনা যেন জমা। গরম হাওয়ার প্রচণ্ড উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে মধুর গ্রাণে পাগল পতঙ্গ দল। কিন্তু কি আশ্চর্য তবু এর মধ্যে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ধারা—সেই এপার ওপারের বিশাল সাগর পেরিয়ে আসা যুবক যুবতী। কাঁচা বয়সে কাছা-কাছি এগিয়ে কাছে থাকা অপরাধে নয়, তবু অনভ্যস্ত দৃষ্টির বিকৃত বিদ্রূপের চাপা চাপা বক্রোক্তি শোনা যায়। ঐ ম্যানিয়া কণী ভদ্রলোক বল্লেন—কি যুগে এসে দাঁড়িয়েছি মশাই মান সম্মান আর থাকে না। যত অনাসৃষ্টি এ যুগের ধর্ম্মো মশাই।

আসলে বহু যুগ ধরেই চলে আসছে অবশ্যই নতুন কিছু নয়—। ওদিকে তমাল কুঞ্জ হতে তপোবন পর্যন্ত বিগত যুগে যা ঘটে গেছে, আজকেও তারি রূপান্তর ঘটছে

মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য, এ যুগে এত অহরহ, পথে ঘাটে সাহিত্যে পটে সর্বত্র এই মানহানিকর ব্যাপার দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়েও এখনো মানে ঘা লাগে আমাদের,—এটা মোটেই সুবুদ্ধির লক্ষণ নয় কিন্তু। ওদিকে হাসতে হাসতে বিদায় নিলো আর এক ভদ্রলোকের। যেন বহুল লোক-গুলো একটু হাসি খুশি আমুদে হয়ে থাকে আর কারণে অকারণে টক্ করে নষ্টকে পড়ে 'থ্যাংকিউ ভেরি মাচ' হয়ে। 'আপনি ঘুরে দাঁড়ান না দাদা এদিকে।' ওদিকে ওরা কিন্তু ওসব ইসারা ইঙ্গিত বাক্যোক্তে ভ্রুক্ষেপ করলে না। বয়সের সহজ ধর্মের ইঙ্গিতে এগিয়ে গেছে আরো কাছা-কাছি। আর সেই সব কথাই হয়তো বলছে। তুমি আমি আরো অনেকে অনেকবার যা বলেছি কিম্বা বলবার চেষ্টা করেছি। এমনি এক ছোট্ট কর্ম বিরতির অমৃত প্রহরে মনের মানুষ যদি মনের কথা শুনতে চায়—অবশ্যই অপরাধ আইনের মধ্যে পড়বে না। চাইকি এখন অনেকের অকাল বসন্ত নেবে আসতে পারে কিছুকালের জন্য। ভুল হতে পারে অধিক, স্থান কাল লজ্জা ভয়, কিন্তু—থাক অন্যের কথা।

যুবক-যুবতী হাত ঘুরিয়ে বার বার ঘড়ি দেখছে আর গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে একে অন্যের মুখের দিকে। ঘুরিয়ে এলো দুটির ঘণ্টা। বিদায় বেলা এলো। কিছু খাওয়া হোলনা ওদের। তাড়াতাড়ি যেতে যেতে মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বল্লে যুবক—

বেরুতে দেরী কোর না যেন। মনে আছে কি বলেছিলে? আজ আমার চাই। যুবতী হাসলো মাথা নেড়ে অদ্ভুত সুন্দর হাসি। হয়তো মনে পড়েছে—, তারও আজ নিশ্চিন্ত হওয়ার মত কিছু একটা চাই যুবকের কাছ থেকে।

অফিস ফেরতি ব্যস্ত জনপথ, অবিশ্রান্ত জীবনের স্রোতের টানে বেরিয়ে পড়লো ওরা। মুহূর্তে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি ধরে রেখেছিল পথের দুপ্রান্তের মানুষ। মাঝখান দিয়ে পার হলো ওরা কাছাকাছি হয়ে। তার-পর হাত পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বসেছিল খুব ধরে পথের দিকে পিছু দিয়ে।

সন্ধে বেলাকুলি সন্ধ্যা নামছে ভিক্টোরিয়ার সৌধ ঘিরে। অগণিত গাড়ি থামছে এসে। ঝাড়োয়ারী পার্ক নাম হয়েছে ও দিকের মহদান, হাওয়ায় মনকে করা ঊর্ধ্বার গন্ধ আসছে।

যুবতী বললে—মাড়োয়ারীরা বাঙ্গালীদের চাইতে অনেক সুখী—

যুবক বল্লে—ভুল ধারণা তোমার, ওরা সুখে থাকতে চেষ্টা করে, আমরা তা করি না। এখনো আকাশের বুক চিরে টুকরো আগুন শিখা আসছে বেরিয়ে। অস্ত সূর্যের শেষ প্রলাপ শুনে শুনে গঙ্গার কোলের কাছে মড়ক লাগা গাছের মাথায় শঙ্খ চিলেরা ডানা ঝিমিয়ে বসে ঝিমোতে সুরু করেছে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলো দুজন শুকনো ঘাসের উপরে বসে।

একজনের প্লাষ্টিকের বাগ অন্যজনের সস্তা সান গ্লাস একসঙ্গে রাখলো দুজনে।

আবার সেই শুজনের পালা, হঠাৎ চমকে উঠে একটু সরে বসলো যুবতী তকাতে, দলাজভঙ্গিতে কামড়ে ধরলো ওষ্ঠাধর নিজের। মুহূর্ত মাত্র তবু আঘাতের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেন। ঝুরুকা হাওয়ায় হাল্কা আঁচল উড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো যুবকের বুকে মাথায়। ছন্দকরে বল্লে যুবক—

"দীর্ঘ আঘরণ থাক খসে থসে,
আমরা দুজনে যেন ঐ
বাতাসে খুশিতে ভরে রই,
তোমার আমার মধুপ্রেম
দূরে আকাশে লেখা থাক।

ক্রমশঃ স্তব্ধ নিথর হয়ে যায় যুবতী। করুণ বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো মুখে। তারপর ঝরে পড়তে লাগলো অঝোর অশ্রু, যুবক তাকিয়ে রইলো অন্যদিকে। এবার স্পষ্ট শোনা গেল যুবতীর অনুনয়—

—এই যদি তোমার ইচ্ছে এতদিন আমায় বলনি কেন, এখন—বলতো কি করি সবাই জানে তোমার সঙ্গে আমার—

কথা শেষ করবার আগে উঠে দাঁড়ালো যুবক।

আস্তে, চুপ করো চিনেবাদামওয়ালা আসছে, ছিঃ ছিঃ কি ভাবছে ওদিকের ওরা। কেন বুঝতে পারছনা-আমার বিয়ে করবার উপায় নেই। থাকলে অবশ্যই

করবুধ। সত্যটি—রাগ কোর না আমি তোমায় ভাল-বাসি।

এবার আরো স্পষ্ট-সেই সব কথা যা অনেকে অনেক বার—রলে বলে অনেক যুবতীকে সুখের মৌন থেকে নামিয়ে পথের তিথিরীতে রূপান্তরিত করেছে। প্রেমের মধু চন্দ্রিমা আর একশ পঞ্চাত্তরের পরিবারে বাস্তব সমস্যা একসঙ্গে ঘুর্ণিপাক খেয়ে বৌয়ের মুখুপী গড়তে থাকে।

বোধ হয় ঝড় আসছে। ভাল করে চোখ মুখ মুছে প্রস্তুত হলো যুবতী ফিরে চল্‌লো তারপর দুজন দুপাশ ফিরে। যেন কোন দুর্ঘটনায় ছিটকে পড়েছে দু-জন দু-প্রান্তে যেখান থেকে আর পৌঁছতে পারবে না দুজনে দুজনের কাছে। সেই মামুলী যুগের সাধারণ ব্যাপার—বাসর ঘর থেকেও এমন পরিস্থিতি হতে শোনা যায়। এক পক্ষের মান রাখতে অন্যের প্রাণ যায়, কিন্তু সহজে সমাধান নেই।

দৈনন্দিন জীবন-সমস্যার মুখে ভালবাসার পাতার ভেলা এক নিমেষে যায় তলিয়ে তারপর যে সেই অন্ধকার। অবশ্যই সাধারণ জীবনের কথা।

শীতের ভোরে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আজ শীতের ভোরে চুপটি ক'রে আছি শুয়ে মরার মতো,
এখন কল্পনা-জাল বোনা ছাড়া নেইকো কিছু করার মতো।
ছোট্ট গাঁয়ের মেঠো রাস্তা বেয়ে
ভোরের ভজন যায় কে গেয়ে;
পুবে সূর্য উঠে—ফুলগুলো সব হ'ল বেবাক্ করার মতো!

দেখি জানলা দিয়ে নারিকেলের শাখায় কাকের কুস্তমেলা,
আর সদ্যকোটা গাঁয়ের বুকে হরীন্ প্রজাপতির খেলা।
ক্রমে কর্ম—কোলাহলের সুরু,
আর বুকটা আমার দুরু দুরু;—
এবার উঠতে হবে, ছুটতে হবে নেইকো কথা বাড়বে বেলা।

অতোই করছি মনে উঠি উঠি—পড়ছি শুয়ে আবার ফিরে,
এই নিদ্-জাগানো নরম নেশায় শয্যা আমার জড়ায় কিরে।
তাই আজ মনে হয় দুধাই খাটা,
মিথ্যে এ সব ছোটা হাঁটা,
আহা কতোদিনের ক্লান্তি যেন ঘনায় নিবিড় অঙ্গ ঘিরে।

বলো কী কাজ উঠে। কী কাজ ছুটে!—এসব বড়োই বাড়াবাড়ি।
এখন শান্ত সুস্থ এই প্রকৃতি, নেই কো কোনোই তাড়াতাড়ি
এই হাতময়ী স্বামল ধরা
কেবল কাজের লোকেই রইবে ভরা?
হায় অলস কবির মনের বনে ফুটবে না ফুল কল্পনারি?

ঐ বনের বুকে ছায়ার মতো এমনি যদি শুয়েই থাকি,
হঠাৎ অচল হয়ে উঠবে বলো এই জগতের চাকা'টা কি?
এই মহির আলস মধুর প্রাতে
মন ভরেছে কী মৌতাতে!
ফুলের মালী—পাটের হাটে তারেও যেতে হবেই নাকি!

আহা। এইতো ভালো—সরস স্বাদু নরম আলস শীতের ভোরে!
এই লগনেই কাব্যলক্ষ্মী আসেন স্বয়ং মূর্তি ধ'রে।
তোরা আজ প্রভাতে তোল্‌রে আওয়াজ—
ধরায় কাজের লোকের আর নাহি কাজ;
যতো অ-কেজো সব স্বাপ্নিকেরাই জীবন যাপে মধুর ক'রে?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিউইয়র্কের অধিবাসীর জাতি, বর্ণ ও পেশা

যদি বিভিন্ন ইউরোপীয় বংশের লোকসংখ্যার মান নির্ণয় করা যায় তো দেখা যাবে ইতালিয়ান্ বংশের লোক রোমের চেয়ে এখানে বেশী, আইরিশ বংশের লোক ডাবলিন চেয়ে এখানে বেশী, অন্যদেশের তুলনায় এখানেই বেশী ইহুদী। সাদা চামড়ার লোক এখানে শতকরা ৭৩.০%ভাগ। সাদা চামড়ার মধ্যে ইতালিয়ান দশ লক্ষ, রাশিয়ান (যার অধিকাংশই ইহুদী) সাড়ে ন'লক্ষ, জার্মাণ ছ'লক্ষ, আইরিশ সাড়ে পাঁচ লক্ষ, পোলাণ্ডবাসী বাকী সাড়ে চার লক্ষ।

এখানের কেনা ও বেচাই হ'ল মুখ্য ব্যবসা। এখানের মূলধনের সুবিধে, কাঁচা মাল, বিশেষ যন্ত্রপাতির, ভৌগোলিক অবস্থিতি, বহুলোকের বিশেষ করে দক্ষ কারিগরদের সমাবেশ সব মিলে নিউইয়র্ককে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ত্রিশ বছর আগেও প্রায় ত্রিশ হাজার শিল্প সংস্থায় প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। সর্ব বৃহৎ শিল্প হ'ল পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি।

'নিউ ইয়র্কের বস্তি হার্লেম্' :

নিউইয়র্কের বিখ্যাত বস্তি অঞ্চল হ'ল হার্লেম্। এটা ম্যানহাটান দ্বীপের সেন্ট্রাল পার্ক থেকে শুরু ক'রে হারলেম্ নদী পর্যন্ত আর মর্নিংসাইড এভিন্যু থেকে ইষ্ট নদী পর্যন্ত। এখানে হাজার হাজার নিগ্রো, ইতালিয়ান ও পুয়োরোটিকাণ বসবাস করে। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে এটী স্থাপিত হয়। প্রায় দুশো বছর ধ'রে এই অঞ্চলটি একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে গ'ড়ে উঠেছে।

ম্যানহাটানের দক্ষিণ অঞ্চলে বহুতল আকাশ ছোঁওয়া বাড়ী তৈরি হওয়ায় বহু উদ্বাস্তু জনতা সস্তা ভাড়ার লোভে এখানে বসবাস শুরু করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বহু আফ্রিকান উপনিবেশীদের অভিযানে এটি পূর্ব নিগ্রো অঞ্চলে পরিণত হয়। এদের নিয়ে বহু সমাজ তাত্ত্বিক গবেষণা চলেছে। তবে এটুকু বলা দরকার যে হার্লেমের বস্তি হাওড়ার 'পিলখানা,'টিকে-পাড়ার বা জগদ্দলের ছেঁচা বেড়ার হেলানো বেয়াল ঘেওয়া খাপরার কুটো ছাওয়ালা ভিজে সোঁতসেতে ঘেরের বাড়ী নয়। সেখানের পরিবেশে ভাঙ্গাচোরা ভেন নেই; আর নেই ঘটঘটে চাপাকল, নেই ওঁচলা-স্তূপের মধ্য থেকে নেকড়া খোঁজার লোকের মহলা খেঁটে কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের ব্যস্ততা। নিউইয়র্কের 'হার্লেম্' তিনতলা বাড়ীর বস্তি, সেখানে মেরামতের অভাবে মলিন; যত্নের অভাবে নোংরা। ভারতের অনেক প্রাচীন জমিদার বাড়ীর বর্তমান দশার চেয়েও কিছু ভাল। বর্তমানে আবার নতুন বস্তি হ'ল 'স্পেনিশ হার্লেম্' যেটা সেন্ট্রাল পার্কের পূর্বে 96th ও 125th (street) স্ট্রীটের এর মাঝে গড়ে উঠেছে। যেখানে স্পেনিশ সিনেমা দেখানো হয়। রেস্তোরাঁয় স্পেনীয় কায়দায় রান্না হয়। শুধু স্পেনিশ জানার জন্য এরা সর্ব নিম্নমানের কাজ পায়। তাই সস্তায় থাকতে চায়, যার ফলে বাড়ী ঘরের মান কিছু কমে যায়।

ব্রডওয়ে :

ব্রডওয়ে ভাচ্ আমলের সেই প্রাচীন রাস্তা কিন্তু আজও নিউইয়র্কের দীর্ঘতম ও পৃথিবীর এক বিস্ময়কর সরণি।

ষ্টীভ বোল মাইল পথ ম্যানহাটান দ্বীপের দু'চোখো বুক থেকে বেরিয়ে আসিক কেন্দ্র Wade ষ্ট্রীটকে ছেদ ক'রে পৌরভবনগুলির পাশ দিয়ে Union Squareএর কাছ থেকে বেঁকে 'ফেডিনর কোয়ারে ডাইনে রেখে Fifth Avenue-কে ছেদ ক'রে বিখ্যাত 34th street-কে ভেদ করে চলিশের পাড়া পার হয়ে 42nd street এ হাজির। 42nd street থেকে 53rb street এর মাঝা ব্রডওয়ে হ'ল দুই মাইলে বসবল প্রেট হোয়াইট ওয়ে,যার খ্যাতি অনেকের উৎস ও অভিনয়ের কেন্দ্র হিসেবে। 53rd St. থেকে Central Park এর দক্ষিণ—পশ্চিম কোণে কলম্বাস সার্কেলে আসতে 'অ্যাটোমোবিল রো'কে ছেদ ক'রে এর হাঁকা তার কাউয়ে 70th ষ্ট্রীট থেকে ম্যানহাটান দ্বীপের সমাপ্তকাল রেখার চ'লে গেছে, যেখানে সারিবদ্ধি হোটেল, ডাক্তারখানা, রেস্তোরাঁ, আধুনিক নাগিতের দোকান, চিত্রগৃহ ও গির্জা। 114th ষ্ট্রীটের পর থেকে এর রূপ গেল বদলে যখন এটা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলেছে। আবার 155th street এ সংগ্রহশালার সমৃদ্ধির রেখা মিলবে। তারপর থেকে এই বিখ্যাত ব্রডওয়ে অর্ধেকের অকালের মধ্য দিয়ে মহানগরীর সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। প্রাচীনতম হর্ম্য এই ব্রডওয়ের উপর হ'ল St. paul's Chapel (১৭৬৬—১৭৬৯)। এই গির্জাটীর বিশেষ ঐতিহাসিক অবদান হ'ল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম প্রেসিডেন্ট হ'য়ে ওয়াল ষ্ট্রীটের Federale Hall থেকে বেরিয়ে পাত্রমিত্র নিয়ে এই গির্জাতে প্রথম বিশেষ প্রার্থনায় যোগদান করেন। আমাদের সংসারে যেমন কোন শুভ কাজে সিদ্ধি লাভ করলে ঠাকুরখানে গিয়ে পূজো দিয়ে আসতে হয় তেমনই এখানে বোধ হয় অধিষ্ঠানকালে তিনি এই গির্জাতেই প্রার্থনার জন্য যেতেন। যখন এখানে ব্রডওয়ের মার্কেলেরা ব্যবসাসূত্রে মহা ধনবান হ'তে লাগলেন, ব্রডওয়ের ওপর বড় বড় বাড়ী উঠতে লাগলো তখন এই ব্রডওয়ে হ'য়ে গেল অতি ভিক্ষের রাজ্য। ফলে এর প্রশস্ততার মান ও মর্যাদা ঘুচে গেল। সূর্যের মধ্য গগনে আসার আগে পর্যন্ত এখানে দীর্ঘ কলেবর অট্টালিকার সুদীর্ঘ ছায়ায় এর পথ ছায়াময় থাকে। দুপুরের সময় কী ধাক্কা-ধাক্কিই না চলে। বেপে যাও, ছুটে যাও, নইলে ভিড়ের চাপে মারা পড়বে। দাঁড়াবার কারো অবকাশ নাই নাই নাই নাই, সময় যে নাই। সময়ের স্রোতে বেগে অবিরাম বেয়ে চলেছে অগণিত মানুষের শির। সেদিন প্রদীপ্ত বাগচীর সঙ্গে ওদের ওখানে রাতের আহার সেরে যখন টাইমস্ স্কোয়ারে এলাম তখন প্রায় রাত প্রায় বারোটা। তবুও সেখানে ভিড়ের অন্ত নেই। প্রদীপ্ত আলোর উজ্জ্বল এই টাইমস্ স্কোয়ার। রঙ্গজগতের নাভিকেন্দ্র এই টাইমস্ স্কোয়ার। সংবাদ জগতের মহা উৎস TIMES SQUARE-এর পশ্চিমেই অভিনয় ও সিনেমার জগতের রাজা।

ম্যানহাটান থেকে East নদী পার হ'য়ে ব্রুকলীনে যাবার জন্য রয়েছে East Lexington Avenue Subway, 6th Avenue Subway, 14th St Eastern Subway, Queens Midtown tunnel, Queensboro Subway ও ব্রুকলীন সেতু, ম্যানহাটান সেতু, উইলিয়ামস্ বার্গ সেতু ও কুইনসবরো সেতু। বচেষ্টার বা ষ্ট্যাটেন দ্বীপকে ম্যানহাটানের সঙ্গে যোগ করেছে ব্রুকলীনের মধ্য দিয়ে Verragano Narrows সেতু। নিউজার্সির মধ্য দিয়েও বচেষ্টার যাওয়া যায়। জর্জ ওয়াশিংটন সেতু দিয়ে অথবা লিংকন কি হল্যাণ্ড টানেল দিয়ে হাডসন নদী পার হয়ে এসে পরে 'বেয়নী সেতু' দিয়ে পার হ'লেও 'বচেষ্টারে' যাওয়া যায়।

হার্লেম নদী পার হলেই ব্রংক্স। বহু সেতু দিয়ে সংযুক্ত, তার মধ্যে হেনরী হাডসন সেতুই প্রধান। এখানের ফোর্ডহাম (FORDHAM) বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রংক্সের পশুশালাই সুবিখ্যাত। এই চিড়িয়াখানায় 'বেওয়া' থেকে সাহা বাঘ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১০০ একর অর্থাৎ এক বর্গমাইলেরও বেশী জমির উপর এই চিড়িয়াখানা স্থাপিত। চিড়িয়াখানার দরজা থেকে ছোট ছোট চাকা দেওয়া ব্যাটারী দিয়ে চালিত মোটরে ক'রে একসঙ্গে বহুযাত্রী নিয়ে বাঘ ভালুক হাতীশালার কাছে হাজির ক'রে দেয়। এর জন্যও মূল্যও নেয় কিছু। এটী সকাল ৯টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে। লোম ও বৃহস্পতিবার মাথাপিছু ২৫ সেন্ট ও শিশুদের জন্য ১৫ সেন্ট প্রবেশমূল্য নেওয়া হয়। অন্যদিন পয়সা লাগে না। এটী নাকি আমেরিকার সর্ববৃহৎ চিড়িয়াখানা। পশুবিজ্ঞানের বহু

গবেষণাও এখানে হয়। গবেষণার সুব্যবস্থা এখানে রয়েছে। ঐ দালা বাড়ের উপর নানা প্রজনন ফলের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে।

ম্যানহাটান দ্বীপটী সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দ্বীপ। কত কোটী কোটী ডলার ঢেলে কত না আকাশচুম্বী বাড়ী রয়েছে। ক্রাইসলার করপোরেশনের বাড়ী (৭৭তলা) প্যানামের বাড়ী (৫৯), রকীফেলার সেন্টার (১০) (তার মধ্যে রেডিও সিটী, মিউজিক হল) Woolsworth এর বাড়ী (৬০), ম্যানহাটান ব্যাঙ্ক (৭১) চেস্ ম্যানহাটান ব্যাঙ্ক (৬০)। New York Times-এর বাড়ীতে চলন্ত আলোর লেখায় অবিরাম সংবাদ পরিবেশন চলে Time Square-এ। এখানের United Nations এর খাড়া দেশলাইয়ের খোলের মত বাড়ীটার প্রতিবিম্বেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটী সারা বিশ্বের দেশবাসীর অর্থে নির্মিত হয়েছে তবে সবচেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করেছে মার্কিন রাজ্য। তাই সব দেশবাসীরই এতে দাবী রয়েছে।

১৯৬৪ সালের ২২শে এপ্রিল থেকে ১৮ই অক্টোবর নিউইয়র্কে বিশ্বমেলা বসে। এটী Flushing এর এক বর্গমাইল বিস্তৃত ভূমিতে স্থাপিত হয়। এর বৈশিষ্ট্য ছিল Man's achievement in an Expanding Univevrse।

এর মধ্যে Peace through Understanding ছিল এর মুখ্য বক্তব্য।

বাগচীর বাসায় :—

আমরা দুজনে সামান্য কেনাকাটা পথে সেরে Tube এ ক'রে বাগচীদের বাড়ী রাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। মিনিট কয়েক হাঁটার পর আমরা তার এপার্টমেন্ট বাড়ীতে এসে গেলাম। বাইরে থেকে তার এপার্টমেন্টের কলিংবেলটী টিপতেই শ্রীমতী কবি বাগচী ওপর থেকেই প্রশ্ন করলেন—'কে'?

বাগচী সাহেব উত্তর দিল—'আমরা'। নীচে ও উপরে মাইক্রোফোন মারফত কথা শোনা ও বলা বোঝা যায়। তিনি ওপর থেকেই সুইচ টিপে লোকার বড় সদর দরজা খুলে দিলেন। আমরা দুজনে ঢুকতেই সেট আপনিই বন্ধ হ'য়ে গেল। যান্ত্রিক লিফ্‌টে চ'ড়ে আমরা যথাস্থানের বারান্দায় পৌঁছে গেলাম। তাঁর এপার্টমেন্টের দরজায় গিয়ে বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলেন। দুজনে নমস্কার বিনিময় হবার পর আমাদের হাসিমুখে নিয়ে গেলেন কবি বেণী। শ্রীমতী বাগচী উত্তর প্রদেশের কনভেন্টে পড়া শিক্ষিতা, সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না ও আতিথেয়তায় পূর্ণা মেয়ে। এখানে স্বামীর সঙ্গে ছাড়া সব সময় ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলেন। তাঁদের তিন চার বছরের অতি মিষ্টি মেয়েটীকে ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। নানা বিষয়ে পারদর্শিনী হলেও তিনি রন্ধন সম্বন্ধে অসামান্যতায় কিছুটা সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন। নিজের রান্না নিজের ভালই লাগে এমন কি পোড়া দুটো পর্যন্তও। কিন্তু বাইরের লোকের মুখের সুখ্যাতিই যে তাঁদের কাছে মূল্যবান একথা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের বহু পদ আমিষ ও নিরামিষ রান্না রন্ধন বিষয়ে বহুদিনের খ্যাতি। রান্না রন্ধনের সংখ্যায় সারা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যেতে এঁরা, কি ফরাসী, কি মেক্সিকান রান্না, যাইহ'ক না কেন। আমার এখানে থাকার সময়ে অনেকখানি তাঁর সময় রন্ধনশালায় কাটলো। সেই মেয়েটী আমার কোলে এসে বসলো। ওদের তোলা নানান ধরনের ছবি ওঁরা আমায় দেখতে দিলেন। বাগচী সাহেব যখন নিউ-অরলিনসে তখন শ্রীমতী গিয়েছিলেন মন্ট্রিয়ালে তাঁর এক আত্মীয়ার বাড়ী। মন্ট্রিয়ালের কাহিনী আলাপ প্রসঙ্গে জানলাম। সামান্য অবাধ্যতার জন্য ছোটমেয়েকে তিনি ইংরেজীতেই বকছেন।

রাত দশটা নাগাদ আমরা নৈশভোজে বসলাম। ওঁর মনে একটু যেন অস্বস্তি রয়েছে তা' তিনি প্রকাশ না করলেও তাঁর সতর্ক জড়তায় আমার কাছে অপ্রকাশিত ছিল না। মেয়েরা রন্ধন বিষয়ে নিন্দাস্তুতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। উত্তরপ্রদেশের বাঙালী মেয়েদের রান্নার ধরণ বাংলাদেশের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানে ভাল রোটীই ও গোস্ত হ'ল মুখ্য খাদ্য। উনি রেঁধেছিলেন পোলাও, মুরগী, আলুর দম, চাটনী প্রভৃতি। সত্যিই তিনি অতি ভাল রেঁধেছিলেন। তাঁর দুএকটী প্রশংসা করতে তাঁর মনের অস্বস্তির কাঁটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। তাঁর আড়ষ্টতার বাধা দূর হ'তে তিনি বিশেষ আন্তরিকতায় অভিভূত করলেন। আহারে বসে সেরে সামনের সোফায় বসতে তিনি এসে পাশে বসলেন ও আমায় প্রশ্ন করলেন

—আপনার কটী ছেলেমেয়ে।

কবী দেবী, প্রশ্নটা একটু বিসদৃশ করেছেন। অপরিচিতা মার্কিন মহিলা হ'লে তিনটা মৌখিক আলাপের পর এই প্রশ্নটা করতেন। ইংরেজ হ'লে করতো না। গতকাল বিমানে আসার সময় আমার পাশে-বসা মেয়েটি বললো সে নার্সিং শিখতে যাচ্ছে ওয়াশিংটনে। তার বাপ মা এসেছিল তাকে তুলে দিতে, আর তার দুই ভাই। সেখানে এক বছর অন্ততঃ থাকতে হবে। এমনি হাবিজাবী কত কি কথা কইছিল। তারপরই প্রশ্ন করলো 'তোমার কটী ছেলেমেয়ে?' আমি তাকে বললাম—একটী। তবে তোমার এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অবান্তর কেননা সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে কুমারী মেয়েদের বড় একটা কৌতূহল থাকে না তুমি কিন্তু তার ব্যতিক্রম।

পূর্বিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে যা দেখেছি তাতে তোমায় বলতে পারি নার্সিং-জানা মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। কেননা তারা তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততিদের ভাল ক'রে মানুষ করতে জানে।' সে তখন মৃদু মৃদু হেসে বলে—'হয়তো বা তাই'। শ্রীমতী বাগচীকে আমার পুত্রের কথা বললাম। তখন আর ঘরোয়া কথার অন্ত নেই। তিনি খাইয়ে শুধু ক্ষান্ত হননি। তিনি আমাকে একটী প্লাস্টীকের ছোট গিটার উপহার দিলেন। সেটার বুকে যে মাপবার ফিতে গুটোনো আছে তা' আমার চোখে তখন পড়েনি। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা দুজন রাত এগারোটা নাগাদ চললাম হোটেলে ফিরে। সেই টিউবে ক'রে চলেছি Time Squareএ। এই সুড়ঙ্গ-পথ কিছুটা মাটীর উপর আকাশে, কিছুটা মাটির উপর, আবার কিছুটা মাটীর নীচে ও জলের নীচ দিয়ে চলে গেছে। এখানে অতি দ্রুতগতিতে চলে এই ট্রেন। Time Square এ এসে দেখি বেজায় ভিড়। এখান থেকে একটু পায়ে হেঁটে চলে এলাম Tudor হোটেলে, Time Square এর রাস্তা 42nd St-এর উপর।

সময়ের অভাবে আমার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ, বহুদিনের পরিচিত স্বামী নিখিলানন্দের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে উঠতে পারলাম না। মনে অত্যন্ত ক্ষোভ রয়ে গেল। উনি ভারতবর্ষে যখন এসেছিলেন সুযোগমত সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি কিন্তু বিশ বছর আগে আমি যখন নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম তখন তিনি তাঁর আশ্রমে সোনামুগের ডাল, ভাত, বড়িভাজা প্রভৃতি খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন —সে কথা আজও আমার স্মরণে আছে। উনি ছিলেন প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে অধ্যাপক মণি মুখার্জির সহাধ্যায়ী।

সারাদিন Air coolir চালিয়ে রাত্রে ঘরটী শোবার উপযোগী ঠাণ্ডা হয়েছিল। রাত্রের নিদ্রা সেরে জিনিষপত্র গুছিয়ে তৈরি হতেই Ross আমার বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে গাড়ী নিয়ে হাজির। না হ'লে মহামুস্কিল হত। কেননা আজ আবার এখানের ট্যাক্সিওয়ালাদের ধর্মঘট।

নিউ ইয়র্কের সেতু :—

নিউইয়র্কের মূল কর্মকেন্দ্র হ'ল ম্যানহাটান দ্বীপ। এই দ্বীপের উত্তরে ও উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে হারলেম নদী, পশ্চিমের হাডসন নদী ও পূবের ইষ্ট নদীর সংগে সংযোগ স্থাপন করছে। হারলেম নদী পার হওয়া নিম্নের সেতু দিয়ে সম্ভব।

১। হেনরী হাডসন সেতু—যার উত্তরে ৮০০ ফিট, নির্মাণ কাল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে।

২। ২২৫নং রাস্তার সেতু,

৩। ২০৭ নং রাস্তার সেতু,

৪। জর্জ ওয়াশিংটন সেতু, (উত্তার ৩৫০০ ফীট ৬ ইঞ্চি ; সুরু ১৮২৬ শেষ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

৫। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন সেতু,

উপরের দুটী সেতু জর্জ ওয়াশিংটন এক্সপ্রেসওয়ে ও ক্রস্ ব্রংক্স এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

৬। হাই সেতু,

৭। ম্যাক ড্যাম সেতু,

৮। ১৪৪ নং রাস্তার সেতু,

৯। মেডিসন সেতু,

১০। থার্ড এভিন্যুর সেতু,

১১। উইলিস এভিন্যু সেতু,

ইষ্ট নদী যেখানে সুরু সেখানে কুইনস্ অঞ্চলে আসার আগে ছোট ছোট দুটী দ্বীপ আছে। তাদের নাম হ'ল র‍্যাণ্ডেল দ্বীপ ও ওয়ার্ড দ্বীপ। র‍্যাণ্ডেল দ্বীপের সঙ্গে ম্যানহাটান যুক্ত হয়েছে।

১২। ১২৫ নং রাস্তার সেতু দিয়ে।

তার ওয়ার্ড দ্বীপের ম্যানহাটানের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই কিন্তু কুইনস্ অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে নীচের দুটি সেতু দিয়ে।

১৩। ট্রাইবারো সেতু—যার উত্তার ১৩৮০′ ফিট নির্মাণ কাল ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১৪। হেলগেট সেতু উত্তার ১০১৬ ফিট, নির্মাণ-কাল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ইষ্ট নদী বেশ প্রশস্ত, হারলেম নদীর মত সংকীর্ণ নয়। কুইনস্ অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে ওয়েলফেয়ার (Welfare) দ্বীপের মাধ্যমে।

১৫। কুইনস্ বরো সেতু—যার উত্তার ১১৮২ ফিট (১৯০৯)

ইষ্ট নদীতে আরো তিনটী দীর্ঘ সেতু রয়েছে; তারা হ'ল :

১৬। উইলিয়ামস্ বার্গ সেতু—যার উত্তার ১৬০০′ (১৯০৩)

১৭। ম্যানহাটান্ সেতু—যার উত্তার ১৪৭০′(১৯১০)

১৮। ব্রুকলীন্ সেতু—যার উত্তার ১৫৯৫½′(১৮৮৩)

যেখানে হাডসন্ ও ইষ্টনদী 'আপার' উপসাগরে মিসলো সেখান থেকে হুডসন নদীর উত্তর পারেই নিউইয়র্কের বন্দর ও জাহাজ দাঁড়াবার জেটী। তাই দীর্ঘ বার মাইল নদী পথে কোন সেতু নেই। আছে দুটি সুড়ঙ্গ পথ।

(১) হল্যাণ্ড সুড়ঙ্গ

(২) লিংকণ সুড়ঙ্গ

ইষ্ট নদী যেখানে সবচেয়ে বেশী চওড়া সেখানে সেতু না করে 'কুইনস্' মিডটাউনে সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছে হাডসন নদীর মোহনা থেকে প্রায় বার মাইল। উত্তর পূর্ব্বে

১৯। জর্জওয়াশিংটন সেতু—উত্তার ৩৫০০ ১৯০১′)।

হাডসন নদীর অপর পারে নিউ জার্সি রাষ্ট্র। নিউ জার্সি রাষ্ট্র থেকে ম্যিকমণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে দুটি সেতু :

২০। বেয়নী সেতু—

২১। গোয়েথাল্ সেতু

আপার উপসাগরের দক্ষিণে ব্রুকলীন অঞ্চল ও ম্যিকমণ্ড অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য সদুরগামী জাহাজ চলাচলের যথেষ্ট অবকাশ রেখে একটি উঁচু সেতু নির্ম্মিত হয়। সেটির নাম হ'ল :—

২২। ভেরা জানো নেরোস্—সেতু—(VERRAZANO NARROWS)

এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম ঝুলন সেতু যার উত্তার ৪২৬০ ফীট (১৯৬৪)

তাছাড়া জাহাজদিয়ে পারাপারের বহু ব্যবস্থা রয়েছে।

সুড়ঙ্গ পথে যে রেল চলাচল করে তার জন্যও অনেকগুলো সুড়ঙ্গ পথ আছে। দ্বীপের মাঝে সুড়ঙ্গগুলো দুই এমন কি তিন তলা পর্যন্ত রয়েছে। তাতে নানা তলায় নানা কোম্পানীর রেলষ্টেশন রয়েছে। সবচেয়ে বহুতল পাতাল ষ্টেশন হ'ল TIMES SQUARE এ। এখান থেকে IRT Line চারদিকে ও BMT line দুদিকে গেছে। হারলেম নদীর তলা দিয়ে IRTর চারটী সুড়ঙ্গ ও INDর একটী সুড়ঙ্গ পথ আছে। ইষ্ট (EAST) নদীর তলা দিয়ে ১৩টী সুড়ঙ্গ পথ আছে, তার মধ্যে IRTর তিনটী, BMT সাতটী ও INDর তিনটী সুড়ঙ্গ পথ।

এখানের মোট সুড়ঙ্গ পথের দৈর্ঘ্য ২০৭ মাইল। এখানে ৪৮২টী ষ্টেশন আছে ও দিনে হাজার হাজার যাত্রী বহন করে। একবার ষ্টেশনে ঢোকার পরে একই ভাড়ায় আধমাইলও যাওয়া যেতে পারে অথবা ২৭ মাইলও যাওয়া যেতে পারে। অর্থব্যয় সেই একই। টিকিট কিনতে হয় না। শুধু লোকারে মুদ্রা ফেলে ঢুকলেই হল। মুদ্রা না ফেলে ঘোরানো গেট ঠেললেও খুলবে না।

নিউইয়র্কের শিক্ষা ব্যবস্থা :

নিউইয়র্কের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হল কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় পলাশী যুদ্ধের তিন বছর আগে—১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার আগে বিগত মহা-যুদ্ধের সর্বোচ্চ সম্মানীয় সর্বাধিনায়কের পদ থেকে অবকাশ নিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হন। এখানের ছাত্র সংখ্যা হ'ল ১৭,৩১১ ও অধ্যাপকের সংখ্যা হল ৩৯১১ এখানে এনডাউমেণ্ট (ENDOWMENT) করা আছে ১৩, ১, ০০০, ০০০ ডলারের। লাইব্রেরির বাঁধানো বইয়ের সংখ্যা ৩, ৬৭৬, ০০০।

তাছাড়া এখানে আছে—

২। জোভেহাব বিশ্ববিদ্যালয়
৩। সং আইল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়
৪। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়
৫। সেণ্ট জনস্ বিশ্ববিদ্যালয়
৬। ইসিভা বিশ্ববিদ্যালয়

তাছাড়া বহু বিভিন্ন বিষয়ের বহু কলেজও রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হ'ল :—

১। বার্ণার্ড কলেজ
২। ব্রুকলীন কলেজ
৩। কলেজ অব দি সিটি অব নিউইয়র্ক
৪। মাউণ্ট সেণ্ট ভিনসেণ্ট কলেজ
৫। হাণ্টার কলেজ
৬। জুইস্ থিয়োলজিক্যাল সেমিনারী অব আমেরিকা
৭। জুলিয়ার্ড স্কুল অব মিউজিক
৮। ম্যানহাটান কলেজ
৯। মেরিটাইম কলেজ
১০। নিউ স্কুল ফর সোসাল রিসার্চ
১১। পেশ কলেজ
১২। প্র্যাট ইনষ্টিটিউট
১৩। কুইনস্ কলেজ
১৪। সেণ্ট জোসেফস্ কলেজ
১৫। ওয়াগনার কলেজ
১৬। ইউনিয়ন থিয়োলজিক্যাল সেমিনারী

আগামী বারে 'নিউইয়র্ক' সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলব। [ক্রমশঃ

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ

৩৬ শ্লোক

উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ
যুক্তির দ্বারা উৎপন্ন যে হয় এই নিশ্চয়
শাস্ত্রের মাঝে গুণী জ্ঞানী জন জেন এই কথা কয়
অনাদি যে হয় এই সংসার
সৃষ্টি প্রলয় হয় বার বার
পূর্ব জন্মে যে জীব যা করে সেই মত গতি হয়
বলি করজোড়ে কহে হরিনাথ জীবে শিব জ্ঞান বয়

২।১।৩৭

সর্ব ধর্মোপপত্তেশ্চ

কন শঙ্কর সব ধর্মের উৎপত্তি যে হয়
ঈশ্বর সেই জগৎ কারণ উপাদান নিশ্চয়
সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তি
রবে সেইজন অভিতে যুক্তি
তাঁহারি চরণ কমলে শরণ অন্য উপায় নাই
হরিময় হোক সকল জীবন দুখীরে জানিও ভাই

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

প্রথম শ্লোক

রচনানুপপত্তেশ্চ

জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না বলিয়া একথা কয়
ন অনুমানম, অর্থে প্রভৃতি জগত কারণ নয়
শঙ্কর কন কপিল বলেছে
সাংখ্য দর্শনেতে এই কথা আছে
তবু ভেবে দেখো কুম্ভোর না হলে কুম্ভ কিকরে হয়
অচেতন যাহা প্রাণ ব্যতিরেকে রূপ কি সে লভয়।

২।২।২

প্রবৃত্তেশ্চ

গঠনের আগে মননের মাঝে মূরতি মূর্ত হয়
অচেতন প্রকৃতির মাঝেতে তাহাত সম্ভব কভু নয়,
ঈশ্বর নিজ মানসের দ্বারা
গড়েছেন এই জগতের ধারা
তাঁহারি রচনা রবি শশি তারা সমুদ্র কল্লোল
সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাই রাজে নাহি এতে কিছু গোল।

[ক্রমশঃ

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছয়

আর্ডেন হোটেলে দীর্ঘকালের বাসিন্দাদের বেশীর ভাগ যদও ভারতীয়, পাকিস্তানী, তাহলেও বেশ কিছু ব্রিটিশ ও টুরিষ্ট ইয়োরোপীয়ান, আমেরিকান নরনারী সেখানে থাকতেন, বেড়াতে আসতেন।

শঙ্করের ঘরের সামনে, হেম দত্তর ঘরের পাশে ম্যাকডোনাল্ড বলে একজন স্কটিশ ছেলে দিন করেক হল থাকবার জন্যে এল।

ছেলেটার মাথার একটু গণ্ডগোল ছিল। ওখানে কি একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করত' আর সন্ধ্যে ছটা বাজলেই সে তার রেকর্ড প্লেয়ারটা চালিয়ে গান শুনত। বেশীর ভাগই পপ সং। মাঝে মাঝে আবার নিজেই হেঁড়ে গলায় গান গাইত।

প্রথম কয়েকদিন সহ্য হল। শঙ্কর হেম দুজনেই ভেবেছিল দু'দিন বাদে সে চলে যাবে। কিন্তু মাস খানেক কেটে গেল সে আর আর্ডেন হোটেল ছেড়ে নড়েনা।

কিছু বলাও যায় না। তারতো আর পড়াশুনোর ঝামেলা নেই। নিজের ঘরে বসে গান শুনছে। রাত এগারটা বাজলে না হয় বলা যায়-মশাই আর আওয়াজ করবেন না। এগারটার পরে প্রতিবেশীকে ডিসটার্ব করাটা বে-আইনী।

মুস্কিল হচ্ছে সন্ধ্যে ছটা সাতটার সময়েই তারা পড়তে বসত কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের রেকর্ড প্লেয়ারের আওয়াজ শুধু যে তাদের পড়াশুনোরই বারোটা বাজাত তা নয়, তাদের কানও ঝালাপালা হয়ে যেত।

একদিন ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে এক আইরিশ দম্পতীর এ নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। তাঁরা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে আয়র্ল্যাণ্ড থেকে এডিন বরায় এসেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁরা যখন নিস্তব্ধ কূজন সুরু করেছেন তখনই ম্যাকডোনাল্ডের হেঁড়ে গলায় গান আরম্ভ হয় "আই অ্যাম এ প্রি—হিস্টোরিক ম্যা—ন ; মাই নেম ইজ নিল—টার জ—ও—ন"। ম্যাকডোনাল্ড বলত স্কটল্যাণ্ডে ওসব চাপাকি চলবে না। আমি গান গাইবই।

শেষপর্যন্ত হেম দত্ত একদিন আর না পেরে বলল, দাঁড়াও, আমি ম্যাকডোনাল্ডকে জব্দ করবই।

একদিন হেম দত্ত কোথেকে একটা টেপ রেকর্ডার আর গোটাকয়েক রেকর্ড নিয়ে এল। সন্ধ্যেবেলায় ম্যাকডোনাল্ড যখন যথারীতি গান সুরু করেছে তখন সে চালিয়ে দিল তার রেকর্ড-গুলো এক এক করে।

"শিং নো ইউ ক্যান নেম ইট সিংহ
ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব"

সেটা শেষ হতে না হতেই 'সারে লাপপা, লারে লাপপা" শেষ করে হেম দত্ত যখন জনি-ওয়াকারের "ঘাবড়াও কাহে অরমাও কাহে—ওমেরে রাজা। আ যা—আয়—আ য়" সুরু করেছে তখন ম্যাকডোনাল্ড এসে দরজায় নক করতে লাগল।

হেম তৈরী হয়েই ছিল। সে দরজা খুলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। ম্যাকডোনাল্ড চটে-মটে বলল এখানে সব ভদ্রলোকদের আস্তানা। ওরকম স্কাউণ্ড্রেল রেকর্ড তোমরা বাজাবে না। আমার কানের পর্দা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

হেম দত্ত চটল না। উপরন্তু একগাল হেসে

বলল আরে রেকর্ডের কথা পরে হবে, এস মিঃম্যাক্ ডোনাল্ড ; ইণ্ডিয়ান সুইট মিট খাবে এস। দেশ থেকে সবে এসেছে। বলে সে ম্যাকডোনাল্ডকে এক প্লেট চানাচুর খেতে দিল।

ভদ্রতার খাতিরে ম্যাকডোনাল্ড দু এক চামচ চানাচুর মুখে দিল। খেয়ে তার একটু ভাল লাগল। তারপরে আরও এক চামচ। করতে করতে সে পুরো প্লেটটাই শেষ করে ফেলল।

চানাচুরটা হেম দত্ত স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বম্বের দোকান থেকে করিয়েছিল। খাবার পরেই ম্যাকডোনাল্ডের গলা জ্বলতে আরম্ভ করল।

ওয়াটার—ওয়াটার। ইট ইজ টেরিবল হট —বলতে বলতে ম্যাকডোনাল্ড নিজের ঘরের দিকে ছুটল। সে রাত্তিরে সাপারের টেবিলে আর সে এল না। হেম দত্তের চানাচুর হজম করতে তার পুরো দুদিন লেগেছিল। বলাবাহুল্য তারপর আর কোন দিনই সে গলা ছেড়ে গান গায় নি, রেকর্ড প্লেয়ারও বাজায় নি।

পরে শঙ্কর শুনেছিল ম্যাকডোনাল্ড আর্ডেন হোটেল ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায় গেছে।

বার-বিকিউয়ে সেদিন সকাল সকাল গিয়ে শঙ্কর পৌঁছল। লোকের অনেক দেরী। তাকে আজ একবার সার্জনস হলে যেতে হবে। ক্লিনিক্যাল এটাচমেন্টের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে।

গিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চক্কোত্তি মশাই এসে হাজির হলেন। উপাধ্যায়ও কিছুক্ষণ বাদে। এক রাউণ্ড কফি নিয়ে সবাই বসল।

কিছুক্ষণ বাদে উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে, শুকনো মুখে আর একজন ছেলে সেখানে হাজির হল। ইণ্ডিয়ান দেখে চক্কোত্তি মশায় ডেকে তাকে ডেকে নিয়ে এলেন।

সে মাদ্রাজের লোক। মিঃ ভূতলিঙ্গম্। ইকনমিকসের ছাত্র। নতুন এডিনবরায় এসেছেন। কয়েকটা বাড়ীর খোঁজ করেছে থাকবার জন্যে। যেখানেই যায় তাকে বলে জায়গা নেই। শেষকালে এক গেষ্ট হাউসের মালিক তাকে বললেন দেখুন আপনাকে থাকতে দিতে আমার ব্যক্তিগত কোন আপত্তি নেই কিন্তু ব্যাপারটা কি হচ্ছে জানেন? আপনাকে থাকতে দিলে আমার গেষ্ট হাউসে আর কোন গেষ্ট থাকবে না। এটা খালি কলার কমপ্লেক্স নয় কালচ : কমপ্লেক্সও বটে। আমি ব্যবসায়ী; আমার ব্যবসায়িক স্বার্থও দেখতে হবে।

আর একটা হোটেলে সে গিয়েছিল। সেখানকার ম্যানেজার তাকে বললেন আপনি আফ্রিকার কোন দেশ থেকে এসেছেন?

ভূতলিঙ্গম সবিনয়ে উত্তর দেয় সে আফ্রিকার লোক নয় সে ইণ্ডিয়ান।

ম্যানেজার গোঁফটা চুমরে ফের বললে—ও একই কথা। আফ্রিকান্ আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান একই ব্যাপার।

তাড়াতাড়ি ভূতলিঙ্গম বলে সে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান নয় তার বাড়ি ইণ্ডিয়াতে।

সে কি? আপনাকে দেখতে ইণ্ডিয়ান মনে হয় না। কিন্তু ইণ্ডিয়ানদেরও আমাদের হোটেলে রাখি। বলে তিনি বয়কে মিঃ হাফিজ মহম্মদকে ডাকতে বললেন।

বোর্ডার হাফিজ মহম্মদ কাশ্মীরের লোক। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ তার গায়ের রং। তিনি এসে ভূতলিঙ্গমকে ইণ্ডিয়ান বলেই সনাক্ত করলেন।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বললেন—সেকি তোমাদের একজন ব্ল্যাক আর একজন হোয়াইট অথচ একই দেশের লোক! একি করে সম্ভব?

তখন ভূতলিঙ্গম আর সেখানে থাকতে রাজী হলনা।

সবশুনে চক্কোত্তিমশাই ভূতলিঙ্গমকে বললেন অগতির গতি বরাল টেরাসে কামরো ভাড়া হোটেলেই আসুন। সেখানে সকলের অবারিত দ্বার।

এবার উপাধ্যায় বলল, তার ল্যাণ্ডলেডি একদিন বলছিলেন—তিনি কলার্ডদের তার গেষ্ট হাউসে রাখেন বলে, আশেপাশের ল্যাণ্ডলেডিরা তার সঙ্গে আর কথা বলেননা বা আর তাঁর বাড়ীতে আসেন না।

শঙ্কর কফি খেয়ে তাড়া আছে বলে সার্জেনস হলের দিকে ছুটল।

সাত

সার্জনস হল থেকে বেরিয়ে বাইরে ফুটপাথে এল শঙ্কর। আগামীকাল থেকে তাকে ইন্টার্ণ

জেনারেল হসপিটালে যেতে হবে। ডাঃ বার্গসের ওয়ার্ডে তাকে ঘুরতে হবে, মেডিসিন সম্বন্ধে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করার জন্যে।

সামনের নিকলসন স্কোয়ারে কয়েকজন বুড়ো বসেছিলেন বেঞ্চিগুলোর ওপর। শঙ্কর জানে এরা সব বেকার। ওল্ড এজেড পেন্সন পায় গভর্মেণ্টের কাছ থেকে।

শঙ্করকে দেখে তাদের একজন উঠে এসে গুড ডে বলে বাও করল তারপর কানের কাছে মৃদুস্বরে বলল ডু ইউ হ্যাভ অল পেন্স স্যার?

শঙ্কর বুঝতে পারেনা সে কি চায়। বুড়োটার বয়স আশীর কাছাকাছি হবে। লোলচর্ম: মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা পাকা দাড়ি। ম্যাকিনটশটার জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। মাথায় একটা ফল্ট ক্যাপ। মুখে একটা ব্রাউন রংয়ের বহু পুরোনো তামাকের পাইপ।

শঙ্কর অপ্রস্তুত হয়ে কি করবে ভাবছে আর বুড়োটা সামনে দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে পাইপ টানছে।

এমন সময় আর্ডেন হোটেলের শরৎ চৌধুরী বাস থেকে সেই ষ্টপেজে নামল। তাকে দেখে শঙ্কর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

কি ব্যাপার। চৌধুরী জিজ্ঞেস করল।

দেখুনতো এই বুড়োটা কি চায়? কি বলতে বুঝতে পারছিনা।

হোয়াটস রং?

—কুড ইউ গিভমি এ অল পেন্স স্যার।

ও হো হো। ওকে ছ পেন্স দিন। পরে বলছি।

শঙ্কর পকেট থেকে ছ পেন্স বার করে দ্বিরুক্তি না করে তাকে দিয়ে দিল। বুড়োটা থ্যাঙ্কস জানিয়ে চলে গেল।

আসুন লাঞ্চ খেতে খেতে আপনাকে ব্যাপারটা কি হয়েছে বুঝিয়ে বলব। কোথায় লাঞ্চ খান আপনি? চৌধুরী জিজ্ঞেস করে।

—বার বিকিউতে।

ওহ্, বড্ড ভীড় ওখানে। দ্বিশি খাবারও পাওয়া যায়না। বর্মার হোটেলে আসুন।

সেটা কোথায়?

কেন? জানেন না, এই সামনেই এডিনবরা ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন আছে। পটারস রো তে। লোথিয়ান ষ্ট্রীটের পাশেই। তার চার তলায় বর্মার হোটেল। পাঞ্জাবী। এদেশেই বিয়ে করেছে।

চারতলায় ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশনে উঠে তারা বর্মার রেস্তোরাঁতে ঢুকল।

শঙ্কর লক্ষ্য করে একটা বড় হলঘরের সবটা ডাইনিং হল করা হয়েছে। হলটার সামনে করিডোর, উঠবার সিঁড়িটা করিডোরে এসে পড়েছে। করিডোরটার অন্যকোণে আর ছুটো মাঝারি সাইজের ঘর নিয়ে এসোসিয়েসনের লাউঞ্জ ও রিডিংরুম করা হয়েছে। করিডোরের অপর কোণে কিচেন।

ডাইনিং হলটা ইণ্ডিয়ান ছেলেতে ভরে গেছে। তাদের দেখে শঙ্কর বুঝতে পারে তারা তারই মত, নতুন এসেছে। চক্রবর্তি মশায়ের ভাষায় এরেবারে raw. মন ওরেটার্ণ।

শরৎ চৌধুরী পাটনার ছেলে। বাংলার হিন্দীর টান। ভেটেরিনারী সার্জেন।

চেয়ারে বসে সে বলল, দেখুন এ দেশে ভিক্ষে করাটা বে-আইনি। এ দেশের বুড়োরা কিন্তু খুব গরীব। তাদের দেখবারও কেউ থাকে না। গভর্মেণ্ট থেকে হপ্তায় হপ্তায় অল্প যা টাকা পয়সা দেয় তাতে তাদের চলে না। সেজন্যে বিদেশী ছাত্র দেখলে মাঝে মাঝে ওরা ওভাবে ভিক্ষে চায়। মুখ ফুটে বলতে পারে না।

বুড়োটা আপনার কাছ অল পেন্স চেয়েছিল। তার মানে ছ পেন্স। কারণ তার চেয়ে ছোট পেন্স আর হয় না।

এতক্ষণে শঙ্কর সব বুঝতে পারে।

পরোটা আর মাটন কোর্মার অর্ডার দেয় তারা। শরৎ চৌধুরী বলে আমার এক বন্ধু প্রেম মঙ্গল সিং-ও এখানে খেতে আসেন তার জন্যে অপেক্ষা করে দুজনে একসঙ্গে খাই। তারপর খেয়ে দেয়ে আবার কাজে বেরোই।

বলতে বলতে প্রেমমঙ্গল সিং এসে যান। একটা চেয়ার টেনে বসে যান। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিসেস বর্মা প্লেট হাতে করে তাকে খাবার দিয়ে যায়।

যেন আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল।

প্রেমমঙ্গল সিং নিষ্ঠাবান রাজপুত। নিরামিষাশী। কোন মাংসের কাছে যান না। এ দেশে কখন কোন্ মাংসের ভেতর গোমাংস লুকিয়ে থাকে সেই ভয়ে রাজপুত হয়েও মাছমাংস খান না।

খেতে খেতে তারা বর্মা সম্বন্ধে গল্প করতে লাগল।

বর্মা বোম্বাই ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। তাদের মতন একদিন দেশ থেকে পাশ করে বিলেত এসেছিল উচ্চশিক্ষার জন্য। ইংলণ্ডের কোন এক ইউনিভার্সিটিতে এসে সে ভর্ত্তি হয়।

সে যে ল্যাণ্ডলেডির বাড়ীতে থাকত তার সুন্দরী মেয়ে মার্থা বর্মাকে রোজ ভোরে ঘুম ভাঙ্গাতে বিশেষ কষ্ট দিত।

মার্থা না তুললে বর্মার আর ক্লাসেই যাওয়া হতনা। সে ভীষণ ঘুমকাতুরে ছিল।

শেষকালে বর্মার জীবন মার্থাময় হয়ে উঠল।

মার্থার সঙ্গে রোজ ইভনিংয়ে বেড়াতে বেরোত বর্মা। নাচের আসরে, পার্কে, পার্টিতে। মার্থার মা বারণ করত।

স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ। মার্থা নাবালিকাও নয়। তাছাড়া বর্মা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। যার দাম ও সম্মান ইংলণ্ডে খুব দেওয়া হয়।

বর্মা শেষকালে ভুল চাকায় (চক্কোত্তি মশায়ের ভাষায়) পা দিয়ে ফেলল।

ইউনিভার্সিটির পড়াশুনো চুলোয় গেল। বর্মা আর দেশে ফিরতে পারল না।

মার্থাকে সে বিয়ে করল। মার্থার এক মেয়ে হলো।

বর্মা এখন রেস্তোরাঁ চালিয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করে। মধ্যে মাঝে কুকুরের রেসও খেলে। দেশে সে আর কোনদিনই ফিরবেনা।

কথায় কথায় শঙ্কর বললে সে ইষ্টার্থ জেনারেল হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল এটাচমেণ্ট পেয়েছে।

শুনে ডাঃ প্রেম মঙ্গল সিং বললেন, তাহলে আপনি পোর্টাবেলাতে আমার চেনা ল্যাণ্ডলেডি মিস ডেনহলের বাড়ী চলে যান। চমৎকার ভদ্র মহিলা ভদ্রবন্ধু। আমার বন্ধু তেওয়ারীজী একসময় ওখানে থাকতেন। খুব আদরে সে সেবানে ছিল।

কিন্তু তাহলে রয়াল-টেরাসের-আর্ডেন হোটেল আমাকে ছাড়তে হবে। কামরোভস্কিও চটবে।

—আরে, কামরোভস্কির কথা ছেড়ে দিন। ও আপনাকে আর চার পাঁচ মাস বাদে গরমের সময় এসে গেলে এমনিতেও তাড়াবে। আর তাছাড়া মিছিমিছি বাদে ভাড়ার পয়সা খরচ দেবেন কেন আর্ডেন হোটেল থেকে? পোর্টাবেলাতে চলে যান। ওখান থেকে রুটি গুটি হাসপাতালে যাবেন আর বাড় ফিরে পড়াশুনা করবেন। এতক্ষণে চৌধুরী কথা বলে।

সে রাস্তায় আর্ডেন হোটেলে ফিরে শঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। তার এখন কি করা উচিত? সে কি এখান থাকবে না পোর্টাবেলাতে যাবে।

তার মনের মধ্যে টাগ অফ ওয়ার সুরু হল। মার চিঠির কথা মনে পড়ল। "শঙ্কর পাশ করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আইস। তোমার পথ চাহিয়া আমরা বসিয়া আছি। বুল্টু সোনা খালি জিজ্ঞেস করে কবে দাদা ফিরিয়া আসিবে? তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমার বিবাহ দিয়া তবে আমি নিশ্চিন্ত হইব। সংসারে এখন বড় টানাটানি যাইতেছে। সবই ভগবানের ইচ্ছা।"

তার বিবেক বলতে লাগল—শঙ্কর, কি জন্যে তুমি ইংলণ্ডে এসেছ? পড়াশুনো করার জন্যে। মানুষ হবার জন্যে। দশজনের মধ্যে একজন হবার জন্যে। প্রেম করে বিধবা মায়ের টাকা ওড়াবার জন্যে নয়।

অন্যদিকে তার অবচেতন মন থেকে কে যেন ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে বলতে লাগল—শঙ্কর—তুমিও মানুষ। স্কট-মেণ্টের জন্যে তোমার জীবনের, যৌবনের মূল্যবান সময়টা নষ্ট করবে কেন? এ বয়স ফুরিয়ে গেলে আর ফিরে আসবে না।

টক্ টক্ টক্। দরজায় আবার কে নক্ করছে। শঙ্কর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢোকে হেম দত্ত।

মিত্তির, জান আজ কি হল? বর্মার বাড়ী, ফোর্থ নদীর ব্রীজের কাছে গিয়েছিলাম। বর্মা তার মা, বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। খুব উদার-মতাবলম্বী ওরা।

আমাকে লঞ্চি খাওয়াল। বর্মার বাবা যুদ্ধের সময় মণিপুরে ছিলেন। ভারতীয়দের আতিথেয়তার খুব প্রশংসা করলেন।

নর্মার সঙ্গে ফোর্থ নদীর তীর ধরে বেড়ালাম। শুধু ঘাস একসাথে। ফোর্থ নদীতে নতুন আর একটা ব্রীজ তৈরী হচ্ছে। আমার একদিন যাব। আনন্দের উচ্ছ্বাসে হেম যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

হঠাৎ শঙ্করের বিষণ্ণ মুখ লক্ষ্য করে হেম বললে —এ কি ব্যাপার! মিস্টার তুমিইত আমার ফোর রাণার। আর তুমি আজ এত নিরুৎসাহ কেন? কি হয়েছে?

হেম, আমি আর্ডেন হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি।

সে কি? কেন কেন?

আমাকে এখন পড়াশুনা করতে হবে হেম। পোর্টসেলাতে গিয়ে থাকব। ইষ্টার্ণ জেনারেল হাসপাতালে ঘুরতে হবে রোজ। সেখানে থাকলে বাসের খরচটা বাঁচবে।

জানইত ছ মাসের ফরেন একসচেঞ্জ গভর্ণমেণ্ট থেকে আমায় দিয়েছে। আর কয়েকমাস বাকী আছে মাত্র। এ ভাবে চললে কি করে চলবে?

কিন্তু শালি। শালির কি হবে? এতদূর এগিয়ে পেছিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

কিছুই আমি এণ্ডর্টান হেম। আগুনের আভা দেখে পতঙ্গের মত একটু মুগ্ধ হয়েছিলাম মাত্র। আমাকে পাশ করে দেশে ফিরে যেতে হবে হেম।

তাছাড়া বিলিতি জীবনের ধরণ ধারণ আমার ভাল লাগছেনা। সেই কাঁটা চামচে, খাবে শব্দ হবে না মুখ থেকে। হাসবে কিন্তু মাপের বেশী আওয়াজ হবে না। প্রত্যেক কথায় প্লিজ, এসকিউজ মি, থ্যাঙ্ক ইউ।

কোন আন্তরিকতা নেই খালি আড়ষ্টতা। আমি ইণ্ডিয়ানই থাকতে চাই। ম্যানার্স আর কার্টিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে আর ভাল লাগছে না। আমি কোনদিনই ইংরেজদের কার্বনকপি হতে পারব না।

সে রাত্তিরে শঙ্কর কামরোত্তিরে জানাল সে আর্ডেন হোটেল ছেড়ে দেবে। সাতদিনের নোটিশ দিয়ে আগাম টাকা তাকে দিয়ে দিল।

কামরোত্তির মুখ দেখে বুঝতে পারল, সে বেজায় চটেছে। শীতের মুখে দাঁড়িয়ে খদ্দের ভেগে যাওয়ার মত দুর্ভাগ্য তার বুকে বড্ড বাজে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শঙ্কর নাইটিংগেল পাখীর ডাক শুনতে লাগল। আর কার্লটন হিলের হাওয়া বয়ে নিয়ে আসতে লাগল করুণ পাতার দীর্ঘশ্বাস। টিপ্—টিপ্—টিপ—টিপির—সস্—সস্-স-স্।

চিরন্তন

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কেঁদোনা……কেঁদোনা
আমার সকল বেদনা
সারা বিশ্বের অন্তরে……অন্তরে
আমার সকল চেতনা
আমার সকল বাসনা
চিরসবুজের বন্দরে……বন্দরে
আমার যত কিছু-উৎসব

সকল সাধনা
চিরসুন্দর করিতে রচনা
এই হ'তে এপারে
মোর আশা হীনা যত ভাষা
আশা হীনা যত ভাষা
যুগ হতে যুগে
কাল হ'তে কালান্তরে!

হিমালয় দুহিতা :

—শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য্য

ওঁ সত্যপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।

গঙ্গামাতৃকা এই ভারতবর্ষে গঙ্গাই হলো ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র মুখ্য পরিচয়। মূর্ত্তিময়ী এই গঙ্গাই হলো পৃথিবীর আদি প্রত্যক্ষীভূতা জননী। সকল পাপী-তাপী জীবগণের মুক্তির কারণেই এই পৃথিবীর বুকে হয়েছে তার শুভ আবির্ভাব। গিরিরাজ হিমালয়ের পবিত্র অঙ্গ গোমুখী তীর্থ হতে হয়েছে এই স্রোতস্বিনীর অবতরণ। বিষ্ণু পাদপদ্মভূতা এই গঙ্গার শুভ অবতরণে হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য যেন এক অপরূপময় আধ্যাত্মিকতার মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। তাই আজও বহু বৈদিক ও পরিব্রাজকগণ হিমালয়ের তুষিরার আকর্ষণ হৃদয়ে অনুভব করে মোক্ষপ্রদায়িনী এই গঙ্গার উৎপত্তি স্থল স্বর্গনিভিলাষে দুর্গম গাঙ্গের তীর্থ গোমুখী অভিমুখে ধাবিত হয়ে থাকেন। কেউ ফিরে আসে, আর কেউ বা রয়ে যান চিরকালের জন্যে, তাঁদের আত্মোদ্ধেশ্যে সুরধুনীর সহিত চির স্থায়িত্ব প্রাপ্তির আশায়।

পরে সেই সকল সাধনারত সাধকগণের কণ্ঠে সদা ধ্বনিত গঙ্গা বন্দনায় প্রসন্না হয়ে শিব মৌলী বিহারিণী গঙ্গা হিমালয়ের ক্রোড়ে চির জাগ্রত হয়ে বিরাজ করছেন। গঙ্গার এই চিরন্তনী পবিত্র জল ধারা ভুবার আচ্ছন্ন হিমালয়ের প্রান্তদেশের গো-মুখাকৃতি একটী বিশাল গহ্বর হতে বেরিয়ে এসে পরে এই হিমালয়ের-ই গাত্র দেশের বিভিন্ন প্রান্ত দিয়ে তা অজস্র ধারায় এই ভূমিতলে নেমে আসছে। শুভ সন্ধিক্ষণে এই রূপে পৃথিবীতে হলো গঙ্গার প্রথম অবতরণ। গোমুখী তীর্থ হতে উক্ত অবতরণ বারিধারার জন্য বলেই পুরাকালে ঋষিগণ ইহার নামকরণ করেছিলেন গঙ্গা। এই গঙ্গা গোমুখী তীর্থ হতে নির্গত হয়ে সর্বপ্রথম হিমালয়ের যে স্থানে এসে আপন প্রাণময় উচ্ছলতায় মধুর মূর্ত্তিতে বয়ে চলেছেন তার নাম হলো গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীর এই পবিত্র জাহ্নবীর তীরে পুরাকালে গড়ে উঠেছে গঙ্গার এক সুরম্য মন্দির। যে মন্দিরে তিনি যুগ যুগ ধরে পরম মাতৃময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করছেন।

গঙ্গার এই মর্ত্তে আগমনের মূলে রয়েছে তপস্বী ভগীরথের কুমার তপস্যার এক কঠোর সাধনা। যে সাধনায় প্রীত হয়ে মা গঙ্গা একদিন ভগীরথকে অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন এবং সগরের ভস্মীভূত পুত্রগণের জীবন দান করেছিলেন। ভগীরথের এই মহান কৃতিত্বের স্মারক স্বরূপ গঙ্গার প্রথম্ যাত্রাটি ইতিহাসের পাতায় আজো ভাগীরথী নামে স্বর্ণাঙ্কিত হয়ে আছে। এই গঙ্গাকে কেন্দ্র করে উত্তর কালে গড়ে উঠেছিল ভারতে প্রথম আর্য্য সভ্যতা। আর্যগণের নিকট এই গঙ্গা ছিল অতি প্রত্যক্ষীভূত দেবতা। তারা গঙ্গাকে জেনেছিল তাদের জীবন স্বরূপিণী জননীরূপে। তাই যুগ যুগ ধরে তারা করে গেছেন গঙ্গার অনন্যা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। হিন্দুর সনাতন ধর্মের জন্মদাত্রী হলো বেদমাতা এই গঙ্গা। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ এই গঙ্গাকে মূল প্রাণাস্ত দিয়ে গিয়েছেন। একসময় এই আর্য্যগণকে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় এই গঙ্গার তীরেতে অতিবাহিত করতে দেখা গিয়েছিল। আর তাদের এই দীর্ঘদিন গঙ্গার তীরে বসবাসের ফলে উত্তর কালে এই গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল তাদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য দেবমন্দির। পরে তাদের প্রতিষ্ঠিত সেই সকল দেবমন্দির গত আর্য্য যুগ থেকে সুরু করে আজও তাদের সেই মহান স্মৃতিকে বহন করে চলেছে।

এই গঙ্গা কেবলমাত্র হিমালয়ের শোভাবর্দ্ধন কারিণী রূপে প্রকাশিতা নয়। হিমালয়ের আধ্যাত্মিক পরিবেশকে বেষ্টন করে সে স্বয়ং প্রকাশিতা। গঙ্গার এই মধুর আলিঙ্গনে হিমালয়ও যেন চির গরীয়ান হয়ে আছে। গঙ্গার

হয় হলো দৈবিক এবং এই দৈবিক বর্ণেই রঞ্জিত হয়ে সে হিমালয়ের বুকে বয়ে গেল চিরদিন শিবারাধনা। পুরাণের আদি ইতিহাসে সে যে দৈবিক বসনাবৃতা প্রথম সন্ন্যাসিনী। কেউ কেউ বলেন এই গঙ্গা হলো দেবতাত্মা হিমালয়ের মানসকন্যা। কিন্তু ভারতীয় গঙ্গাপুরাণের ইতিহাসে পাওয়া যায়, যে এই গঙ্গা হলো জহ্নুমুনির কন্যা, তাই তার আর এক নাম হয়েছে জাহ্নবী। তবে এই গঙ্গা যে প্রকৃত পক্ষে শিবকন্যা সে কথা ভারতীয় আর্য্য সাহিত্যে বহুবার স্বীকৃত হয়েছে। জগতের কল্যাণে শিব এই গঙ্গাকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এই গঙ্গার কাছে নেই কোন জাতিভেদ এবং নেই কোন ছুৎমার্গ। তাই তিনি সকল অপাঙ্‌ক্তেয়কে অবাধে নিজের বুকেতে স্থান দিয়েছেন।

এই গঙ্গার প্রথম শুভ অবতরণ হয় অপোভূমি হরিকেশে। পরে সেখান থেকে সে তার আপন ঊর্দ্ধপ্রবাহ স্রোত নিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধন তীর্থ হরিদ্বারের পুণ্যভূমিতে বয়ে আসে। হিমালয়ের স্বর্গীয় রাজ্যে যাবার প্রথম প্রবেশ পথ হলো এই হরিদ্বার। মহাপ্রস্থানের মহাপথের সুরু এখান থেকে। ভারতীয় পুরাণের ইতিহাস থেকে জানা যায় একদা হরিহর আত্মার মহামিলন হয়েছিল এই পুণ্য তীর্থ হরিদ্বারে। তাই পরবর্ত্তী কালে এই হরিদ্বারে বৈষ্ণব ও শৈবদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। পৌরাণিক যুগ থেকে এই হরিদ্বারের অন্তরালে লুকিয়ে আছে ভারতীয় পুরাণ অন্তর্গত সমুদ্র মন্থনের একটি সুবিখ্যাত অমর কাহিনী। যে কাহিনীর মধ্যেদিয়ে একদা এই হরিদ্বারে উৎপত্তি হয়েছিল ভারত বিখ্যাত কুম্ভমেলার। অমরত্ব লাভের আশায় দেবতাগণ এই হরিদ্বারের পবিত্র কুম্ভমেলায় মহাস্নান করে চির ধন্য হয়ে ছিলেন। সেই থেকে কুম্ভযোগের পুণ্যতিথিকে কেন্দ্র করে পরবর্ত্তী কালে পুণ্যময় এই হরিদ্বার জগতে শ্রেষ্ঠ কুম্ভতীর্থ রূপে পরিচিত হয়ে উঠল। কথিত আছে, বারশ বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত এই পূর্ণ কুম্ভ বেলার স্নান ও দর্শন করলে মানবগণের আর কখনো পুনর্জন্ম হয় না। পুণ্যক্ষেত্র এই হরিদ্বারে একদা গঙ্গাবাস কামনায় এসেছিলেন পরিব্রাজক আচার্য্য শঙ্কর। সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে পদব্রজে হিমাদ্রি দর্শনের পথে আচার্য্য শঙ্কর এই পুণ্যভূমিতে কিছুকাল কাটিয়ে গিয়েছেন। সেই সময় তিনি এই প্রাণোচ্ছলময়ী গঙ্গার মনোরম শোভা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে রচনা করেছিলেন গঙ্গা বন্দনার এক অতি মধুর লহরী।

পতিত পাবনী এই গঙ্গা হরিদ্বার থেকে পুনরায় আপন বেগে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে ছুটে চললেন শিবময় বারাণসীর পথে। দীর্ঘ পথ ছুটে অবশেষে একদিন তিনি এসে পৌঁছলেন দেবাদিদেবের পুণ্যময় পুরী বারাণসী ধামে। হরিদ্বারেতে ছিল তার যেটুকু উদ্দাম ও উত্তালতা অবিমুক্ত ক্ষেত্রে এসে দেখা গেল তার সেই নব উচ্ছলময় চঞ্চলতা যেন নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে সে যেন এক শান্ত সমুদ্রের মত বয়ে চলেছে। মনে হয় দীর্ঘ দিন পরে তার পিতার পবিত্র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে তাঁকে তার অন্তরের প্রণাম জানাবার জন্যে সে আজ শান্ত কন্যা রূপে তার পিতার চরণে এসে পৌঁছেছে। শিবময় এই পুণ্য স্থানে এসে গঙ্গা তার গতিকে বহু পরিবর্ত্তন করে যথাক্রমে উত্তরবাহিনী রূপে বয়ে চলেছেন। গঙ্গার গতির এই আমূল পরিবর্ত্তনে পবিত্র বারাণসীতে গঙ্গার গৌরব চিরদিনের জন্যে মহিমান্বিত হয়ে আছে। আবহমান কাল থেকে ভারতের চতুঃপ্রান্ত হতে আগত সকল ভক্তিমান মানবগণ তাদের তাপিত জীবনে শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গাবাস কামনায় শেষ জীবনে এই পবিত্র সাধনোচিত ধামে আসিয়া থাকেন। ভারত বিখ্যাত সাধক মুক্ত পুরুষ শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী শান্তি প্রদায়িনী এই জাহ্নবীর তীরে দীর্ঘ শত বর্ষ ব্যাপী বাস করে গেছেন। পরে এই গঙ্গা তার নির্মল সলিলে বারাণসীকে ধৌত করে বাংলা দেশের সাগর সঙ্গম অভিমুখে এসে পৌঁছলেন। হিমালয় হতে বেড়িয়ে আসা গঙ্গার সেই অপ্রতিহত গতিবেগ পরিশেষে শান্ত হয়েছিল মহা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে। সোমুখী হতে হয়েছে যে গঙ্গার উৎপত্তি বাংলাদেশের শান্ত পীঠস্থ সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়ে সাধিত হলো তার পূর্ণ নিষ্পত্তি। সুদীর্ঘ এই দুই সহস্র মাইল পরিধির পরিসমাপ্তির কেন্দ্র স্থলে গড়ে উঠেছে উত্তর কালের প্রসিদ্ধ গঙ্গাসাগর তীর্থ। যে সাগর তীর্থে শুধু একটি দিনের মহাস্নানে মানবগণের লাভ হয়ে থাকে সর্বপাপের মুক্তি ও তাপিত জীবনে এক পরম শান্তি। পুরাণে কথিত

আছে, যে নির্জন সমুদ্র বৈজয়ন্তের এই সাগর বীপই ছিল একদিন মহামুনি কপিলের পবিত্র সাধনাশ্রম। তাঁর সাধনা-প্রভাবের নিকটেই ভস্মীভূত হয়েছিল ষাট হাজার সগরসন্তান। উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বতমালা স্থিত গোমুখীর উৎস স্থল থেকে সুরু করে বাংলা দেশের সাগর সঙ্গম পর্যন্ত হলো যথার্থ গঙ্গা—পরিক্রমা। আবহমান কাল থেকে ভারতের পুণ্য কামী মানবগণ ভক্তি পূত চিত্তে এই সুদীর্ঘ গঙ্গা—পরিক্রমা সমাপন করে এক অক্ষয় পুণ্য লাভ করে থাকেন। সর্ব কলুষ হরা এই গঙ্গা। সে যে চির কলস্বনা, দৈবিক বসনা ভীষ্ম-জননী।

মহীরুহ

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

তুমি যে দেখেছিলে প্রাসাদের ছাতে
চারা গাছগুলি
তারা আজ মহা মহীরুহ।
যে অমর কবি সে উদ্ধত প্রাসাদ
আজ সে মহীহ।
আকাশ তাহাকে দেখে হাসে,
কাক পাখি দেয় যায় বাঁধে।
পরপার থেকে তারে দেখে
তুমিও তো মিছেই ভালো।

চারারা ঘিরেছে আজ নাড়া
প্রাসাদের প্রতিটি ভিতেতে।
আবহেলা—আকাশে হাসছে ছোট তারা,
তো-কিও হাসে চাঁদ নেই দেখে।
রক্ত, ঘাম, অশ্রু জল দিয়ে
এ প্রাসাদ হয়েছে নির্মিত
আজো তার দেয়া শোধ কেউ করেনি তো।
পথের কুকুর, পক্ষ, বস্তির ছেলেরা
নির্বিবাদে ঢুকে যায় প্রাঙ্গণে তাহার
কেউ খেলে খুন্ খেয়ালেতে
কেউ বসে প্রকৃতির ডাকে
একদিন যেখানেতে ছিল ফুল লতার বাহার।
সেদার জানায় না কেউ
পথের কুকুর শুধু তবে যেউ যেউ।
মাঝে মাঝে ফোটে দুই দেয়ালা
লটকায় সমন।

ঐশ্বর্য ও কীর্তি তার কীর্তিনাশা জলে
হয়ে গেছে সব বিসর্জন।
মনিহারী কান্তি মহিমার
ফেকে চুরে হয়ে গেছে শেষ।
কাঁদে এর প্রতিটি ঘরেতে
বাদুর, চামচিকে, ছুঁচো প্রেতাত্মা অশেষ।

জমিদারী গেছে আজ লাটে
চালের আবহার নেই—লাভ নেই পাটে
হকশোষ মহাজনী তেজারতি সব
হ'ল বহুপ্রায়।
ভাড়াটেরা কর্তা গেছে
গিন্নী গেছে মেয়ের বাসায়।
তারে তারে লেগেছে মামলায়
উকিল মহুরী সব লুটে পুটে খায়।
কাঁকি আর চালাকীর ধন
কতকাল বাঁচে বাছাধন ?
মৃত্যু আজ পাপীকে বাঁচায়।
জন্মের কলঙ্ক পাপ, বংশের মাথায়।
রক্ত, ঘাম, চোখের জলের
দেনা আজও হয়নি তো শেষ।
প্রাসাদের অণু পরমাণু কাঁদে মুহ মুহুঃ
"আমি ভুখা হুঁ, আমি ভুখা হুঁ"।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিশ্বাস

নারীর প্রতি কবির প্রেম অনেকখানি পূজো। কবি জানতেন, প্রেমকে ভোগের মধ্যে নামিয়ে আনলে তার পবিত্রতা চলে যায়। এই জন্যেই কবি মিলনের চেয়ে বিরহকেই বেশী সুন্দর বলেছেন। মিলনে যা নষ্ট হয়ে যায়, বিরহে তা উজ্জ্বল, পবিত্র হয়ে ওঠে। কবি লিখেছেন—

"বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে
মিলন দাবানলে গেল যেন জ্বলে রে।"

প্রেয়সী যখন কবিকে বলেছিল—তুমি চলে গেলে আমার জীবন অর্থহীন শূন্য হয়ে যাবে। তার প্রত্যুত্তরে কবি বলেছেন—তোমার সঙ্গে যদি আমার বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে তোমার আমার মধ্যেকার সেই শূন্য আকাশ বিরহের গানে ভরে উঠবে। তোমার চলে যাওয়ায় যে বেদনার বিদ্যুৎ—সেই আমার গানকে জাগিয়ে তুলবে।

কবির গান তাঁর বেদনারই ধন। বেদনার আঘাত না হলে তার অন্তরের কবি জেগে ওঠে না। কবি তাই বেদনাকেই বলেছেন—

"ও আমার গান জাগানিয়া
ও আমার ঘুম ভাঙানিয়া।"

কবি লিখেছেন—

"গানগুলো বেদনার ধন যে আমার
কিছুতে ফুরায় না আর।

কবির বেদনারও অন্ত নেই।

প্রিয়ার বিচ্ছেদে যে দিন কবি শোক করতে বসেছেন সে দিন যেন প্রিয়া তাকে দূর থেকে ভর্ৎসনা করে বলেছে—আমি যে চলে গিয়েছি সেটাই তোমার কাছে বড় হল, আমি যে একদিন এসেছিলাম সেটা কি কিছু নয়? এই শোক যেন অকৃতজ্ঞ শোক। এতে যেন কবির প্রিয়ার প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রেম ঠিক এই ধুলো মাটির সংসারের জিনিষ নয়, এ যেন শুধু এক মানস অভিজ্ঞতা। বাস্তব সংসারে নামিয়ে আনলে যেন তার পবিত্রতা চলে যায়। চিরকুমার সভায় কবি লিখেছেন,—"অভিসার জিনিষটা ঠিক যেন সংসারের জিনিষ নয়. যে পথে অভিসারিকা চলে ভাবতে পার কি সে তোমার ওই পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। অভিসারিকার বুকের থেকে খসে পড়ে মুক্তোর মালা, সে ফিরেও তাকায় না, সত্যিকারের মুক্তো হ'লে কুড়িয়ে নিত।" কবি বলেছেন এ অভিসার হ'ল মনের দিকে মনের অভিসার। যে জিনিষ অত্যন্ত বেশী সুন্দর তাতে যেন বাস্তবের স্পর্শ সয় না। অভিসারও তেমনি মানসলোকের পথেই সুন্দর, বাস্তব জগতের পথে তাকে নামালেই সে অসুন্দর হয়ে ওঠে।

এই মনোভাব নিয়েই কবি নারীকে বারে বারে তাঁর মানস পূজা জানিয়েছেন। তাঁর মন গেছে বারে বারে নারীর দিকে মানস অভিসারে, তাকে ধূলতার জগতে নামিয়ে আনতে কবির দ্বিধা।

বিদেশিনী ভক্তিমতী, বিজয়াকে উদ্দেশ্য করে তাই কবি 'পূরবী'র একটি কবিতায় লিখেছেন:—"তপস্বিনী আমি যদি তোমার তপের শিখা গুলিকে জাগিয়ে তুলি, তবে সেই হোমাগ্নিতে আহুতি দেব এমন কোন সম্বল আমার আছে, তাই আমি একাই ফিরে যাব।"

বিজয়া তার স্বদেশ ছেড়ে কবির সেবায় আত্ম-নিবেদন করতে চেয়েছিলেন, এ তারই প্রত্যুত্তর। নারীর তপস্যা প্রেমের। প্রেমের জন্য সে তার স্বদেশ, স্বজন সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু এতবড় আত্মাহুতি যে নেবে তার তো ভয় আছে সে এতবড় ত্যাগের কোন মূল্য সে তাকে দিতে পারবে। তাই কবি তপস্বিনী বিজয়ার আত্মদান গ্রহণ করতে পারেন নি। তাকে ছেড়ে একা ফিরে এসেছেন, আর সেই বিরহের আকাশকে

ভরে দিয়েছেন তার গানে। সেই গান তিনি পাঠিয়েছেন ওই পূজারিণীর হাতে পূব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্তের পানে। এই হল তার বিজয়ার প্রতি বিদায় অভিনন্দন।

পূরবীর উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন,—

"বিজয়ার কর কমলে"। সেখানে কবি লিখেছেন—

"অস্ত সিন্ধু কূলে এসে কবি—
পূরব দিগন্ত হতে পাঠাইল অন্তিম পূরবী"।

এই বিদেশিনী নারীর উল্লেখ আমরা কবির কাব্যের মধ্যে পেয়েছি। এই বিদেশিনীর ভাষা কবি জানতেন না, কিন্তু তবু ভাব বিনিময় হতে বাধা হয়নি। কবি লিখেছেন—"ভাষা তার জানা ছিল নাকো, আঁখি তার করেছিল কথা"।

কবির জীবনী থেকে বাস্তব নারীর ইতিহাস এমনি করে উদ্ধার করে যদিও কোন লাভ নেই, তবু যদি সে চেষ্টা কেউ করে তো কিছু কিছু ঠিকানা কবির কাব্যে মিলবে।

প্রথম কৈশোরে বিলাত যাবার আগে কবির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মারাঠী মেয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে। সে কবিকে একদিন বলেছিল তোমার ওই মুখের সুষমা যেন কখনো দাড়ি রেখে ঢাকা দিও না, কিন্তু কবি লিখেছেন—সবাই জানেন তার সে কথা আমি রাখিনি।

বিলাতে গিয়ে ডাক্তার স্কটের মেয়েদের কথা কবি জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন। সেখানে কবি লিখেছেন—'ডাক্তার স্কটের তিনটি মেয়েই আমাকে ভালোবাসত।'

কিন্তু এই কৈশোরের ভালোবাসার চেয়ে প্রৌঢ় দিনে যে বিদেশিনী তাকে পূজো জানিয়ে ছিল, তার পূজার প্রভাব কবি বেশী করে অনুভব করেছিলেন। তার সেই গভীর অনুভূতির কথা তিনি প্রকাশ করেছেন পূরবীতে।

কবি নিজের কাব্য উৎসর্গ করেছেন প্রধানতঃ নারীকে স্মরণ করে। স্মরণ কাব্য তাঁর পত্নীর স্মৃতিতে লেখা, আর এই 'পূরবী' বিজয়ার হাতে কবির উৎসর্গ।

এই বিজয়ার পূজা নিবেদনের স্মৃতি কবির জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভুলতে পারেননি। শেষ বয়সে লেখা বোধহয় শেষ সপ্তকের একটি কবিতায় কবি এই পূজারিণী কে স্মরণ করেছেন। কবি যখন বিজয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন, তখন পথে কবির কষ্ট না হয় এই জন্যে বিজয়া কবির জন্যে জাহাজে একটি খাট দিয়েছিলেন সেই খাট বহু পথ অতিক্রম করে একদিন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেছিল। তা শান্তিনিকেতনে কবির ঘরে রাখা ছিল। শেষ বয়সে কবি লিখেছেন —ঐ আসন, যেন তার সেই বিদেশের প্রেমেরই আসন। ও যেন তাকে বিদেশের আদরের বাণী আর একবার নতুন করে শোনায়।

তাই আমরা দেখি কবির জীবনে নারী বিরহের পটভূমিতেই প্রকাশ পেয়েছে। স্মরণও বিরহীর গান, পূরবীতেও আছে বিরহীর বাণী।

আর এক নারী কবিকে প্রভাবিত করেছে সেও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই। সে কবির কিশোর-সঙ্গিনী বৌদিদি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী, কাদম্বরী দেবী। এই বৌদিদি কবির সমবয়সী ছিলেন। একটি কবিতায় কবি তাঁর স্মৃতি-জাল বুনে চলেছেন। সে কেমন করে কবির কাছে দেখা দিত, তার হাতে কোনদিন থাকত রেশমের রুমাল ঢাকা সোনার বর্ণের পাকা আম একটি বুড়িতে। কবি যেন কল্পনায় আর একবার সেই কৈশোর সঙ্গিনীর সঙ্গে কৌতুকালাপের আনন্দ কল্পনায় সম্ভোগ করছেন এই কবিতায়। কবি বলছেন সেই কল্পনা রূপিণী ছায়াকে মনে করলেন আমার এই সব কথা কেবল স্মৃতির ছলে নিজের দাবী দাওয়া জানাবারই জন্যে। না হয় কোন উপচার নাই নিয়ে এলে। না হয় খালি হাতেই এসো। তোমার সেই দুটি শুধু হাতের মূল্যও কম নয়।

এই বৌদিদি যে দিন সহসা মৃত্যুর মাঝে হারিয়ে গেলেন, সে দিন মৃত্যু কবির জীবনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। এই সময়কার কথা কবি লিখেছেন কবি এ কথা বারবার করে বলেছেন যে দুই অপরিচিতের মধ্যে পরিচয় যেমন ঘটিয়ে দেয় নারী ঠিক তেমনি মরণের সাথে কবির পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে নারী। কৈশোর সঙ্গিনী এই নারী যেদিন মরণের আলিঙ্গনে ঝাঁপ দিল, সে দিন কবি মরণকে দেখলেন শ্যাম রূপে। তাকে দেখলেন যেন নব বিবাহের বর। সে যেন রক্তাম্বর পরে 'সেজে' এসেছে

প্রিয়তমের মত। লোকে তাকে দেখে ভয় পায়, কিন্তু বধূ জানে সে তার প্রিয়তম। এমনি করেই তো একদিন শিব এসেছিলেন ভয়ঙ্কর রূপে! তাকে দেখে সতীর মা বাপ কপালে করাঘাত করে কেঁদেছিলেন, কিন্তু সতী দুরু দুরু কম্পিত বুকে তাঁকেই আপন বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। তেমনি মরণও সেই শিব। আমরা তার মঙ্গল মূর্তি দেখতে পাই না বলেই তাকে ভয় করি তার বাইরের ভয়ঙ্কর বেশ বাস দেখে আমরা তাকে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু যে তাকে জেনেছে সে তারই বুকে ঝাঁপ দিয়েছে একান্ত দরদ্ ভরা সান্ত্বনার জন্য। সংসার যখন তার সমস্ত সান্ত্বনা কেড়ে নিয়েছে তখন সে মরণকেই একমাত্র আপন বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি অনেক দিন ভেবেছি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির মহৎ মানুষ। কবি যাদের কাছ থেকে মহত্ত্বের পথে দীক্ষা পেয়েছেন—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ তাদের মধ্যে প্রধানতম। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ কবির সমস্ত খেয়ালের প্রশ্রয় দিতেন। কোনদিন তাকে বাধা দেন নি।

এই জ্যোতিরিন্দ্র নাথই স্বদেশের সেবার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন। ইনি স্বদেশী স্টীমার কম্পানী খুলেছিলেন। তাতে ইংরেজ কম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইনি সর্ব্বস্বান্ত হন। অবশেষে তাঁর জাহাজ গঙ্গায় ডুবে যায়।

এ হেন উদার প্রকৃতির স্বামীর স্ত্রী কেন যে আত্মহত্যা করলেন এ নিয়ে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল তার কোন উত্তর কোথাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু অবশেষে উত্তর পেয়েছি। রবীন্দ্র সাহিত্য অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করে আমি যেন কবির গোপন কথা গুলোর সন্ধান পাচ্ছি। তারা যেন একে একে কবির মনের কথা গুলো, তার গোপন কথা গুলো, আমার কানে কানে বলতে চাইছে। 'নষ্ট নীড়' গল্প গুচ্ছের একটি গল্প। (তার সমালোচনা আমি আগেই লিখেছি।) তখনো আমি সে গল্পের সঙ্গে কবির জীবনের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বুঝতে পারিনি। ভেবেছি, অন্য অনেক গল্পের মতই এই গল্পও কবির কল্পনা প্রসূত। হয়ত বা তার চোখে দেখা কোন ঘটনার আভাস নিয়ে তিনি এই গল্প লিখেছেন। কিন্তু আজ আমি নিঃসংশয়ে বুঝেছি—ওই গল্পের ছোটভাই অমল কবি নিজে —ওই খবরের কাগজ নিয়ে আর বন্ধু বান্ধব নিয়ে আপন খেয়ালে ভেসে চলা উদার প্রকৃতি ভূপতি হলেন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর চারু হ'ল বৌ-দিদি কাদম্বরী দেবী।

ওই গল্পে আমরা দেখেছি যে দুর্ঘটনা ঘটল তার জন্য দোষী কেউ নয় শুধু ভূপতির একটু খানি অবিবেচনাই ওই জন্যে দায়ী। ভূপতি কেন নিজের স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেয় নি তার প্রতি আপন দাবী দাওয়া কেন জানায়নি। কেন যে ঐ মেয়েটিকে নিজের দিকে টেনে নেয় নি, কেন যে তাকে অন্যের আদর উৎপাত, অত্যাচার ও দাবী দাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাকে ভালোবাসার সুযোগ দিল। এই উৎপাত, অত্যাচার ও দাবী যে তার নিজের ছিল। নারীর হৃদয় যে সুধায় ভরপুর সে যে দিতেই চায়। দিতে পেলেই সে খুশী তাই যে তার দাবী জানায় সেই তাকে পায়। যে কিছুই চায় না সেই তো বঞ্চিত হয়। ভূপতি যে বাইরে থেকে ঘা খেয়েছিল, ঠিক জ্যোতিরিন্দ্র নাথও বিপত্তির দিনে তেমনি করেই বাইরের সংসারের বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত পেয়েছিলেন। সে দিন বুঝি তিনি সান্ত্বনার আশায় অন্তঃপুরে এসেছিলেন, কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাস নিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। কবি লিখেছেন— "সে দিন চারু যেন হঠাৎ তার হৃদয় ভাণ্ডারের চাবি হারিয়ে ফেলল"। কিন্তু অমল তার সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে একবার দাদার মুখের দিকে তাকিয়েই সমস্ত আদ্যোপান্ত বুঝে নিল। সে বুঝে নিল চারুর মনকে সে এমন করে অধিকার করে নিয়েছে যে সেখানে আর তার দাদার জন্যে কোন সান্ত্বনার সম্বল বাকী নেই। একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র যে দাদা তার প্রতি অমলের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তারই জীবনে এই বিপর্য্যয় নিজের অজ্ঞাতে নিয়ে আসার জন্যে অমল সে দিন সহসা সজাগ হয়ে উঠে একেবারে চমকে উঠল। কবি লিখেছেন—সে যেন না জেনে অন্ধকারে একেবারে এক গভীর অতল গহ্বরের মুখে এসে পা রেখেছে। আর এক পা ফেলেই সে ওই গহ্বরের অতলে তলিয়ে যেত।

এমনি সময়ে তার চেতনা হল। তার পরে আর দেরী নয়। অমল যাকে পেল তাকেই না দেখে, না বিচার করে দাদা ও বৌদিদির মঙ্গলের জন্যে বিয়ে করে বৌদির কাছ থেকে দূরে চলে গেল। সে আর তাকে চিঠিও দিল না শুধু দাদারই চিঠিতে তাকে প্রণাম জানাল। কিন্তু দুর্বল নারী এই একান্ত গোপন শোক নিয়ে হিস্থলা নারী অবশেষে একদিন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। চারুর এই মূর্চ্ছার অর্থ কি আত্মহত্যা?

কবি লিখেছেন—

"মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকী সব আছে স্বপনে
ওগো নিভৃত স্বপনে।" [ক্রমশঃ

স্বপ্নের ধূপকাঠি

জগদীশচন্দ্র দাশ

'The whole midnight the lotus blooms'.

ফুলেরা আলোতে জেগে উঠে।
নিশি ফুলেরাও নিশির আলোতে জেগে উঠে।
দিবাকরের নিশি আলো চেতনা।
ফুলেরাই ফুলে জেগে উঠে।

বৃক্ষেরা স্বপ্ন দেখে।
আকাশের আলোর স্বপ্ন।
মৃত্তিকাগর্ভ বৃক্ষদের
আর এক স্বপ্নলোক।

শিকড়ের শ্রীপরশ থেকে
বৃক্ষেরা সবাই আকাশের
আদরে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়
আলোর লতায় আলোর গান
গাইবার জন্য, গানের পানীয়
নিবেদন করার জন্য দখার সমক্ষে।

এক একটা গাছ যেন
এক একটা মেয়েলোক।
ফুলের গয়না পরে পাতার চুল বেঁধে
বাকলের শাড়ী পরে সেজেগোজে দাঁড়িয়ে আছে।
হাতে কুঁড়ির অ্যানিটি ব্যাগ
পায়ে মাটির জুতো।

ছিরছায়। এইবার মান সেরে উঠল
চুলের জলের কণা উড়ছে
হাওয়াতে গা ধোয়ার গন্ধ ছিটিয়ে দিচ্ছে
গা নড়ে দাঁড়াল, এইবার
কিছু কথা বলবে। মোলায়েম নরম কথা
যে কথা বুকের গরম জায়গায় বাস করে, থাকে।

গাছগুলি যেন
আমার স্বপ্নের এক একটা ধূপকাঠি।
যাকে নিবেদন করা যায়
মায়ের পায়ের কাছে আপনাকে
ফুলের মত জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়াই
আসল সুখের কাজ আসল সুখের কাজ…
ফুলের মত আত্মনিবেদন করা
নিজেকে ফুল করে দাও।

ধূপদান হয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দাও
শিখা হয়ে উর্দ্ধপানে উঠুক
মায়ের মুখের দিকে চক্ষুস্পর্শে বেষ্টন করে
আকাশে এক হয়ে নানা প্রবাহে
আত্ম উৎসর্গের।

(শ্রীবি, আর, প্যানলায়ের সৌজন্যে।)

দেবী দর্শন

মানসী মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে 'ধনচক্রে ভগবান ভূত'। আমি ত' নামান্য মানুষ। অনেক চেষ্টা করেও তাই পশ্চিমের এই ছুন মাসে দেওকী পাণ্ডের দেবী দর্শনের ইচ্ছেকে ঠেকান গেল না। তার মুখে এক কথা, ঈশ্বর আর সাধু দর্শনের আবার সময়—অসময় কি! কতকগুলো ইংরেজী নভেল পড়ে আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই—। দেওকী বাংলা জানে।

বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করি, তার তো আমার শরীরের হাল। এই গরমে—

দেওকী আর আমায় এগুতে দেয় না, যেন খাবড়া মেয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে বলে, তোমার শরীরের জন্যই তো টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কতকগুলো শিশির ওষুধ খেলে শরীর সরস করা ছাড়া আর কি কোন কাজ দেয়। দেবীজীর অলৌকিক গুণের সামনে একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে—

এতটা বলে গদগদ স্বরে তার গলা যেন বুঁজে আসে।

অগত্যা রওনা দিতে হল। হরিদ্বারে যেতে সারা ট্রেন দেওকী তার দেবীজীর মাহাত্ম্য কীর্তনে ব্যস্ত। এই গরমে, রোদে, ভীড়ের মধ্যে পাখা টানতে টানতে আমি অস্থির।

পাণ্ডার নাম বৃষভকর্ণ শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠেছিলুম। কিন্তু মানুষটিকে দেখে ভাল লাগল। ধর্মশালাটি আরো ভাল। গঙ্গার ওপর ঢালা শ্বেত পাথর বাঁধান বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার সব কষ্ট দূর হল, মন তৃপ্তিতে ভরে গেল।

এ ধর্মশালায় তার একদল যাত্রিনী এসে আছেন। এঁদের বসুন বহর ও খাওয়ার আয়োজন দেখলে মনে হয় ধনীর ঘরের ব্যাপার। চোখাচোখি হলেও "কথামালা"-র "সেই 'বৃদ্ধ ও কাংস্যের পাত্র" গল্প মনে করে চুপই থাকি। হয়ত এমনি চুপচাপ থেকে একদিন দেবীদর্শন করে ফিরে যেতুম, কিন্তু বাদ সাধল ওঁদের দলের ঐ রাঙা-বৌ।

সত্যিই টুকটুকে রাঙা রং, তেমনি চোখ, নাক, মুখ ও চুল, যেন শিল্পীর হাতের পাষাণ পুতুল প্রাণ পেয়ে ঘুম ভেঙেছে। স্বভাবত ঘ-গোষ্ঠী বিরোধী।

আমার ঠাণ্ডা উল্লুর বা পাশ কাটান ভাব গ্রাহ্যই করলেন না। গায়ে পড়ে ভাব জমালেন, তারপর, বেশ আড্ডা। 'আপনি' 'তুমি' থেকে শেষে 'তুই' শুরু করে দিলেন।

সেদিন 'কনে দেখা' বেলায় বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুচকে হেসে রসিকতা করলেন।

"রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।"

তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফুট কাটলেন, ফেলে আসা মানুষটির জন্য মন কেমন করছে তো? তা মরতে এই বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করা কেন, গাঁট ছড়া বেঁধে এলেই পারতিস।

হেসে জবাব দিলুম, আমার গাঁট-গাটারি বইবার জন্য সঙ্গে আসতে বলেছিলুম—

রাঙা বৌদি মাঝপথেই আমায় বাধা দিয়ে বললেন, স্পর্ধা তো কম নয়!

এ রকম বাধা-বিপত্তি ঘটলে কথা শেষ করি কি করে।

—বল, বল, বল ছুঁড়ি তোর আর কি কথা আছে। রাঙা বৌদি কপট ভিরস্কারে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন।

—কিন্তু কথা হচ্ছে 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর'। তার যেখানে বিশ্বাস নেই—

—কৃষ্ণে বিশ্বাস না থাকতে পারে তোর প্রতি তো আছে। সেই শক্তি দেখিয়ে একা না এসে—

—এ প্রশ্ন তো উঠতেই রাঙা বৌদি। আপনি তো একা না এসে—

কথা শেষ হবার আগেই রাঙা-বৌদি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন। দেখি সন্ধ্যাকাশের বিষণ্ণ ছায়া ওঁর মুখেও প্রতিবিম্বিত। আমি অবাক!

কিন্তু সে একটুখানির জন্য। তখুনি নিজেকে সামলে রাঙাবৌদি প্রশ্ন করলেন সন্ধ্যেবেলা হর কী পাড়ি-তে গঙ্গা —আরতি দেখতে যাবি?

– যাব নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনার ঐ হাই সোসাইটির সঙ্গে—

—ধুর ধুর, ওরা ঘোর সংসারী। তীর্থে এসে গঙ্গার কেউ বসে ওদের খালি খাওয়ার চিন্তা আর পরচর্চা। চল্ তৈরী হয়ে নে।

পরের দিন সকালে জলযোগ সেরে রুক্ষবাট-কন্যা সতীর মন্দির দেখতে দুজন মিলে রওনা দিলুম।

সতীর মন্দির বলতে একটি বেদী যেখানে শিব নিন্দায় পতি মোহাগিনী মহাসতী দেহত্যাগ করেছিলেন। বেদীর পাশেই শিব মন্দির; শ্বেতশুভ্র শিবলিঙ্গ যেন সতীর বিচ্ছেদ বেদনায় ঈষৎ নীলাভ। মন্দির চত্বরের দেওয়াল তপ্ত, জীর্ণ, অসমতল জমি ঘাসে পাতায় আকীর্ণ।

দলের সবাই রুক্ষবাটে স্নান করতে গেলেন। রাঙা বৌদিসহ আমি অদূরে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলুম। ইস্পাতের মত ঝকঝকে আকাশের বুক বেয়ে এক ঝাঁক তৃষ্ণার্ত পাখি চিঁ চিঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল।

একটু পরে দেওকীর আহ্বানে তার জামা কাপড় নিয়ে ঘাটে এলে সে বলল,—রুক্ষবাটে এলে অথচ স্নান করলে না, এতবড় তীর্থ!

উত্তরে জানালুম,—স্নান করতে আপত্তি ছিল না তবে রাঙা বৌদিকে একা ফেলে আসতে হত। শুনেছ তো রাঙা বৌদির ঠাণ্ডা লেগে মাথা ভারি হয়ে আছে।

দেওকীর পাশ থেকে রাঙা বৌদির এক পাড়াতুত পিসশাশুড়ী যেন সাপের মত ফোঁস করে উঠলেন,—ঐ একটা খারাপ মেয়ে মানুষের জন্যে তুমি তীর্থের জল তুচ্ছ করলে?

রাঙা বৌদি খারাপ মেয়েমানুষ! এরপর আর কি শুনব।

দেওকী চোখের ইশারায় আমায় চুপ করতে বলল।

আমি প্রতিবাদ করলুম, কখনো না, এ সব মিথ্যে কথা।

মিথ্যেকথা! পাড়াতুত পিসশাশুড়ী ঝর ঝর করে বলে চললেন, এখানে যারা যায় এসেছে সবাই জানে ওর সোয়ামী শিবু দুশ্চরিত্র আর তার মূলে ঐ বৌ।

দেওকী বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, তবে যে ওঁর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বলছিলেন বিয়ের আগেই—

পাড়াতুত পিসশাশুড়ী গালে হাত দিয়ে বলে উঠল, তুই অবাক করলি মা, আমার এ চুল কি আজ পেকেছে! বিয়ের পর থেকেই দেখছি একদিকে শিবু তো এক দিকে তার বৌ। সোয়ামীকে সাজিয়ে গুজিয়ে বাইরে পাঠিয়ে তারপর নিজে কার জানি মন ভোলাতে, পরীটি সেজে নাটক-নভেল নিয়ে সময় কাটায়।

—'হায় হায় পিসীমা, আপনার পাকা চুল এত খবর ফাঁস করেছে আর রাঙা-বৌদি কার মন ভোলাতে এত কাণ্ড করছেন তার ঠিকুজীকুষ্টি যোগাড় করতে পারল না।' কথার শেষে আমি চলে যাচ্ছিলুম।

দেওকী থামিয়ে জানাল, আগামী কাল আমরা দেবীজীকে দর্শন করতে যাব।

শিবের মাথায় জল ঢেলে এবার আমাদের ফেরার পালা। রাঙাবৌদি আর আমি পেছনে পড়ে গেছি। হাঁটতে হাঁটতে আমি বলি, ভাবতে অবাক লাগে রাঙা-বৌদি যে, এখানে একদিন রাজপ্রাসাদে রাজঐশ্বর্য ছিল।

ছিল অবশ্যই। আমাদের দুজনের মাঝখানে হঠাৎ দেওকী উদয় হয়ে উপরোক্ত অভিমত জানাল। এক সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে তার অভিমতের জের টেনে বলল, কালের করাঘাতে আজ এখানে শুধু ধ্বংসের পাহাড়। সতী কেবল ঐ মহাসতীর মাহাত্ম্য যা তাঁর সন্তানদের শ্রদ্ধাপ্লুত মনে শতদল হয়ে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছে। এই সব সহ্য উপলব্ধি করার জন্য আমাদের মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে পড়া দরকার।—কথার শেষে সে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ দেওকী আমাদের এ উপদেশ দিয়ে গেল কেন, আমার সন্দেহ হল। ও কি পাড়াতুত পিসীর দ্বারা

ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত হল! বৌদি দেখি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁচছেন।

খানিক চুপচাপ থাকার পর আমি আরম্ভ করলুম, আমার মনে হয় সতীর দক্ষযজ্ঞে যাওয়াই উচিত হয় নি যিশেষত যেখানে শিবনিন্দা হবার সম্ভাবনা ছিল।

—আসলে শিবনিন্দা যে তাঁর সুখে কতখানি বেদনাদায়ক হবে মহাসতী তা আন্দাজ করে উঠতে পারেন নি।

রাঙাবৌদির এ কথার প্রতিবাদ করে আমি বললুম, এ কিন্তু ছেলেমানুষি কথা।

রাঙাবৌদি অন্য দিকে মুখ করে আস্তে আস্তে সেই বিখ্যাত কবিতার দুটি চরণ উচ্চারণ করলেন—

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

রান্না ও খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওকী তার দেবীজীকে দর্শন করতে যাবার কথা আর একবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিল ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনায় যেন পঞ্চমুখ হল। খাওয়া হয়ে গেলে সবাই ঘুমপাড়ানী মাসীর আরাধনায় বিছানা নিলেন। আমি চুপিচুপি নীলধারার দিকে পা বাড়ালুম।

নীলধারার পুলের পাশে ছোট্ট ফুল বাগানে ফুলেরা হাসছে। একটি ঝাড়ের পাশে বসতে গিয়ে রাঙাবৌদিকে দেখতে পেয়ে অবাক হলুম।

তিনি আমার মুখের ভাবগতিক দেখে হেসে শোনালেন :—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যমুনা প্রেমের স্রোতে—

তাঁকে মাঝ পথে থামিয়ে বললুম, এসে অবধি তো শুনছি কথায় কথায় গজ-গজ উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি। আপনার স্টোরুমে বাস করার ফলে কি কিছু নেই?

তিনি আমার রসিকতার সঙ্গে তাল করলেন 'ধীরে রজনী ধীরে,' দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে রাত জেগে জেগে যা সঞ্চয় করেছি তা এত শিগ্‌গির নিঃশেষ হয় কখন?

আমি ততক্ষণে নরম ঘাসের বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছি। আকাশে পূর্ণের মুখে এক টুকরো কালো মেঘের ঘোমটা। তাতে তাই আলো আছে কিন্তু জ্বালা নেই।

রাঙাবৌদির ভিবে থেকে এক খিলি পান মুখে ফেলে বলি, আপনার দিনের কাজের ফিরিস্তি শুনিয়েছেন। এত কাজ করার পর রাত জেগে বই পড়তে কষ্ট হয় না?

—আমাদের ফলবলের মারফৎ আমার কষ্টের কথা নিশ্চয়ই জেনেছ; হয় তো সে কষ্টের কাহিনী অনেক ঘষামাজা ধারণ করে তোমার মনোরঞ্জন করেছে অন্তত: দক্ষে গিয়ে দেওকীর সেই অভিমতে তাই মনে হয়।

সত্য গোপন করলুম না কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল। বললুম, কষ্টের প্রতীকার করার চেষ্টা করলেন না কেন?

ঐ দেখ, সব শেয়ালের এক রা। আরে, সাপে কামড়ালে তবে তো তার জ্বালা বুঝব। ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস থাকলে তবেই তাকে রাশ টেনে কেমন করে থামাতে হয় জানব। বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে, তখন আমি এ সবের জানিই বা কি যে একজন বিরাট মানুষকে রাশ টেনে সামলাব, আটকাব।...তাছাড়া একটা বারো বছরের খুকির কাছে মন বসত না, আমিও তাই তাকে মুক্তি দিলুম।

—কিন্তু চিরকাল তো আর বারো বছরের খুকি ছিলেন না। পরেও তো চেষ্টা—

ম্লান হেসে রাঙাবৌদি মাঝপথে প্রশ্ন করলেন, তোর কি বিশ্বাস, ধরে বেঁধে প্রেম হয়?

আপনার কি প্রেম ছিল না, ভালবাসেন নি তাঁকে?

কঠস্বরে রাঙাবৌদি জবাব দেন, আমাদের দেশে আমরা শিশু বয়স থেকে মাটির শিব গড়ে তার মধ্যে দিয়ে স্বামীকে ভালবাসতে শিখি। কল্পনার মাটির শিব যেদিন বাস্তবে রক্তমাংসের মানুষ রূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তার আগেই তো আমরা একআত্মা এক প্রাণ, জন্মজন্মান্তরের সম্পর্কে বাঁধা।

—তবে তাঁকে বাঁধার চেষ্টা না করে ছেড়ে দিলেন কেন?

ভালবাসি বলে। তাকে ভালবাসি বলেই চেঁচামেচি অশান্তি না করে তাকে মুক্তি দিতে পেরেছি।

সলজ্জোচে প্রশ্ন করি, কষ্ট হয়নি?

—'বুক ভেঙে গেছে।' ভিজে গলায় উত্তর দেন রাঙা বৌদি।

—তা হলে ?

তাহলেও ওকে ছেড়ে দেবার জন্য নিজের মনকে তৈরী করেছি। মনকে প্রবোধ দিয়েছি—স্বামী যখন আমার প্রিয়পাত্র তখন স্বামীর যে প্রিয়পাত্রী সে আমারো প্রিয়পাত্রী। স্বামীকে যখন ভালবাসি তখন তার ভালবাসার পাত্রীকেও আমি ভালবাসব এবং ভালবেসেছিও।

অবাক হয়ে বলি, পারলেন ?

—আমাকে যে পারতেই হয়েছে বোন। নয় তো আমি নিজেও শান্তি পেতুম না, জলে পুড়ে যেতুম এবং আমার চারপাশে যারা সংসারকে, বিধাক্ত মনের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ছারখার করে যেতুম।

—এই আপনার সান্ত্বনা ?

আমার সান্ত্বনা ও শান্তি। দুঃখের ঢেউয়ের মধ্যে আমার গলা ডুবে আছে, কিন্তু সে দুঃখ তার আমার উপরে। ভেতরে আমার অসীম শান্তি ও অনন্ত ভালবাসা তাই কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, রাগ নেই, দুঃখ নেই। আমি সকলকেই ভালবাসি।

নীলধারার স্বচ্ছনীল জল মিষ্টি রাগ রাগিণীর ঐক্যতানে পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরের নুড়ি ছিটিয়ে সবুজের হিজিবিজি কেটে কেটে বয়ে চলেছে। আজকের এই পরিবেশের একদিন পরিবর্তন হবে, হয় তো সম্পূর্ণ বদলে যাবে, কিন্তু নীল ধারার স্বচ্ছ নীল জলের এই জলধারা অনাবিল আনন্দে প্রবাহিত থাকবে।

রাঙাবৌদি কখন এক সময়ে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছেন জানিনা। আমিও উঠে পড়লুম।

ডেরায় ফিরে নিজের বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলুম। ডেওকী কাছে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি বলত ?

সহজভাবে জবাব দিলুম, কিছুই না। আমার দেবী দর্শন হয়ে গেছে অতএব ঘরের মানুষ এবার ঘরে ফিরে চলেছি।

রাগিণী

উমা দে শীল

যখন ইমনে যাবো, যাজি ইমনে,
অন্তর-আকুতি মেখে কাঁদি দুজনে।
বিষম বিকেলখানি মূলতানে চাকো,
কোমল-গান্ধার-হাত কড়ি-স্বরে রাখো।
নিষাদ ন্যাসে টানে ললতীর নীচে,
তোমারি হৃদয়-কাছে যাই ফিরে ফিরে।

বসন্ত-বাহারে গাঁথা সোনা-ঝরা ক্ষণ,
মালা-বদলের খেলা, বাঁধে দুটি মন।
খেলা শেষে মালাছেঁড়া বাথাটির তানে,
তান-ছেঁড়া হাহাকার বীণাটির তারে।
দুই হাতে সব ব্যথা নিয়ে যাই দূরে,
প্রেমের বেদনি রাখি কাঁপনের সুরে।

সংকলন

জ্যোতি দ্রুম।

সম্প্রতি তামিল মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত পিলু স্বামী নাথ রচিত ভ্রমণ কাহিনীতে "জ্যোতি-দ্রুম" সম্বন্ধে কৌতূহলজনক তথ্য জানা গিয়েছে। লেখক ইতিমধ্যেই পর্বত শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। সেখানে সাধারণত কোন লোক যায় না। সাধারণের ধারণা সেখানে গেলে কেউ ফেরে না। সেখানে সন্ধ্যায় একটা ভূত আসে। সে ভূতের আলোতে পর্বত শীর্ষ রঞ্জিত হয়ে উঠে। সে ভূতের সামনে যে পড়বে, তার রক্ষা নেই, মৃত্যু অনিবার্য। তবু সাহসে ভর করে লেখক অল্প কয়জন সঙ্গী নিয়ে পর্বত শীর্ষে আরোহণ করলেন। ভয় পাবার মত তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তবে একটি বড় গাছ দেখতে গেলেন। তাঁর সঙ্গীদের ভীত ও ত্রস্ত ধারণার জন্য তিনি পর্বত শীর্ষে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারলেন না। নেবে এলেন। কিন্তু সন্ধ্যা আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলেন পর্বত শীর্ষ থেকে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে।

পরের দিন তিনি একাই সাহস অবলম্বন করে সেই পর্বত শীর্ষের গাছের নীচে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসতেই গাছের তলা আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি গাছের ছাল, কিছু ডাল, শিকড় কেটে নিয়ে ফিরে এলেন। রাত্রির আঁধার নেমে আসতেই একটি ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে বার করলেন তার ব্যাগ থেকে সেই গাছের ছাল, ডাল প্রভৃতি। ঘরের ভেতর কে যেন আলো জেলে দিল। পিলু স্বামী নাথ তখন সকলকে ডেকে এনে দেখালেন সেই আলোক। জ্যোতি-দ্রুমের রহস্য—তখন সকলই জানতে পারলেন।

প্রশান্ত ঘোষ

বিবর্তনের পথে কে কত অগ্রগামী

কিছু দিন আগে এক ইতালিয়ান গবেষক প্রচার করেছেন—নারী পুরুষের চেয়ে বিবর্তনের ধারায় একধাপ বহুদূর এগিয়ে গেছে। তাঁরা পুরুষদের চেয়ে দেখতে ভাল;—চিন্তাশীলা মননী সুরুচিশীলা, ধৈর্যশালিনী। একটি প্রমাণ তিনি দাঁড় করিয়েছেন দেহে লোমের পরিমাণের উপর। আদিম মানুষের দেহে লোম ছিল প্রচুর। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহের লোমশতা হ্রাস পেয়েছে। নারীর দেহ পুরুষের চেয়ে অনেক কম লোমশ। তার দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে নারীদেহ বিবর্তনের ধারায় পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর।

কিন্তু চোখ খুলে তাকালে সেই বিজ্ঞানী মশাই দেখতে পেতেন তাঁর দেশের মেম সাহেবদেরই অনেকের গোঁফ হচ্ছে দাড়ি হচ্ছে। অনেককে ক্ষুরের সাহায্যও নিতে হচ্ছে কারণ লোমনাশক চূর্ণে তাদের কাজ হচ্ছে না। ঐ সব নারীগণ নিশ্চয়ই বিবর্তনের ধারায় পিছিয়ে পড়ছে। বিবর্তনের ধারা কি তবে গোল?

সুকুমার রায়

অব্যক্ত

—প্রীতিরঞ্জন সেনগুপ্ত—

"বাবা! বেখনা আমার জামা ছিঁড়ে গেছে। মাকে কত বলি কিনে দেয় না। তুমি বাড়ী থাকতে আমায় কত খাওয়াতে। এখন মা চকলেটও দেয় না, মাছও খেতে দেয় না। তুমি চল না বাবা বাড়ী? তুমি।···

এক নিঃশ্বাসে অবোধ শিশু হাসপাতালে শায়িত তার বাবার কাছে অনেকগুলো অভিযোগ পেশ করল।

অচলা তার সন্তানের কথাতে হকচকিয়ে গেল। সে হার স্বামীর বেড থেকে দূরে দাঁড়িয়ে এক আত্মীয়ার সাথে কি কথাবার্তা বলছিল। মেয়ে যে ঐরকম একটা বলে ফেলবে তা সে ঠিক বুঝতে পারে নি।

আজ প্রায় ছ মাস হতে চলল সমীর হাসপাতালে। যে রকম এক্সিডেন্ট হয়েছিল তাতে বাঁচবার আশাই ছিল না। সম্পূর্ণ একটি পায়ের বিনিময়ে সে তার জীবনটুকু মাত্র ফিরে পেয়েছে। সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা ফিরে পাবে কিনা নিশ্চয় করে ডাক্তারেরা এখনও বলতে পারছেন না।

সুখের না হলেও তাদের ছিল শান্তির সংসার। মাস গেলে সমীর যা আনত তা সম্পূর্ণরূপে তুলে দিত অচলার হাতে। অচলাও হাসিমুখে তা গ্রহণ করত এবং গৃহিণীর ন্যায় সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করত। সমীর কোন দিন কোন প্রশ্নও করেনি কিছু জানতেও চায়নি।

বিয়ের দুবছর পর তাদের কোল জুড়ে এল একটি কন্যা সন্তান। কন্যাসন্তান অঙ্গীকার করলে যাদের চক্ষু চড়কগাছ হয় এদের ঠিক তাদের দলে ফেলা যায় না। এই কন্যাটিকে ঘিরেই এদের কত কল্পনা, কত আমোদ, আহ্লাদ। কত কি যে পরিকল্পনা করত এরা এই কন্যা-টিকে নিয়ে তার ইয়ত্তা নেই।

সমীর রোজ অফিস ফেরৎ তার মেয়ের জন্য কিছু না কিছু কিনে আনত। বাবাকে আসতে দেখেই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের জিনিস কেড়ে নিত। মেয়েকে কোলে নিয়ে সমীরও ভুলে যেত ক্লান্তির কথা, সারাদিনের পরিশ্রমের কথা।

অচলা অভিযোগ করত মেয়ের একেবারে পিতৃভক্ত প্রাণ, বাবা এলে আর মাকে মনেই থাকেনা। সমীর কিছু বলত না, কেবল মুচকি হেসে মাথা নাড়ত।

এইত কয়দিন আগে খুকু পাঁচবছরে পদার্পণ করল। সেদিন কি ঘটা করেই না ওরা তার জন্মদিন পালন করেছিল। এমনকি ট্রেঞ্চিতে মেয়ে কটা তুলেছিল।

কিন্তু এমনটি যে হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ট্রেঞ্চিং থেকে ফেরার পথেই একটি চলন্ত লরীর ধাক্কায় সমীর ছিটকে পড়ল একেবারে রাস্তার কিনারায়। রাস্তায় বহুলোক জড় হয় এবং অজ্ঞান অবস্থায় সমীরকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেই থেকেই সমীর হাসপাতালে।

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর। কিছু জমান ত দূরের কথা, এই দুর্মূল্যের বাজারে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহ করাই এক বিরাট সমস্যা। একদিকে স্বামীর চিকিৎসার ব্যয় অন্যদিকে সংসারের খরচ চালাতে গিয়ে অচলা চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। কারুর কাছ থেকে যে সাহায্য পাবে এমন ভরসাও নাই। আত্মীয় স্বজন যারা ছিল তারা মামুলি সহানুভূতি জানিয়েই তাদের যার যার দায়িত্ব পালন করল।

কিন্তু বিপদে যারা মুষড়ে পড়ে অচলা তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। প্রথম প্রথম তার গায়ে যে সামান্য গহনাগুলো ছিল একটি একটি করে সেগুলো বেচ করল।

হাসপাতালে খালি হাত দেখে সমীর যখন গহনার কথা জিজ্ঞাসা করত, অচলা হাসিমুখেই জবাব দিত—

"হাসপাতালে গয়না গায়ে কি আসা যায়? তাই ওগুলোকে বাক্সেই রেখে এসেছি।"

"সংসার কি করে চালাচ্ছ?"

"সে ভাবনা তোমার নয়, তুমি এখন সম্পূর্ণ সেরে ওঠ। তারপর যত ইচ্ছা ভাববে।"

সামান্য যা লেখাপড়া জানা ছিল তার বিনিময়ে অচলা দু একটা টিউশনি জোগাড় করল। তাছাড়া সেলাই করেও মাঝে মাঝে কিছু পয়সা রোজগার করতে লাগল। কিন্তু এসবের স্থায়িত্ব সব সময় থাকে না। তাই সব কিছুর সমতা রাখতে গিয়ে নিজেদের খাওয়ার অংশের অনেক কাটছাঁট করতে বাধ্য হল। মেয়ের জন্য দৈনন্দিন যে দুধ ফল ও অন্যান্য জিনিসের বরাদ্দ ছিল তা সবই আস্তে আস্তে বন্ধ হল।

খুকুকে নিয়েই হয়েছে মহামুস্কিল। ওর অবোধ মন কিছুতেই বোঝে না সংসারের অবস্থা। আগের মতই এটা ওটা বায়না ধরে। "বলে তুমি আমায় খেতে দাও না, বাবাকে বলে দেব।"

কোনদিন যদি সত্যিই সমীর সংসারের অবস্থা জানতে পারে তাই অচলা কোনদিনই মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে যায়না। কিন্তু সেদিন আর পারেনি। সমীর বার বার করে অনুরোধ করাতে বাধ্য হয়েই নিয়ে এসেছে।

গায়ে কিছু বলে ফেলে এই ভয়ে অচলা সব সময়ই মেয়েকে কাছে কাছে রেখেছে। কিন্তু একটু অসতর্ক হতেই ও ছুটে গেছে বাবার কাছে আর বলে ফেলেছে। হয়ত আরও কিছু বলে ফেলত। তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে মেয়ের সব কথা শেষ হবার আগেই ওর গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়েছে।

আচমকা চড় খেয়েই খুকু তার যে চীৎকার করে কেঁদে উঠতেই সকলে এমন কি নার্সরাও ছুটে এসে খুকুকে শান্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"ছিঃ! ছিঃ! এরকম একটা শিশুকে এভাবে মারে? দেখ দেখি গালে কিরকম দাগ পড়ে গেছে? তুমি মা না আর কিছু?"

সকলেই খুকুকে শান্ত করতে ব্যস্ত। তীব্র ভর্ৎসনার মুখে অচলা হতবাক। সে অধোবদনে নিজের দিকে তাকিয়ে রইল আর তার অশ্রুপূর্ণ চোখ দুটি থেকে অজস্র-ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

খুকুর বেদনার কথা সকলেই জানল। সকলেই তার প্রতি সহানুভূতি জানাল। কিন্তু মাতৃহৃদয়ের যে অব্যক্ত বেদনা অচলার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার সমব্যথী বোধ হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ রইল না।

মহাপীঠের প্রাচীনত্ব ঃ জল্পেশ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

জলপাইগুড়ি সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে জল্পেশ-গ্রাম। এই গ্রামেই অবস্থিত উত্তর বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান 'জল্পেশ মহাপীঠ'; অধিষ্ঠিত দেবতা শিব মন্দিরে যে শিব প্রতিষ্ঠিত তাঁর কোন মূর্ত্তি নাই, তিনি অনাদি লিঙ্গ মূর্ত্তি। এই শিবের নাম হইতে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে, না গ্রামের নাম হইতে শিবের নামকরণ হইয়াছে, তাহা আর এখন সঠিক ভাবে বলা সম্ভবপর নহে। শিব চতুর্দ্দশীর দিন হইতে প্রায় এক মাস কাল এখানে উৎসবের সমারোহ লাগিয়া থাকে এবং দূর-দূরান্তর হইতে অসমীয়া, ভুটিয়া, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভক্ত তীর্থযাত্রীগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন। উৎসবের অন্যান্য সময়েও এখানে যাত্রী সমাগম কম হয় না, বিশেষতঃ সপ্তাহদিনে।

কিন্তু জল্পেশ মহাপীঠ কত প্রাচীন তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল শ্রীএম্, এস্ ভাটস্ (M.S.Vats) বিগত ১৯৪২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিয়াছেন, প্রবাদ এই যে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বা সমসাময়িককালে মহারাজা প্রাণ-নারায়ণ কর্ত্তৃক পুনর্নির্ম্মিত জল্পেশস্থিত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কোচ ভুটান শ্রেণীর নরপতি কর্ত্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল' (১)। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন লিখিয়া-ছেন "জল্পেশমন্দির কমিটির প্রথম সম্পাদক কুমার জগদীন্দ্রদেব রায়কতের গবেষণা মতে ৮ম শতাব্দীতে বর্ম্মন —বংশের শেষ রাজা জাহুদর বর্ম্মণ জাহুদ মন্দির নির্ম্মাণ করেন" (২)। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে আনুমানিক ১০০ খৃষ্টাব্দে জল্পেশর নামক একজন রাজা সর্ব্বপ্রথম এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই একজন অধস্তন পুরুষ পৃথুরাজা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মন্দিরটির সংস্কার করেন (৩)। বলাবাহুল্য, এই সকল মত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কারণ জাহুদের বর্ম্মণ রাজগণের বংশ তালিকার অন্য বা জল্পেশর নামক কোন রাজার নাম এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পৃথু রাজার প্রকৃত পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। পৃথুরাজার গড় নামে পরিচিত, অধুনা পূর্ব্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত, ভিতরগড় ধ্বংস প্রকৃত ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া পৌরাণিক নরপতি পৃথুর স্মৃতি বহন করিতেছে; বাঙ্গালার ইতিহাসে এরূপ ঘটনার অভাব নাই (৪)। ভিতরগড় কিংবদন্তীর ভবদত্ত রাজার রাজধানী বলিয়াও পরিচিত (৫)। অন্য মতে রাজা জাহুদ ভিতারির সমসাময়িক (৬)। বৌদ্ধ-পণ্ডিত ভিতারি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। ভিতারি উত্তর বঙ্গের অধিবাসী (৭)।

সুতরাং এই সকল অবিরোধী প্রবাদ বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভরশীল এই বংশের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা, মনে হয়, যুক্তিসঙ্গত নয়। এমন দিন ছিল যখন আমাদের দেশে এক শ্রেণীর 'পণ্ডিত' কুলজী গ্রন্থ এবং কিংবদন্তীর সাহায্যে যদৃচ্ছা ইতিহাস রচনা করিতেন। সরল বুদ্ধি গ্রাম্য লোকের সহজ কল্পনায় তাঁহারা প্রচুর ইন্ধন যোগাইয়াছেন এবং সেইজন্য একই স্থান বিজড়িত একাধিক ঐতিহাসিক ব্যক্তির বা স্থানের অস্তিত্ব এদেশের যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুমান ইতিহাস নয়, কুলজী গ্রন্থগুলিও ইতিহাস নয়; কিংবদন্তীও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এ সকলের কোনটি ঐতিহাসিক মূল্য নাই তাহা নহে, বিচার বিশ্লেষণ ও অন্য তথ্য-প্রমাণে যাচাই না করিয়া তাহা গ্রহণ করা যায় না।

তবে কি জল্পেশ মহাপীঠের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই? মনে হয় আছে, কারণ শুধু পালপল্ল বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এত বড় একটা তীর্থস্থান এত দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারে না। হয়ত ঐতিহাসিক সত্য

বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে ইতিহাস কোন-দিন আবিষ্কৃত হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে পারে। অবে মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা চলে এই মাত্র।

"কালিকা পুরাণের" দশসপ্ততিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"জামদগ্ন্যাত্তথাত্রীতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বমেব যে।
ব্রেচ্ছরূপং সমাস্থায় জগ্মুঃ শরণং গতাঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয় ম্লেচ্ছের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জগ্নীশদেবের শরণাগত হইল (৮)।

"যোগিনীতন্ত্রে" লিখিত আছে—

"পরশুরামতস্তাৎকাত্রঃ
সাঙ্কাচাং কোচ উচ্যতে

অর্থাৎ পরশুরামের ভয়ে কোন ক্ষত্রিয়গণ কোচ নামে পরিচয় দিয়াছিলেন (৯)

এই জামদগ্ন্য ও পরশুরাম নিশ্চিতভাবেই ক্ষত্রিয়-নিধনকারী পৌরাণিক পরশুরামকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। এই জন্য সকল পাঠ বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্মণ লিখিয়াছেন "পরশুরামের যুগের আখ্যানিকায় পৌত্র দেশবাসী ক্ষত্রিয় ও জগ্নীশদেবের নামোল্লেখ সম্ভব হয় না।" এ কারণে তিনি বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত "দ্বিতীয় ভার্গব তুল্য" মহাপদ্মনন্দকে-ই পরশু-রাম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন (১০) পুরাণ কাহিনীর একটি মোহিনী শক্তি আছে। নিপুণ রচয়িতার লেখনী হইতে নির্গত কাহিনীতে অসঙ্গতি বা অতিশয়োক্তি থাকিলেও পৌরাণিক সাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃই লোকে সংস্কার বশেই তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই কারণে পুরাণাদিতে বর্ণিত সকল আখ্যান সর্ব্বত্র না মিলিলেও পূর্ব্ব সংস্কারের বা ধর্ম্ম বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে অসঙ্গতি সমূহ উপেক্ষা করিয়া সকল আখ্যান-ই সমদৃষ্টিতে পাঠ করিয়া থাকেন। এই কারণে সকল প্রমাণ বিচার করিয়া সকল অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াও বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত—"দ্বিতীয় ভার্গবতুল্য" বা "পরশুরাম ইব" বাক্যের সহিতই জয়ন্তেশ মন্দিরের সম্বন্ধ করা হইয়াছে। "পরশুরাম ইব" বা "দ্বিতীয় ভার্গবতুল্য" কথাতে কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তিকে বুঝা যাইতেছে না। কারণ "কালিকা পুরাণ ও "যোগিনী-তন্ত্রে" সুস্পষ্টভাবে "জামদগ্ন্য" ও "পরশুরাম" নামই উল্লেখ করা হইয়াছে; কোনরূপ সন্দেহ বা কষ্ট কল্পনার অবসর ইহাতে নাই।

অনুধিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জামদগ্ন্য ও পরশুরাম এক এবং অভিন্নব্যক্তি নহেন। পরশুরাম সগরের সমকালীন, তিনি সগরকে আগ্নেয়াস্ত্র শিখাইয়াছিলেন (বায়ু পুরাণ-৮৮।১৩৪)। আবার পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জুনকে মারিলেন ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া রামের দ্বারা নিজিত হইলেন বিষ্ণুপুরাণ—৪।৪।৩)। পুনশ্চ পরশুরাম মূলককে নির্ব্বাসিত করিয়া-ছিলেন (বিষ্ণু পুরাণ ৪।৪।৩৮)। অগস্ত্য পরশুরাম সগর, মূলক ও রাম তিনজনেরই সমসাময়িক হইতেছেন, রামের ১০ পুরুষ পূর্বে মূলক ও মূলকের ১৭ পুরুষ পূর্ব্বে সগর" (১১)। কিন্তু একই ব্যক্তি ২৭ পুরুষ ব্যবধানে জীবিত থাকিতে পারেন না। কাজেই ইহা নিশ্চিত যে "তিন রামের কীর্ত্তি পরশুরামে আরোপিত হইয়াছে।" এইভাবে পরশুরাম আর প্রকৃতে পরিণত হইয়াছেন। পরশুরামের খণ্ডিত বিখণ্ডিত বহুস্থান ও কাহিনী বাঙ্গলার এবং ভারতের বিভিন্নস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে কালিকা পুরাণোক্ত এই পরশুরাম কে? এবেশে "জামদগ্ন্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি থাকায় একে অন্যের অবতার বলিয়া কল্পিত হইলেন ও সকলেই নারায়ণের অংশ হইলেন। বিভিন্ন রামের কীর্ত্তি পরশুরামে আরোপিত হইল। যে রাম পরশুরাম বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তিনি ক্ষত্রিয় সংহার করিয়াছিলেন; পরে যিনিই ক্ষত্রিয় সংহার করিলেন; তিনিই পরশুরাম নাম পাইলেন। কীর্ত্তিমাত্রই নাম-সাদৃশ্য কল্পিত হইল" (১২)।

এইরূপ নাম সাদৃশ্যের জন্যই জয়ন্তেশ মন্দিরের সহিত সম্পর্কিত রাম নামক একব্যক্তি পরশুরাম রূপে কল্পিত হইয়াছেন। উত্তর বঙ্গে ইতিহাসে রাম নামধারী যে ব্যক্তির নাম জানা যায় তিনি পালবংশীয় নরপতি রামপাল কৈবর্তনায়ক ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত ও বধ করিয়া পিতৃরাজ্য (জনকভূ) বরেন্দ্রী উদ্ধার সাধনের পর প্রবল আক্রোশে ক্ষত্রকীগণকে বিনাশ করেন (১৩)।

তাঁহার ভয়ে কৈবর্তরাজের আত্মীয় স্বজন ও সামন্তবংশীয়গণ কামরূপ ও কুচবিহারের জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আজও তথায় রাজবংশীদের মধ্যে রামভীতি প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিংবদন্তীর কুকটিকার রামপালের প্রবল পরাক্রমের নামে এখনও চলিয়া যাইতেছে। বগুড়া, রঙ্গপুর ও কুচবিহারে এখনও শরভরামের প্রতাপের কথা ঘরে ঘরে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, এই উপকথা বা প্রবাদের নায়ক পরশুরাম নহে, গৌড়াধিপ রামপাল" (১৪)। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে "কালিকা পুরাণ" প্রভৃতি উপপুরাণ সমূহ রচিত হইয়াছিল (১৫)। গৌড়াধিপ রামপালের সময় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ। কাজেই "কালিকাপুরাণ" বা "যোগিনীতন্ত্রে"র রচনাকালে লোকচিত্ত হইতে রামপালের স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সেই রামপাল কর্তৃপরাভূত কৈবর্ত রাজবংশীয়গণের "ভটৌঘ" মন্দিরে বা মন্দির সংলগ্নস্থানে আশ্রয় লওয়ায় দ্বাদশ একাদশ শতাব্দীতে বরেন্দ্র মহাপীঠের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

পালযুগের শেষ কালের "কৈবর্ত বিদ্রোহ" বলিয়া কথিত সামন্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্বোক, রুদ্রোক ও ভীমের কোন ইতিহাস নাই। পালযুগের এই সামন্তরাজগণ কাহারা? কেন তাঁহারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন? রামপালদেবের অনুগ্রহজীবী হইয়াও স্বয়ং সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার "রামচরিত" কাব্যে ভীমের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা পালরাজাদের অপেক্ষা কম ছিল না। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন—

"যস্মিন বরাভয়প্রদে নরপত্যপি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ।
তেপাদিজাতবাহিপ্রবর কবীন্দ্রায়েহপ্যাপক॥
(২।২০)"

অর্থাৎ সর্বপ্রকার বরের আশ্রয় যে ভীমের মধ্যে স্বয়ং নরপতি ও লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহার অধিকারে শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি সহ সেই সেই জনগণও শত্রুচিন্তামুক্ত হইয়া বাস করিত। সন্ধ্যাকর কবির এই অযাচিত-প্রশংসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মদনপালদেবের 'মনহলি তাম্রলিপি' হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্ব কালেই দিব্য বা দিব্বোক উত্তরবঙ্গের একাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন (১৬)। বঙ্গপতি জাতবর্ম্মার সহিত যে দিব্বোকের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার সংবাদ "মালদহ লিপি" হইতে জানা যায়। "দিব্যের সৈন্য আক্রমণকালে (জাতবর্ম্মাকে) নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গে অভিযান করিতে হইয়াছিল" (১৭)। জেজাবর্ম্মার "খেলার লিপি" হইতেও দিব্যের সহিত জাতবর্ম্মার যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় (১৮)। এই সকল বিবরণ হইতে অনুমিত হয় যে তথাকথিত—"কৈবর্ত রাজগণ" সাধারণ সামন্ত ছিলেন না। তাঁহাদের জাতিগত ইতিহাস কি? জানা নাই। তবে নবাবিষ্কৃত যশোদাসের "তাতুরিয়া লিপি" হইতে এই প্রশ্নের উত্তর হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। কৈবর্ত বংশীয় যশোদাস পালবংশীয় নরপতি রাজ্যপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং কৈবর্ত সেনার সাহায্যেই রাজ্যপাল নূতন নূতন দেশ জয় করিয়াছিলেন এই তথ্য প্রদান করিয়া অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী লিখিয়াছেন :—

"দিব্বোক হঠাৎ একদিনে বড় হন নাই। সম্ভবতঃ তিনি যশোদাসের বংশধর এবং যশোদাসের মতই তিনি প্রধানমন্ত্রীর মত কোন উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। ১০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপাল এবং ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই ১৬২ বৎসর ধরিয়া যশোদাস এবং তাঁহার বংশধরগণ (প্রধান) মন্ত্রীর সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অনেক হয়, ইহার ফলেই দিব্বোকের সিংহাসন গ্রহণে কোন আপত্তি উপস্থিত হয় নাই।" তাতুরিয়া লিপির উপসংহারে জানিতে পাওয়া যায় সরোবর, মন্দির, বিহার, প্রাসাদ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া যশোদাস বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং আটটি মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত একটী বিরাট মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মহাদেবকে রাজ্যপাল নিজের মধুপ্রস্থ গ্রাম দান করিয়াছিলেন (১৯)। এই শিবলিঙ্গ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মধুপ্রস্থ গ্রামই বা কোথায় তাহা আর আজ জানিবার উপায় নাই। ইহাতে কৈবর্তরাজগণের শৈবধর্মানুরক্তির পরিচয় জানা যাইতেছে এই মাত্র।

যশোদাসের প্রপিতামহ সন্ধ্যাস "এই বংশের প্রখ্যাত

ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সুরদাস ও সদয়দাস ঐশ্বর্য্যে ও বীরত্বে বিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সদয়দাস পূর্ব্বাচলে ও পূর্ব্বাচীর সরস্বতীর মত বিদুষী কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সদয়দাসকে শিবের সঙ্গে ও দুর্বাচীকে হিমালয় ও মেনকার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সদয়দাসের পুত্র যশোধাসের যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যশোধাসের পিতা ও পিতামহের সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং তাঁহার নিজের গুণাবলী তাঁহাকে পাল রাজবংশের রাজা রাজ্যপালদেবের (প্রধান) মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার সহায়ক হইয়াছিল"। মূল লিপির অষ্টম পংক্তিতে উল্লিখিত "অম্বরসৈ—ভূমিচ্ছৈ" পদগুলিতে বুঝা যায় ভূমিজ চাষী কৈবর্ত্তদের সাহায্যেই রাজ্যপাল মুক্ত হস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে বৃহদ্ঘটা নামক স্থানের অন্তর্গত অট্টমুগ রাজধানীর রাজভূমি ছিল। এই স্থানগুলি ঠিক কোথায় ছিল তাহা বর্ত্তমানে বলা দুঃসাধ্য (২০)

সন্ধ্যাকর নন্দী কোথাও দিব্যর বা তাঁহার শ্রেণীর বৃত্তি বা সামাজিক স্থান সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করেন নাই। মনে হয়, সমাজে তাঁহাদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। একাধিক-ব্যাধ সত্ত্বেও ...তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। কাব্যও রচনা করিতেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ভক্ত অনুরাগী ছিলেন। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থে (১২০১) কেবট্ট পশীপ বা কৈবর্ত্ত পশীপ রচিত সন্ধ্যাকরের একটি পদ আছে, পদটি বিনয় মধুসূদন" (২১)।

জয়ন্তেশ মহাপীঠের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া এ সকল কথা লিখিবার কারণ এই যে জয়ন্তেশ মহাপীঠের সহিত "রাজবংশী" সম্প্রদায় অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।" মন্দিরের দ্বার রক্ষক বা দেউরীগণ সকলেই রাজবংশীয়। যে বিষয়ে মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, তাহা মন্দির প্রবেশকারী ভক্তকে এই দেউরীদের নিকট হইতে নিতে হয় ...মন্দিরের পূজার বা ভোগের রান্নার যোগাড় দেওয়ার ভার এদেরই এবং মন্দিরের চাবিও দেউরীদের নিকটে থাকাই নিয়ম।" 'তোষয়িত্বা তথা শর্ব্বান্ জয়ন্তেশং পূজয়েন্নরঃ'।—ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া জয়ন্তেশের পূজা করিবে (২২)। কাজেই জয়ন্তেশ মন্দিরের প্রসঙ্গে রাজবংশীদের আধিকথা কিছু জানিতে হইবে বৈ কি?

এই প্রসঙ্গে "ব্রহ্মযামলে" উল্লিখিত পরশুরামপুত্রের পুণ্ড্রদেশের "বর্দ্ধন" হইতে পলায়ন করিয়া রত্নপীঠে বা জয়ন্তেশে আশ্রয় গ্রহণের কথা উল্লেখযোগ্য। "বর্দ্ধন" যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রামপালদেব যখন ভীমকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার পূর্ব্বক "বর্দ্ধন" বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন। তখন আত্মীয়স্বজন সহকারে পরশুরামপুত্রের "বর্দ্ধন" হইতে অসিয়া রত্নপীঠে বা বনাকীর্ণ শিবভূমি জয়ন্তেশে আশ্রয় গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পরশুরামপুত্রের ভিতরেও ভীম নামক এই ব্যক্তির আভাষ পাওয়া যাইতেছে ("নন্দীভূত জয়ান্তীয়ে" ইত্যাদি)। "এই শ্লোকের পরিস্ফুট অর্থ করিয়া আসামের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের শিষ্য পণ্ডিত রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য্য "কামতেশ্বর কুলকারিকা" গ্রন্থে লিখিলেন—

* * * *

বর্দ্ধনস্থত পাঁচজন, রত্নপীঠে নিল স্থান
আর কেহ লুকাইল ঘোনিগর্ত্ত পীঠে।
তার মধ্যে ভীমেশ্বর, আরাধিল মহেশ্বর,
সিদ্ধ হইল সিদ্ধু রত্নপী ঠর নিকটে" (২৩)।

"ব্রহ্মযামলে" ও "কামতেশ্বর কুলকারিকায়" প্রচারিত অথবা জয়ন্তেশ মহাপী ঠর সহিত ভীমবংশীয়গণের সংস্রবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সদাশিবের খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও জয়ন্তেশ মন্দিরের সহিত ভীম-বংশীয়গণের সংস্রবের জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ভীমের ছেলে-রাজবংশীভাষায় "ভীমের বোয়া"—পাঁচশত বৎসর পরে লোকের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ভীমেশ্বর' হইয়াছে। ইহাতে ইতিহাসের মূলকাঠামো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শুধু রামপালের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পরশুরাম এবং ভীমের স্থলে বৎসর ভীমেশ্বরে পরিণত হইয়াছে। ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে, ঐতিহাসিক রূপান্তরিত হইয়া এই ভাবেই কিংবদন্তীর উৎপত্তি হয়।

বিক্রোক, রুদ্রোক ও ভীম রাজা ছিলেন ইহা ঐতি-

রাজিক নহে। তাহারও পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পালরাজবংশের (প্রধান) মন্ত্রীর সহায়তা পর হেড়ম্বভিন্ন বংশের অধিকার করিয়াছিলেন। কাজেই ইহাদের বংশ উপেক্ষণীয় নহে। রাজবংশ অর্থেই ক্ষত্রিয় বংশ, ইহাই বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিধান (২৪)। এই কারণে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ প্রকৃতই রাজবংশীয়। "রাজবংশ রাজনীতি" ইত্যাদিঃ। "অমরকোষে"র মতে রাজার ঔরসে (বীর্য্যে) যাহাদের জন্ম তাহারাই রাজবংশীয় আখ্যাতে যাহাই হোক না কেন (২৫) একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি" সহিত একাত্মভূত হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে যে ইহারা অতীতের রাজকীয় মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এরূপ একটা ক্ষোভ যেন রাজবংশীদের জাতি-মানসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। যাহাহোক, উপরোক্ত তথ্যে একাদশ শতকের শেষ এবং দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদেও অন্তত যাদবের অস্তিত্বের কথা জানা যাইতেছে।

দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জে প্রাপ্ত দশম-একাদশ শতকে উৎকীর্ণ এক তাম্রশাসনে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ ভগবান শঙ্করকে উদ্দেশ পূর্ব্বক ভূমিদান করিয়া "অটোদা" নদীতীরে এক শৈবতীর্থের অবস্থিতির পরিচয় দিয়াছেন। এই শৈবতীর্থ কোথায় অবস্থিত ছিল? তাম্রশাসনের ৩১ এবং ৩২ পংক্তিতে দেখা যায় যে ঈশ্বর ঘোষ অটোদা নদীতে স্নান করিয়া পিতৃ, দেবতা এবং ঋষিতর্পণ করিয়া (অটোদাবারি স্নাত্বা তিল ধর্ত্ত পবিত্র পূর্ব্বকং ভগবন্ত শঙ্কর ভট্টারক মুদ্দিশ্য (২৬) "চেকুরী" নামক গ্রাম হইতে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার সময় স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন-"অটোদা—চেকুরী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী নদী ছিল বলিয়া—তাহার সাহায্যে চেকুরীর প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণীত হইতে পারিবে" (২৭)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও বর্দ্ধমান জেলায় 'ইছাই ঘোষের ঢেউলের' ঢেকুরের সহিত ঈশ্বর ঘোষের চেকুরীর অভিন্নত্ব অনুমান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু "চেকুরী বা চেকুর বলে কোন গ্রাম নেই গোপভূমে (বর্দ্ধমান জেলায়)। জাহেব-কেতুনির পূর্ব্বদিকে, অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেন পাহাড়ীর অন্তর্গত গৌরাঙ্গপুর নামে একটি গ্রাম আছে। গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের বিখ্যাত ঢেউল আছে—বাংলাদেশের ঢেকুরেউলের মধ্যে একটি অন্যতম নিদর্শন। বিশেষ প্রাচীন নয়। গড়ন ও অন্যান্য বিশেষত্ব দেখে বিশেষজ্ঞরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ঢেউল বলে মনে করেন। পরবর্ত্তীকালে গোপ-রাজবংশের কেউ হয়ত—ইছাই ঘোষের স্মৃতি রক্ষার্থে এই ঢেউল নির্ম্মাণ করেছিলেন, এমনও হতে পারে" (২৮) কিন্তু "হয়ত" "হতে পারে" কথা দ্বারা ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ঢেউল দ্বারা দশম-একাদশ শতাব্দীর ঈশ্বর ঘোষের ঐতিহ্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে। একমাত্র নামসাদৃশ্য ব্যতীত ইছাই ঘোষের সহিত ঈশ্বর ঘোষের অভিন্নত্ব অনুমানের অপর কোন ভিত্তি নাই। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক অনুমানই পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; চেকুরীর স্থান নির্ণয়ও তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বর্দ্ধমান জেলার চেকাক নামক লৌহ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে চেকুরী নাম কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় উত্তর বঙ্গে "সরকার চেকুরী" নামক এক পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন। এদিকে উত্তর আলামের অধিবাসিগণ কুচবিহার, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের কথা ত বাকে সেদিন পর্য্যন্তও "চেকুরী" বা "চকেরী" ভাষা বলিতেন এ সাক্ষ্য স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ার্সনের মত ভাষাতত্ত্ববিদ্ দিয়াছেন (২৯)। ইহারই সঙ্গে স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বর্দ্ধমান জেলার চেকুর কখনই ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনোক্ত চেকুরী হইতে পারে না; 'অটোদা' নদীর সাহায্যেই তাহার "প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণীত হইতে পারিবে।"

"কালিকা পুরাণে" অটোদা ও তৎসন্নিহিত নদনদীর বর্ণনায় লিখিত আছে—

অটোদাখ্য তত্র নদী হিমবৎ প্রভবা শুভা।
যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি ভাগীরথীসমম্।
গৌরী বিবাহ সময়ে সর্ব্বৈ মাতৃগণৈঃ কৃতঃ।
জলাভিষেকো ভর্গস্য অটাস্থেষু যঃ পুরা।

তৈস্তোটৈরেতৎ যন্মাজ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ

• • • •

তত্র স্নাত্বা মহানদ্যাং জয়ন্তীশং প্রতিপূজ্য চ।

তস্যাং নিশি হবিষ্যাশী সংযতস্তাং নিশাং নয়েৎ(৩০)॥"

হিমালয় হইতে যে নদী উৎপন্ন, যে নদী মহানদী বলিয়া পরিচিত এবং যে নদীতে স্নান করিয়া জয়ন্তেশ মন্দিরে পূজা দিতে হয় তাহাই 'জটোদা'। কালিকা পুরাণে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মানস (মানসাই ?) প্রভৃতি নদী জয়ন্তেশ মহাপীঠের সন্নিকটে অবস্থিত। কাজেই জটোদা নদীর অবস্থান যে উত্তর বঙ্গের হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলে একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। স্বর্গীয় হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী "জটাদিকর" নদী জটোদার নাম জলঢাকা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (৩১)। "জটাদিকর" নাম কি জটোদা তীরবর্তী চেকরী নগরীর স্মৃতিও বহন করিতেছে? অসম্ভব নয়। মুন্সী জয়নাথ ঘোষের "কুচবিহার রাজোপাখ্যানে" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়) জটোদার বর্তমান নাম 'মানসাই'। জলঢাকা নদীর নিম্ন ভাগও 'মানসাই' বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 'কালিকাপুরাণের মতে মানস ও জটোদা ভিন্ন নদী। নন্দলাল দে তাঁহার ভৌগোলিক অভিধানে জটোদা নদী বর্তমান জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৩২)। আবার অন্যমতে বর্তমান জয়ন্তেশ মন্দির সন্নিহিত "করতা" নদীই জটোদা (৩৩)। স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় পূর্বে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্তমান গোয়ালপাড়া সহরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত "ধরলা" নদীই জটোদা (৩৪)। কিন্তু পরবর্তী কালে মত পরিবর্তন করিয়া কুচবিহার জেলার গোপালীমারীর প্রান্তদিয়া প্রবাহিত "আত্রিধরলা"কেই জটোদা বলিয়া গ্রহণ করেন (৩৫)। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে জটোদাকে বর্তমান জেলায় খোঁজা নিরর্থক; "জটোদা নদী জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত; ইহার বর্তমান নাম ধাড়দা" (৩৬)। ইংরেজ ভৌগোলিক মেজর রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪-৭৬) জয়ন্তেশ মন্দিরের পূর্বদিক দিয়া Jerdeeker নামক একটি নদী প্রবাহিত দেখা যায়। ইহা হয়ত "জটোদা চেকরীর" অপভ্রংশ নাম। এই সকল নদীই জয়ন্তেশ মন্দিরের নিকটবর্তী এরূপ দেখা যাইতেছে। কাজেই জটোদা নদী তীরবর্তী শৈবতীর্থ জয়ন্তেশ যে খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল তাহা "রামগঞ্জ লিপি" হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গ যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তাহা অবিসংবাদী সত্য। বহুদিন-পূর্বে দিনাজপুর জেলার ধাবোহরপুর গ্রামে কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্তের রাজত্ব কালের কয়েকখানি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছিল। ৪নং ধাবোহর লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে নগরশ্রেষ্ঠী বিভুপাল হিমালয়ের পাদদেশে ভোগগ্রামে কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী এবং নাগ লিঙ্গের পূজা ও সেবারজন্য ভূমি দান করিতেছিলেন। ৫নং ধাবোহর পট্টোলীতে (৪৪৩-৪৪পৃষ্টাব্দ) দেখিতেছি, শ্বেতবরাহ স্বামীর মন্দির সংস্কার জন্য ভূমিদান করিতেছেন অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব এই সবকয়টি লিপি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ভূমি সীমামধ্যে এক দুর্গম প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সম্বন্ধীয়" (৩৭)। ইহাতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পুণ্ড্র-বর্ধন ভুক্তি বা উত্তরবঙ্গের সীমামধ্যে এক দুর্গম প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একলিঙ্গ বিগ্রহের (লিঙ্গরূপী শিবের) সংবাদ পাওয়া যাইতেছে (৩৮)।

উপরোক্ত রামগঞ্জ ও ধাবোহরপুর লিপি হইতে হিমালয়ের পাদদেশে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত চেকরী ও ভোগগ্রামের নাম পাওয়া যাইতেছে। দুইটি একই স্থানের বিভিন্ন সময়ের নাম কিনা তাহা অবশ্যই বলা যায় না। তবে হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তরবঙ্গের শৈবস্থানের পরিচয়ই এই তাম্রশাসনগুলি হইতে পাওয়া যাইতেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এরূপ স্থানের গ্রাম পরিবর্তন সদাসর্বদাই ঘটিয়াছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেও কুচবিহারের নাম পরিবর্তিত হইয়া আলমনগর হইয়াছিল, তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রায় তাহার প্রমাণ আছে (৩৯)। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "চেকরী" উত্তরবঙ্গেই অবস্থিত এবং কোচবিহার জেলায় গোসানীমারীর পূর্বনাম এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (৪০) কিন্তু গোসানীমারী শৈবস্থান নহে, শক্তি পীঠ (৪১)। শক্তি পীঠে শিবের বা বিষ্ণুর অবস্থান থাকিতে বাধা নাই, কারণ সে সকলই পরবর্তী কালের যোজনা। কিন্তু

সোমাসীমারীর তীর্থ মহাত্ম্য কৈ? শৈবতীর্থরূপে তাহার প্রসিদ্ধি কৈ? কাজেই সোমাসীমারী শিবভূমি চেকরী জোড়াগ্রাম হইতে পারে না। দামোদরপুর লিপির সাহায্যে আমরা সন্নিহিত গ্রামগুলির ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শৈবতীর্থের প্রকৃত অবস্থান নির্দ্ধারিত হইবে।

দামোদরপুর লিপিতে যে সকল দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা হইলেন কোকামুখ স্বামী, বেতবরাহ-স্বামী এবং নাগলিঙ্গ। "কোক" শব্দের অর্থ বন্যকুকুর বা নেকড়ে। অর্থাৎ যে দেবতার পূজা করলে বন্য কুকুর বা নেকড়ে বশীভূত হয়, তিনিই কোকামুখ স্বামী। 'কোক' শব্দের আর এক অর্থ বিষ্ণু। দুর্গা কোকমুখা নামে মহাভারতে পূজিত হইয়াছেন। বরাহ তো বিষ্ণুর এক অবতার রূপেই স্বীকৃত। অমোঘ মন্দির হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত মাধবডাঙ্গার ভগ্নস্তূপ যে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বেও বিষ্ণু বা নারায়ণের মন্দির নামে পরিচিত ছিল তাহা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্যান্ডার্স সাহেব তাঁহার সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন (৪২)। ময়নাগুড়ি তহশীলের ২৫ নং তালুকের নাম 'গড়তলি'। "গড়—দুর্গ, তলি—সন্নিহিত অঞ্চল; অর্থাৎ দুর্গের সন্নিহিত অঞ্চল। অমোঘ মন্দির এই তালুকেই অবস্থিত। মনে হয়, অতীতে এখানে একটি দুর্গ ছিল এবং দুর্গের নামেই তালুকের নাম হয়।" ২০নং তালুকের নাম চূড়াবন্দর। "চূড়া-রাজমুকুট; বন্দর = স্থান। প্রবাদ এই যে অমোঘ মন্দিরের চূড়া ঝড়ে এখানে পতিত হয়, তাহা হইতেই এই স্থানের নাম চূড়া বন্দর হইয়াছে।" এখানে প্রকৃত ইতিহাস কিংবদন্তীর আড়ালে লুক্কায়িত আছে। গড়তলি ও রাজমুকুট একত্রে বিবেচনা করিলে দুর্গ ও নরপতির কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। ইহা অকারণ নয় এবং অনৈতিহাসিকও নয়। প্রাচীন চেকরী নগর এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। এই অনুমান আমাকরি উপরোক্ত প্রমাণে অসঙ্গত মনে হইবে না। কারণ ইতিহাসে যুক্তিসঙ্গত অনুমানের স্থান আছে।

তবে এখন যেখানে অমোঘ মন্দির অবস্থিত। পূর্ব্বেও সেইখানে মন্দির অবস্থিত ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত স্যান্ডার্স (D, H, E,—SUNDERS) সাহেবের সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে পশ্চিমদুয়ার বা জলপাইগুড়ি অঞ্চলের গ্রাম বা তালুকগুলির বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণগুলিতে তালুকগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক তথ্য প্রভৃতি জানা যায়। ময়নাগুড়ি তহশীলের ২২ সংখ্যক তালুকের নাম পূর্ব্বতহর। পূর্ব = প্রথমে—প্রথম; তহর—উপাসনা = পূজা করা। এখানে পূর্ব্বতহর (মহাদেব) নামে দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির দেখতে পাওয়া যায়—ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রবাদ এই যে যিনি অমোঘ মন্দির তৈরী করিয়াছিলেন, সেই রাজাই এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন" (৪৩)। "বিশ্বকোষ" মতে—'ড' শব্দের অর্থ 'ডয়তে উচ্চীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ" অর্থাৎ শিব। কাজেই পূর্ব্বতহর অর্থে প্রথম শিব। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে অমোঘ লিঙ্গ আদিতে পূর্ব্ব তহর মন্দিরেই স্থাপিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে "তহর" শব্দের আর এক অর্থ 'নৌকার তলদেশ'। নৌকার তলদেশের মত আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ ডোঙ্গার মত দেখতে যে গ্রাম তাহাই কি ডোঙ্গাগ্রাম? এই অর্থে পূর্ব্বতহর এবং ৪নং দামোদরপুর লিপির ডোঙ্গাগ্রাম এক এবং অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ধনাইকুড়ি, চুকচুকা। জলঢাকা প্রভৃতি নদীর ভগ্নস্তূপ পরিবেষ্টিত পূর্ব্বতহর তালুক দেখিতে এখনও নৌকার খোলের বা ডোঙ্গার মতই মনে হয়। ইহাও আদিতে অমোঘ লিঙ্গ পূর্ব্বতহর মন্দিরে থাকিবার আর এক প্রমাণ। পূর্ব্বতন মন্দির ধ্বংস হইয়া গেলে কুচবিহারের নরপতি প্রাণনারায়ণ লিঙ্গ বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিয়া বর্ত্তমানস্থানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই জন্য পূর্ব্বতহর মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছে জন্য পূর্ব্বতহর মন্দিরের গর্ভগৃহ শূন্য রহিয়াছে। নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সময় তীর্থ মহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য মহারাজা প্রাণনারায়ণ মন্দির প্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী "বড়দা" নদীকে অটোদা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া মনেহয়। কারণ 'বড়দা'র উৎপত্তি হিমালয় পর্ব্বতে হয় নাই; ইহার উৎপত্তিস্থান বর্ত্তমান মন্দিরের অধিক দূরে নহে। কিন্তু জলঢাকা হিমালয় হইতে উৎপন্ন এবং প্রকৃতই মহাবেগী, ইহার ভূটানের পার্ব্বত্য অঞ্চলের নাম

'দি-হু (৪৪)। "বোডো ভাষায় দি-তল; দু জল। অর্থাৎ অনেক জল বা মহানদী। জলঢাকা পূর্বতটের মন্দিরের অদূরে প্রবাহিত হিমালয়োৎপন্ন নদী—ইহাই তাম্রশাসনোক্ত অটোদা।

জলেশ লিঙ্গ অনাদি লিঙ্গ বলিয়া পরিচিত; ৪নং ধামোদরপুর লিপির "নাম লিঙ্গ-ও" শিবলিঙ্গ। উভয়ের প্রাচীনত্ব সন্দেহের অবকাশ রাখে না। দুইটীই উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। এই জন্য উভয়কে, পৃথকভাবে উল্লিখিত হইলেও, এক এবং অভিন্ন লিঙ্গ বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতে স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ হয়। এই অনুমান সত্য হইলে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও জলেশ লিঙ্গ বিগ্রহের প্রসিদ্ধি ছিল। অন্যথায় "অযোধ্যা-বাসী কুলপুত্রক" "অমৃতদেব" মন্দির সংস্কার করিবার জন্য পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত হিমালয়ের পাদদেশে ভূমিদান করিতে আসিবেন কেন? পরবর্তীকালে, দশম একাদশ শতাব্দীতে মহাযানী ঐশ্বরঘোষ অটোদা নদী তীরবর্তী 'চেকরী' নামক স্থানে অবস্থিত ভগবান শঙ্করের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্তও "ওটাদিকর" বা Jerdecker যে প্রাচীন 'অটোদা-চেকরীর' স্মৃতি বহন করিত একথা রেনেলের মানচিত্রে এবং হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর ইতিবৃত্তে প্রমাণিত হয়। অধুনা বিস্মৃত উত্তরবঙ্গের নরপতিগণের সমর্থন-পুষ্ট ছিল জন্যই জলেশমন্দির এত প্রসিদ্ধি ও তীর্থমর্যাদা লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে কোচবিহার নরপতি-গণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে জলেশমন্দির নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছিল মাত্র।

এই প্রসঙ্গে জলেশ শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তর বঙ্গে প্রচলিত কিংবদন্তীটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বনে গমন করিয়া গরুর দুধ দেওয়া এবং স্বপ্নাদেশের সঙ্গে শিবের উৎপত্তির যে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়, তাতে নৃতত্ত্বের কিছুই নাই। বাংলা দেশের অধিকাংশ শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধেই এই ধরণের কিংবদন্তী প্রচলিত। তাহা হইলেও এই সকল কিংবদন্তী ঐতিহাসিকের কাছে একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। কোন কাহিনী, প্রবাদ বা কল্পনা যখন লোকচিত্তে শিকড় বিস্তার করিয়া থাকে, তখন মাটিতেও তাহার মূল থাকা সম্ভবপর। সুতরাং মনে হয়, এই সব প্রাগৈতিহাসিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যত শিকারীগণ যে এতদঞ্চলে বাস করিত, পশু শিকার করিয়া এবং অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহা কল্পনা করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। হিংস্র পশুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য আদিম মানবগণ যে সকল দেবতার কল্পনা করিত তাহার সহিত বৃক্ষ, বনস্পতি, পর্বত ও অরণ্য জড়িত ছিল। ধামোদরপুর লিপিতে উল্লিখিত দেবতা সকলের নামেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করিয়া মানুষ যখন স্থায়ী ও উন্নত সভ্যতার স্তরে উপনীত হইল তখন পশুপালক আদিম মানব জাতি যে দেবতার শরণাপন্ন হইল, তিনি পশুপতি শিব। আদিম মানব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত বলিয়াই শিব অনাদি লিঙ্গ; জলেশ সম্বন্ধেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য, শিকড় এত গভীরে বলিয়াই জলেশ লিঙ্গ শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরই উপাস্য দেবতা।

শিব যে ভারতীয় বৈদিক দেবসমাজে বহিরাগত দেবতা তাহা মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতেও দেখা যায়। "মহাভারতের" শান্তি পর্বের ২৮২ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে। ঐ যজ্ঞে শিব ব্যতীত সকল দেবতারই নিমন্ত্রণ হওয়ায় পার্বতী ক্ষুব্ধ হইয়া শিবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শিব বলিলেন—

"যজ্ঞেষু সর্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ। ২৮
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ষতঃ। ২৯"

অর্থাৎ পূর্বকাল হইতে দেবতারা যে বিধান করিয়া-ছেন তাতে কোন যজ্ঞেই শিবের ভাগ কল্পিত হয় নাই এবং শিবও কোনদিনই ভাগ লইতে যান নাই।

স্বামীর অনিমন্ত্রণে দেবীর দুঃখ দেখিয়া আত্মমাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য যজ্ঞভাগ আদায় করিতে শিব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের পৃষ্ঠপোষক দক্ষ বলিলেন "সন্তি নো বহবঃ রুদ্রাঃ ভূতহন্তা কপর্দিনঃ, তুমি ইহাদের মধ্যে কোন্ জন?" যজ্ঞভাগ না পাইয়া শিব যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন; তখন হইতে ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন শিবকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হইবে। এখানে যজ্ঞধ্বংস আছে। কিন্তু দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ নাই; পার্বতী

আছেন, কিন্তু তিনি হাকাইটী নহেন এবং যজ্ঞে তিনি দেবভাগও করেন নাই। শিব যে বাহির হইতে আগত দেবতা তাহা পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"এই শঙ্কর নামক আগন্তুক আমাদের অপেক্ষা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ? (৪৫)

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে শিবলিঙ্গ পূজারও সূত্রপাত দেখা যায়। সেই সুদূর অতীতকাল হইতে এ পর্যন্ত সকলই শিব অপ্রতিহত শক্তিতে জন সাধারণের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু গ্রামে গ্রামে যে শিব দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই; তিনি অনাদি লিঙ্গ মূর্ত্তি। ঘরে ঘরে ভক্তিমতী রমণীগণ যে শিবমূর্ত্তি গড়েন, তাহাও আদীর লিঙ্গ মূর্ত্তি। শিবের অনাদি মূর্ত্তি মানবইতিহাসের আদিম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত তবুই জল্পেশ মন্দির উত্তরবঙ্গে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

পাদটীকা :

১। Jalpaiguri Distrit Haud Book—A. Mitra—p 148-49

২। জল্পেশ মহাপীঠ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ৩৮ পৃঃ

৩। The Rajbansis of North Bengal—Dr. Charuchandra Sanyal-p 149.

৪। An Anaint Dejree of North East—P. C, Dasgupta—Amrita Bajar patrika Magazine—12th January, 1969,

৫। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—৺দুর্গাচরণ সান্যাল ১৪৭ পৃঃ

৬। The Corch Behar State and its Land reforms—H.N. Chouduri—p 218.

৭। বাঙ্গালার গৌরব—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত ৬৫-৬৬ পৃঃ, বাঙ্গালীর ইতিহাস ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় আদিপর্ব—৭১২ পৃঃ

৮। জল্পেশ মহাপীঠ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ২ পৃঃ

৯। The Cooch Behar State etc—Harendra Narayan Chouduri—P 417

১০। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ৬৮-৬৯ পৃঃ

১১। পুরাণ প্রবেশ—গিরীন্দ্রশেখর বসু ১৮ পৃঃ

১২। পুরাণ প্রবেশ—গিরীন্দ্রশেখর বসু ২০ পৃঃ

১৩। Ram Charitam—Vorendra Research Soceity Edition—Introduction—P—XXIX; Chatter—II, Verse 30-34.

১৪। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—৺নগেন্দ্রনাথ বসু রাজন্যকাণ্ড ২০৩ পৃঃ

১৫। ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত ১২ পৃঃ

১৬। Ram Charitam V.R.S. Edition—Introduction P XVIII : গৌড় লেখমালা ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—১৪৭ পৃঃ

১৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় আদিপর্ব ২৯১ পৃঃ

১৮। Inscriptions of Bengal—N. G. MaJumder—vol-III—Introduction—P xxi

১৯। ভারতবর্ষ—১৩৬৩, ফাল্গুন, ৩১৩-১৪ পৃঃ

২০। ভারতবর্ষ—১৩৬৩ ফাল্গুন, ৩১১-১২ পৃঃ

২১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় আদিপর্ব ২৮২ পৃঃ

২২। জল্পেশ মহাপীঠ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ৩৪ পৃঃ

২৩। জল্পেশ মহাপীঠ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ৩০-৩১ পৃঃ

২৪। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ—২০৪ পৃঃ

২৫। "They are Austric, rather Than Mongoloid,—Local Pre-Arian People"—Kirata—Jana—Kriti—Dr. Suniti Kumar Chatterjee—P 62

২৬। Inscriptions of Bengal—N. G. Majumder—vol III—p 154

২৭। সাহিত্য—১৩২০, বৈশাখ ৩৯ পৃঃ পাদটী কা।

২৮। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ ২১৭ পৃঃ

২৯। The Linguistic Survey of India—vol—V, port—I—p 4

৩০। কালিকা পুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (বঙ্গবাসী) ৪৯৭ পৃঃ

৩১। The Cooch Beher State etc—H.N Choudhuri—p 209-10
৩২। Indian Antiquary—1922,Supplment —p 81
৩৩। Jalpaiguri District Gezatter—p 152
৩৪। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্য কাণ্ড ২০০ পৃঃ
৩৫। Social History of Kamrup—N. N. Basu—vol—I—p 214-15
৩৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—৪র্থ সংস্করণ ৬১৪-১৫ পৃঃ
৩৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় আদিপর্ব্ব ২৭০-৭১ পৃঃ
৩৮। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় আদিপর্ব্ব ৬০২ পৃঃ
৩৯। ইতিহাস—৭ম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা ১৪৯-৫০ পৃঃ
৪০। Social History of Kamrup N, N,Basu vol I-p 214
৪১। কোচবিহারের ইতিহাস—খান চৌধুরী আমানত উল্লা ৫২ পৃঃ
৪২। Madha—The Hindu God Krishna, dangi = high land. This is a shrine of his God on a peice of high land in the taluk, which is named after him. D. H. E. SUNDER'S Report as quoted in the Jalpaiguri District Hand Book—Jalpaiguri,Appendix—V p·cxciii
৪৩। District Hand Book—Jalpaiguri, A. Mitra, Appendix—V-cxcii
৪৪। Sikkim and Bhutan—I. Clande White (1909)—p 3
৪৫। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—বঙ্গবাসী সংস্করণ—২৪ অধ্যায়

সংস্কৃতিনায়ক দিলীপকুমার

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৫৩৩ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে এক শোচনীয় গতানুগতিকতা ও অবক্ষয় দেখা যায়। পরবর্তী প্রায় আড়াই শো বছরের মধ্যে সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। সূর্য অস্ত যাবার পরেও যেমন গোধূলির হাল্কা আলোয় পশ্চিম নভোপট বহুক্ষণ আলোকিত থাকে, তেমনি চৈতন্যদেবের প্রভাব বহুকাল যাবৎ সক্রিয় ছিল। কিন্তু সারা দেশের মনোজগৎ যে অন্তঃপতনের অমানিশায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল তা বুঝবার অবস্থায় বশ বাঙালির সেই অন্ধকার দূর করার কোন উদ্যম ছিল না।

১৭৭৪ সালে রামমোহনের জন্মের সঙ্গে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হল যিনি নিজের মহিমায় সংস্কৃতি জগৎকে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ। এই সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে পর পর কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাধর মহাপুরুষ আবির্ভূত হলেন যাঁরা শুধু বাংলাদেশকে কাঁপিয়ে তুলে চমকে দিলেন তাই নয়, বহির্বিশ্বকেও যে বাঙালির কিছু দেবার ও শেখাবার আছে তা প্রতিপন্ন করলেন নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টি-সামর্থ্যের জোরে। ১৭৭৪-১৯৬৯, এই প্রায় দুশো বছরের মধ্যে মরা গাঙে জোয়ার আসার মতো পর পর অনেক কৃতী পুরুষকে বাংলাদেশে দেখা গেছে বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে জাতি সংগঠক বলতে পারা যায় মাত্র কয়েক জনকে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাঁরা আধুনিক বাঙালি জাতির ভিত্তি গঠন করলেন তাঁদের সংস্কৃতি নায়করূপে অভিহিত করা যায়। তাঁরা হলেন সময়ের হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, বিনয়কুমার, মানবেন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র। দেশের মধ্যে এবং বাইরে এঁরা বাঙালি জাতির প্রভাব বিস্তার করেছেন যা চৈতন্যদেবের পর দীর্ঘকাল বাঙালির পক্ষে করা সম্ভবপর হয় নি।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে এই প্রাণবত্তা অবসিত হয়েছে। ১৭৭৪-১৮৯৭ সালের অর্থাৎ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতির বর্তমান শোকাবহ অবক্ষয় নিয়ে বিলাপ ক'রেও কোন লাভ নেই। ইংরেজ শাসনের পটভূমিকায় বাঙালির এই নবীন ভাবআন্দোলন ও কর্ম-প্রচেষ্টার ধারায় আগত শেষ মহাপুরুষও সংস্কৃতি নায়করূপে এখন অবশিষ্ট আছেন একমাত্র দিলীপ কুমার রায় যিনি বাঙালি জাতির শেষ কুলপ্রদীপ বা দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স্।

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পৌত্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার বাঙালি অভিজাত সম্প্রদায়ের শেষ গৌরবান্বিত প্রতিনিধি। আবির্ভাব-কালের দিক থেকে সময়ের বিচারে তিনি সুভাষচন্দ্রের চেয়ে মাত্র বিশ বছরের বড়, আক্ষরিক অর্থে তাঁর সম-সাময়িক। আধুনিক বাঙালি জাতির অন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই শেষ সংস্কৃতি নায়কের মহা গৌরবময় দানসম্ভারের মর্যাদা বাঙালিকে আগামী কালে সশ্রদ্ধ চিত্তে উপলব্ধি করতে হবে। এখন একমাত্র তিনিই পারেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালিকে নেতৃত্ব দিতে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা গানের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে দিলীপকুমার প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন। বহির্ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের সুপ্রচার করেও তিনি যশস্বী হন বটে, কিন্তু বহির্বঙ্গে বাংলা গানের মাধুরী বিতরণ ক'রে এই সুগায়ক কবি-সুরকার সঙ্গীতের বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান ক'রে দিয়েছেন। দেশের মধ্যে অতুল-প্রসাদ ও নজরুলের গান তিনি প্রথম জনপ্রিয় ক'রে

তোলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওস্তাদি বা ক্লাসিক্যাল চেয়ে যে কথা ও সুরের গুণ সমন্বয়জাত বাংলা গানের মর্যাদা অনেক বেশি, এ-কথা প্রমাণ করা তাঁর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। বাংলা গানকে বহু বৈদেশিক সুরের আবাহন ক'রে তিনি সমৃদ্ধতর করেছেন, তাতে নব সৃষ্টির পথ প্রশস্ত ক'রে অভিনব উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন, সেটাও স্মরণীয়।

বাংলাদেশে দিলীপকুমারের প্রথম অভ্যুদয় সঙ্গীতজ্ঞ রূপে। কিন্তু সাঙ্গীতিক সাফল্যের জন্যেই তিনি সংস্কৃতি নায়ক, এমন নয়; সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা-দৃষ্টির পরিচায়ক অনায়াস পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ রসোচ্ছ্বসিত রচনাবলী প্রমাণ করে যে, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এত বড় শিল্পিকুশল সর্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা দেশে কখনও জন্মগ্রহণ করে নি।

একথা ঠিক যে, দিলীপকুমারের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সঙ্গীতে হয়েছে। সুরস্রষ্টারূপে তাঁর কৃতিত্বের কোন তুলনা নেই। গায়করূপে আজ পর্যন্ত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান পাওয়া যায় নি। বহু ভাষায় বহু রকমের গানে তাঁর অবাধ শ্রুতিমধুর সকরুণ ও অসীমাভিসারী সুরবিহার কলারসিক ও ভক্তকে সমভাবে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি ব'লে আশঙ্কার কারণ আছে যে, ভবিষ্যতে তাঁকে মনীষী লেখকরূপে যত লোক সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে স্মরণ করবে, তাঁর সুর ও গায়কীর পরিচয় তত লোক পাবে না। তার কারণ, অন্তরালে একটি বড় প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় না থাকলে কোন সুরকারের সুর বা গায়কের গায়কী তাঁর তিরোভাবের পর অব্যাহত বা প্রচলিত থাকা একরকম অসম্ভব। দিলীপকুমার তাঁর বিস্ময়কর কণ্ঠস্বর ও অনুপম গীতিভঙ্গি নিয়ে অন্তর্হিত হবার পর ভবিষ্যতে সাধারণ লোকে জানতে পারবে না তাঁর গায়কী কেমন ছিল। আর তাঁর সুর স্বরলিপির সাহায্যে নির্ভুলভাবে গেয়ে অব্যাহত রাখার মতো কোন সম্প্রদায় বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্যবশত এখনও গঠিত হয় নি।

সঙ্গীত ও লেখনী সাধনার ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতিনায়ক মহাপুরুষের দান এত বিরাট যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার সব দিক আলোচনা করতে হলে একটি বড় বই লেখা দরকার। দিলীপকুমার স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁকে নিয়ে গবেষণা ক'রে দুচারজন বিশ্ববিদ্যালয়-বীর অনায়াসে ডক্টরেট পেতে পারেন। কারণ, দিলীপকুমার রায় বলতে বোঝায় এমন এক ব্যক্তিত্বশালী বৃহদ্ভর মহামনীষীকে যিনি সঙ্গীতজ্ঞ-গায়ক সুরকার কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিক গল্পকার প্রাবন্ধিক ভ্রাম্যমাণ ছান্দসিক পণ্ডিত মনীষী অনুবাদক পত্রসাহিত্যিক বক্তা প্রেমিক সাধক কথক ভক্ত যোগী গুরু সবই একাধারে। এমন এক বহুমুখী ব্যক্তিত্বের কথা বলতে বসাও স্পর্ধা ও বিড়ম্বনার বিষয় এই অঙ্গে যে, এর ফলে অন্ধের হস্তীদর্শন ও হস্তীবর্ণনার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিলীপ কুমারের সমস্ত জীবন ও শিল্প সৃষ্টি একটি মহৎ আধ্যাত্মিক চেতনায় বিধৃত। তাঁর সঙ্গীত ও সাহিত্য সবই এক অধ্যাত্ম জ্যোতির দিব্য স্ফুরণ। দিলীপ কুমারের শিল্পী সত্তার উন্মেষ হয়েছে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির প্রতিষ্ঠাভূমি থেকেই। সুতরাং তিনি যখনই শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তখনই তা একপক্ষে বিমল আত্মচৈতন্যের জ্যোতির্ময়ী দীপ্তি হয়ে উঠেছে। তিনি নিজে ভক্ত সত্তার বিকাশের খাতিরে শিল্পী সত্তাকে বিসর্জন দিতে চাইলেও তাঁর ভক্ত হৃদয়ের প্রকাশ অনায়াসসিদ্ধ শিল্পরূপ লাভ ক'রে সুষমাময়।

দিলীপকুমারকে বর্তমান বাংলাদেশের সংস্কৃতি নায়ক বলা এই অঙ্গে সঙ্গত যে, জীবনের সব ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির সব অঙ্গে তিনি শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। ললিত কলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখন তিনিই সবচেয়ে বড় প্রতিভা। সাধারণত বড় শিল্প প্রতিভার কর্মের দিকটা ক্ষীণ নজরে হয়ে থাকে। কিন্তু দিলীপকুমারের কর্ম-শক্তির অসামান্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল পুনার হরিকৃষ্ণ মন্দির। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কথা বাদ দিলে আর কোন বাঙালি গায়ক ও সাহিত্যিকের কর্ম-ক্ষমতার এত বড় উদাহরণ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। বড় প্রতিভা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে যদি তাকে ঘিরে একটি গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায় গ'ড়ে ওঠে। দিলীপ কুমারকে কেন্দ্র ক'রে একটি কবি গোষ্ঠী ও একটি ভক্ত সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। আশা করা যায়, অচিরে একটি সঙ্গীতজ্ঞ-সমাজও তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আত্ম প্রকাশ করবে। অর্থাৎ তিনি একা তিনটি সম্প্রদায়ের প্রেরণা

স্মরণ থাকবেন। এমন কৃতিত্ব যাঁর, তিনি এদেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি নায়ক।

ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কেবল গানে ও লেখায় হয় না, আরো অনেক ভাবে হতে পারে, দিলীপ কুমারের ক্ষেত্রে হয়েছে। দিলীপ কুমারের ব্যক্তিপুরুষটির কথা বলতে হলে—তাঁর অভিজাত্য, বংশ মর্যাদা, ছাত্র জীবনের সাফল্য, প্রণয়লীলা, মুখিষ্ট হাসি, সরল ভাষণ, সরল কথন, গভীর ভাবুক চাহনি, উদার ক্ষমাশীলতা, মধুর প্রকৃতি, চির-তারুণ্যের কমনীয় উজ্জ্বলতা, সহজ—মনোরম বাস্তবী বৎসলতা অথচ মুকঠোর ব্রহ্মচর্য ও চিত্ত সংযম, আদর্শের জন্যে সর্বস্বপণ, চিরকৌমার্য, দুই যুগব্যাপী কারাবাসের মতো কঠোর সাধনাময় আত্মনিবাস—এ-সবের কথা বলতে হলে লিখতে হবে বাস্তবের চেয়েও বাস্তব উপন্যাসের পর উপন্যাস পর কাহিনী গল্প হলেও সত্যি, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা সব সময়ে মিলবে না।

যদি দিলীপকুমারের বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনাবলী মাত্র আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ করা হয়, তা হলে তাঁর জীবনী রবীন্দ্র-জীবনীর চেয়ে ক্ষুদ্র হবে না। তাঁর বান্ধব ও বান্ধবীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ; তাদের মধ্যে সব বয়স, শ্রেণী, জাতি, সমাজ ও ধর্মের লোক আছে। পরিচিতির এমন বিস্তৃতি কোন জননায়কের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয়। ব্যক্তি-ত্বের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব যে কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, তা দিলীপ কুমারের জীবন-কাহিনী ও প্রভাবের পরিসীমা আলোচনা না করলে বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। চাকর-বেয়ারা-দারোয়ান থেকে কোটি পতি-সমাজপতি-রাষ্ট্রপতি-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মহারাজ-মহারাণী পর্যন্ত সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সমান স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছন্দ। দুর্লভ আত্মসিদ্ধি ভিন্ন এ-ব্যবহারসাম্য অর্জন করা অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যদেবের পর এমন সর্বভূতে প্রীতি দেখা গেছে কিনা, সন্দেহ।

দিলীপকুমার বাঙালি জাতিকে অজস্র পরিমাণে দান করেছেন, যেমন দিয়েছেন বহির্বিশ্বকেও। বাইরের জগৎ তাঁর গুণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একশো জনের মধ্যে স্থান দিয়ে। বাঙালি কি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা তাঁকে দিতে পেরেছে আজও? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সবাইকে দিতে হবে আজ কিম্বা আগামীকাল।

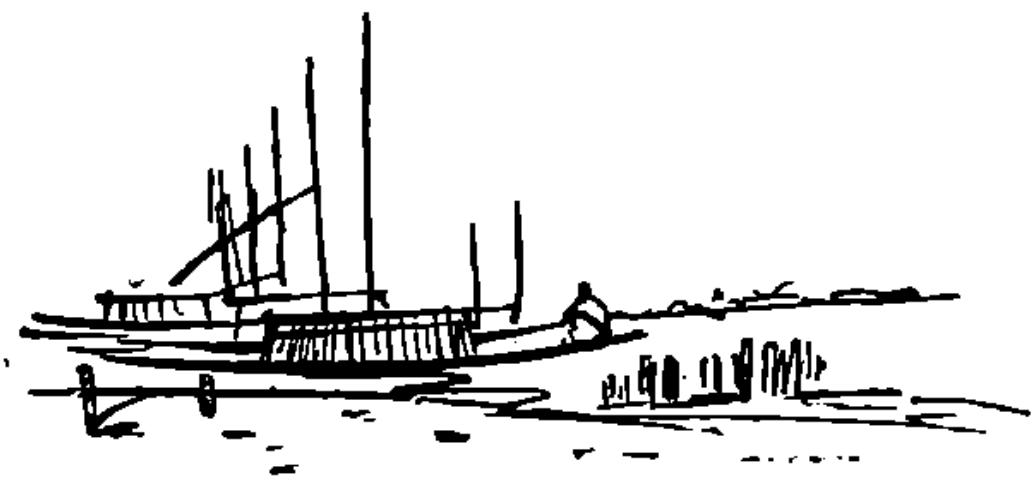

সুরাচার্য

প্রশ্ন উত্তর ও বিচার

১। সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা—২৪

আপনি শারদীয় সংখ্যার কুপন পাঠাইয়াছেন। এই সংখ্যায় ব্যক্তি গত ডাক যোগে উত্তর দেবার কথা জানান হয় নাই। কাজেই আপনাকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মাধ্যমে উত্তর দিতেছি।

ক। আপনার—তৃতীয় স্থান রাহু শনি দৃষ্ট। তৃতীয়াধিপতি নীচ রাহু যুক্ত, তৃতীয়স্থ বৃহস্পতি গ্রহ—ষষ্ঠাধীশ শনি দৃষ্ট কাজেই আত্মীয় সুখ বিশেষ পাইবেন না। বিচ্ছেদ হইলে ত শেষ হইয়া যাইত, বিচ্ছেদ না হইলেই বা সুখ কোথায়?

খ। আপনার সন্তান ভাগ্য মন্দ নয়। তাই বলিয়া সন্তান সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা কি এড়াইতে পারিবেন? আপনি গোমেদ ও মুক্তা ধারণ করিলে ভাল হয়।

২। শ্রীচারুমোহন চক্রবর্ত্তী, এডভোকেট, কলিঃ ১১

ক। আপনি খানিকটা দেনা শোধ করিতে পারিবেন। কিছু থাকিয়াই যাইবে মনে হইতেছে।

খ। আপনার রাহুর দশার অবসান হইতে প্রায় ৮ মাস বাকী। ইহার পর বৃহস্পতির দশা পড়িবে। বৃহস্পতির দশা প্রশংসনীয় নয়। তথাপি গোচরে শনি লাভস্থ হইলে অর্থাৎ বৃষরাশিতে অবস্থান করিলে এবং বৃহস্পতিগ্রহ বৃশ্চিক রাশিতে সরিয়া যাইলে আপনার আর্থিক উন্নতি হইবে। সাধারণ হিসাবে আপনার অর্থভাগ্য ভাল।

৩। শ্রীকল্যাণকুমার বাগচী—নালকিয়া, হাওড়া

ক। আপনি আষাঢ় মাসের কুপন দিয়াছেন। ইহাতে ব্যক্তিগত উত্তর ডাকে পাঠাইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষ পত্রিকা মারফৎ উত্তর দিতেছি। আপনার অর্থোপার্জ্জন যোগ ভাল, কাজেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আশা করিতে পারেন।

খ। বিবাহ সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার বিশদ আলোচনার জন্য সাক্ষাৎ আলাপ প্রয়োজন।

৪। ডাঃ পঞ্চানন রায় এম ডি, এইচ এম এস সি, (হোমিও) বরগোসাই, আসাম।

আপনি আষাঢ় মাসের কুপন পাঠাইয়াছেন। ডাক-যোগে ব্যক্তিগত উত্তর দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষ পত্রিকা মারফৎ জবাব দিতেছি।

আপনার বয়স জানাইয়াছেন ৫৭ হইতে ৬০। এই বয়স অনুযায়ী জন্মচক্রের যে গ্রহসংস্থান লিখিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। আমার মনে হয় আপনার জন্মবৎসর ১৯০৪ কি ১৯০৫। আপনি সঠিক ইংরাজি কি বাংলা তারিখ না জানাইলে এই চক্রের দ্বারা আপনার প্রশ্নোত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি কোন্ তারিখে কটার সময় প্রশ্ন লিখিয়াছিলেন জানাইলেও উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত। হাতের ছাপ পাইলেও কতকটা জবাব দিতে পারিতাম। কাজেই এইগুলি দিয়া পরের বার প্রশ্ন করিতে পারেন যদি

একান্ত জন্মদিন তারিখ সময় ইত্যাদি না জানা থাকে।

৫। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীরামপুর।

আপনি কার্ত্তিক মাসের কুপন পাঠাইয়াছেন। এই মাসে ডাকযোগে ব্যক্তিগত উত্তর দিবার কথা নাই। কাজেই ভারতবর্ষ মারফৎ উত্তর দিতেছি।

ক। আপনার নিয়োজিত অর্থ সম্পূর্ণ ফেরৎ পাওয়া সম্ভব মনে করিনা। যেটুকু পাইবেন তাহাতেও যথেষ্ট সময় লাগিবে। আপনার দ্বিতীয়স্থ নীচস্থ রাহু অর্থ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি কারক। আপনি ৭৮ রতির গোমেদ ধারণরীতি পূজা করাইয়া পরিলে ভাল করিবেন।

খ। মৃত্যুর চিন্তা করিয়া লাভ কি?

উহাকে উহার সময় মত আসিতে দিন। দুশ্চিন্তা করিয়া উহার পথ সুগম করিবেন না। ঈশ্বর চিন্তায় ডুবিয়া যান। অনেক মুস্কিলের আসান হইবে সন্দেহ নাই।

৬। কুমারী সুস্মিতা দত্ত। আগরাবাজার। উড়িষ্যা

১। আপনার ১৯৭০ সালে বিবাহের যোগাযোগ রহিয়াছে। ১৯৭১।১৯৭২ সালেও এই সম্বন্ধে যোগাযোগ দেখা যায়। 'শুভস্য শীঘ্রং' জানিয়া অযথা বিলম্ব করিবেন না।

দাম্পত্য জীবন মোটামুটি। আপনার কোষ্ঠীতে ভৌমদোষ আছে, কাজেই কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহ—বাঞ্ছনীয় মনে করি।

৭। শ্রীমতী আরতি ব্যানার্জ্জী, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা

১। আপনার স্বামীর কপমুক্ত হইতে বহু সময় লাগিবে। সত্বর কিছু হইবে বলে মনে হয় না।

২। উহার দুশ্চিন্তা বাড়াইয়া শরীর খারাপ করিবেন না। স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করুন। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীরোগের চিকিৎসার প্রয়োজন হইতে পারে। আপনি ৭৮ রতি প্রবাল ধারণ করুন।

৮। শ্রী এম পালিত। ইন্দ্রপুর রোড, পাটনা।

আপনি শারদীয় সংখ্যার কুপন পাঠাইয়াছেন। এই সংখ্যায় ডাক যোগে ব্যক্তিগত উত্তর দিবার কথা জানান হয় নাই। কাজেই ভারতবর্ষ পত্রিকা মারফৎ উত্তর দিলাম।

আপনার জন্মচক্রে দেখিলাম অধিকাংশ গ্রহই ষষ্ঠ ও দ্বাদশে। কাজেই উন্নতি করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে। বর্ত্তমান সময় মোটেই ভাল নয়। নানা কারণে অর্থব্যয় দেখা যাইতেছে এবং জাতি আত্মীয় কারণে বিশেষ সুখ দেখিবেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পর্য্যন্ত চলিবে। ইহার পর বুধ রাহু হইতে কিছুটা তেজ শক্তি বৃদ্ধি হইবে। অন্ততঃ বৎসর কাল, দেখিতেছি, যা কিছু করিয়াছেন সবই জলে ঘি ঢালা হইয়াছে। এখন নূতন কিছু করিবার প্রয়াস করিবেন না। আগামী মার্চ মাস হইতে কিরূপ সুযোগ আসে দেখুন তারপর সেগুলি সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন। বগড়া বিবাদ যতটা পারেন কম করুন। তেজ প্রতাপ দেখাইতে দেখাইতে অর্দ্ধেক জীবন পার হইয়া গেল। নিজের সম্বন্ধে কিসে ভাল হয় সেই দিকে চিন্তা করুন। আপনার শেষ জীবন ৫২ বর্ষ হইতে ভালই দেখিতেছি।

৯। শ্রীলালমোহন সিংহ—ত্রিপুরা আপনার প্রশ্নের জবাব ডাকে চলিয়া গিয়াছে। আশা করি সময়ে পাইয়া গিয়াছেন।

১০। শ্রীমান দীপঙ্কর চৌধুরী, হাওড়া—তোমার বয়স খুবই অল্প। এই বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করা ঠিক্ নয়। যদি তোমার অভিভাবক ইচ্ছা করেন তিনি তোমার জন্ম সময় তারিখ ইত্যাদি জানাইয়া প্রশ্ন করিতে পারেন। তুমি মন দিয়া পড়, নিশ্চয় পাস করিবে এবং শরীরের দিকেও যথা সম্ভব দৃষ্টি রাখ কোনরূপ অসুস্থতা যাহাতে না হয়। মনে রাখিও আত্ম চেষ্টায় মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। লাগাও পড়া আর স্বাস্থ্য রক্ষা আর বড় কথা কি?

১১। শ্রীসুব্রত ব্যানার্জী, কলিকাতা—৪, ক—বিদেশ ভ্রমণের (Foreign) যোগাযোগ কম। ২৪ হইতে ৩০ বৎ কাল মধ্যে চেষ্টা করিতে পারেন।

খ—আপনার কোষ্ঠীতে লগ্নস্থ—দশমপতি গুরুর একত্রাবস্থান হেতু রাজযোগ অর্থাৎ বিশিষ্ট ভাল যোগ আছে। কিন্তু উহা অষ্টম স্থানে হওয়ায় সুফল পাইতে অনেক কাঠ খড় পোড়াইতে হইবে। আপনার বুদ্ধি ধীর্য্য ও একাগ্রতার সহিত অগ্রসর হউন, ভবিষ্যতে ভালই উন্নতি হইবে। আপনার কেমদ্রুম যোগ আছে এবং দশমে প্রজাপতি গ্রহ অবস্থিত। কাজেই জীবনে কয়েকবার

reverse হইবে। অধিক তেজ বিক্রম বা অতিবুদ্ধি চালিলে বিপদের আশঙ্কা। প্রায় বৎসর খানেক যাবৎ শনি মেষ রাশি ত্যাগ করিয়া বৃষ রাশিতে যাইবে। শনি বৃষে থাকা কালীন আপনার অনেক দিক দিয়া সুবিধা হইবে।

কয়েকটি কথা—

১। বর্তমান বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যক্তিগত ডাকযোগে উত্তর দেওয়া হইতেছে না। তথাপি অনেকে ডাকটিকিট পাঠাইয়া ব্যক্তিগত উত্তরের অনুরোধ করিতেছেন। কুপন পাঠাইলে প্রশ্নের উত্তর কেবল ভারতবর্ষ পত্রিকা মারফৎ দেওয়া হইবে। অবশ্য কেহ যদি কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইবার জন্য বা ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাবের জন্য খরচ করিতে রাজী থাকেন, তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে।

এইরূপ ইচ্ছা হইলে, ডাকটিকিট যুক্ত খাম পাঠাইবেন।

মহাকবি মধুসূদন

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(জন্মদিন ২৫শে জানুয়ারী)

বাঙলাদেশে জন্মেছিল শক্তিমন্ত একটি বিরাট্ কবি!
কেউ ছিল না সমকক্ষ, কেউ হবে না সুদূর ভবিষ্যতে!
ছন্দ ভাষা শব্দযোজন বাক্‌বিভূতি অপূর্ব্ব তার সবি!
প্রাক্তনতার পন্থা ছেড়ে চললো নিজের আবিষ্কৃত পথে!
হর্ষে কর্ষে চালচলনে মনঃপ্রাণে মানতো স্বতন্ত্রতা;
দেখতে যাহা পায়নি কেহ, সে যেন তার প্রখর পেলো দেখা!
গড়তে উদার জাতীয়তা ভাঙলো অনেক কুপমণ্ডূকতা!
তার প্রতিভা কল্পরথে তিনটি ভুবন করতো ভ্রমণ একা।

শুধু ছাটি বছরমাত্র করলো কাব্য সরস্বতীর ধ্যান;
লক্ষ্মীকে খুব করতো হেলা, যাবজ্জীবন তাই পেয়েছে সাজা!
এবং বুদ্ধি বেজায়, সহায় ছিল অনেক ভাষার জ্ঞান;
বাঁচায় শুধু বিদ্যাসাগর, নইলে জীবন হোতো ভাজা-ভাজা!
দান-দাতব্য চলতো আবার, ঘরে খাবার থাক্-বা না থাক্
পুঁজী!
চণ্ডড়া বুকে অসীম দয়া, বেহিসাবী, হোক্ তবু সে বড়!
দাতব্য আরোগ্যালয়ে মৃত্যু হোলো নেহাৎ সোজাসুজি!
বলিষ্ঠ সেই দেহের মাঝে মনটা আবার নয় তা তেমন দড়!
সস্তা যশের মৌলতে আজ ঢের লেখকের হোক্ না বিরাট্
বাড়ী
খুব তারা খদ্যোতিকা, আর তুলনায় এরা স্বল্পায়ী,
মরার পরেই ডুবছে মানুষ কিন্তু তবু বেজায় অহঙ্কারী!
মহাকালের দরবারে এই মহাকবির আসন চিরস্থায়ী।
তীব্র জ্ঞানের উন্মাদনায় ধাতস্থ সে করলো অনেক কিছু;
কাব্যে এনে ওজস্বিতা করলো ভাষার মেরুদণ্ড সোজা;
রক্ত মাংসে মিশলো কবি, উন্নত শির হয়নি তাতে নীচু;
হলো এমন মধুচক্র, যুগযুগান্তর চলবে সুধা খোঁজা!
খৃষ্টধর্ম শ্রেষ্ঠ মেনে হয়নি মধু হিন্দুধর্মত্যাগী,
উচ্চাকাঙ্ক্ষা করলো পাগল, ভ্রান্ত পথে অনুতপ্ত শেষে;
বাইরে উগ্র পাক্কা সাহেব, অন্তরেতে হিন্দু অনুরাগী;
শান্তি পেতে জানেনি তাকে, ওই প্রতিভাই এমনি সর্ব্বনেশে!
মন কিছুতেই বাগ্ মানেনি, তাই অকালে মরতে হোলো
তাকে!
অভাব তাহার যায় না ভোলা, আজ বাঙালী কাঁদছি সবাই
শোকে!
বাঙলাদেশের আকাশ, বাতাস, বনের পাখী, সবাই তাকে
ডাকে।
অমর লোকের এই কবিকে—'কপোতাক্ষ' ডাকছে
মর্ত্যলোকে!

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর পেতে হলে জ্যোতিষাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানাবেন। যাঁদের জন্মসময় প্রায়ই ভুল, প্রায়ই ঘড়ি বিশেষজ্ঞদের ধরা যা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri' Ephemeris বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ জ্যোতিষাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটীর বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন। অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটী ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি কুপন'-এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

পত্র লেখার সময় ও তারিখ পত্রে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপও পাঠাতে পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্ঘাটনের সহায়ক হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না; Stamp pad ink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink, Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভুষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে বৃথা খরচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও জ্যোতিষাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় বা গুরুতর বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন যার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। একটু প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন।

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধতে পারবো কি?" "দেনা শোধ করতে কত সময় লাগবে?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে"—এই সব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যই আকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনকভাবে দিতে গেলে জ্যোতিষাচার্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

ভারতবর্ষ অগ্রহায়ণ—১৩৭৬ গ্রহ-জগৎ

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

ফ্রান্স
১৯২৮

The passion of Joan of Arc

১৪১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী ফ্রান্সের এক অজ পাড়াগাঁয়ে জোয়ান অফ আর্ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা উভয়েই গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। গরু, মেষ, ঘোড়া চরানোর মাঝে ত্রয়োদশী বালিকা তন্ময় হয়ে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব বিস্মরণ হোত। সমবয়সী বন্ধুদের বলতো রাণীর পোষাকে ডপস্বিনী ক্যাথরিন এবং মার্গারেটকে আমি প্রায়ই দেখি এবং তাঁদের দৈববাণীও শুনি। তাঁরা আমায় নির্দেশ দিয়েছেন দণ্ডধর চার্লসকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার সব দায়িত্ব আমার এবং আমি ঐ কার্যের জন্যই পৃথিবীতে এসেছি। এই দৈববাণীর ওপর নির্ভর করে জোয়ান বিভিন্ন সময় নায়ক বা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিন্তু প্রত্যেকেই এটাকে বালিকাসুলভ চাপল্য বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। অবশেষে নানান্ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে জীবনের সেই লগ্নক্ষণ এলো এবং তিনি ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে যে অর্লিন্স সাত মাস ধরে ইংরাজ সেনাদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল তাহা নয় দিনের মধ্যে মুক্ত করে দণ্ডধর চার্লসকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। একের পর এক যুদ্ধে ইংরাজদের পরাস্ত করে জোয়ান ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের হস্তে বন্দী হন। বন্দী জোয়ানের বিচার হয়। বিচারে তাঁকে ডাইনী, যাদুকরী ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করে তাঁকে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেওয়া হয়। রুয়েনে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। যে ফরাসীরা জোয়ানকে সন্দেহের চোখে দেখতেন—যাদুকরী, ডাইনী বলে বিশ্বাস করতেন—জোয়ানের মৃত্যুর পর তারা অলৌকিক ভাবে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে গেলেন। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। সামন্ততান্ত্রিক কলহের সূত্রপাত যে যুদ্ধের—জাতীয় যুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি। জোয়ানের মৃত্যুর পূর্বে যা সম্ভবপর হয়নি, তাঁর মৃত্যুর পর সেই ফ্রান্সের জনগণ এক রাজার রাজত্বে হলে সমবেত হয়েছিলেন। ডাইনী জোয়ান অব আর্ক জন্মেছিলেন ১৪১২খৃঃ, পুড়েমরেছিলেন ১৪৩১ খৃঃ, ১৪৫৬ খৃঃ পুনর্বাসিত হয়েছিলেন, সন্তের বলে সম্মানিত হয়েছিলেন ১৯০৪ খ্রীঃ, আশীর্বাদ ধন্য বলে ১৯০৮ খ্রীঃ, এবং ১৯২০ খ্রীঃ সাধু ডপস্বিনীদের শ্রেণীভুক্ত হন। দণ্ডধর বসন্তের পুষ্পরাজি পাপড়ি-দল মেলবার পূর্বেই ধরণীতে ঝরে গেল।.....

ইতিহাসের এই পটভূমির উপর "দি প্যাশন অফ জোয়ান অব আর্ক" গড়ে উঠেছিল। কার্ল থিয়োডর ড্রেয়ার—যিনি এই চিত্র উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য চিত্রও ফিল্ম যাদুঘরের অন্যতম আশ্চর্য সংগ্রহ। তিন দশক আগে যখন এই চিত্র মুক্তিলাভ করেছিল, তখনই এই চিত্র নিয়ের মাধ্যম কি হওয়া উচিত; সত্য শিব সুন্দরের ব্যঞ্জনা কি—সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চিত্রটি মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই "আর্ট ফিল্ম" হিসাবে সকলের প্রশংসা অর্জন করে। এই চিত্রের সেনাধ্যক্ষ বা মানুষের ধর্মবুদ্ধি বিশ দশকের বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন দর্শকদের আকৃষ্ট করে নি; ধার্মনৈতিক কারণে সেনাধ্যক্ষের ভাবমূর্তি বা সৌন্দর্যের প্রতিও তাঁরা বিরূপ ছিলেন এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রতিও তাঁদের মনোভাব সদয় ছিল না।

কোনো জিনিস আস্তে আস্তে ভেঙে পড়লো, বা পড়ছে এবং পুনরায় তাকে ঐন্দ্রজালিকের মত পূর্বাবস্থায় সঠিক অবস্থায় দেখানো, সম্ভবপর হয়—চলচ্চিত্রে, উল্টা দিক থেকে দেখিয়ে। গীর্জায় জনকে পোড়ানোর পর তাকে ডপস্বিনী বলে রূপান্তরিত করার দৃশ্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেমন "The blood of a poet"-এ কাব্যখানার চিমনিটি দাড়াক্ষণই ভেঙে পড়েছে।

ড্রেয়ারের ইচ্ছা হয়েছিল বাহ্যিক বাস্তবতা, জোনের

মানবিকতা বোধ, তার জীবনের নাটকীয় অংশবিশেষ, ভাব বিচার ও শান্ত নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা। আইজিস বেরির মন্তব্য—ড্রেয়ারের টেকনিক এমন কিছু নতুনত্বে ভরা নয়, কেবলমাত্র ফিল্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা ছাড়া। আধ্যাত্মিক বাস্তবতা—জনের নয়নীয় নৈতিক বাস্তবতার মধ্যে এবং তার দুঃখ কষ্ট ভোগ করার মধ্যেই ছিল। ডাইনী বা যাদুকরীর কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধরনের চিত্র "Day of wrath"—ড্রেয়ারকে ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান এনে দিয়েছিল। ডাইনী বা যাদুকরীদের শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ, মানুষের আত্ম উপলব্ধির করুণ পরিণতি—ড্রেয়ারের চিত্রেই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। পুরাতন ঐতিহাসিক নথি-পত্রের সাহায্যে জোসেফ ভেন-টেল ড্রেয়ারের চিত্রনাট্যকে, বিশেষভাবে দৃশ্য, শেষ বিচারের পর্বটি আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। কড়সফ মাতের আলোক চিত্রের কাজ অতুলনীয় বললেও তাঁর প্রতি অর্ঘই মূল্য আরোপিত হবে না। যদিও জোনের উপর পূর্বে যে সমস্ত চিত্র তোলা হয়েছিল সেই গুলিতেও ক্যামেরার চাতুর্য্যই বেশী প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু বহুদোষ গুণ সত্বেও ড্রেয়ারের এই চিত্রে জোনের আত্মবিশ্বাস যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা তুলনাহীন। গীর্জার বাইরের এবং ভেতরের দারুণ প্রাচীরের মধ্যে যেখানে বিচারপর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছে তা যেন সময়ের পশ্চাদ্‌পট এবং জনকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে "সিলুয়েট ফিগার" বা প্রতীকী ছায়া বলে মনে হয়। পুরুষত্বাপন্ন কৃষক বালিকা জোন চটের পোষাক পরে বধ্যভূমিতে যাচ্ছে, নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ মুহূর্তে জনের কেবলমাত্র ঠোঁট দুটি নড়ছে, কোন প্রকার শব্দ নেই—একটি নাটকীয় মুহূর্তের সূচনা করে। (নির্বাক চিত্র হলেও অন্তরঙ্গময় ভাষার যে লেখা দিয়ে কথোপকথন দেখানো হয়, এখানে তা'ও অনুপস্থিত)। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে জোনের পোষাকের টুকরা টুকরা অংশের দৃশ্য, অগ্নিকুণ্ডের ধূম আস্তে আস্তে সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়েযাচ্ছে—দর্শকদের চক্ষুকে সজল করে তোলে। এই করুণ দৃশ্যটির সঙ্গে একমাত্র মার্গারেট গথিয়ারের মৃত্যু দৃশ্যটির তুলনা করা চলে। পোষাক চিত্রটির অভিনেত্রী গ্রীটা গার্বোর অতুলনীয় অভিনয়ে স্পন্দিত এবং জোনের চরিত্রটি রিলি ডালে কনেটির চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ায় ধন্য।

• • • •

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

শোভা সেনগুপ্ত—হিন্দুস্থান রোড—কলিকাতা

সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মারফৎ কিছু জানতে চাওয়াটা অসুস্থ মনের পরিচায়ক নয় কি? অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে সাধারণের সম্পর্ক কি?

o কোন সম্পর্কই নেই। সুস্থ সমাজ থাকলে তবে ত সুস্থ মনের খোঁজ আপনি পাবেন! অসুস্থ সমাজের কাছ হতে আপনি এর চাইতে কি বেশী আশা করতে পারেন? তাছাড়া আমাদের, বাঙালীদের আরও একটা দিক আছে। দৈনিক বেশ কিছুটা পরিমাণে পরচর্চা ও পরনিন্দা না করতে পারলে বদ হজমের আশঙ্কা আছে।

o o o

প্রকাশ ঘর, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী রোড, কলিকাতা

হ্যাঁ, না, হচ্ছে, হবে না, এই রকম ধারণারা উত্তর দেন কেন?

o উত্তরটা নির্ভর করে প্রশ্নের উপর বলেই।

• • •

বসুধারা পাইন—বিধান সরণী—কলিকাতা

কিশোর কুমার বাংলায় একটা ছবি প্রযোজনা করবেন শুনছি। সত্যি নাকি? কে কে অভিনয় করবেন?

o যোগদান অপর্ণা সেন, কিশোরকুমার ও তারা বন্দ্যোপাধ্যায়

• • •

জপমালা পুরোকাইত—বনহুগলী

"রাধনীর" ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য কতদূর? কলকাতায় তো মুক্তি হয়েছে বলে মনে হয় না।

○ ব্যবসায়িক সাফল্যের খবর একমাত্র প্রযোজকরাই বলতে পারেন। ও ব্যাপারে কোন উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

• • •

মণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—চণ্ডীতলা রোড—কলিকাতা

দীপচাঁদ পরপর কাঁকারিয়া প্রযোজনা ও পরিবেশনা সংস্থাগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন না কি?

○ এরকম বিচিত্র খবর আপনি কোথায় পেলেন? আজ অবধি কোথাও শুনেছেন কি কোনও মাড়ওয়ারি ব্যবসা সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে?

• • •

পাপিয়া মিত্র—কারসটেয়ারস টাউন—দেওঘর

জলের তলায় ফটো তোলা হয়েছে বলে "অনমোজ-মোডি" ছবির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। জলের তলায় ফটো কি ভাবে তোলা হয়?

○ দুরকম ভাবে জলের তলায় ছবি তোলা যায়। এক—জলের তলায় ছবি তোলবার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত ক্যামেরা নিয়ে সরাসরি জলের তলায় ডুবসাঁতার দিয়ে ছবি তোলা যায়। দুই—বিরাট কাঁচের চৌবাচ্চা তৈরী করে চৌবাচ্চার বাইরে হতে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হয়। শিল্পীরা অবশ্য কাঁচের চৌবাচ্চার ভিতরে নেমে প্রয়োজনানুযায়ী অভিনয় করেন।

• • •

অসিত বসু—ডাক্তার লেন—কলিকাতা

অরণ্যের দিনরাত্রির পরে সত্যজিৎ রায় কি ছবি করবেন?

○ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' করবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

• • •

যমুনা রায়—ডোভার লেন—কলিকাতা

মাধবী মুখার্জি (চক্রবর্তী) নাকি মা হয়েছেন

○ হ্যাঁ, একটি কন্যার।

• • •

শেখর দাস—বারাসত—২৪পরগনা

সুচিত্রা সেনের পরবর্তী ছবি কি?

○ সুশীল মুখার্জী পরিচালিত "মেঘ কালো"।

• • •

জয়ন্ত হালদার—প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট—কলিকাতা

পঙ্কজ মল্লিক নাকি আবার গানের সুর দিচ্ছেন?

○ গানের সুর দেওয়া উনি ছেড়ে দিয়েছিলেনন কবে তাতো জানতুম না!

• • •

অনিতা দাসগুপ্ত সুকুমারীমোহন এভিনিউ, কলিকাতা

নিজের দেশের প্রথমী চলচ্চিত্রের খবর রাখি না, পরের দেশের দেখে কি লাভ বলতে পারেন?

○ আপনারাই জানেন!

• • •

সুনীল পাল—আনন্দপুর রোড—কলিকাতা

ইদানীং কোলকাতায় যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল তাতে দিল্লীতে পুরস্কার প্রাপ্ত কোন ছবি কোলকাতায় এলো না কেন?

○ কোলকাতার লোকেরা ঐসব পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি দেখবার অনুপযুক্ত বলেই।

• • •

অরুণাভ মৈত্র—রামমণি বাজার—কলিকাতা

সংরক্ষণ সমিতি প্রভৃতি সেন্সার বিষয়ক ছবি রিলিজের যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে ১৪।২০ খানা ছবি দেখা হয়ে গেলে তারপর কি করবেন?

○ আবার নতুন ছবি তুলবেন।

• • •

শোভনা দেবী—বেকবাগান রোড—কলিকাতা

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়াটা অসুস্থ মনের পরিচায়ক নয় কি? শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে সাধারণের সম্পর্ক কি?

○ কোন সম্পর্ক নেই। তবে এ জাতীয় কৌতূহল পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়। আর অসুস্থ মনের কথা বলছেন? সুস্থ সমাজ থাকলে তবেতো সুস্থ মনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

• • •

অমূল্য সাহাল—আশকার গার্ডেন—আসানসোল

"দিবারাত্রির কাব্য"র পরিচালক কে?

○ বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী

• • •

বিভাস মিত্র—বাটানগর

"অরণ্যের দিনরাত্রি" মুক্তি উপলক্ষে প্রাচী সিনেমায় যে তাণ্ডব হলো সেটা আপনি কি সমর্থন করেন?

○ যারা তাণ্ডব করেন তার কি কারুর সমর্থন বা অসমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করেন! তাছাড়া গায়ের জোরে "অরণ্যের দিনরাত্রি"কে রিলিজ করতে তাণ্ডবটাকেই বা কি করে সমর্থন করেন? কাগজে দেখলাম কর্তৃপক্ষ তো তথ্যমন্ত্রীর নামও তাতে টেনেছিলেন এই ব্যাপারে।

• • •

কল্যাণ রায়—বাঘা যতীন কলোনি—যাদবপুর

"কমললতা"র সুচিত্রা সেনকে আধুনিক শহরে বৈষ্ণবী বলে মনে হল। শরৎবাবুর গল্পের দফারফা করে দিয়েছেন

মনে হয় উনি কমললতার চরিত্রটা একে- পারেন নি।
পারলেও তিনি নিরুপায়। সুচিত্রা সেন যেখানে সেখানে ওধরণের ব্যাপার ঘটলে[illegible] হবেই। বৈষ্ণবী হলে তার [illegible] কান[illegible]ar না এরকম কোন কথা [illegible]

* * *

[illegible]মা হালদার—বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা
সৌমিত্র চ্যাটার্জির পরবর্ত্তী ছবি কি?
খুবসম্ভব মঙ্গল চক্রবর্ত্তী পরিচালিত "আলেয়ার-[illegible]" ও ইন্দর সেন পরিচালিত "প্রথম কদম ফুল" এবং অজিত লাহিড়ী পরিচালিত "রক্তগোলাপ"।
(২) অনিল চ্যাটার্জিকে বহুদিন দেখতে পাইনা কেন।
০ ইদানীং "প্রতিদান" ছবিতে দেখা গেছে

* * *

অরূপ চৌধুরী—বাগনান
উদয়শঙ্কর শীঘ্রই নাকি "শঙ্করস্কোপ" নামে এক আজব [illegible]াবেন? জানলে কিছু বিস্তারিত বলবেন?
আজব চিজের খবর আপনারাই তো বেশী রাখেন [illegible] শঙ্করস্কোপ জাতীয় কোন জিনিষের নাম আমি এখনও কিছু শুনিনি।

* * *

রমেন [illegible]মিক—পঞ্চাননতলা লেন—হাওড়া
সাগি[illegible]াহাতোর হিন্দী সংস্করণ হবে বলে শুনেছি। বাংলা [illegible]ন্দী করার চেয়ে একসঙ্গেই দুটো ছবি তুললে এই [illegible]ওার বাজারে দুটো পয়সা বাঁচতো নাকি? আ[illegible]মনে হয়?
[illegible]না মাহাতোর হিন্দি চিত্ররূপের কথা এখনও কিছু [illegible]ন। "সাগিনা মাহাতোর" [illegible] চালক তপন সিংহ "আপনজনের" হিন্দি [illegible] বলে শুনে[illegible]। সঠিক খবর পরে জানান হবে।

* * * *

নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য—ছকু খানসামা লেন—কলিকাতা
এটা মেয়েদের যুগ কি বলেন? ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে রাণী এলিজাবেথ, ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, এবং সুচেতা কৃপালনী, পদ্মজা নাইডু, শ্রীমতী বন্দর নায়ক, প্রভৃতিরা বেশ ভালভাবেই আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। পৃথিবীর প্রথম সম্রাজ্ঞী কে ছিলেন বলতে পারেন?
০ মিশরের রাণী হাটসেপসুট।

* * *

প্রসাদ ত্রিবেদী—ডাক্তার লেন—কলিকাতা
কলকাতায় টেষ্ট খেলতে এসে পতৌদির নবাব হোটেলে না উঠে শ্বশুরবাড়িতে [illegible]লেন। শ্বশুরবাড়ীতে উঠলে খেলার ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হ[illegible]
০ ক্রিকেট খেলার ডিসিপ্লি[illegible]ভিড় ক'রে না জানিনা তবে দা[illegible]খেলার ডিসিপ্লিন বোধহয় এক [illegible] থাকে।

* * *

নবকুমার পাল—হালতু, কসবা
ষ্টেজে মিস্ লাইট নামে পুরোনোদিনের কোন অভিনেত্রী ছিলেন কি?
০ ছিলেন। মিনার্ভার ষ্টেজে তিনি একসময়ে নিয়মিত অভিনয় করতেন।

* * *

মন্নুয়া রায়—রমেশ মিত্র রোড—কলিকাতা
(১) রাজনীতির ব্যাপারে আপনি কোন্ দলকে সমর্থন করেন……
০ সুবিধাবাদী দলকে

* * *

(২) এইরকম [illegible]রাষ্ট্র সং) [illegible]দেশ আর কতদিন চলবে?
০ যতদিন না শক্ত হাতে রাশ [illegible] কোন নেতা আসছেন, ততদিন।

* * *

[illegible]য় সং—ছায়া[illegible]

[illegible]চিত্রে রূপা[illegible]

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[illegible]াস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।